

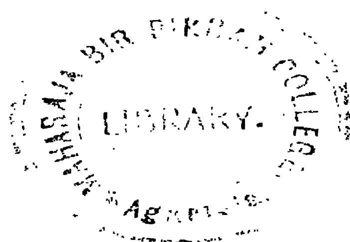
প্রবোধকুমার সান্যাল



দেবতাত্মা হিমালয়

[দ্বিতীয় খণ্ড]

প্রবোধকুমার সান্যাল



॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা-১২ ॥

[এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ]



প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
কলিকাতা-১২

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

নয় টাকা আট আনা





[illegible]পরিচয়

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ... [illegible]

ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগ ... [illegible] অভিযান

ভারতীয় তথ্য ও প্রচার বিভাগ ... [illegible]

শ্রী[illegible] সেন ... [illegible]

শ্রী[illegible] ... [illegible]

শ্রী[illegible]প্রসাদ [illegible] ... [illegible]

শ্রীমাণিক বন্দ্য ... [illegible]

শ্রী [illegible] সরকার ... ভুটান

[illegible] ... জোশী [illegible]

[illegible] ... [illegible]

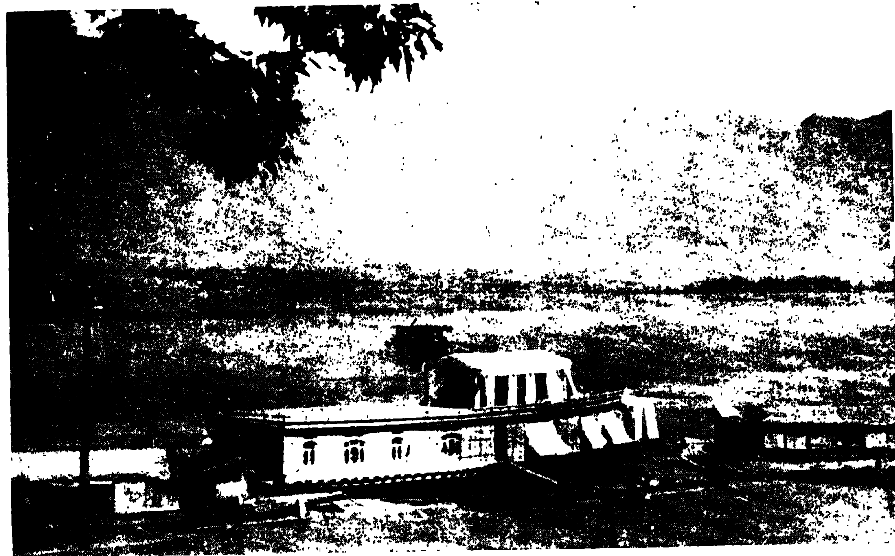
শ্রী বি-এন সরকার ... [illegible]

শ্রীঅজিত [illegible] ... [illegible]



খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীর প্রথম গান্ধার বুদ্ধমূর্তি

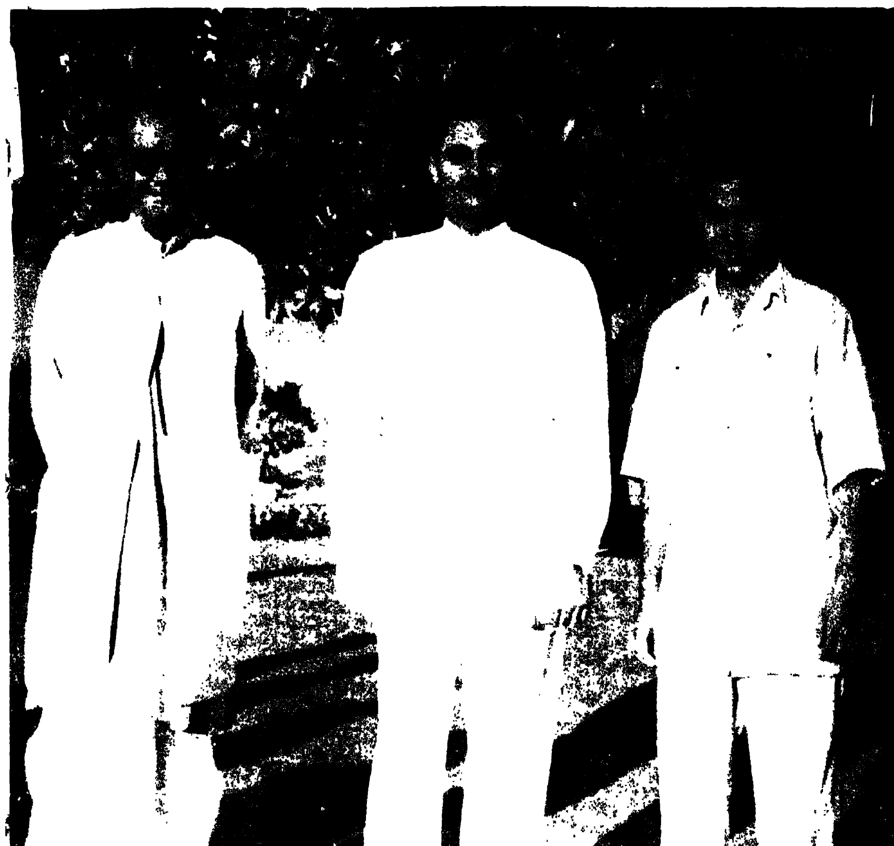
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

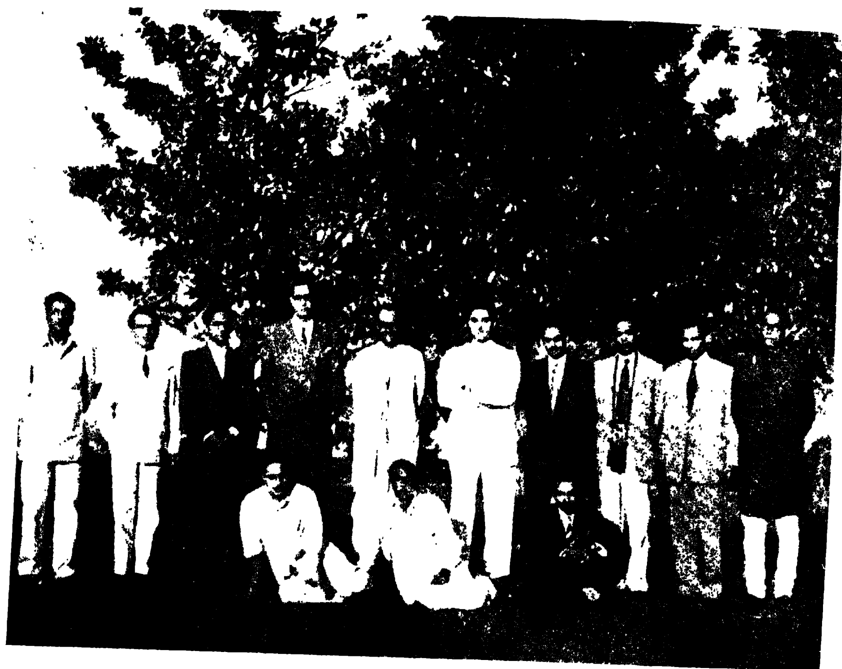


[illegible]বাগ থেকে [illegible]

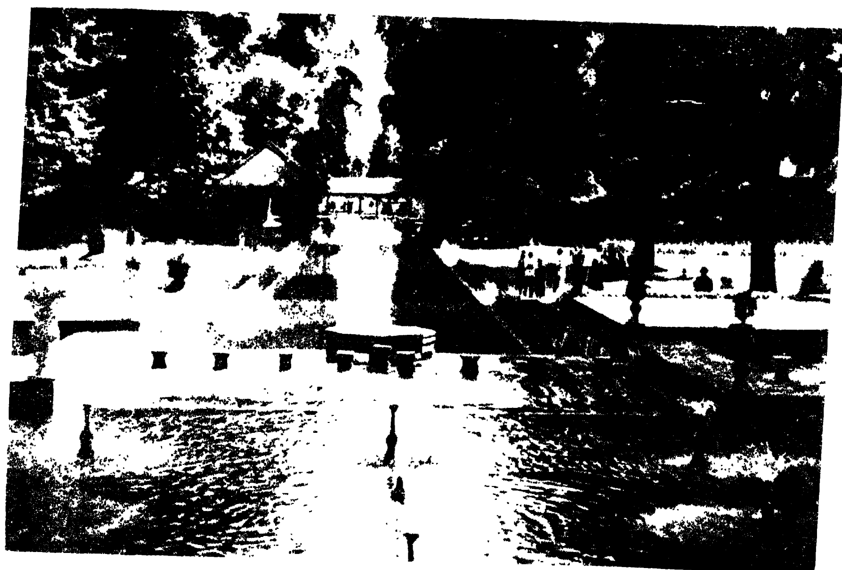


নিশাৎবাগ — অদূরে 'ডাল' হ্রদ





কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখকসহ [illegible]



শালিমার বাগ

I have been asked by Shri P.K. Sanyal to send a message to the people of Bengal. All I can do is to send the people of that great land my best wishes. I hope to some day visit your State which has played such a noble and dynamic role in the history of our nation.

Karansingh

29th. August 1953.
Karan Mahal
Srinagar.







মার্তণ্ড মন্দির ললিতাদিত্যের স্থাপত্যকীর্তি



মার্তণ্ড শহরের প্রান্তে সম্রাট ললিতাদিত্যের স্থাপত্য অবশেষ





শিলঙের পার্বত্য শোভা ও পাইন অরণ্য

[illegible]



[illegible] মন্দির



শ্রীনগরের দ্বিতীয় 'কদল' (সাঁকো)

ক্ষীরভবানীর প্রধান মন্দির

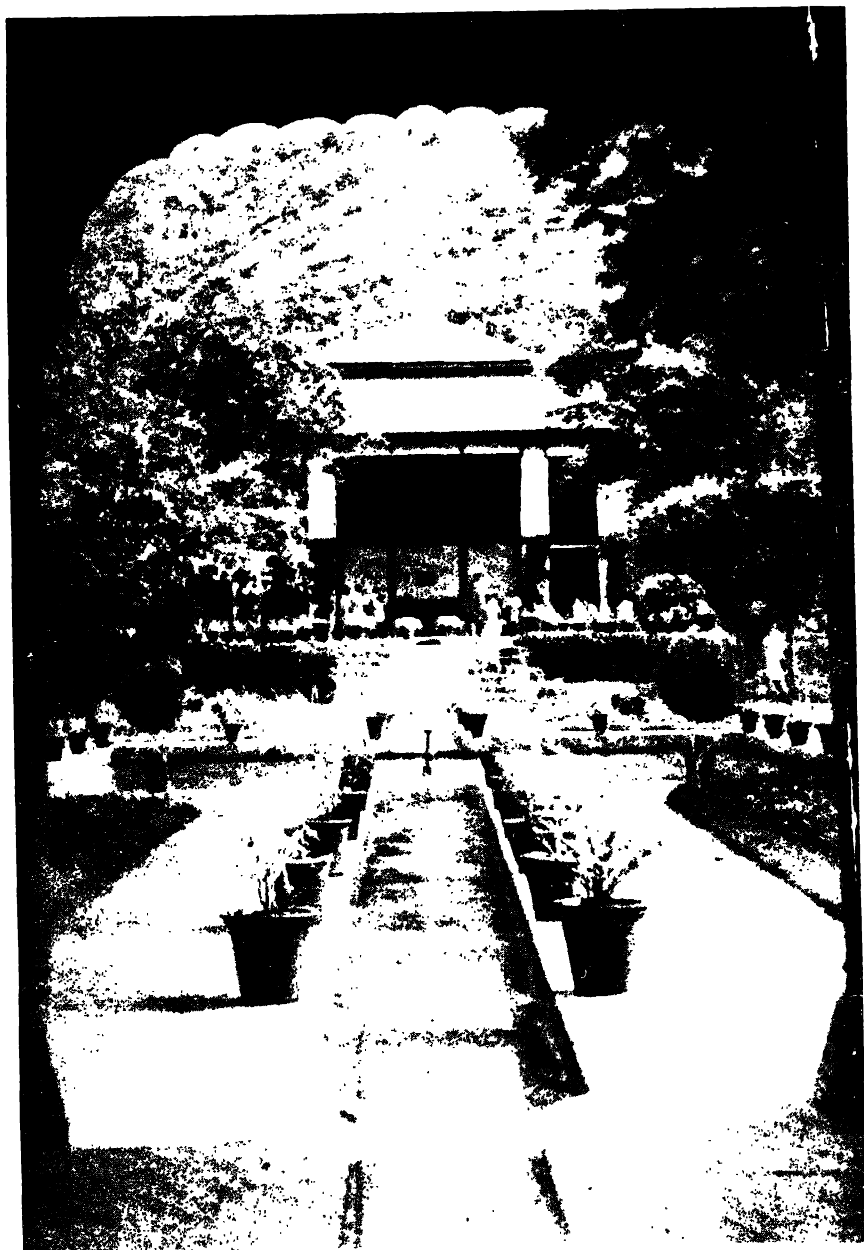


নাগিনী সরোবর





তুষারপ্রাকার বেষ্টিত পাইনসমাকীর্ণ গুলমার্গ শহর



॥ ১ ॥

পুরাণে দেবী ধরিত্রী প্রশ্ন তুলেছেন : প্রভু, তোমার আপন স্বরূপ লুকালে কোথায়? মানবাকারে তুমি প্রকাশ নও কেন? ওই উদার গিরিশৃঙ্গমালার বিশাল মৌনে কেন তুমি আপনাকে অভিব্যক্ত করেছ?

পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণু জবাব দিচ্ছেন : প্রিয়ে, মহাহৈমবতের ওই প্রসন্ন আনন্দ-স্বরূপ ক্ষুদ্র মানবাকারের মধ্যে কোথা? ওখানে প্রস্তর-কাঠিন্যে দেবতাত্মার প্রকাশ। ওই বিরাট তুষারশৈলাধার সকল দুর্যোগ, শীতাতপ, ভয়, মৃত্যু, বেদনা, জরা ও জয়োল্লাসের অতীত। মহৎ স্থাণুর মধ্যে দেবতাত্মা যোগাসীন। তিনি অজর, অব্যয়, অমেয়।

ধরিত্রী তাঁর শিয়রে ধারণ ক'রে রয়েছেন মহাজট তুষারকিরীট দেবাদিদেবকে, যিনি চিরতন্দ্রায় নিমীলিতনেত্র,—যিনি আত্মস্থিত যোগাসীন। সুদূর দক্ষিণে ধরিত্রীর চরণচুম্বন করছেন মহাজলধি আপন তরঙ্গরঙ্গে!

এই ভুবনমনোমোহিনী তুষারকিরীটিনীর দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে রয়েছেন সম্রাট অশোক। তিনি ধ্যানস্থ, আত্মসমাহিত। ভারতবর্ষের সুদূর ভবিষ্যতের দিকে এই জগদ্‌বরেণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠের দৃষ্টি নিবন্ধ—সাম্প্রতের আবরণ সরিয়ে। দুই হাজার দু'শো বছর আগেকার কথা।

পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসম্মেলন হয়ে গেল। রাজধর্মকে কল্যাণধর্মে রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সম্রাট। পৃথিবীর প্রথম মানব-সভ্যতা প্রবর্তনের প্রাথমিক নীতিকে উৎকীর্ণ করেছেন তিনি পঞ্চশিলায় ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শে। কিন্তু তবু তাঁর আনন্দ নেই মনে, ললাট চিন্তান্বিত, দৃষ্টি বিষণ্ণ। দেশদেশান্তরাগত সন্ন্যাসীগণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হে অমিত-তেজঃ, তুমি কি তুষ্ট নও? আসমুদ্রহিমাচল কি তোমাকে বরণ করেনি?

সম্রাট ধর্মাশোক জবাব দিলেন, মহাত্মন্, আমি ভিক্ষু,—আমি বুভুক্ষু কল্যাণের। বিশ্বমানবের দুঃখ, মৃত্যুভয়, নিরানন্দ—এরা বিদূরিত না হ'লে কোথা আমার শান্তি, কোথা বা এই দেবভূমি ভারতের আনন্দ? সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি কোথা?

কর্তব্য আদেশ করুন, হে ভিক্ষুপতি!

গৈরিকবসনাবৃত নগ্নপদ দারিদ্র্যভূষণ সম্রাট-ভিক্ষু নতজানু হলেন [illegible] গণের পদপ্রান্তে। বিগলিত অশ্রুনয়নে নিবেদন করলেন, মহাত্মন [illegible] বুদ্ধের যোগধর্ম প্রচারিত হোক বিশ্বময়, সপ্তদ্বীপায় তাঁর বাণী নবক[illegible]

আনয়ন করুক, বুদ্ধের দৈবসত্তা প্রতি মানবের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হোক,—এই আমার জীবনের ব্রত। অহিংসার মন্ত্রে পৃথিবী দীক্ষালাভ করুক, প্রেমের মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত হোক, ত্যাগের মন্ত্রে তাদের সিদ্ধিলাভ ঘটুক, শান্তিময় সহস্থিতির মন্ত্রে তা'রা নবজীবনবেদের ব্যাখ্যা লাভ করুক। আমার নির্বাণ-লাভের পূর্বে বিশ্বজীবনের এই সার্থকতা দেখে যেতে চাই, মহাত্মন্!

রাজভিক্ষুর সেই একান্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছিল,—ইতিহাসে এই সংবাদটি পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার-কামনায় কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে গান্ধারের দিকে এবং পূর্বে তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার দিকে সন্ন্যাসী ভিক্ষুগণকে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর কেউ তখনও জাগেনি। মঙ্গোলিয়া ও মিশর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন; ব্যাক্টিরিয়া, আসিরিয়া, ইয়ারখন্দ, চীন—সবাই ঘুমিয়ে। ইউরোপ উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায় বনে অরণ্যে আর সমুদ্রতীরে; আমেরিকার জন্ম হয়নি। সম্রাট অশোকের আবেদনের ফলে তিব্বতে, মধ্যএশিয়ায় ও গান্ধারে বৌদ্ধভিক্ষুগণ বৌদ্ধসভ্যতার কীর্তি স্থাপন করেন। সেই কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে কুন্লুন গিরিমালার উত্তর পারে বিশাল তাক্লা মাকানের মরুলোকে—ইয়ারখন্দ, খোটান ও কেরেয়া নদের এপারে ওপারে,—যাদের নাম মাসারতাগ, কারাডঙ, দানদান উইলিক, আইপা ইত্যাদি। শত সহস্র বৎসরের বালুর ঝাপটা এই ধ্বংসাবশেষগুলিকে আজও বিলুপ্ত করতে পারেনি। আজও এদের বালুপাথরের প্রাকার গৌতম বুদ্ধের বাণীকে বহন করছে।

সম্রাট অশোকের এই বিশ্ববৌদ্ধবাণী-সাধনার প্রথম কেন্দ্রে পরিণত হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিল কাশ্মীর। প্রথম কাশ্মীর থেকে ভিক্ষুর দল প্রবেশ করেছিল সম্রাট অশোকশাসিত গান্ধারে,—যে-গান্ধারে একদিন মহাভারতীয় চন্দ্রবংশের প্রভুত্ব ছিল। আজকের মতো সেদিনও গান্ধারের প্রধান প্রবেশপথ ছিল 'পুরুষপুর', একালে যে শহরটিকে বলা হচ্ছে পেশাওয়ার। রাজধানী পুরুষ-পুরকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র গান্ধারে বৌদ্ধ সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন সম্রাট-ভিক্ষু অশোক।

ভারতের উত্তরে কাশ্মীর থেকেই বৌদ্ধসভ্যতা প্রথম দিগ্বিজয়ে যাত্রা করেছিল। সেদিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য সীমানা আজকের মতো চিহ্নিত ছিল না। ওদিকে পারস্যের পথ এবং এদিকে তিব্বত-মঙ্গোলিয়ার পথ সম্পূর্ণ অবারিত ছিল। মানবধর্মনীতি ও সুশাসনের প্রভাবে সকল জাতির মানুষ সেদিন সহজে বশ্যতাস্বীকার করতো। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্য, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, এবং দক্ষিণে সিংহল, ও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্রাট অশোকের ধর্ম ও মানবতার নীতির নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে আনন্দ পেয়েছিল।

এই কীর্তি ভারতের সংস্কৃতির—কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর ছিল এই সংহতিমন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। শত শত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে চ'লে এসেছে এক ঐতিহ্য আর সভ্যতা। মহাপ্রলয় ও ঝঞ্ঝা, সংহার ও সৃষ্টি, অগণিত

দানবীয়তার দংষ্ট্রাঘাত, অসুরের করালচক্ষু, এবং সংখ্যাতীত সন্ন্যাসী ও দৈব-মানবের ভয়হীন প্রতিভার স্বাক্ষর—কাল-কালান্তের সকল ইতিহাস চিহ্নিত রয়ে গেছে এই সংস্কৃতির পর্বে পর্বে। কিন্তু একথা সত্য, আড়াই হাজার বছর আগে গৌতমবুদ্ধের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ভারতেরও নবজন্মলাভ ঘটে।

কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম।—

ধবলাধার গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে সোজা উত্তরে, উত্তর থেকে পূর্বদিকে তা'র শাখা-প্রশাখা। উলঙ্গ ফকিরের মতো সে ঊর্ধ্ববাহু, বুভুক্ষায় বঞ্চনায় সে যেন চিরদরিদ্র। আমাদের পথ ধবলাধারের দিকে নয়, আমরা যাবো উত্তর-পশ্চিমে,—ইরাবতী নদী পেরিয়ে জম্মুর দিকে। পুরাকালে চাক নামক এক বর্বর পার্বত্য জাতি কাশ্মীরের উপর প্রবল অনাচার করেছিল, সম্ভবত তাদেরই নামানুসারে চাক্কি নামক একটি চেক্-পোস্ট পাশে রেখে আমরা পাঠানকোট থেকে বেরিয়ে মাধোপুর ও লক্ষণপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। গত রাত্রে আমরা জলন্ধর থেকে পাঠানকোট পর্যন্ত শতদ্রু এবং বিপাশা অতিক্রম ক'রে এসেছি। বস্তুত কাশ্মীর পরিভ্রমণকালে কোনো না কোনো সময়ে পঞ্চনদ এবং সিন্ধুনদ না পেরিয়ে উপায় নেই। নদীর সঙ্গে যোগাযোগ না করলে পার্বত্যভূমিতে আনাগোনা করা যায় না। আসামে ব্রহ্মপুত্র, ভুটানে রায়ডাক আর কালচিনি, সিকিমে তিস্তা আর রংগীত, দার্জিলিংয়ে মহানন্দা, নেপালে বাগমতী, কুমায়ুনে কোশী আর গঙ্গা-যমুনা,—যেখানে যাও, যে কোনো পাহাড়ে, যে কোনও হিমালয়ে। প্রভাতের প্রথম রক্তরশ্মির নীচে দিয়ে দেখে এসেছি শীতলসাগর হ্রদ, অতিক্রম ক'রে এসেছি বিপাশার গৈরিক স্রোত। দেখে এসেছি এই সুদূর উত্তরেও ছড়িয়ে রয়েছে বাঙলা দেশ এখানকার পথে প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে আর গুল্মলতায়—সমস্ত নীলাভ ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে। দূরে দূরে ধূম্রাভ গিরিশ্রেণীর স্তবকে স্তবকে শ্রাবণশেষের বর্ষণক্লান্ত মেঘের দল বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রজাপতি পতঙ্গরা পথে বেরিয়ে পড়েছে সূর্যকিরণে।

পাঠানকোট থেকে জম্মুর পথ আগে ছিল অব্যবহার্য, এখন সে-পথ চিক্কন ও মসৃণ। শিয়ালকোট থেকে জম্মু ছিল রেলপথ, কিন্তু শিয়ালকোট এখন পশ্চিম পাকিস্তানে। পাঠানকোট থেকে জম্মু মোটর বাসে গেলে সাতষট্টি মাইল।

সমগ্র কাশ্মীর দুই ভাগে বিভক্ত। পীর পাঞ্জালের এপার হোলো জম্মু উপত্যকা, ওপার হোলো কাশ্মীর উপত্যকা। জম্মু পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল [illegible] জম্মু হিন্দুপ্রধান, এবং কাশ্মীর বর্তমানে মুসলীম-প্রধান বাটোয়ারা।

মাধোপুর ছাড়িয়ে ইরাবতীর পুল পেরিয়ে লক্ষ্মণপুর পিছনে রেখে আমরা চললুম পশ্চিম দিকে। শাল-শেগুন আর শিসমের বনচ্ছায়াময় পাখীডাকা উপত্যকাপথ মধুর লেগেছে মনে মনে। দক্ষিণের হায়দারাবাদের মতো এদিকে পাঞ্জাবের সুদীর্ঘ কোন কোন অঞ্চল মালভূমির মতো; রুক্ষ রক্তিম পর্বতের সানুদেশ লতাগুল্মবিজড়িত। তারই ভিতর দিয়ে কোথাও কোথাও পীর পাঞ্জালের বন্য নদীর রক্তবরণ প্রবাহ ছুটে চলেছে। এই পথ থেকে শিয়ালকোটের সীমানা বড় নিকট। এই রক্তবরণ প্রবাহ ইরাবতীরই শাখাপ্রশাখার অন্তর্গত। এরা আসছে ধবলাধার গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এদের মূল উৎস সম্ভবত পীর-পাঞ্জালে, যার ক্রোড়পর্বত হোলো ধবলাধার। কিন্তু এমনটি দেখিনি কোথাও,—এত লাল, এত রক্তের স্রোত। হয়ত একেই বলে, রক্তগঙ্গা।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নকালে একটি গ্রাম পেরিয়ে গেল। নাম শম্বা। শম্বা অর্থে বিদ্যুল্লতা; যদি শম্ব হয় তবে বজ্রদণ্ড। ছোট পাহাড়ী গ্রাম পূব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত; ডানদিকে পার্বত্য ক্রোড়ভূমি। বনময় উপত্যকা আর আঁকাবাঁকা গিরিনদীর উপলাহত স্রোত নিঃঝুম মধ্যাহ্নকে নিবিড় ক'রে তুলেছে। দূর দিগন্তে ঠাহর করা যায় পাঞ্জাবের বিশাল সমতল, আর সেই সমতলের থেকে শিরদাঁড়া ও মেরুদণ্ডের মতো হিমালয়ের পার্বত্য শিরা উপশিরাগুলি উত্তরখণ্ডের দিকে প্রসারলাভ করেছে। এরাই হোলো হিমালয়ের ভিত্তি, এরাই হোলো তা'র ভৌগোলিক পঞ্জর-বন্ধন।

কিছু অস্বস্তি ছিল মনে, কিছু বা শঙ্কা। দিল্লী থেকে বাহির হবার কালে কোনো কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভয় দেখিয়েছিলেন, কাশ্মীরে রক্তারক্তি চলছে, ওদিকে নাই গেলেন! সেটা ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্টের মাঝামাঝি। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে শেখ আবদুল্লা গদিচ্যুত হয়েছেন, এবং কয়েক সপ্তাহ আগে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীনগর প্রান্তে আটক অবস্থায় হঠাৎ মারা গেছেন। অজানা ভবিষ্যতের ভাবনায় সমগ্র কাশ্মীর উদ্বিগ্ন।

দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করি, রক্ত দেখতে দেখতেই আমরা মানুষ, কারণ আমরা বাঙালী। জীবরক্ত আমাদের খাদ্য, টাট্‌কা মাছ-মাংসের হৃৎপিণ্ডঝরানো রক্ত দেখলে আমাদের মুখ লালাসিক্ত হয়। রক্তাম্বর আমাদের চোখে পবিত্র পরিধেয়। রক্তলোভাতুরা মহাকালী আমাদের ইষ্টদেবী। বলিদানের পুণ্যরক্ত দেখলে আমরা ভাবাপ্লুত হই। সন্ধিপূজায় অসুরনাশিনী চণ্ডীর স্তোত্র শুনতে শুনতে আমাদের আবেশ আসে। রক্তজবা আর রক্তপদ্ম আমাদের পূজার উপচার। আমাদের মেয়ে পায়ে পরে আল্‌তা, মাথায় ধরে সিন্দুর। রাঙ্গাপাড় শাড়ী তাদের সকল উৎসবে পরিধেয়। বাঙালী কবি উদয়াস্ত গগনের রক্তচ্ছটায় কাব্যের প্রেরণা পায়। রাজনীতিতেও তাই। ১৯০৫ থেকে ১৯৫০ অবধি। অগ।

রক্তক্ষরণের কাহিনী। শৈবভারতের রাজনীতি বাঙালীকে অভিভূত করে। রক্তবিপ্লবে তা'রা পেয়েছে আনন্দ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেদিন সংহারমূর্তি নিয়ে দাঁড়ালেন, বাঙালী সেদিন প্রাণের শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য সাজালো তাঁর উদ্দেশে। বাঙলার সরকারী প্রতীক্ হোলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রক্তে বাঙালীর ভয় নেই। এই সেদিনও এক পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাতে গিয়ে কলকাতার পথে-পথে বাঙালী রক্তারক্তি করেছে! কিন্তু তবু সাম্প্রতিক রাজনীতিক বিপর্যয়ের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণ যে-সময়টায় বিস্ময়-বিমূঢ় এবং হতচকিত, ঠিক সেই সময়টিতে অজানা দেশে প্রবেশ করা দুর্ভাবনার কারণ বৈ কি। চারিদিকে চাপা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে, কাশ্মীর মিলিসিয়ার কর্মতৎপরতা নানা দিকে প্রকট, কখন্ আগুন জ্বলে ওঠে কে জানে।

দেখতে দেখতে এসে পড়েছি অনেকদূর। অনেক বাঁক ঘুরেছি, উপত্যকা আর অধিত্যকার সর্পিল গতি আমাদের মোটর বাসকে অনেক চড়াই উৎরাইতে ঘুরিয়ে আনলো। তপ্তরৌদ্রের চেহারায় মধ্যাহ্ন বিগতপ্রায়। সমতলের কোলাহল-কলরব আর কোথাও শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে রাঙ্গামাটির অধিত্যকায় শালশেগুন-শিশমের ছায়ানিবিড় বনে পাখীসমাজের বিশ্রম্ভালাপ চলছে।

পার্বত্য পাঞ্জাব হিন্দুপ্রধান—শিব এবং শক্তির পূজারী। সেইকারণে জম্মু উপত্যকায় প্রায় সর্বত্রই হিন্দুমন্দির। কোথাও রঘুনাথ, কোথাও, রুদ্রেশ্বর, কোথাও বা ভৈরব। রাজপথের বাইরে নিরিবিলি বৃক্ষজটলার মধ্যে চকিতে শোনা যায় পূজাপ্রহরের ঘণ্টারব। কোথাও দেবদেউলের বাইরে এসে দাঁড়ালো পট্টবস্ত্র-পরিহিত পূজারী ব্রাহ্মণ; ছোট পাহাড়ের ওই অনেক উঁচুতে হয়ত চোখে পড়ছে ত্রিশূলীর মন্দিরে শ্বেত ও রক্তপতাকা উড্ডীন। কোথাও দেখছিনে একটিও মসজিদ, অথবা একটিও শিখ গুরুদ্বার। কাশ্মীরের ধমনীতে হিন্দু আর বৌদ্ধভারতের রক্ত বইছে চিরদিন।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। আমাদের মোটর বাস এসে দাঁড়ালো জম্মু শহরে। ঘণ্টাখানেকের মতো ছুটি পাওয়া গেল। জম্মু হোলো পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের মিলনক্ষেত্র।

বড় শহর, মস্ত বাজার হাট। পাহাড়ের নাতিউচ্চ প্রশস্ত উপত্যকায় এই শহর খুবই প্রাচীন। একদিকে পাঞ্জাব এবং অন্যদিকে শ্রীনগর, সুতরাং এ শহরে আমদানি রপ্তানির কাজ প্রচুর। বাহির থেকে নানা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা এসে এখানে রাজ্যপাট বসিয়েছে বহুকাল আগে থেকে। পথঘাট অপ্রশস্ত,—পার্বত্য শহরে যেমন হয়। কোনদিক ঢালু, কোনদিক বা উঁচু। এটি হোলো কাশ্মীর মহারাজার শীতকালীন রাজধানী। এখন মহারাজা হরি সিং তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনত্র নির্বাসিত; তাঁর স্থলে আছেন তাঁরই তরুণ পুত্র করণ সিং,—তিনিই এখন কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ, অর্থাৎ অনেকটা রাজ্যপালের মতো।

বাটোটের কাশ্মীর ও জম্মুতে চাউল হোলো প্রধান খাদ্য, গম নয়। কিছু বিস্ময়

...গে যখন দেখি বাঙালীর অতি পরিচিত ভোজ্য উপকরণ কাশ্মীরের প্রায় সর্বত্র। লাউ বেগুন থোড় কচু কাঁচকলা ঝিঙে উচ্ছে ডুমুর কুমড়ো নটে আর লাউডগা। যদি কেউ মনে করে কাশ্মীরের হিন্দুমুসলমান জনসাধারণ উগ্র এবং বলিষ্ঠ স্বভাব, সে ভুল করবে। ওদের প্রাণশক্তির প্রবল কোনও পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। এমন নিরীহ জাতি ভূভারতে নেই। ওরা তাই মার খেয়ে এসেছে চিরকাল, কিন্তু মাথা তোলেনি একবারও। একবারও শোনা যায়নি, উৎপীড়িত কাশ্মীরীরা বিপ্লব ঘোষণা করেছে, অথবা দস্যুকে বিতাড়িত করেছে। এ দুর্নাম ওদের নেই। শক্তিতে ওরা বাঙালী অপেক্ষা অনেক দুর্বল। ওরা হোলো প্রাচীন আর্যজাতির মহৎ বিনষ্টির সাক্ষ্য। ওরা শুধু মধুরস্বভাব, ওরা অতিথিপরায়ণ, ওরা পরম শান্ত,—কিন্তু না আছে ওদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, না বা আত্মপ্রতিষ্ঠা। যে-কোনো শ্রেণীর শাসক বাইরে থেকে এসে ওদের ওপর প্রভুত্ব করুক, ওরা আত্মসমর্পণ করতে উৎসুক। এই অতি কোমল প্রকৃতির ভিতর থেকে বজ্রের কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে আজ একটি মানুষ, তিনি হলেন বক্সী গোলাম মহম্মদ।

জম্মুর চাউল হোলো ভারতপ্রসিদ্ধ। এমন নধর সুস্বাদু ও শুভ্র তার শ্রী। একটি গুজরাটি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে পথের ধারে এক মনোহারী দোকানে উঠে বসলুম। আমি বাঙালী শুনে দোকানদার সসম্ভ্রমে আসন দিল। কাশ্মীরের জন্য সর্বশেষ আত্মবলি দিয়েছে বাঙালী, অর্থাৎ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। সমগ্র কাশ্মীর এখন বাঙালীর জয়গানে মুখর। বলতে বলতে মুসলমান ছোকরা অতিশয় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার ধারণা, শ্যামাপ্রসাদের অপমৃত্যুর জন্য 'শেখ সাব' সম্পূর্ণ দায়ী। হম কাশ্মীরী হুঁ, কবভি ঝুট্ নহি বোল্‌তা, সাব! দুনিয়াভর ইনসানকো মালুম হো গৈ!

আমাদের মোটর বাস আবার জম্মু ছেড়ে চললো। বেলা অপরাহ্ণ। আমরা এন-ডি-রাধাকিষেণ কোম্পানীর গাড়ীতে যাচ্ছি। এটি লালমোটর, অর্থাৎ ডাকগাড়ী। আমাদের ড্রাইভার অতি ভদ্র এক কাশ্মীরী সৌম্যদর্শন ব্যক্তি, নাম বক্সীজী। পার্বত্যপথের বিপদসংকুল বাঁকে-বাঁকে গাড়ী চালাবার জন্য যে ধীর বিচারবুদ্ধি ও সচেতন দৃষ্টির প্রয়োজন,—বক্সীজীর অনন্যসাধারণ যোগ্যতায় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল পদে পদে।

জম্মু থেকে উধমপুর বেশী দূরে নয়। এবার আশে পাশে অল্পস্বল্প পাওয়া যাচ্ছে পার্বত্য প্রাচীর। ধীরে ধীরে উঠছি চড়াই পথে। নিস্তব্ধ উধমপুর। অদূরে বট-অশ্বত্থের ছায়াচ্ছন্নলোকে একটি মন্দির দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় আজ সেখানে কোনও বিশেষ পর্ব ছিল। পথের বাঁকে রাজার এক উদ্যানবাটির মস্ত তোরণ। তারই প্রত্যেক ঘাঁটিতে দেখা যাচ্ছে মিলিটারী পোষাকপরা সশস্ত্র প্রহরীর দল। উদ্যানটির আয়তন অতি বিস্তৃত এবং দূরে থেকে চোখে পড়ে একটি টিলাপাহাড়ের উপরে একতলা রাজবাড়ী।

আবদুল্লা সাহেব বর্তমানে অন্তরীণাবদ্ধ। তিনি নিজে বন্দী, কিন্তু আছেন সপরিবারে। দেশের নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য বক্সী গোলামের হাতেই বন্দী, কিন্তু শিষ্যের হাত থেকে গুরু তাঁর দক্ষিণা পাচ্ছেন নিয়মিত; অর্থাৎ, চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই তাঁকে আটক রাখা হয়েছে,—সংবাদপত্রাদি এবং বেতার যন্ত্রসহ। তাঁর গতিবিধি প্রাসাদ উদ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রাসাদের বারান্দা থেকে সমগ্র জম্মু উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়।

উধমপুর ছেড়ে গাড়ী ছুটে চললো এবার চড়াই পথ ধ'রে। এবার যেন শতদলের এক একটি দল মেলছে। পূর্বদিকে এবার ধবলাধারের বিস্তার,—আমরা প্রবেশ করছি উত্তরে পীর পাঞ্জালের আঁকাবাঁকা চড়াই পথে। গোধূলির আর বিলম্ব নেই। এপাশে ওপাশে নামছে গিরিনির্ঝরিণীরা, ওদের নূপুর-নিক্কণ কানে আসছে, শুনতে পাচ্ছি কলকণ্ঠীর গুনগুনানী। সমতল জগতে ওদেরকে কোথাও পাইনে; ওরা থাকে হিমালয়ের পারিজাত কাননের আড়ালে-আবডালে। আজ শুক্লা সপ্তমী। হিমালয়ের রাজসভা বসবে আজ চন্দ্রভাগার তীরে-তীরে, তার জন্য তৈরী হচ্ছে ওরা, ওই 'সুন্দরী ঝর্ণা, তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা!'

খদ নামক একটি পাহাড়ী বস্তির কাছে এসে চা পান করা গেল। স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে 'কুদ'। কিচ্ছু নেই কোথাও, অনেক উঁচু থেকে অনেক নীচু অবধি চলে গেছে এই বস্তি। তীর্থপথে একে সাধারণ 'চটি' বলা যেতো। এখানে দুটি উল্লেখযোগ্য জলধারাপাত চোখে পড়ে। সমগ্র খদটি অর্ধচন্দ্রকার, অশ্বক্ষুরাকৃতি। যেমন দেখেছি মুসৌরী ছাড়িয়ে কেম্পটি প্রপাত, যেমন দেখে এসেছি চেরাপুঞ্জির জলধারা। এতক্ষণে আমরা সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠেছি। বাতাস লঘু, মুখচোরা স্নিগ্ধ হাওয়ায় আমরা সজীব হয়েছি। সন্ধ্যার ছায়ায় আমরা ছোট্ট শৈলস্বাস্থ্যনিবাস বাটোটে এসে পৌঁছলুম।

আমরা মোট জন পঁচিশেক যাত্রী। সবাই বলছে, এবার ট্যুরিস্টের ভীড় কম রাজনীতিক কারণে সকলেই ত্রস্ত। কারো কারো ধারণা, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আক্রমণ ঘটতে পারে। আমাদের গাড়ীতে স্ত্রীলোক ও শিশুও আছে দুচার জন। কেউ কেউ বমি করতেও আরম্ভ করেছে, অর্থাৎ 'চক্কর' লেগেছে। একজন আছেন মাদ্রাজী সরকারী কর্মচারী, নাম আয়ার। তাঁর আর্থিক অবস্থার চাকচিক্য ঠিকরে পড়ছে আমাদের এপাশে আর ওপাশে। তিনি যাচ্ছেন কাশ্মীরে স্বাস্থ্যোদ্ধার কামনায়। যুবক বলা চলবে না, প্রৌঢ় বলতে বাধে। সম্ভবত কেউ তাঁকে ব'লে থাকবে, দুধ খেয়ো খুব, ফল খেয়ো তা'র চেয়েও বেশি। ফলে, তাঁর এহাতে ওহাতে কিছু না কিছু ফল, ঝুড়িতে ফল, দুই পকেটে ফল। গাড়ী কোথাও থামলেই তিনি ছোটেন কোনও দোকানে, যদি দুধ পাওয়া যায়। সকাল থেকে তিনি বার আষ্টেক দুধ খেয়েছেন, ফলের রস ঝরেছে তাঁর কোটপ্যান্টে। বাটোটের ছায়ান্ধকারে তিনি কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়েছিলেন। বক্সীজী

কামন্দার হর্ন দিচ্ছিলেন গাড়ীতে তাঁর জন্য। একসময় তিনি ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। মুখে হাতে জলের দাগ। বেশ হাসিখুশী। তাঁকে নিয়ে সারাদিন ধরে গাড়ীর মধ্যে চাপা হাসি আর টুকরো কথার চোখ ঠারাঠারি ছিল। আমার ভ্রূক্ষেপ করেননি। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে আর্যাবর্তের আজও রুচির মিল হয়নি।

গাড়ী ছাড়লো। কিন্তু এবারে ভয়ের সঞ্চার হচ্ছিল মনে মনে। পাহাড়ের পথ অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়ীর হেডলাইট জ্বলেছে। রাত্রি তা'র দিগন্তজোড়া ডানা মেলে নেমে এসেছে পীর পাঞ্জালের চূড়ায়-চূড়ায়। দিনমানে যে-হিমালয় শোভা ও সৌন্দর্যের প্রতীক্, রাত্রির অন্ধকারে তা'র দানবাকার মূর্তি হৃৎকম্প আনে। অনেক উঁচুতে উঠতে হচ্ছে, অথচ প্রশস্ত পথ নয়। একটু ভুল, একটু অমনোযোগ, একটু বা দৃষ্টিবিভ্রম,—অমনি আমাদের অস্তিত্বের অবশ্যম্ভাবী অবলুপ্তি। সাধারণত রাত্রের দিকে পার্বত্য পথে মোটর চালনা নিষিদ্ধ। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানতে গেলে চলে না। বলা বাহুল্য, বাইরের দিকে নিরুপায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমরা রুদ্ধশ্বাস ভয়ে গাড়ীর মধ্যে ব'সে

যেদিকে গহ্বর সেইদিকে আমি। গাড়ীর চাকা আর মৃত্যুর মাঝামাঝি কয়েক ইঞ্চি মাত্র ব্যবধান, হেডলাইটের আলোয় তা'র পরিমাপ করছিলুম প্রতি ক্ষণে। কিন্তু আতঙ্কময় বিমূঢ়তারও শেষ আছে একসময়ে। যদি হঠাৎ আসে এক ঝলক অরণ্যপুষ্পের গন্ধ, মৃত্যুভয় মধুর হয়ে ওঠে। যদি হঠাৎ চোখে পড়ে শুক্লা সপ্তমীর মলিন জ্যোৎস্না বিশাল তির্যক ছায়া ফেলেছে হিমালয়ের ওই কৃষ্ণাঙ্গ দৈত্যদলের বক্ষপটে, তবে হতচেতন বিস্ময়ের উপর দিয়ে অনন্তের তোরণদ্বার খুলে যায়। একটি বিন্দুর উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমান কাঁপতে থাকে থরথরিয়ে।

আমরা যাচ্ছিলুম চন্দ্রভাগার ধারাপথ বেয়ে। ঘূর্ণী লেগেছে তা'র রক্তবর্ণ স্রোতে, সেই ঘূর্ণীজল মায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায় শত শত চন্দ্রঝলকে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে। আমরা উৎরাই পথে রামবান সাঁকোর দিকে নেমে যাচ্ছি। বনতল অন্ধকার,—চন্দ্রহাস রাত্রি নেমে এসেছে চন্দ্রভাগায়। লক্ষ লক্ষ বৈদূর্যমণির মতো জ্যোৎস্না জ্বলছে খরতর তার প্রবাহে।

সম্মুখের রত্নগিরিদলের চূড়ার উপর আকাশলোকে এসে দাঁড়ালেন সপ্তর্ষিদল। পুরাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে একে একে বেরিয়ে এলো অপ্সরা,—জ্যোৎস্নারাত্রে লজ্জাবাস বিসর্জন দিয়ে যারা অবগাহন স্নানে নামে। বন-কেশরীর রক্তমাখা পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে সিংহশিকারী বল্কলবাসা কিরাত এসে দাঁড়ালো নদীর বালুবেলায়। নন্দনকান্তি বিদ্যাধররা ভূর্জপত্রে রক্তিম স্বর্ণাক্ষরে লিখে চলেছে প্রণয়সঙ্গীত। হিমালয়ের গুহাছিদ্র-নিঃসৃত শীতলবায় নিকটবর্তী বেণুবনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আপন মর্মরধ্বনিতে মধুর সুরযোজনা করে। ময়ূরপঙ্খী কিন্নরদল নৃত্য ক'রে যায় তা'র তালে তালে। আরণ্যক

ঐরাবতরা এসে তাদের গাত্র ঘর্ষণ ক'রে যায় বিশাল দেবদারু কাণ্ডে, সেই ক্ষত-গাত্রের সুগন্ধে পর্বতশীর্ষ হয় সুবাসিত। হিমালয়ের বন্য জ্যোতির্লতার আভায় আলোকিত গুহাভ্যন্তরে অরণ্যচারী কিরাত ও যক্ষিণীগণের লজ্জাহরণের বিলোল বিহ্বল রসরঙ্গলীলা; অবশেষে মেঘের দল নেমে এসে গুহামুখে যবনিকার আবরণ টেনে-দেয়। প্রভাতে আসেন সপ্তঋষিগণ স্বর্ণপুষ্পচয়নে। তাঁরা পদচারণা ক'রে যান্ তুষার প্রান্তরের ধারে শতদল সায়রে।

সেই জ্যোতির্লতা আর স্বর্ণপুষ্পের সন্ধানে আমার উৎসুক দৃষ্টি ওই তারকাস্পর্শী বিরাট হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় সেই জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

রামবান পেরিয়ে আমাদের গাড়ী আবার সেই ছায়ান্ধকার গিরিগাত্রের বিপজ্জনক পথ দিয়ে চড়াই ভেঙে চললো।

আতঙ্কে আনন্দে সে পথ বিচিত্র। ঠিক ভয় নয়, কিন্তু বিমূঢ় বিস্ময়। দুর্ভাবনায় কথা বলছে না কেউ। থার্ড গীয়রে গাড়ী চলছে, তা'র অবিশ্রান্ত গোঁ গোঁ আওয়াজে কানে তালা লাগছে। জ্যোৎস্নারাত্রে বিমানে চ'ড়ে যারা আকাশলোকে বিচরণ করেছে তা'রা জানে এ আওয়াজ। বিমান ভেসে চলেছে স্বপ্নসায়রে। ভয়েব চেতনা লোপ পেযেছে। বিমানখানি বিকল হয়ে যদি প'ড়ে যায় নীচে, তা'ব পরিণাম সম্বন্ধে মন অসাড়। কারণ নীচেকার পৃথিবী দেখা যাচ্ছে না। কুতব মিনাবেব শীর্ষে উঠলে ভয় কবে, কারণ পতনের ফলে যে শারীরিক সংঘাত ঘটবে—সেই কঠিন ভূমি আমরা দেখতে পাই। জ্যোৎস্নালোকে দশহাজার ফুট উঁচু শূন্যে বিমানে ব'সে আমরা শুধু দেখতে পাই একটা অবাস্তব মাযাচ্ছন্ন ব্যোমলোক,—সেটি শব্দজগতেব ঊর্ধ্বে, সেখানে পাখী পৌঁছয় না,—প্রাণের কোনও চেতনা নেই। অনন্ত গগনে সেই আশ্চর্য শূন্য! ঘণ্টায তিনশো মাইল বেগে ভেসে চলেছে বিমান,—কিন্তু অনুভব করছে না কেউ। প্রচণ্ড গতি, প্রচণ্ডতর বেগ,—অথচ বিমানটি স্থির, একটু নড়ছে না, একটু দুলছে না,—সে অচঞ্চল, গতিচেতনাহীন। চাঁদ নড়ে না, তারা নড়ে না, মহাশূন্য নড়ে না। আরাম-গদিতে শুয়ে আরোহীবা নিদ্রিত। কাঁচের জানলার ভিতর দিয়ে স্থির জ্যোৎস্না এসে পড়েছে হয়ত কোনও এক বিবশা তনুলতার উপরের মুখচন্দ্রমায়।

এখানে অন্য কথা। পর্বতবক্ষে জ্যোৎস্না, নীচের খদ ভয়ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এপারে বিশাল দেওয়ালগাত্রে যে-সূত্রপথ, তা'র উপব দিয়ে মোটর বাস চলেছে। চাকার পাশে দেখতে পাচ্ছি নীচের দিকে দু'হাজার ফুট কালো গহ্বর,—দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর মুখব্যাদান, এবং তাকে পদে পদে এড়িয়ে পালাতে চাইছি।

রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় বানিহাল বস্তির উৎরাই পথে গাড়ী এসে পৌঁছলো। শরীরের অস্থিতন্ত্রে তখন অবসাদ জড়িয়ে ধরেছে।

কয়েকখানি দোকানে অল্পস্বল্প আলো জ্বলছে। আবছা জ্যোৎস্নায় আশ-পাশে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমাদের গাড়ী এসে থামলো একটি যাত্রীশালার ধারে। এখানে আজকের মতো রাত্রিবাস। রক্ষক হোলো এক মাড়োয়াড়ী। দু'টাকা ভাড়ায় একটি ঘর নিলুম।

চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে এই বানিহালের অধিত্যকা। চাঁদের আলোয় আন্দাজে বোঝা গেল, কাছাকাছি রয়েছে একটি গিরিনদী। এখানে ওখানে কয়েকখানি দোকানদানি, সামনেই কোথাও আছে একটি ব্যাটারিচার্জ করা বেতার-যন্ত্র। আমার ঝুপসি ঘরখানার কোলে বারান্দা, সেখানে নানালোকের নানা জটলা। ঠাণ্ডা পড়েছে বাইরে। আগামী প্রভাতে সাতটায় আবার আমাদের গাড়ী ছাড়বে।

বনময় গিরিনদীঘেরা পাহাড়তলীর অধিত্যকায় ওই পরম সুন্দর জ্যোৎস্না-রাত্রিটি ওই বেতারযন্ত্রের চিৎকারের দ্বারা যেন ক্ষণে ক্ষণে সূচিকাবিদ্ধ হচ্ছিল। এমন বিরক্ত হইনি আর কোনওদিন ওই যন্ত্রটার প্রতি। কিন্তু কতকটা অন্যমনস্ক ছিলুম ব'লেই আসল ব্যাপারটা অনুধাবন করিনি। ঠাহর ক'রে দেখি, এই পার্বত্য গ্রামটি কতকগুলি সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় পরিবেষ্টিত রয়েছে, এবং অদূরে একটি দোকানে ওই বেতারযন্ত্রের চারিদিকে অনেকগুলি লোক ভীড় করেছে। পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা ও রাজপুরুষ করাচী থেকে অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কাশ্মীরবাসীর উদ্দেশে বেতারে বক্তৃতা করছেন।

বক্তৃতার ভাষাটি উর্দু। অল্পস্বল্প বুঝতে পারা যাচ্ছিল। 'শেখ আবদুল্লার গদিচ্যুতি এবং অবরোধের সংবাদে সমগ্র পাকিস্তান আজ মর্মাহত এবং অশ্রু-ভারাক্রান্ত। কাশ্মীরবাসীগণের প্রতি ভারতের অমানুষিক অত্যাচার যে কতখানি বর্বরোচিত তা পৃথিবীবাসীগণ জানে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় শেখ আবদুল্লার প্রতি ভারত যে-প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং ভারতীয় সৈন্যরা সমগ্র কাশ্মীরে নরনারী ও শিশু নির্বিশেষে যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য পাকিস্তান প্রস্তুত। অতএব আমরা পবিত্র কোরাণের নামে শপথ করছি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ তোমাদের এই সর্বনাশা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য শ্রীনগরের দিকে অভিযান করবে। ইসলাম আজ বিপন্ন, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। শেখ আবদুল্লা সাহেবের অপমানের প্রতিশোধ নাও।'

শেখ আবদুল্লার প্রতি এই প্রীতির সংবাদ শুনে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খাঁনের কথা,—যাঁকে রাওয়ালপিণ্ডিতে হত্যা করা হয়। তিনি একদা এক বক্তৃতাকালে ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে শেখ আবদুল্লার উদ্দেশে বলেন, 'কাশ্মীর আপকো বাপকা মিলিকিয়াৎ নেহি হ্যায়।'—কাশ্মীর আপনার পৈতৃক সম্পত্তি নয়!

শেখ আবদুল্লা শ্রীনগরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে জবাব দিয়েছিলেন, কথাটা ঠিক। তবে কাশ্মীরে আমার পুরুষানুক্রমিক বসবাস। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ-

থেকে গিয়ে যদি কোনও ব্যক্তি পশ্চিম পাঞ্জাবের উপরে অন্যায় প্রভুত্ব করে, তবে তাকেই অনুরূপ সম্ভাষণ করা উচিত,—আমাকে নয়।

নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খাঁন এই মন্তব্যটি শুনে চুপ ক'রে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর বাড়ী ছিল উত্তর প্রদেশে। আজ সহসা বেতার যন্ত্রে উচ্চারিত আবদুল্লার প্রতি এই প্রীতি—এর পিছনে কোনও রহস্যজনক কারণ আছে কিনা এখনও জানতে পারিনি।

আমার পক্ষে মুস্কিল হোলো এই, এক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবকরা যদি সশস্ত্র এসে কাশ্মীরের উদ্ধারকার্যে লাগে, তবে আমি পালাবো কোথা? তাছাড়া কাশ্মীর উপত্যকায় এখনও প্রবেশ করিনি,—এখনও আছি জম্মুপ্রদেশে,—সুতরাং ধ'রেই নেবো করাচীর শ্রদ্ধেয় নেতারা সত্যভাষণ করছেন। নেতামাত্রই সত্যভাষী—এই আমার ধারণা। তবে কি সত্যই সামগ্রিক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে গিয়ে পড়তে হোলো? প্রাদেশিক অভব্য ভাষায় বলতে হয়, একটু ভড়কে গেলুম!

ঘরে এসে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। ভিতরে দেখি সেই স্বাস্থ্যান্বেষী ফলভুক মাদ্রাজী ভদ্রলোক কৌপীন মাত্র সম্বল ক'রে প্রাণপণে ডন্-বৈঠক দিতে ব্যস্ত। চেহারাটি তাঁর শীর্ণ,—এ বয়সে এক্সারসাইজের দ্বারা তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি কতখানি সম্ভব বলা কঠিন। আমাকে দেখে তিনি একটু থতিয়ে ইংরেজিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কিছু মনে করবেন না, আজ থেকে আমি একাজ ধরলুম। এটা দরকার।

আমার মুখে চোখে প্রশ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল। পুনরায় তিনি বললেন, ধরুন কাশ্মীর যদি আক্রান্ত হয়, আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার! দেশের জন্য, জাতির জন্য . ..

কিন্তু সাতদিনে কি লড়াইয়ের উপযুক্ত শরীর হবে আপনার?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক তা নয়, তবে মেহন্নত করলে মানুষ সাহসী হয়, জানেন ত?

জানলুম।

পুনরায় তিনি বললেন, অন্তত ছুটে পালাবার মতো শক্তিও থাকা চাই।—আজ একটু গুমোট! আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে বারান্দায় গিয়ে শো'ন, আমি এ ঘরটায় যা হোক ক'রে থেকে যাই। একখানা খাটিয়াও রয়েছে দেখছি।

এবারে বলতে বাধ্য হলুম,—তা'র চেয়ে ভালো হয় যদি আপনি গিয়ে বারান্দায় শো'ন,—আপনার এক্সারসাইজ করা ঘর্মাক্ত দেহ একটু স্নিগ্ধও হবে! আমি ঘণ্টাখানেক আগে ওই মাড়োয়াড়ীর হাতে দুটি টাকাও দিয়েছি!

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর কি মনে হোলো, [illegible] জোব্বাটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। সে-রাত্রে তিনি একটি স্নানের [illegible] দরজা বন্ধ করেছিলেন, সকালের আগে আর দরজা খোলেননি।

তাঁর এই দরজা বন্ধের ইতিহাস হয়ত আরও একটু ছিল। আহারাদি সেরে ঘরে ঢুকে একটু সুস্থির হয়ে বসেছি, এমন সময় জনতিনেক স্থানীয় অধিবাসী মহা হল্লা বাধিয়ে আমার ঘরে এসে ঢুকলো। বাইরে একটা গোলমাল বেধেছে। ওদের মধ্যে দু'জন মুসলমান এবং একজন এই যাত্রীশালার খিদমদগার। মুসলমান দুজনেই বয়সে যুবক, কিন্তু ওর মধ্যে একজন একটু বেশীমাত্রায় দেশী 'সরাব' পান করেছিল। একটু বে'হুস, একটুখানি টলটলে।

চেঁচামেচি শুনে বারান্দার ওদিকের ঘরগুলি সব বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে টলটলে যুবকটিকে ধ'রে রাখা যাচ্ছে না। অন্য যুবকটি ওকে যখন শান্ত করার চেষ্টা পাচ্ছে, ও তখন একখানা ছোরা বা'র করেছে। ওর ইচ্ছা, ওই শান্তিবাদী যুবকটিকে হত্যা করবে। আশে পাশে লোক হাসাহাসি করছিল। খুনে ব্যক্তিটিকে আমার বিছানায় বসানো হোলো বটে, কিন্তু ছোরাখানা সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। খুন সে করবেই।

হারিকেন লন্ঠনে কেরোসিন তেল কম, সুতরাং আলোটা নিভে আসছিল। মদ-খাওয়া যুবকটি নাকি বেতার যন্ত্রে করাচীর বক্তৃতা শুনতে শুনতে বন্ধুর সঙ্গে বিতর্ক বাধায়, এবং সুস্থ শরীরে বন্ধুর পিঠে ছুরিকাঘাত করা একটু চক্ষুলজ্জার ব্যাপার ব'লে সে দেশীমদ খেয়ে ছুরি নিয়ে ছুটে আসে। হত্যা সে এখনই করবে, তবে তা'র আগে আমার ন্যায় একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অনুমতি পাওয়া দরকার।

যুবকটিকে একটি সিগারেট দিয়ে নিজেই দেশালাই জেবলে দিলুম। দেখি ওর চোখদুটো লাল টসটস করছে। হেসে বললুম, যে-ব্যক্তি ছুরি মারে, সে কি অনুমতির অপেক্ষা রাখে?

খুব জোরে সিগারেটে টান দিয়ে রাঙা চোখ তুলে যুবকটি বললে, আপনি কি মানা করছেন?

বললুম, না, মানা করবো কেন? তবে কাল সকালে মেরো। নৈলে তোমার মতন ভদ্র ছেলের নামে এই দুর্নাম রটবে যে, তুমি মাতলামি করতে গিয়ে খুনখারাপি করেছ। বরং বেশ ভেবে চিন্তে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ছুরি মারলে তবেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে!

ছেলেটি হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠলো,—ঠিক বলেছেন। একে মেরে যদি ওই পাহাড় ডিঙিয়ে পুঞ্চ-এর দিকে পালাই, কে ধরছে! সালাম লিজিয়ে, সাব।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তাকে ওই 'দুষমন' বন্ধুটিরই সহায়তা পুনরায় নিতে হোলো। অবাধ্য পা দুখানা তা'র বড়ই টলছিল।

সকালে উঠে দেখি নিস্তব্ধ পাহাড়পল্লী। তখনও ঠিকমতো বালিহাঁসের ঘুম ভাঙেনি। রঙীন পাখীরা পীর পাঞ্জাল থেকে নেমে এসেছে অধিত্যকায়।

বস্তির উত্তরপ্রান্তে উপলাহত গিরিনদীর কুলকুলধ্বনি শোনা যাচ্ছে।' চতুর্দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়ের অবরোধ। ওরই মধ্যে একটু আধটু চাষবাস ও ফসলের কাজ চলছে। দোকান পাট এখনও খোলেনি। রাত্রে যে-উত্তেজনাটুকু দেখা গিয়েছিল, সকালে তার চিহ্নমাত্রও নেই। রাজনীতিক ভূমিকম্পের সঙ্গে কাশ্মীর চিরদিন পরিচিত, এই সামান্য বিপর্যয়ে তা'র বিশেষ কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমাদের গাড়ী প্রস্তুত হোলো সকাল সাতটায়। কিন্তু গাড়ী ছাড়বার প্রাক্কালে সেই যুবকটি এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে—যাকে আজ এখনই হয়ত হত্যা করা হবে। অতি ভদ্র মুসলমান যুবক। মদ্যপায়ী যুবকটি ওরই 'চাচার' ছেলে, নাম শের গুল। শের গুলের উত্তেজনা অতি ক্ষণস্থায়ী,—যুবকটি জানালো। ছোরাখানা নাকি এই যুবকটির কাছেই জিম্মা রেখে শের গুল ঘুমোতে গেছে। আর কোনও ভয় নেই।

গাড়ী ছেড়ে চললো উত্তর পর্বতের চড়াই পথে। দেখতে দেখতে মধুর রৌদ্রের দিকে উঠে এলুম। আমবা চলেছি বানিহাল গিরিসঙ্কটের দিকে। বাতাস ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ হচ্ছে। বর্ষায় ফল হয়েছে প্রচুর। ফুলশয্যা পাতা হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। ধবলাধাব গিরিশ্রেণীতে যেমন কথায়-কথায় পাথবের হাড়-পাঁজবা বেরিয়ে পড়ে, এখানে তা নয়। শ্রাবণের নুপুব-ঝুমুর শোনা গেলেই মৃৎপিন্ডের থেকে বেরিয়ে আসে মৌসুমীফুল বর্ষার অভ্যর্থনায়। সমগ্র পীর পাঞ্জালেরই এই প্রকৃতি, এই অকৃপণ দাক্ষিণ্য। হাভেলীয়ন, আবটাবাদ, মুজাফরাবাদ, মীবপুব,—যেখানে যাও, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। কোথাও ছায়া পড়েছে প্রাচীন বনস্পতির, কোথাও বা সকবুণ মায়া কাব্যব্যঞ্জনার। প্রতি গুহাগহ্বরে বেখে যাচ্ছি আমাব প্রাণেব সুর, প্রতি গুল্মলতায় জড়িয়ে যাচ্ছি আমার মর্মের বাঁধন, আমার মায়ার কাঁদন।

দেখতে দেখতে প্রসারিত হচ্ছে জ্যোতির্ময় দিগন্ত। অন্ধকারে নীচেব দিকে পড়েছিলুম গত রাত্রে,—যেখানে মানুষের ক্ষুদ্রতাব ইতিহাস নিত্য রচিত হচ্ছে। যেখানে চিত্তের বিদ্বেষ পারিপার্শ্বিককে বিষাক্ত কবছে ক্ষণে ক্ষণে; স্বভাবের বিকারে, চরিত্রের গ্লানিতে, সংশয় ও ধিক্কারে যেখানে নরক সৃষ্টি হচ্ছে কথায় কথায়। কিন্তু এখানে পূর্ব দিগন্তের রত্নগিরিদ্বারে উঠে এলে সব তুচ্ছ। এখানে হিমালয়ের হাওয়া ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করছে মুহুর্মুহু। যত উঁচু তত বিস্তার, ততই প্রসার। ক্ষতি নেই, যদি এখান থেকে ডাক দাও আরও বৃহত্তর দৈবজীবনকে, হাত বাড়িয়ে যদি সমস্ত আকাশকে আলিঙ্গন করো,—সমগ্র ক্ষুধার্ত প্রাণ যদি ডানা মেলে উড়ে যায় পীর পাঞ্জালের উপর দিয়ে হিমালয় ছাড়িয়ে কোথাও উধাও হয়ে। থামা চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। যেমন আকাশপথে রাজহংসেরা পাখা মেলে চ'লে যায় নিরুদ্দেশ লোকে; যেমন পরস্পর তা'রা কথা কয়, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!'

চড়াই উঠছে মোটর বাস,—প্রচন্ড হাঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে। আপার মুণ্ডার

দেওয়াল বেয়ে উঠছে,—সুদীর্ঘ জিগ্‌জ্যাগ্ পথ একবার পূর্বে এবং একবার পশ্চিমে প্রসারিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আজ ভয় নেই,গতরাত্রির মতো যা কিছু প্রচ্ছন্ন ছিল রাত্রের অন্ধকারে,—এখন সমস্তটা আলোকিত। কাল দেখেছিলুম মৃত্যুকে, আজ মৃত্যুর অতীতকে। মুখ ফিরিয়ে দেখছি অনেক দূরে রয়ে গেল বানিহাল গ্রাম, তারও চেয়ে অনেক দূরে সমতল ভারত প্রায় দশ হাজার ফুট নীচে। ক্রমে আমাদের গাড়ী এসে পৌঁছলো পর্বতচূড়ার কাছাকাছি স্বল্পপ্রসার একটি মালভূমিতে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা গেল সশস্ত্র সামরিক প্রহরী বানিহাল গিরিগহ্বরের প্রবেশপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে।

কাশ্মীর ও ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে এই একমাত্র সুড়ঙ্গপথ,—অন্য পথ নেই। এটি আগে কাশ্মীর মহারাজার নিজস্ব পথ ছিল। শীতের কয়েকমাস এই গহ্বরপথের এপার ওপার কঠিন বরফে আচ্ছন্ন থাকে, সেজন্য সম্প্রতি নীচের দিকে আরেকটি পথ নির্মাণের চেষ্টা চলছে। কাজ সমাপ্ত হ'লে কাশ্মীর অনেকটা সুগম হবে। আমাদের গাড়ী কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। অতঃপর একটি মিলিটারী গাড়ীর কন্‌ভয় পেরিয়ে যাবার পর আমাদের বাস ঢুকলো সেই অন্ধকার গহ্বর লোকে। দীর্ঘপথ সত্যই অন্ধকার ঘুটঘুট্টি। পিছনে জম্মু, সামনে কাশ্মীর।

ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মিনিট তিনেক। সত্যি বলবো, ঠিক এ প্রকার ধারণা আমার আগে ছিল না। অন্ধকার থেকে আলোয় আসামাত্র কাশ্মীরের দৃশ্য যে অবাক বিস্ময়ের ধাক্কা দেয়, সেটি বিচিত্র। কিছুক্ষণের জন্য চেতনা লোপ পায়। সৌরবিশ্বলোকের কোনও বাতায়ন থেকে যদি সৃষ্টিকর্তা আপন আশ্চর্য সৃষ্টির দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে অভিভূত হন্, তবে এটি সেই একমাত্র বাতায়ন। বায়ুস্তরের মধ্যে সূর্যরশ্মির যে কাঁপন উত্তরমেরুতে অরোরার আলিম্পনার সৃষ্টি করে, দুই চোখ মেলে তা বিশ্বাস ক'রে যাচ্ছি। চতুর্দিকে শত শত মাইল পরিব্যাপ্ত চিরতুষারময় হিমালয়, তাদেরই কোলে-কোলে ভাসছে মেঘের দল চিত্ররথের মতো। উপর থেকে দেখছি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে তা'রা,—এবং তাদের ভিতরে-ভিতরে পলকে-পলকে রামধনু তরঙ্গায়িত হচ্ছে নানা বর্ণে। বায়ুলোকে পরিব্যাপ্ত সূর্যরশ্মি এই বিচিত্র ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছে মুহুর্মুহু; ফলে, দৃষ্টি আমাদের বিভ্রান্ত হচ্ছে পলকে-পলকে। প্রায় দশ হাজার ফুট উপরে আছি ব'লেই এই দৃষ্টিবিভ্রম এবং এই অনির্বচনীয় বিস্ময়। সমতলে নেমে গেলেই দৃষ্টি স্বচ্ছ। পৃথিবীকে আমরা দেখছি একই চেহারায় লক্ষ লক্ষ বছর থেকে, বিপরীত দিক থেকে একে কখনও দেখিনি। কিন্তু ভিন্ন গ্রহের উপরে দাঁড়িয়ে যদি দেখতুম পরিচিত পৃথিবীকে, তবে দৃশ্য-বৈচিত্র্য আবিষ্কার করতুম। পাশের বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ীটি দেখলে বৈচিত্র্যবোধের আস্বাদ লাগে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বানিহালের এই সুড়ঙ্গলোক দিয়ে যদি

কাশ্মীরে প্রবেশ করতেন, তাঁর হাত থেকে আমরা একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা লাভ করতুম।'

মিনিট দুই হতচেতন হয়ে ছিলুম। ওইখানে নেমে একবার দেখে নিলুম দেবতাত্মার শীর্ষলোক। শ্বেতচূড়া একটির পর একটি পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বে প্রসারিত। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অস্পষ্ট হিন্দুকুশ আর কারাকোরামের প্রত্যন্ত শীর্ষ, গিলগিটের পারে দুর্মানি, দেখতে পাচ্ছি নাঙ্গার তুষারশীর্ষ, কোলের কাছে দেখছি হরমুখ, সোনামার্গ আর জোজিলা, বাল্‌তিস্তানের পূর্বলোকে গাসেরব্রুম আর মাসেরব্রুম, তা'র দক্ষিণে দেবসাহি, লাডাখ আর জাসকার গিরি-শৃঙ্গমালার অন্তহীন তরঙ্গলোক।

গাড়ী এবার নামতে লাগলো আপার মুণ্ডার পথ বেয়ে। কিন্তু ওই যে দু'মিনিটের একটি বিন্দুর উপরে দাঁড়িয়ে অনাদি অনন্তকাল মূর্ছাহত হয়েছিল, ওটা যেন ভূতের মতো পেয়ে রইলো। শুধু আমার কাছে নয়, প্রত্যেক পর্যটকের কাছেই চিরকালের কাশ্মীর ওই দু'মিনিটের মধ্যে নির্ভুল সত্য হয়ে থাকে। দেখতে দেখতে গাড়ী নেমে যেতে লাগলো নীচের দিকে। অনেক দূর নীচে সেই পৃথিবীপ্রসিদ্ধ 'পপলার এভেনু' পথটি ছবির মতো চোখে পড়ে। সমগ্র বিরাট উপত্যকা নীলাভ সবুজ, এবং বর্ষার শেষ প্রান্তে এসে সজল শ্যামল শোভায় ঝলমল করছে। বুঝতে পারা যায় কাশ্মীর কেন এত লোভের বস্তু, কেন এই মানহারা সর্বহারা অনাথিনীর সর্বাঙ্গে হাজার দু' হাজার বছর ধ'রে বিভিন্ন বর্বরের দল তাদের হিংস্র দাঁতের দাগ ও নখেব আঁচড় রেখে গেছে!

উপর থেকে নেমে সমতল পথে গাড়ী চললো। চব্বিশ ঘণ্টার পর সমতল দেখলুম। আরও কুড়ি মাইল ওই পপলার শ্রেণীর মধ্যপথ ধ'রে এসে কাজিকুণ্ডে পৌঁছে বাস থামলো। এখানে প্রাতরাশ সেরে নিতে হবে। কাজিকুণ্ড থেকে শ্রীনগর যতদূর মনে পড়ছে আন্দাজ চল্লিশ মাইল পথ।

এই পথ খানাবলে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। একটি যায় উত্তরপূর্বে পহলগাঁওর দিকে,—অন্যটি উত্তরে অবন্তীপুরা হয়ে সোজা চ'লে যায় শ্রীনগরের দিকে। ছোট ছোট পাহাড় এক পাশে, কিন্তু একদিকে অনন্ত ধানক্ষেত এবং আখের চাষ। সব্জি ও শস্যের বাগান এখানে ওখানে। গ্রামের বাড়ীগুলি ছবির মতো, প্রত্যেকটিতে শিল্পীমন কাজ করেছে। এ ধরনের ঘরদোর ভারতবর্ষে দেখিনি। সস্তায় বিভিন্ন নামের ফল পথেঘাটে দোকানে প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। এটা ভাদ্রের প্রথম, বাজারে আপেল আসছে অল্পস্বল্প। টসটসে আঙুরের গোছা নিংড়ে খাচ্ছে কাশ্মীরী মেয়ে। কালো চোখের প্রসন্ন চাহনির দ্বারা বিদেশীকে ওরা অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু ওরা কি জানে, অজানা বিদেশীর পৈশাচিক বিশ্বাস-ঘাতকতার আঘাতে ওদের মাটির ঘরের গৃহস্থালী যুগে যুগে মাটি হয়েছে? এতকাল ধ'রে মার খেয়েও কাশ্মীরীদের স্বভাব-কোমলতা নষ্ট হয়নি, এটা ওদের পক্ষে গৌরবের কথা—এ আমি মনে করিনে।

কিতস্তার গৈরিক-রক্তিম আঁকা-বাঁকা স্রোত চলেছে পাশে পাশে। আশ্চর্য, এত বড় পার্বত্য উপত্যকার পাথরের জটলা কোথাও দেখছিনে। চারিদিক সুন্দর আর কোমল। প্রথম দেখলুম 'চেনার' আর 'উইলো' গাছ। চেনারের বৃহৎ বৃক্ষ ছায়া ফেলেছে মসৃণ সুন্দর পথে। পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ-ছাগল ও গরুর পাল চরছে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীরী পণ্ডিত আর পাণ্ডিতানিকে।

গাড়ী ছুটেছে। ছুটেছে দূর থেকে দূরান্তরে। মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ। এক-সময় প্রখর রৌদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর বাস এসে পৌঁছলো আধুনিক শ্রীনগর শহরের এক মোটর ষ্ট্যাণ্ডে। সেখানে টাঙ্গাওয়ালাদের ভীড় জমেছে।

প্রায় আধমাইল দূরে কাশ্মীর খালসা হোটেলে গিয়ে উঠলুম।

* *

*

হরমুখ পর্বতের পাদভূভাগে প্রাচীনকালে ছিল দিক্‌চিহ্নহীন সুবিশাল জলাশয়। তার পৌরাণিক নাম হোলো সতীসায়র। দেবী পার্বতী নেমে আসতেন তুষারচূড়া থেকে, এবং এই জলাশয়ে তরণীবিহার করতেন। তারপরে গিয়েছিল কতকাল। হরপার্বতী গেলেন অধিকতরো লোভনীয় মানস সরোবরে। ইত্যবসরে জলোদ্ভব নামক জনৈক অসুর এসে অধিকার করলো ওই সতীসায়র। মানুষের উপরে দানবের অনাচার চললো বহুকাল। ওদিকে ব্রহ্মার পৌত্র কশ্যপমুনি এই অনাচারের প্রতিকারের জন্য হাজার বছর ধ'রে তপশ্চর্যা করছিলেন। সেই তপস্যায় খুশী হয়ে দেবী তাঁর নিকট এক পাখীকে পাঠিয়ে দেন্। পাখীর ঠোঁটে ছিল একটি পাথরের টুক্‌রো। ওই পাথরের টুক্‌রোটি জলোদ্ভব অসুরের শিরে ফেলা হয়, এবং ক্রমে সেই পাথর বৃহদাকার ধারণ করে। এর ফলে জলোদ্ভব সতীসায়রের নীচে সমাধিস্থ হয়, এবং বর্তমান হরিপর্বত দাঁড়িয়ে ওঠে। সতীসায়রের জল চ'লে যায় বরাহমূলের দিকে, মরুময়ভূমি দেখা দেয় চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত অধিত্যকায়, এবং পরবর্তীকালে এই ভূভাগের নাম হয় 'কশ্যপ-মীর।'

ঠিক এমনি উপকথা শুনে এসেছি নেপালের কাটমাণ্ডুতে। মঞ্জুশ্রীদেবের খড়্গাঘাতে বাগমতীর সৃষ্টি হয়। নেপাল উপত্যকার জন্ম তখন থেকে। ওদের পূজ্য মঞ্জুশ্রীদেব।

এই সমস্ত উপকথার পিছনে একটি সত্য আজও বিজ্ঞানীদের চোখে স্পষ্ট হয়ে আছে, কাশ্মীরের 'সুখী উপত্যকা' এককালে 'অনবতপ্তা' মানসের মতো-সরোবরের মতো বিশাল জলাশয় ছিল। আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে পাহাড়ের উপরে বহু অঞ্চলে সেকালের সেই সাগর-উদ্ভূত জীবাণুর নানাবিধ প্রাণীর কোষ আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। ভূতাত্ত্বিকরা চমৎকৃত।

খৃষ্টপূর্ব দুহাজার বছর আগে কোনও নির্দিষ্ট রাজশক্তির খবর পাওয়া যায়

গেলেও রাজা দয়াকরণ ও রাজা রামদেবের কথা শোনা যায়। ঐতিহাসিক কালে আসেন রাজা প্রবর সেন এবং রাজধানীর নাম হয় প্রবরপুর। এইটিই বর্তমান শ্রীনগর। খৃষ্টপূর্ব আড়াই শো বছর আগে সম্রাট অশোক এসে বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে রূপান্তরিত করেন। এই রাজভিক্ষুর মহৎ আদর্শকে বরণ ক'রে সনাতনীরাও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হন্। এর পরে আসেন রাজা জলক এবং তিনি পর্বতশীর্ষে একটি প্রস্তরমন্দির নির্মাণে করেন, সেটি আজও দাঁড়িয়ে,—কিন্তু তা'র নাম শঙ্করাচার্য। এই সময় তাতার দস্যুর দল কাশ্মীর আক্রমণ করে। ক্রমে সম্রাট কনিষ্ক এসে দাঁড়ান্, এবং তাঁ'র রাজত্বকালে দস্যুদল বিতাড়িত হয়। কনিষ্কের কালেই কাশ্মীরের বৌদ্ধমঠে বৌদ্ধধর্মের কোনও একটি মহাসম্মেলনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান ঘটে। পরবর্তী শত শত বৎসর অবধি কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে শ্বেত হূনরা আক্রমণ করে এই ভূস্বর্গ, বীভৎস অনাচারের দ্বারা কাশ্মীরকে তা'রা শ্মশানে পরিণত করে। এই আক্রমণকারীদের মধ্যে প্রধান হলেন বৌদ্ধ-বিরোধী মিহিরগুল। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাং কাশ্মীরের এই সর্বনাশ দেখে যান্—মিহিরগুলের হাতে তখন বৌদ্ধবিহারগুলি প্রায় সবই একে একে ধ্বংস হয়েছে। বৌদ্ধভিক্ষুরা পলায়ন করেন তিব্বতের দিকে, সেখানে নির্মাণ করেন বহু বৌদ্ধমঠ। শ্রীনগর থেকে কয়েক মাইল দূরে হরবনের প্রান্তে আজও সেকালের ভূপ্রোথিত বৌদ্ধবিহারগুলির উদ্ধার কার্য চলছে।

এর পর কাশ্মীরে হিন্দুরাজত্ব আরম্ভ। কবি কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' বলছে, নৃপতিশ্রেষ্ঠ ললিতাদিত্য এলেন, এলেন অবন্তীবর্মণ্, এলেন একে একে হিন্দু নরপতি। সমগ্র কাশ্মীরে অদ্যাবধি বৌদ্ধ ও হিন্দু ভিন্ন অপর কোনও জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও স্থাপত্য-কীর্তি নেই। রাজা ললিতাদিত্য আজও কাশ্মীরে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সম্রাট অশোক, এবং কনিষ্কের পরেই তাঁর আসন নির্দিষ্ট। এই উপত্যকায় তাঁর বিপুল কীর্তি সর্বজনস্বীকৃত। মার্তণ্ড জনপদে তাঁর মন্দির এবং কাশ্মীরভূভাগব্যাপী তাঁর স্থাপত্যকীর্তি আজও তাঁর চরিত্রমহিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর জন্য অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরবের যুগ।

রাজা ললিতাদিত্য সমগ্র উত্তর ভারতখণ্ডে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ক'রে ক্ষান্ত হননি। বিস্ময়ের কথা এই, তুরস্কের ইতিহাসে পাওয়া যায়, ললিতাদিত্য তুরস্ক এবং মধ্যএশিয়ার একটি প্রধান অংশ আপন শৌর্যবলে জয় করেছিলেন। সমগ্র মধ্যএশিয়ার অ-সভ্য জাতিগণের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন হিন্দু ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির কালজয়ী মহিমা। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আল্‌বেরুনী বলেন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট ললিতাদিত্যের আমলে তাঁর দিগ্বিজয়-মহিমা এতদূর গৌরবময় হ'তে পেরেছিল যে, প্রতি বৎসর কাশ্মীর জুড়ে মস্ত এক উৎসবের সাড়া প'ড়ে যেতো।

[illegible] শতাব্দীর মধ্যে পার্বত্য উপজাতি [illegible] ও ডামররা কাশ্মীরের [illegible] নষ্ট করতে চেয়েছে বারম্বার। অগ্নিসংযোগ, লুঠ, নরহত্যা, নারীহরণ—এই ছিল তাদের পেশা। কবি কহ্লন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসব বর্ণনা করেছেন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। 'রাজতরঙ্গিণীতে' তিনি বলছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী হিন্দু রাজত্বের কালে কাশ্মীর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূভাগে পরিণত হয়। সাহিত্যে, কাব্যে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, ভগবৎদর্শনে এবং শৈব বেদান্ত সংস্কৃতিতে কাশ্মীর ছিল অদ্বিতীয়। জনসাধারণ সমগ্রভাবে ধর্ম ও মনুষ্যত্ববাদে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠে।

চতুর্দশ শতাব্দীর তাতার যোদ্ধা জুলফি কাদির খাঁন আসেন কাশ্মীরে। ভয়ানাম্‌ ভয়ম্‌ ভীষণম্‌ ভীষণানাম্‌! তাঁর এক হাতে শানিত তরবারি, অন্য হাতে অগ্নিসংযোগের উপকরণ। তাঁর দানবিক লীলায় কাশ্মীর অগ্নিদগ্ধ হয়। যাবার সময় তিনি পঞ্চাশ হাজার ব্রাহ্মণ নরনারীকে ক্রীতদাস স্বরূপ নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর সেই রক্তরাঙ্গা পথে আসে প্রচন্ড তুষার-ঝটিকা, তিনি নিজে তাঁর উপজাতীয় দস্যুদলসহ এবং ওই নিরীহ পঞ্চাশ হাজার নরনারী সমেত তুষার সমাধি লাভ করেন। আজও তাদের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায় হুন্‌জা পর্বতের প্রান্তে আর কোহিস্তানে, হিন্দুরাজ পর্বতমালার আশে পাশে আর পামীরের মালভূমির তলায়-তলায়। সেকালে কাশ্মীরে ছিল জ্ঞান আর বিদ্যা, কাব্য আর সংস্কৃতি,—কিন্তু না ছিল ক্ষাত্রশক্তি, না ছিল রাজশৌর্য। তবে কাশ্মীরের ইতিহাসে অনাচার ওখানেই শেষ হয়নি। দেখতে দেখতেই আবার এলেন গজনীর মহম্মদ, এলো আবার তাতার যোদ্ধার দল। এই প্রকাব পাঠান আক্রমণের যুগে সেইকালে কাশ্মীরে রাজত্ব করেছেন একাধিক হিন্দুসম্রাজ্ঞী,—তাতার ও পাঠানদের সঙ্গে বহুবার তাঁরা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। ওদের মধ্যে একজন রাণী অনেককাল কাশ্মীরে রাজত্ব করেছেন,—যখন তাঁর স্বামী প্রাণভয়ে পলায়ন করেন রাজ্য ছেড়ে। তিনি জনৈক পাঠানকে নিয়োগ করেছিলেন তাঁর অন্যতম মন্ত্রীপদে। কিন্তু সেই মন্ত্রী শা মির্জা কৌশল-চক্রান্তের দ্বারা সিংহাসন দখল করে এবং রাজরাণীকে পত্নীরূপে লাভ করার জন্য হাত বাড়ায়। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা রাণী আত্মনাশের দ্বারা মুক্তিলাভ করেন।

আবার একশো বছর ধরে পাঠান সুলতানদের হাতে কাশ্মীর উৎপীড়িত হতে থাকে। দেব-দেবীর মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চলে, স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মন্দিরগুলিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। মার্তন্ড, পান্দ্রেথান, গণেশবল, ব্রজবিহার প্রভৃতি জনপদ একে একে ধ্বংসস্তূপে ভ'রে যায়। সুলতান সিকান্দারের বীভৎসতা কাশ্মীরের পথে পথে আজও সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাতার আর পাঠানের কলঙ্ককাহিনীতে কাশ্মীর ভরা।

কিন্তু এক সময় ওই দৈত্যকুলের ভিতর থেকে প্রহ্লাদ এসে দাঁড়ালেন। তিনি

বাদশাহ জয়নুল আবেদিন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরীদের অকৃত্রিম সুহৃদ। তিনি মন্দির মেরামত করলেন, খাল কেটে বন্যার তাড়না থেকে কাশ্মীরকে বাঁচালেন। কাগজ, রেশম, শাল—এদের কারখানা বসালেন। ফলের বাগান সৃষ্টি করলেন। কাশ্মীরীদেরকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। আজও অনেক অঞ্চলে জয়নুল আবেদিনকে নিয়ে লোকসংগীত প্রচলিত, আজও শ্রীনগরে 'জয়না-কদলে' তাঁর ওই সমাধিস্তম্ভটি রাষ্ট্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত আছে।

কিন্তু পাঠান ও তাতারের বহুশতাব্দীব্যাপী ধর্ষণকালের তুলনায় জয়নুল আবেদিনের রাজত্বকাল আর কতটুকু? দার্দ দেশ থেকে এলো গাজি খাঁন, এবং তার পরে-পরে পাঁচসাতজন দস্যু নরপতি। আঘাতে আর অপমানে কাশ্মীরীদের পিঠ আবার দুমড়িয়ে গেল। মনুষ্যত্বের শেষ দশায় এসে তা'রা দাঁড়ালো। কেঁদে কেঁদে অসাড় হয়ে এলো কাশ্মীর।

অবশেষে সম্রাট আকবরের হিন্দু সেনাপতিরা কাশ্মীরে তাঁদের জয়পতাকা তুললেন। 'সুখী উপত্যকায়' বহুকাল পরে শুভসুযোগ এলো। জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার উঠে দাঁড়ালো। আকবর পুনরায় হরিপর্বতের প্রাচীন দুর্গটির সংস্কার সাধন করলেন। প্রাকার তুলে দিলেন চারদিকে। তাঁর পুত্র সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর পুষ্পোদ্যান বানাতে বসলেন ভেরিনাগে, নাসিমে, শালিমারে, নিশাতে। চেনারের চারা এনে পুঁতলেন সর্বত্র। নূরজাহান বানালেন 'পাথর মসজিদ'। জাহাঙ্গীর-পুত্র শাহজাহানও পিতার অনুসরণ করেছিলেন। অতঃপর আওরঙ্গজেবের আমলে আবার কাশ্মীরে উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। পণ্ডিতদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলে, অন্যায় রকম কর দিতে তা'রা বাধ্য হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল দরবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেইকালে মোগলরাজের প্রতিনিধিগণের স্বেচ্ছাচার, অনাচার ও উৎপীড়ন কাশ্মীরে দানবীয় আকার ধারণ করে। এমন সুযোগ ছাড়বে কেন আফগানীরা? অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এলো তাদের পাশবিক আক্রমণ। আহমদ শা দুরানি জয় করলেন কাশ্মীর। পরবর্তী ষাট বৎসরকাল অবধি সর্বব্যাপী ধ্বংস ও নারীর সতীত্বনাশ ক'রে চললো তা'রা। ওটা ওদের গৌরব, ওটাই ওদের ইতিহাস। ওদের পাশবিক অত্যাচার কোনও জাতিভেদ মানেনি, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মনাশ করাই হোলো ওদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে কাশ্মীরী নরনারীকে ধর্মান্তরিত করা হোলো; যারা রাজি হ'তে চাইল না তাদেরকে আগুনে পোড়ানো, জীবন্ত সমাধি দেওয়া, শূলে চড়ানো, বন্যজন্তুর খাঁচায় ফেলা, অথবা জীবন্ত দেহকে চটের থলেতে মুড়ে দাল হ্রদে ডুবিয়ে হত্যা,—এই সব চললো।

দাল-হ্রদের এক কোণের একটি নামকরণ করা আছে, 'বাটে মাজার',—অর্থাৎ হিন্দুসমাধি। এমনি ক'রেই কাশ্মীরে অ-হিন্দুর সংখ্যা বেড়ে উঠেছে।

পরবর্তী কালে এই হাজার হাজার 'হিন্দু' যখন লক্ষে লক্ষে পরিণত হোলো, সেই সময় তা'রা সদলবলে ফিরে আসতে চাইল তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মে,—কিন্তু অনেক দেরি করেছিল তা'রা,—বারাণসীর সনাতনপন্থী হিন্দুরা তাদের আবেদন মঞ্জুর করলো না। আজ সেই আচরণের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে বৈকি।

ইতিহাস নয়, কাশ্মীরের বুকের যে যন্ত্রণা এ তারই কাহিনী। কিন্তু এইখানেই শেষ হয়নি। আফগানী জব্বর খাঁনের অত্যাচারে অস্থির হয়ে পণ্ডিত বীরবল ধর লাহোর থেকে ডেকে আনলেন রণজিৎ সিংহের সেনাপতি রাজা গুলাব সিংকে। তিনি পীর পাঞ্জাল পেরিয়ে এসে জব্বর খাঁনকে বিতাড়িত করলেন। ঊনিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। জনৈক ইংরেজ ভ্রমণ করছিলেন কাশ্মীরে। তিনি বললেন, শিখরা আফগানীদের চেয়ে কম স্বেচ্ছাচারী নয়। হতভাগ্য দরিদ্র কাশ্মীরীরা জোগাতে পারলো না রাজস্ব, সুতরাং তা'রা নিশ্চিহ্ন হতে লাগলো। দেশে ভূমিকম্প, কলেরা, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন—কথায় কথায়। বিচার নেই, অন্যায়ের প্রতিকার নেই, হত্যার শাস্তি নেই, অন্ন-বস্ত্র কোথাও কিছু নেই,—চারিদিকে হাহাকার।

এমন সময় রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যু হোলো। শিখরা পরাজিত হোলো ইংরেজের হাতে। রাজা গুলাব সিংয়ের হাতে এলো কাশ্মীরের শাসনভার। হৃদয় তাঁর কঠিন বটে, কিন্তু শানিত যুক্তি এবং প্রখর ন্যায়বুদ্ধির গুণে কাশ্মীরে তিনি সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করলেন। গুলাব সিংয়ের পৌত্র প্রতাপ সিং অপুত্রক ছিলেন, সেই কারণে তাঁর ভাগিনেয় হরিসিং মহারাজা হন্। হরিসিংয়ের পুত্র হলেন যুবরাজ করণ সিং।

দেখতে দেখতে দালহ্রদের তীরে সন্ধ্যা নেমে এলো। আলো জ্বলেছে হাউস বোটে আর নেহরু-পার্কের তাঁবুর মধ্যে। ফিরে চললুম শহরের দিকে।

শ্রীনগর দুই পারে বিভক্ত,—মাঝখান দিয়ে বিতস্তা নদী প্রবাহিত। সাতটি সাঁকোর দ্বারা নগরের দুই পার সংযুক্ত। বিতস্তাকে দেখলে কালীঘাটের আদিগঙ্গাকে হঠাৎ মনে পড়ে। নৌকা, শিকারা ও হাউস-বোটের ভীড় পদে পদে। আমি ছিলুম শহরের প্রায় নাভিকেন্দ্রে, জনতার কোলাহলে,—ওটায় আমার প্রয়োজন ছিল। হাট-বাজারের ভীড়ের মধ্যে, নোংরা বস্তির আনাচে-কানাচে, টাঙ্গা ও মোটরওলাদের আড্ডায়, ফলওয়ালা ফেরিওয়ালাদের পাড়ায়-পাড়ায়,—আমার কৌতূহলের সীমা নেই। হরিসিং হাই স্ট্রীটের পাশে রাধা-কিষণের মন্দির, পঞ্চমুখী হনুমানজী আর মহারানীর রামজী মন্দির,—এরা রয়েছে নগরের কোলাহলমুখর পল্লীতে। বিতস্তার তীরে রাজা গুলাবসিংয়ের প্রাসাদের মধ্যে পাওয়া গেল গদাধরের মন্দির। এই প্রাসাদের একটি অংশে

বসেছে আজ সরকারী দপ্তরখানা। প্রাসাদের পশ্চিমে হোলো-গান্ধীময়দান। একদা মহাত্মাজী এখানে দাঁড়িয়ে কাশ্মীরবাসীকে সম্ভাষণ করেছিলেন। সেটি ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রাক্কাল। এই প্রাসাদের তল বেয়ে চলেছে আপন মনে বিতস্তা। ওপারে দূরে হরিপর্বতের দুর্গ চোখে পড়ে।

শঙ্খঘণ্টারবে নদীতীর মুখর, সূর্যপ্রণাম করছে কাশ্মীরী পণ্ডিতের মেয়েরা। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করছে। নামহারা অজানা মন্দির অসংখ্য। কপালে চন্দন-তিলক, মাথায় লাল অথবা শাদা পাগড়ী, বর্ণ গৌর—এরা হিন্দু। সরকারি দপ্তরে, ডাকঘরে, টেলিফোনে, ব্যাঙ্কে, কাজকারবারে,—যেখানে যাও, সেখানেই পণ্ডিত। মুসলমান মানেই শ্রমিক জগৎ। কোনও মুসলমানের দাড়ি নেই, নমাজ পড়ে না অধিকাংশ। গরু কাটে না কেউ কাশ্মীরে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের গন্ধও নেই কোথাও। হিন্দুপরিবারে অবাধে চাকুরি করে মুসলমান; শিখহোটেলে নির্বিবাধে রাঁধে মুসলমান,—জাতিভেদ একটুও নেই। মুসলমানের হাতে খাচ্ছে যে-কেউ, ঢালাও বাস করছে উভয়ে একত্র। চট্ ক'রে মনে হতে পারে এটি আজব দেশ,—ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে। হিন্দু-পণ্ডিত আর আর্যমুসলমান বাস করছে কাশ্মীরের ঘরে-ঘরে।

ফিরছিলুম পথে-পথে। শের-ই-কাশ্মীর পার্কের আনাচে-কানাচে, কিংবা বিতস্তার ধারে-ধারে, ময়দানের আশে-পাশে, ছায়ানিবিড় বাগানবাড়ীর পাড়ায়-পাড়ায়। মনে অস্বস্তি ছিল দু'কারণে। পাকিস্তানের সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী কখন্ এসে পৌঁছয়, কখন বা শ্রীনগরে রক্তারক্তি আরম্ভ হয়। ধারণাটা আমার ভুল। আমার আসবার কয়েকদিন আগে খালসা হোটেলের কাছে দু'চারটি দোকানের সামনে একদিন একটু হল্লা হয়, দু'একটি লোক বুঝি পুলিশের গুলীতে মারা যায়,—তার পরে সব শান্ত। যেমন চলছে তেমনি। পীরপাঞ্জালের চূড়া চেয়ে রয়েছে কাশ্মীরের দিকে, চেয়ে রয়েছে হরমুখের চূড়া শাশ্বতকাল থেকে,—নীচের দিকে ইতিহাস পাল্টে যাচ্ছে কথায়-কথায়। দরিদ্র কাশ্মীর, ভাগ্যহত কাশ্মীর,—আছে তা'র ঘরে বিদুরের খুদ, আছে সুশীতল জল। কিন্তু না আছে সোনা, না কয়লা, না তেল, না লৌহধাতু। সমগ্র জগৎ এসে কাশ্মীরে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে যায়, রূপে আর গুণে সে লোভের বস্তু। পাঠান, তাতার, হূন, মোগল,—এরা এসে পাত পেতে খেয়ে গেছে, যাবার সময় হতভাগ্যদের ঘরকন্না ভেঙে দিয়ে মেয়ে লুট ক'রে নিয়ে গেছে। সতীত্বনাশ আর ধর্মনাশ,—এই হোলো কাশ্মীরের মধ্যযুগের ইতিহাস। মেরুদণ্ডভাঙা নিরুপায় দুর্বলের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বর্বর যুগে-যুগে। স্বভাবের কোমলতা তা'রা বোঝেনি, বোঝেনি ন্যায় ও নীতির মর্ম, বোঝেনি জ্ঞান-বিদ্যা-সংস্কৃতির মহিমা,—কিছু বোঝেনি। চেয়ে-চেয়ে দেখছি, সমস্ত মাঠের তৃণশয্যায় ফুল ফুটে রয়েছে বর্ণবাহার কার্পেটের মতো। নদীর তীরভূমি, পাহাড়ের গা, সরোবরের কোল,—সর্বত্র ফুল। পরিত্যক্ত জঞ্জালের স্তূপ, নালা

নর্দমার ধার, বাসন্তী-আস্তাকুঁড়ের ময়লা উঠোন, মাছি-ভনভনে দোকানের নোংরা জলের পাশ, ওদের মধ্যেই অজস্র অনাম্রা ফুল। ফুটবলের মাঠে ফুল মাড়িয়ে ছেলেরা খেলা করে, মেষ-ছাগল-গরুরা ফুল মাড়িয়ে ওঠে পাহাড়ের গায়ে, ফুল মাড়িয়ে তীর্থযাত্রীরা অতিক্রম করে অমরনাথের দিকে দুর্গম পাহাড়, কাটাধানের মাঠ ফুলে ভ'রে যায় কথায়-কথায়। তুলতুলে কাশ্মীরের মাটির তলা থেকে হাওয়ায়-হাওয়ায় ফুলের রাশি ওঠে দাঁড়িয়ে। এত ফুল ফুটলো ব'লেই নরম হয়ে রইলো কাশ্মীরী মেয়ে,—আঙ্গুরের গোছায় আর আপেলের শাঁসে রস এত নিবিড় হোলো ব'লেই তা'রা মদালসা হয়ে রয়ে গেল। এ ভালো নয়। খুশী হতুম, যদি দেখতে পেতুম কাশ্মীরে কাঁটালতার ভীড়, যদি দেখতুম প্রাচ্যের এই নন্দনকাননে পাওয়া যায় বিষাক্ত সর্প, যদি জানতুম অরণ্যে-অরণ্যে দেখা যায় হিংস্র শ্বাপদ। আমরা বাঙালী, কবিতার দেশে আমাদের জন্ম। গান গেয়ে-গেয়ে আমরা ভাব্য সৃষ্টি করেছি। কালো মেয়েকে আমরা বলি কৃষ্ণা, কালো পাথরকে বলি শালগ্রাম। আঙ্গুল টিপলে জল ওঠে বাঙালীর চোখে, জ্যোৎস্না দেখলে আমরা যাই ফুলবাগানে, নদীর কল্লোলের সঙ্গে আমরা ধরি মাঝির গান। বাঙালী ভালোবাসা জানে, কিন্তু অপমানের বিরুদ্ধে খড়গাঘাত করতেও সে জানে। অকল্যাণ ঘনিয়ে এলে সংহারমূর্তি ধরে বাঙালী। রাষ্ট্রে অধর্ম দেখা দিলে বাঙালী হিংস্র হয়ে ওঠে; উৎপীড়নে জর্জরিত হ'তে থাকলে বাঙালী অপেক্ষা প্রতিশোধপরায়ণ জাতি আর কেউ নেই। ডান হাতে তরবারি ধ'রে বাঙালী গীতাপাঠ করে।

সৌন্দর্যের সঙ্গে স্বভাবের দৃঢ়তা থাকলে কাশ্মীরকে মানিয়ে যেতো। কাশ্মীরে পাথর নেই তাই কাঠিন্যও নেই। ওদের ওই লাবণ্যলতাকে নিষ্পেষণ করলে রক্ত ঝরে না, আঙ্গুরের রস গড়িয়ে পড়ে। চাহনিতে ভদ্রতা, আচরণে নম্রতা, চলনে ভব্যতা। জাতিভেদ আছে, কিন্তু অস্পৃশ্যতা নেই; রুচিভেদ আছে, কিন্তু তার প্রকাশে রুক্ষতা নেই। ওদের এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক খাদ্য। ওদের রাজনীতির মধ্যে বিরোধীদলের ধ্বংসাত্মিক চক্রান্ত নেই,—ওরা সবাই একাকার। যাদের সঙ্গে মতে মিলছে না, তাদেরকে ডেকে আনে ঘরের মধ্যে বিরোধ মিটাবার জন্য। ওদের কোনও উগ্র রাজনীতিক অথবা অর্থনীতিক মতবাদ নেই। ওদের একমাত্র কাম্য হোলো যুগযুগান্তরের দস্যুতার হাত থেকে কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে রাখা। ওরা এবার বাঁচবার নীতি গ্রহণ করেছে।

দেখছি খানাবল, দেখছি অনন্তনাগ আর মার্তণ্ড, দেখছি আইশমোকাম আর গণ্ডারবল,—ভাবের বিরোধ নেই কোথাও। নিরীহ সংসারযাত্রা অনাহত শান্ত। মাঠে-মাঠে চাষ চলছে ধানের, মন্দিরে শোনা যাচ্ছে ঘণ্টারব, বিতস্তায় স্নান ক'রে যাচ্ছে মেয়েপুরুষ, কলাবাগানের ধারে লাউমাচার পাশে খেলা করছে শিশুরা, বিছানা রোদে দিচ্ছে মেয়েরা। উপর দিকের দিগন্তে দেবতাত্মা হিমালয়ের আদিঅন্তহীন অবরোধ। অনন্ত পর্বতমালা গগনের এ প্রান্ত থেকে

চ'লে গেছে কোন্ প্রান্তে,—সে যেন দিশাহারা নিরুদ্দেশ। ওই পর্বতশ্রেণীর অজানা অচেনা গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে চিরকাল ধ'রে দানব ও দেবতার আনাগোনা চলেছে। সব চেয়ে প্রাচীন, সব চেয়ে দুঃসাহসিক বিজয়াভিযান চলে এসেছে ওই হিন্দুকুশের তলায়-তলায়। প্রাচীন সভ্যতার বার্তা চলে গিয়েছে এপার থেকে ওপারে। ওরা পেরিয়েছে কৃষ্ণগঙ্গা আর সিন্ধু, পেরিয়ে গেছে টাঙ্গির, কোহিস্তান, হিন্দুরাজ, চিত্রল, পেরিয়ে গেছে অগণ্য পার্বত্য পথ; অতিক্রম ক'রে গিয়েছে দুঃসাধ্য গিরিসঙ্কট একটির পর একটি, সেই সব প্রাণীহীন, তরুলতাহীন, জলচিহ্নহীন দুর্গম তুষারকান্তারের ভিতর দিয়ে। অগণিত নামহারা গিরিসঙ্কট আজও রয়ে গেছে মানচিত্রে। চিত্রলের ভিতর দিয়ে দোরান, পঞ্চশির পর্বতমালার ভিতর দিয়ে বলিয়ানপথ,—একটির পর একটি চ'লে গিয়েছে সেই কোথায় আমুদরিয়ার প্রবাহপথ ধ'রে টারমেজ-এর দিকে।

টারমেজ! চমকে উঠেছিলুম। মনে প'ড়ে গেল প্রাচ্যের মানবসভ্যতার তখন প্রথম জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে! সেদিন স্মরণীয় কালেরও অতীত। আর্যরা জপে বসেছে হিমালয়ে, তাদের সেই বীজমন্ত্রে ভারতসভ্যতার প্রথম উদ্বোধন ঘটছে। কেউ ছিল না তখন পূর্বে আর পশ্চিমে। জন্তুর ছাল জড়িয়ে বেড়াতো মানুষ,—কি মেয়ে, কি পুরুষ, লজ্জা এসে তখনও পৌঁছয়নি তাদের অঙ্গে-অঙ্গে। তার পরে ক্রমে খবর রটে গেল মধ্যপ্রাচ্যের পাড়ায়-পাড়ায়, হিমালয়ের উপবনে আর তপোবনে সামগান মুখরিত হচ্ছে। বেদ রচনার পর বেদব্যাস ব'সে গেছেন বেদবিভক্তিতে। তারপরে দেখতে-দেখতে গেল অনেক কাল। জানিনে কত যুগ-যুগান্ত। এমন এক কালে এই হিমালয়ের গহন রহস্যলোক থেকে উঠে এলো এক তরুণ সুকুমার রাজকুমার,—নাম তার শাক্য-সিংহ। জীবন কি, মৃত্যু কি, পথ কি, ঈশ্বর কি,—এই প্রশ্ন তাকে সেদিন অস্থির করেছিল বলেই ভারতের ইতিহাস আবার ঘুরে দাঁড়ালো। সেই আড়াই হাজার বছর আগে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার; হেলাস, স্লাভ, মোঙ্গল, আরব,—এদের নাম শোনেনি কেউ; গান্ধার তখন ছিল, কিন্তু কনিষ্ক এসে পৌঁছয়নি; তখন অসভ্য জাতিতে ইউরোপ অধ্যুষিত; ইংলন্ড তখন আদিম সামুদ্রিক জাতির এলাকা,—বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ায় জলা-জঙ্গলে। তখনকার দিনে এই হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর আর হিন্দুকুশের শাখাপ্রশাখায়, সমগ্র গান্ধার ছাড়িয়ে কশ্যপহ্রদ পেরিয়ে ওই শাক্যসিংহের পৃথিবী-বিজয়ী সভ্যতা আপন অপরাজেয় বীর্যবত্তাকে প্রকাশ করেছে সম্রাট অশোকের উদ্যমে।

এই আমুদরিয়ার সীমান্তেই ছিল ভারতসভ্যতার সীমানা। প্রায় আটশো বছর পরে চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ এখানে প্রথম পদার্পণ ক'রে দেখেছিলেন পৃথিবীর বিরাটতম বুদ্ধমূর্তি। এই সকল মহাকীর্তির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা

ছিলেন সম্রাট কনিষ্ক—ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের তিনি গৌরব। কনিষ্ক তাঁর রাজত্বকালে সম্রাট অশোকের আদর্শ পালন করেন এবং তিনি সমগ্র গান্ধারে অগণ্য বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। গান্ধার থেকে উত্তর ভারত এবং আর্যাবর্ত অবধি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। ওই গান্ধারেরই এক বৌদ্ধমঠে হুয়েন সাঙ বাস করেছিলেন বহুদিন। এই হিন্দুকুশ আর আমুদরিয়ার মধ্যবর্তী প্রাচীন ব্যাকট্রিয়ার সভ্যতা এই সেদিনও জাজ্বল্যমান ছিল, কিন্তু মোঙ্গলদের হাতে সেই সভ্যতার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটেছে মাত্র ছয়শো বছর আগে। হুয়েন সাঙ বলছেন, হূনদের প্রবল ধ্বংসাত্মক আক্রমণ সত্ত্বেও সপ্তম শতাব্দী অবধি ব্যাকট্রিয়ার রাজধানীর প্রান্তে শতাধিক বৌদ্ধগুম্ফায় প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধ-ভিক্ষু তখনও ছিলেন।

এই টারমেজ আর আমুদরিয়ার তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার। তাদের পরণে ছিল জন্তুর ছাল আর লতাপাতার আবরণ। এই টারমেজ আর আমুদরিয়ার প্রান্ত অবধি ছিল ভারতের রাজনীতিক সীমানা—যার উপরে প্রভুত্ব ছিল সম্রাট অশোকের। উত্তরে তেমনি ছিল বৃহৎ পামীর,—আলাই পর্বতমালার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। ইতিহাসের কাল এসেছে অনেক পরে, কিন্তু কাশ্মীরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে হিমালয়ের অন্তর্গত কারা-কোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরির স্তবকে-স্তবকে,—এবং আলাই, হিন্দুকুশ, কো-হি-বাবা, কালা পাঞ্জা, হরিরুদ্র, হেলমন্দ, পঞ্চশির, কপিশ, ত্রিচিমির, সেবক, শিবরাগ,—ইত্যাদি অঞ্চল ভারতীয় ভূগোলের অন্তর্গত ছিল চিরকাল। অনেকে নাম বদলেছে, ভাষা ও আচার বদলেছে, জীবনের চলতি নিয়মের ধারাও বদলেছে,—কিন্তু আজও রয়ে গেছে ওদের গুহায়-গুহায় বৌদ্ধসংস্কৃতি, পথে-প্রান্তরে-উপত্যকায় মঠ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পাথরে-পাথরে খোদিত অশোক আর কনিষ্কের অনুশাসন লিপি। আজকের আফগানিস্তান সেদিন আগাগোড়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত ছিল, ছিল গান্ধারের অন্তর্গত—যেখানে গ্রীক ও ভারত-সংস্কৃতির সংযোগের ফলে অভিনব শিল্পকলার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে যার নাম শুনি, গান্ধারশিল্প। কিন্তু এই স্থাপত্য ও ললিতকলা বৌদ্ধসংস্কৃতি থেকে জন্মলাভ করে। সম্রাট অশোকের সুশাসনকালে বৃহত্তর কাশ্মীর ও গান্ধারে স্বর্ণযুগের ঐশ্বর্য দেখা দিয়েছিল। শ্রীনগর শহরটি প্রথম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

ফিরে আসি ঐতিহাসিক যুগের কাশ্মীর প্রান্তে। ওই হিন্দুকুশের উপত্যকাপথে দাঁড়িয়ে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদেছে গান্ধার নরনারী। ঝড় উঠেছে ওখানকার স্নিগ্ধ শ্যামল প্রান্তরে, বালুর আঁধি উঠেছে আমুদরিয়া থেকে হিন্দুরাজপর্বতমালা পেরিয়ে মধ্যএশিয়ায়। রক্তমাখা তরবারী হাতে নিয়ে মোঙ্গলরাজ চেঙ্গিস খাঁ ছুটে এসেছে ভারতের বহির্প্রান্তে। ক্ষণে-ক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে চেঙ্গিস। শত-শত কোটি স্বর্ণমুদ্রামূল্যের জড়োয়া জহরৎ, পরমা-সুন্দরী অনন্তযৌবনা কাশ্মীরী উর্বশীর দল, জলা-বিল-উপত্যকাবেষ্টিত

শস্যশোভাময় কাশ্মীর ও ভারত,—চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাতারসম্রাট চেঙ্গিস। পরণে ব্যাঘ্রচর্ম, কণ্ঠে শোণিত পিপাসা,—মৃত্যুর ঝড় তুলে সে আসছে এগিয়ে।

চেঙ্গিস খাঁ বলেছিল, শুধু চাই জয়ের উল্লাস। পদদলিত শত্রুর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে রক্তপতাকা তুলবো—এই আমার একমাত্র আনন্দ। ধ্বংস করবো, লুট করবো,—আর সেই ভগ্নস্তূপের জটলায় দাঁড়িয়ে কাঁদবে সবাই,—এই মনোহর দৃশ্য দেখতে চাই। নারী ও তাদের কন্যাদলের প্রতি পাশবিক অনাচার চালাবো,—এই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। আগুনে, রক্তে, লুণ্ঠনে, ধ্বংসে, হত্যায়—আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

সংখ্যাতীত নরবলি দিল চেঙ্গিস। জনশূন্য হয়ে চললো নানা ভূভাগ মধ্য-এশিয়ায়। লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করলো নগরের পর নগর, ধ্বংসস্তূপে পরিণত রাজপ্রাসাদ আর ধর্মমন্দির। এর পরে আবার গেল অনেক কাল। অতঃপর আবার এসেছিল ওই চেঙ্গিসের বংশধর তৈমুরলঙ্গ। সেও পেরিয়ে এসেছিল ওই আমুদরিয়ার তীরবর্তী টারমেজ। সে পৌঁছেছিল দিল্লী পর্যন্ত। সহস্র-সহস্র নরমুণ্ড নিয়ে লোফালুফির পর সেও এক লক্ষ বন্দী ভারতীয়কে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করে। প্রকাশ, তৈমুরের এক-একজন সেনাপতি নিজের সঙ্গে দেড়শত শিশু, নারী ও পুরুষকে ক্রীতদাস ক'রে নিয়ে যায়। তা'রা সবাই সমরখন্দে ফিরে গিয়ে কোটি-কোটি স্বর্ণমুদ্রা, হীরা জহরৎ ও সুন্দরী নারীদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নেয়। হিমালয়ের গিরিগুহাবর্ত্মে তাদের কান্না অনেককাল প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আমুদরিয়ার অশ্রুনদী আজও বয়ে যায় টারমেজের তীরে-তীরে।

হিমালয়ের গর্ভে সেই পুরনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আবার ঘটে গেল কাশ্মীরে এই সেদিন—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। সেই কথাই বলি।

কাশ্মীরে আমার নবলব্ধ সাংবাদিক বন্ধু এম-কে-ধার-এর উৎসাহে এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন পাব্‌লে এলেন গাড়ী নিয়ে সকালবেলায়। জীপগাড়ীতে আরেক তরুণ বন্ধু আছেন মিঃ আচারি। আমাকে নিয়ে যাবেন ওঁরা যুদ্ধবিরতি সীমানার ধারে, যেটা এখন কাশ্মীরের 'সীজ্ ফায়ার লাইন।'

পীর পাঞ্জালের উত্তুঙ্গ গিরিলোক চিরদিন বিশ্বাসঘাতক। ওই গিরি-শিখর লোকের দিকে তাকিয়ে আজও প্রতি কাশ্মীরীর হৃৎকম্প হয়। মহিষাসুরের মুণ্ডের মতো পীরপাঞ্জালের এক একটি চূড়া করাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কাশ্মীরের দিকে। অথচ সমগ্র কাশ্মীর বংশপরম্পরায় অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত। এরা শেখেনি যুদ্ধ করতে, শেখেনি আত্মরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গের অভিযান। সেই কারণে কোনওদিন কোনও শত্রুকে বাধাও দিতে পারেনি প্রাণপণে।

শ্রীনগর ছাড়িয়ে মাইল চারেক দূরে এসে পাওয়া যায় সাল্লাটেং,—এই পর্যন্ত

এসে পৌঁছে সেদিন পাকিস্তানী উপজাতীয় পাঠানদেরকে থামতে হয়েছিল। এখানে পথ দুইভাগে বিভক্ত। সামনে বিশাল ধানক্ষেত, আশে-পাশে গ্রামবাসীদের নিরুদ্বিগ্ন জীবন। কিন্তু এই ধানক্ষেতের উপর থেকেই কাশ্মীরের মিলিসিয়া পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকের দল ওদের পথরোধ ক'রেছিল। নগরে যেন ওরা প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু সেই প্রতিরোধ শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে তখন বিমানযোগে ভারতীয় সৈন্য ও সাহায্য শ্রীনগরে এসে পৌঁছয়।

উপজাতীয় পাঠানদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্ভাব কিন্তু নেই। এরা আফগানিস্তানের সীমান্ত-সন্তান, কিন্তু পাকিস্তানের শিষ্য নয়। এরা ইংরেজ এবং পাকিস্তান—এই দুয়েরেই প্রতি বিরূপ। কিন্তু এদের মধ্যে যারা একান্তই হিংস্র প্রকৃতি, যেমন হাজারা জেলার অধিবাসী তুর্কী-রুশীয় 'কারগিজ কাজাকি'রা, তাদেরকে উৎকোচে বশীভূত করা হয়েছিল। তা'রা ধনদৌলত পাবে, শস্যক্ষেত্র পাবে, পছন্দসই স্ত্রীলোক পাবে—এই আশ্বাস পেয়ে তবে তা'রা হামলা করে। পিছনে রইলো পাকিস্তান,—অস্ত্র ও রসদ পিছন থেকে অজস্র যুগিয়ে যাবে। সুতরাং দানবকায় মত্ত হস্তীর দল বিরাট এক দস্যুবাহিনীর আকার ধ'রে রাওয়ালপিণ্ডি, মারী, হাভেলীয়ান, নাথিয়াগলি, কোহালা ও দুমেলের পথে বিতস্তা নদীর তীর ধ'রে কাশ্মীরে ঢুকে অতর্কিত আক্রমণ চালালো। রক্ত, আগুন আর নারীধর্মনাশ চললো বন্যাবেগে।

ক্যাপ্টেন পাবলে নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। জাতিতে তিনি শিখ। যেমনই শিক্ষিত ভদ্র, তেমনি শান্ত। আমরা সোজা বরমুলার পথ ধরেছিলুম। পথে-পথে পাওয়া যাচ্ছে রাজা ললিতাদিত্যের কীর্তির অবশেষ, রাজা অবন্তী-বর্মার নানা স্মৃতিচিহ্ন, সম্রাট অশোকের আমলের কিছু-কিছু স্থাপত্য। অতি সুন্দর বাঁধানো পথে পড়েছে মধুর রৌদ্র, আশে-পাশে টিলাপাহাড়ের গায়ে রঙ্গীন পাখীরা ডাক দিয়ে যাচ্ছে আসন্ন শরৎকালকে। এখানে-ওখানে আপেলের বনে একটু-একটু রং ধরেছে।

পাবলে হাসিমুখে বলছিলেন, এ পথে যাচ্ছি, এখানে কিন্তু এই সেদিন অনেক রক্ত গড়িয়েছে। তবে কি জানেন, পৃথিবীতে শান্তি ও অহিংসাবাদ প্রচার করা এক কথা, আর সামরিক রীতি-নীতির পুঙখানুপুঙখ বিধিব্যবস্থার ওপর রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করা অন্য বস্তু।

গাড়ী চলছে। কথাটা বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, আপনি বোধ হয় শোনেননি, কাশ্মীরের এ যুদ্ধ আমরা সম্পূর্ণ জয় ক'রে এনেছিলুম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের মন্দ। চরম আঘাত হানবো, এমন মুহূর্তে হঠাৎ আমাদের থমকে যেতে হোলো।

কেন?

ক্যাপ্টেন হাসলেন। কিন্তু তখনই ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, রাষ্ট্রের নীতি অহিংসাবাদ এবং সাধুতার ওপর দাঁড়াতে পারে, কিন্তু যুদ্ধকালের একমাত্র নীতি

হোলো বর্বরতার অবসান ঘটানো। আমাদের সেই নাটকীয় জয়লাভের অগ্রগতি হঠাৎ রাজনীতিক নির্দেশ সামরিক অভিযানকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে বসলো। কাশ্মীরের জনসাধারণ হায়-হায় ক'রে উঠলো আমাদের দুর্বলতা দেখে।

তার পর?

তারপর 'সীজ ফায়ার!' বুক ফুলিয়ে লাইনের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালো রক্তমাখা দস্যুর দল, আর বুক ফুলিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রকারীরা পাঠিয়ে দিল জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধিদলকে। চেয়ে দেখুন, তাঁবু ফেলে বসেছে তা'রা দুই পারে—চক্রান্ত চলছে এপারে-ওপারে। ক্যাম্পে-ক্যাম্পে মদ আর মেয়ে। সমস্ত রাত ধ'রে হুল্লোড়। শাদা গাড়ী ছুটিয়ে ওরা আসে শ্রীনগরে—অসচ্চরিত্রা ইঙ্গ-মার্কিন মেয়েরা হোলো ওদের গোয়েন্দা। ওদের নোংরা কীর্তি সবাই জানে। আপনারা ত' জানেন, একটি ইংরেজ মেয়ের গোয়েন্দাগিরির কথা। বক্সী গোলাম সাহেব তাকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের সমস্ত শক্তি থাকতেও আমরা নির্বোধ ব'নে রইলুম।

শ্রীনগর থেকে বরমুলো মাত্র চৌত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের পথ। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় শঙ্করাচার্যের মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে পথের দুই ধারে চেনার আর পপলারের সারি। যেদিকে চাই, যে পাশে ফিরি,—মৃন্ময় কাশ্মীর,—সুন্দর, নশ্বর, পেলব। ছোট ছোট টিলা পাহাড় এখানে-ওখানে, এ মাঠে আর ও মাঠে,—মনে হচ্ছে আগামী বর্ষায় গ'লে যাবে সব।

পাটান পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। এই একই পথ। এই পথে যেমন এসেছি পাঠানকোট থেকে জম্মু আর শ্রীনগর, তেমনি এই পথ সোজা গিয়েছে বরমুলো, উরি, দুমেল আর কোহালার ঝিলম নদীর পুল পেরিয়ে সানিব্যাঙ্ক হয়ে রাওয়ালপিণ্ডির দিকে। এ আমার সম্পূর্ণ জানা পথ। এই পথ আমাকে অস্থির করেছিল তরুণ বয়সে,—যখন আমার বসবাস ছিল রাওয়ালপিণ্ডির ওদিকে।

দুই পাশের শান্ত পল্লীপ্রকৃতি পেরিয়ে জীপ চলেছে। অজস্র ফসল দুই ধারের ক্ষেতে। ফলের গাছগুলি এখন পরিপূর্ণ। তন্দ্রাজড়ানো বাতাস বয়ে চলেছে। কোথাও কোনও অশান্তি অথবা কোলাহল নেই।

এক সময় একটি মৃন্ময় টিলাপাহাড়ের নীচে এসে ক্যাপ্টেন জীপগাড়ী থামালেন। আন্দাজ পঞ্চাশ ফুট উঁচু। আমরা উপবে উঠে গেলুম। সামনেই একটি কালো পাথরের স্মৃতিফলক। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ডি-আর-রে এই পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সদলবলে পাঠানদের প্রতিরোধ করেন। এইখানে ব'য়ে গেছে সেদিন রক্তের প্রবাহ, সে-রক্ত গড়িয়ে গেছে ক্ষেতখামারে, গেছে অদূরবর্তী বিতস্তার গৈরিক স্রোতে। কিন্তু হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে দস্যুদলের সামনে কর্ণেল যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি, তেমনি এক ইঞ্চি হ'টে যেতেও চাননি। ফলে, এইখানেই গুলীবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান্। সেই অসম-

এসে কি প্রকৃত যোদ্ধার হৃৎপিণ্ড থেকে ঠিক এই স্থলে প্রথম রক্তবিন্দু ঝ'রে পড়ে, এই কারণেই এখানে তাঁর স্মৃতিফলকটি নির্মিত। তারিখটি লেখা রয়েছে পাথরে, অক্টোবর ২৭, ১৯৪৭।

মাইল দেড়েক দূরে বরমূলায় এসে পৌঁছলুম। ছোট শহর, প্রবেশপথটি পাহাড়ে বেষ্টিত। এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল বরাহমূল। সংবাদপত্রে পড়া সেদিনের বীভৎস কাহিনীর কথা স্মরণ ক'রে পা দুখানা যেন ভারী হয়ে উঠলো। সামনেই সেই মিশনারীদের সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট জোসেফস কনভেণ্ট। ক্যাপ্টেন বললেন, আসুন, ভেতরে ঢুকি।

ভিতরে হাসপাতাল ও বিদ্যালয়, আশেপাশে সুন্দর বাগান এবং বসবাসের ঘর। এরই মধ্যে ঢুকে দস্যুরা যে কয়জন শ্বেতাঙ্গ রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে, তাদেরই একজনকে ডেকে ক্যাপ্টেন আলাপ করিয়ে দিলেন। শান্ত নম্রমুখী মহিলা। তাঁর চোখে চশমা, মুখের ভাবটিতে বুদ্ধি ও মাধুর্য একসঙ্গে মিশেছে। মহিলা সেই ভয়াবহ দিনগুলির নানা বীভৎস কাহিনীর বর্ণনা ক'রে একসময় বললেন, আমাদের এক বন্ধু জনৈক ইংরেজ কর্নেলের স্ত্রী এখানে তখন সদ্য একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন এবং সেদিন পাঠান আক্রমণের সংবাদ পেয়ে স্বয়ং কর্নেল এসে তাঁর স্ত্রী ও সদ্যপ্রসূত সন্তানকে বিলাতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। দস্যুরা স্বামী-স্ত্রীকে এই কনভেণ্টের মধ্যেই হত্যা করে এবং শিশুটিকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আনন্দে নাচতে থাকে। তাদের সাংঘাতিক আক্রমণে সমস্ত কনভেণ্ট ছারখার হয়। এ যা দেখছেন, এসব আবার নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে। আমি একমাত্র সেদিনকার 'প্রেতিনী' হয়ে বাস করছি!

মাথা নীচু করেছিলেন ক্যাপ্টেন। মহিলা এবার চুপ করলেন। আমি ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখতে লাগলুম। পীর পাঞ্জালের দূর সীমানায় এসে এইসব আমাকে দেখে যেতে হোলো।

কনভেণ্টের একটি অংশে প্রসূতি আগার। সেখানে কাশ্মীরী রোগিণী রয়েছে কয়েকজন। অধিকাংশই মুসলমানী। একটি কারিগরী বিদ্যালয়ে কয়েকটি মেয়ে হাতের কাজ শিখছে। শিশুরা একস্থলে ঔষধপত্রাদি নিচ্ছে। একধারে কয়েকটি পরিত্যক্ত নবজাত শিশুকে রাখা হয়েছে। সমগ্র ভারতের ও কলকাতার অন্যান্য কনভেণ্টের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

ভারাক্রান্ত মনে আমরা কনভেণ্ট থেকে বেরিয়ে শহর পরিদর্শনে বেরোলাম। না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। মনে হচ্ছিল, মাত্র গতকাল সমস্ত শহর জ্বলে পুড়ে কাঠকয়লার মতো হয়ে গেছে। পথে পথে সর্বত্র স্তূপাকার ধ্বংস। ক্যাপ্টেন দেখাচ্ছিলেন, অবারিত লুণ্ঠন ও হত্যার কেন্দ্র; শত শত নরনারী পুড়েছে একই অগ্নিকুণ্ডে; পথের এক একটি কেন্দ্রে সংখ্যাতীত রমণীকে উলঙ্গ ক'রে দস্যুদল উল্লাসরঙ্গে নৃত্য করেছিল। স্বামীর দুই হাত আর দুই পা কেটে

নিয়ে সেই কাটা-হাত-পা ন্যাংটা নগ্না স্ত্রীকে প্রহার করা হয়েছিল। অগণ্য উৎপীড়িতা আতঙ্কিতা নগ্না রমণী ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে বিতস্তায়; সংখ্যাতীত রক্তমাখা নারীর অচেতন দেহ নালার ধারে প'ড়েছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়। পাথর দিয়ে ছেঁচে এবং পথের উপর আছাড় মেরে শিশু বালক বালিকাকে হত্যা করা হয়েছে,—তাও অসংখ্য। জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে বরমুলা। যেদিন মৃত্যুর মতো অসাড় শান্তি ফিরে এলো, দেখা গেল বরমুলার অন্ধকার শ্মশানে কাঁদবার কেউ নেই। যাবার সময় দস্যুরা নিয়ে গেছে শত শত নারী ও বালিকা। বরমুলার আগাগোড়া এই ইতিহাস।

মুসলমানি শহর, কিন্তু একটি মসজিদও চোখে পড়ছে না। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সঙ্কীর্ণ বিতস্তার ওপারে প্রাচীন রঘুনাথজীর মন্দিরে তখনও বাজছে শঙ্খ ও ঘণ্টা। একটি বৃহৎ চেনারবৃক্ষের ছায়া পড়েছে মন্দিরের সুবর্ণ কলসে। কলসের গায়ে কালো দাগ। শুনলুম ওপারেও আগুন জ্বলেছিল। মন্দির-অঙ্গনে পণ্ডিতদের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। বিতস্তার তীরে অবগাহন স্নান ও পুজোপাঠ চলছে।

বাজারের জনবহুল পথের এক স্থলে এসে ক্যাপ্টেন দাঁড়ালেন। সামনেই কাশ্মীর-কেশরী মকবুল শেরওয়ানির বালিধ্বসা দোতলা বাড়ী, এবং তা'র ইঁটের দেওয়ালে আজও রয়েছে গুলীর দাগ। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে তাঁর সামনে তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি নারী ও শিশুকে এনে একে একে হত্যা করা হয়। অতঃপর দস্যুরা শেরওয়ানিকে প্রশ্ন করে, এখনও তিনি পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজি আছেন কি না। শেরওয়ানি ঘৃণার সঙ্গে এই নরহত্যাকারী দস্যুদলের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁর অপমানজনক তিরস্কারে ক্রুদ্ধ দস্যুরা তাঁরই বাড়ীর দেওয়ালে তাঁকে পেরেক পুঁতে ঝুলিয়ে তাঁর দেহকে গুলীবিদ্ধ ক'রে শতছিদ্র করে!

শেরওয়ানির উদ্দেশে আজ নিত্যপ্রণাম জানায় কাশ্মীর।

ফিরবার পথে 'সংগ্রামা' হয়ে 'সোপোর'। এর প্রাচীন নাম ছিল, সুইয়াপুর। অনেকে বলে, রাজা অবন্তীবর্মার কালে 'সুইয়া' নামক এক ইঞ্জিনীয়ার ঝিলমের বন্যার গ্রাস থেকে কাশ্মীরকে বাঁচাবার জন্য এখানে এক নদী-পথ কেটে দেন। যাই হোক, সোপোরেরও ওই এক ইতিহাস। নদীর ওপার থেকে আসে উপজাতীয় পাঠানরা, এবং পিছন থেকে এগিয়ে আসে বরমুলা থেকে দস্যুদল। উভয়েরই উদ্দেশ্য লুণ্ঠন ও নারীহরণ। সেই চূড়ান্ত সঙ্কটকালে কয়েকটি পরিবারের পুরুষ আপন আপন হাতে নিজ পরিবারের নারীগণকে হত্যা ক'রে অবশেষে নিজেরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেই নাটকীয় সঙ্কটকালে চারিদিক থেকে ভারতীয় সেনাদল দস্যুদলের উপর ঝাঁপিয়ে

পাড়ে। ক্যাপ্টেন শান্তকণ্ঠে বললেন, মুসলমানের উপরে মুসলমানের এই অমানুষিক বর্বরতা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।'

সোপোরের বাজার বেশ বড়, পথঘাট জনবহুল। বুঝতে পারা যায়, মহাজনতা চিরকাল বিস্মৃতিপরায়ণ। কত ক্ষতি ও ক্ষত মানুষ আবার ভুলতে বসেছে। নতুন কালে আবার নতুন ফসল ফলেছে, নতুন মানুষ জন্ম নিয়েছে, গাছে গাছে নতুন কিশলয় দেখা দিয়েছে।

যদি কেউ এই মৃত্তিকার লাবণ্যের উপর কান পেতে থাকে, কাশ্মীরের কান্না শুনবে। রক্তপিচ্ছল ভূস্বর্গ এবার হয়ত মৃত্যু আর অপমান থেকে ভীষণামূর্ত্তিতে উঠে আসতে চায়। বিবশা বিস্রস্তা মৃন্ময়ী এবার তা'র ধূলিধূসর এলোচুল ফিরিয়ে বাঁধুক। অগ্নিক্ষরা করাল দৃষ্টি তুলে এবার ডাক দিয়ে বলুক, "হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাক্যহীনা, রক্তে মোর বাজে রুদ্রবীণা!" ওর প্রাণের ইতিহাসের পর্বে পর্বে হূন তাতার মোগল পাঠান সবাই এসে ওর সর্বাঙ্গে নখরাঘাত হেনেছে বর্বরের মতো, হিংস্র দস্যুর দল যুগে যুগে ওর তনুলাবণ্যের পরে পাশব প্রবৃত্তির খেলা খেলেছে! এবার উঠে দাঁড়িয়ে মুছুক চোখের জল, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহে ডাক দিক্ ওই হরমুখ হিমালয়ের বজ্রপাণিকে,—পশুহননের জন্য পাশুপত অস্ত্র হাতে তুলে নিক্—!

* *

গুহাতীর্থ অমরনাথ থেকে ফিরে দিন তিনেক পুনরায় বাস করেছিলুম পহলগাঁওয়ে। শহর ফুরিয়ে যায় বড় জোর মাইল খানেকের মধ্যে। ওইটুকুর মধ্যেই চলাফেরা, ওইটুকুর মধ্যেই কাজকারবার ব্যবসা বাণিজ্য। এপাশের উপত্যকা পথে উঠে গেছে পাইনের সুদীর্ঘ বনরেখা, আর দক্ষিণ নীলগঙ্গার তীর ধ'রে চলে গেছে চিড়গাছের অরণ্য। নদীর ওপারে সমগ্র পশ্চিম উত্তুঙ্গ পর্বতমালায় অবরুদ্ধ। ওদের ভিতর দিয়ে মাইল পনেরো অভিযান করলে কোলাহাই হিমবাহ এবং লিডারবৎ,—গুজরজাতির যাযাবরের দল ওই পথ দিয়ে আনাগোনা করে। মহাকাব্য যেন আসন পেতে বসেছে এখানে।

আবহমান কাল এখানে মন্থরগতি। প্রাণীজগতে কোথাও চাঞ্চল্য নেই। আপন মনে কাজ ক'রে চলেছে হিমালয়ের প্রকৃতি। সূর্যাস্তকালে পশ্চিম পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রাখলে সন্ধ্যা কেটে যায়, ধীরে ধীরে মেঘের টুকরো নেমে আসে নীলগঙ্গার নীলাভ জলের ধারে,—তার পর যেন ঘুমিয়ে পড়ে। জ্যোৎস্না-রাত্রে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ডুক্‌রে-ডুক্‌রে ওঠে নীলগঙ্গা।

পহলগাঁও থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লুম।—

ছায়ানিবিড় রোমাঞ্চ ছিল কোনো এক পাহাড়তলীর বস্তিতে, তারই চূড়ায়

দিকে পশ্চিমমুখী এক মসজিদ এতোদিন পরে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল। প্রচুর নাম হোলো, জনকমহল, কিন্তু নাম বদলেছে ইদানীং কালে—যেমন আস্থেশ-মোকাম! প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কাশ্মীরে বৌদ্ধ ও হিন্দু স্থাপত্যকীর্তিই প্রধান,—এদের সঙ্গে মিশেছে কোথাও কোথাও আরও দুটি শিল্পকলার প্রভাব। একটি হোলো গ্রীক, এবং অন্যটি তিব্বতী, যার মূলে ছাঁচ হোলো মঙ্গোলীয়। সাম্প্রতিক তিন চার শো বছরের মধ্যে অবশ্য একটু আধটু মোগল স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে সন্দেহ নেই। শ্রীনগরের সন্নিকটে যেটি বড় মসজিদ—অর্থাৎ শাহ হামদান,—এটিকে বৌদ্ধ-'মসজিদ' বলা চলে। এই মসজিদ যেখানে দাঁড়িয়ে উঠেছে, সেই স্থলটি হোলো দেবী কালীশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের প্রাঙ্গণ। কাশ্মীরের সর্ব-বৃহৎ জুম্মা মসজিদও তাই, প্রাচীন দেবদেউলের কোলেই তার ভিত্তি। কিন্তু এ ছাড়া কি আর কোনও জায়গা ছিল না? ছিল বৈকি। কিন্তু হিন্দুস্থাপত্য স্থান-নির্বাচনে চিরকাল পারদর্শী। পুরীর জগন্নাথ, সমুদ্রবেলায় কোনারক, পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত ঝিলম শহরের নদীতীরবর্তী বিশাল শিবশক্তির মন্দির, পূর্ব পাকিস্তানে সমুদ্রশোভা-সমন্বিত চন্দ্রনাথ, করাচীর মহাকালীর মন্দির, বেলুচিস্তানের অঘোর নদীর তীরে জ্যোতির্লিঙ্গ হিঙ্গুলা দেবী, অগ্নিতীর্থের সোমনাথ, ব্রহ্মপুত্রের পারে কামাখ্যা, বোম্বাইয়ের মহালক্ষ্মী, কাশীর বেণীমাধব আর আদিকেশব,—ব'লে যেতে পারি একটির পর একটি। বলতে পারি রাজগৃহ, যয়শলমের, যোধপুর, পুণা আর রামেশ্বরম্—বলতে পারি আরও অনেক। পাহাড়ে, সমুদ্রে, অরণ্যে, নদীতীরে—প্রত্যেক হিন্দু-স্থাপত্যের স্থান-নির্বাচনটি হোলো সৌন্দর্যবোধের প্রতীক্। এই প্রথম কাশ্মীরে দেখলুম, পাহাড়ের চূড়ায় মসজিদ। কিন্তু এর কারণ অনুমান করতে বিলম্ব হয় না। কাশ্মীর হোলো অতর্কিত বন্যাপ্লাবনের দেশ, হঠাৎ আসে বন্যা,—ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব। উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ।

মার্তণ্ড শহরে এলুম। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের দেখেছি, এবার দেখছি পাণ্ডাদের। এদেরই পূর্বপুরুষ একদা ধর্মান্তরিত কাশ্মীরী হিন্দুকে নিজেদের কোলে ঠাঁই দেয়নি। যেমন গয়ায়, যেমন কাশী আর বৃন্দাবনে, যেমন মথুরা-হরিদ্বার আর কলকাতার কালীঘাটে,—এরা ঠিক তেমনি ছিনেজোঁক। সেই একই ব্যবসা পুণ্যবিতরণের। এখানে সরোবরের তীরে সূর্যনারায়ণের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ,—নাম হোলো মার্তণ্ড মন্দির। এর স্থাপত্য, কারুকলা এবং অবস্থিতি সত্যই প্রশংসার যোগ্য। মার্তণ্ড শহরের বর্তমান নাম ইসলামাবাদ কেন হোলো খোঁজ নিইনি, কিন্তু মার্তণ্ডকে অনেকে আবার বলে মাটান্। এখান থেকে অল্প দূরে রাজা ললিতাদিত্যের সর্বপ্রধান স্থাপত্যকীর্তি দেখে আসা যায়। কাশ্মীরকে তিনি নিজের হাতে গড়েছিলেন।

অনন্তনাগের শান্ত পল্লীতে এসে পৌঁছলুম। উঁচু নীচু গলিঘুঁজি বন-বাগান-ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা গ্রাম। কাছেই একটি গন্ধক-ঝরণার পাশে একটি

দেবস্থান। সত্যি, যেখানে যাও যেদিকে চাও—দেবস্থান ছাড়া কিছু নেই। আসতে আসতেই দেখে নিচ্ছি বিষ্ণু আর রাধাকিষেণ, রামলছমন আর সীতা, সত্যনারায়ণ আর সূর্য। গিরিশ্রেণীর দিকে তাকাও—অধিকাংশ নাম হোলো, হরমুখ, হরমহেশ, কৃষ্ণগিরি, শঙ্করাচার্য, হরিপর্বত, শ্রীশনাগ, ভৈরবঘাটি, অমরনাথ, ইত্যাদি। নদীর দিকে তাকাও,—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, কৃষ্ণগঙ্গা, নীলগঙ্গা, দুধগঙ্গা, রোমহর্ষী, ভৃঙ্গা, সহস্রা, রামবিহারা, মদমতি, ইত্যাদি। নগরগুলির দিকে তাকাও—সুখনাগ, নরনাগ, নাগমার্গ, অবন্তীপুর, ব্রজবিহার, আশুনাগ, রামপুর, রামঘাট চণ্ডীগাঁও ইত্যাদি। হ্রদের কথা যদি বলো, তবে কৃষ্ণসায়র, বিষ্ণুসায়র, গঙ্গা ও মনসাবল, উল্লহর—যাকে বলে উলার, বুদ্ধবল, গান্ধারবল, নরবল, অমরসায়র, তরসায়র, ইত্যাদি দেখিয়ে দেবো। সংস্কৃতি, সভ্যতা ও স্থাপত্যে কাশ্মীর হোলো আগাগোড়া আর্যহিন্দু এবং আর্যবৌদ্ধ। মুসলমান জনসাধারণ যাদেরকে দেখা যাচ্ছে, তাদের প্রকৃতি, আচরণ, অভ্যাস, জীবনযাত্রা, খাদ্য, শরীরের গঠন, আকার, মুখের ভাব, চক্ষু ও নাসা, সামাজিক মেলামেশা,—সমস্তটাই মুসলমান-বিরোধী। উত্তর ভারতের অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমান এসে ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা অবাক হয়; তাতার মোঙ্গল কিংবা পাঠান মুসলমান এলে ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে। মোগল আমলের মুসলমানদের সঙ্গে ওদের আজও মিল হয়নি। ওদের সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয় হোলো কাশ্মীরী হিন্দু। যেমন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের পরমাত্মীয় হোলো পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু। উভয়ের মধ্যে আত্মিক পরিচয় অতি নিবিড়। একই রক্তের যমজ সন্তান। রাজনীতি হোলো বহিরঙ্গ, শোণিতনীতি হোলো অন্তর-অঙ্গ।

সাতটি সাঁকোর দ্বারা শ্রীনগরের এপার ওপার সংযুক্ত। প্রথম সাঁকোর নাম, 'আমিরা কদল।' কদল মানে সাঁকো। আমিরা কদল-এর উভয় পার হোলো নগরের প্রায় নাভিকেন্দ্র। ওরই কাছাকাছি খালসা হোটেলে এর আগে বাসা নিয়েছিলুম। এবার এসে উঠলুম, ইম্পিরীয়ল্ ব্যাঙ্কের বাগানে তাঁবুর মধ্যে। কাশ্মীরে এসে তাঁবুতে বাস করা আনন্দদায়ক। নিরাপদ স্বাধীনতার স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়।

সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে একখানা নিমন্ত্রণপত্র এসে পেঁছিলো সদর-ই-রিয়াসতের ওখান থেকে—সোনালি লাল কালিতে ছাপা। বুঝতে পারা গেল, সাংবাদিক বন্ধু মিঃ ধারের উৎসাহ আছে এর পিছনে। অপরাহ্ণ সাড়ে চারটের সময় যুবরাজ করণ সিং জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করতে চান্।

শ্রীনগরের দক্ষিণ অংশটি হোলো ঘিঞ্জি শহর। বাজার অংশ পেরিয়ে গেলে আধুনিক আবহাওয়া। শেখ আবদুল্লার গদিচ্যুতির পর এখন তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, থমথমে ভাবটি আর এখন নেই, অবস্থা স্বাভাবিক। প্রধান মন্ত্রী

হিসাবে সরকারি শাসনভার হাতে নিয়েছেন কাশ্মীরের 'লৌহমানব' বক্সী গোলাম মহম্মদ। সমগ্র কাশ্মীরে দেশনিষ্ঠ অক্লান্ত কর্মী ও ভয়হীন নেতারূপে তিনি পরিচিত। অথচ এই সেদিন অবধি তিনি শেখ আবদুল্লার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির পাশা খেলা বিচিত্র। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শেখ আবদুল্লাকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে একরাত্রের মধ্যে সরানো হয়, এবং পরদিন তিনি যখন গুলমার্গ থেকে তাঁর সহকর্মী মীর্জা আফজল বেগকে সঙ্গে নিয়ে প্যাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এলাকার ওদিকে পালাচ্ছিলেন, তখন পথের মাঝখান থেকে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার ক'রে আনা হয়। 'প্রজা পরিষদের' সন্দেহ বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

কথাটা এখানেই পরিষ্কার হওয়া দরকার। রাজনীতি অথবা ইতিহাস গবেষণা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কাশ্মীরের একটি বিশেষ সংকট-সন্ধিকালে ওখানে গিয়ে পড়ি ব'লেই ওটাকে এড়ানো কঠিন ছিল। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তাঁকে বলা হয়, কাশ্মীরের 'ব্যাঘ্র'—শের-ই-কাশ্মীর! কিন্তু ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের পর থেকে সহসা তাঁর রাজনীতিক অভিমত ঘুরে দাঁড়ায় এবং কাশ্মীরকে 'স্বাধীন' ব'লে ঘোষণা করার একটা অদ্ভুত চেষ্টা তিনি করতে থাকেন। বহুলোকের ধারণা, তিনি জনৈক আমেরিকান নেতা ও দুই একজন পাকিস্তানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চাপা চক্রান্তে প'ড়ে যান্। প্রকাশ, এমনি সময় কাশ্মীরের প্রজা-পরিষদের নেতারা এই দুষ্ট চক্রান্তের খবর পান্ এবং তাঁদের হাতে তৎকালীন কাশ্মীর-মন্ত্রী মীর্জা আফজল বেগ লিখিত কয়েকখানি চিঠিপত্রের নকল ধরা পড়ে। প্রজা পরিষদ আমন্ত্রণ করেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে। প্রকাশ, শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গিয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হন্ এবং অন্তরঙ্গ মহলের ধারণা এই, তিনি কয়েকখানি চিঠি নেহরুকে দেখান্। নেহরু এতে আস্থা স্থাপন করেননি। শেখ আবদুল্লা তাঁর বিশ বছরের বন্ধু, এবং নেহরু বন্ধুবৎসল। বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা না ক'রে তিনি মতামত স্থির করবেন না। ইতিমধ্যে শেখ আবদুল্লার বিরুদ্ধে প্রজাপরিষদের প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের সম্মানজনক নিষ্পত্তির জন্য শ্যামাপ্রসাদ শ্রীযুক্ত নেহরু ও আবদুল্লার সহিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান করতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তিনি স্বচক্ষে পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য কাশ্মীর প্রবেশের সিদ্ধান্ত করেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয় কিনা, এজন্য শেখ আবদুল্লাকে জানান্। আবদুল্লা এতেও আপত্তি করেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ স্থির করেন যে, তিনি ভারতের এলাকাভুক্ত কাশ্মীরে বিনা ছাড়পত্রেই প্রবেশ করবেন। কাশ্মীর গভর্নমেণ্টের নিজস্ব কোনও ছাড়পত্র নেই, এটি ভারত গভর্নমেণ্টেরই প্রবর্তিত। বস্তুত, শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীর প্রবেশে কোনও প্রকার বাধা দেওয়া হয়নি, এমন কি মাধোপুর চেক্ পোষ্ট থেকে ইরাবতী নদীর পুলের ওপার পর্যন্ত অনেকটা যেন

অভ্যর্থনা করেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। "To see that his entry into the state without permit was facilitated."—এটি ছিল ভারত সরকারের অধীনস্থ গুরুদাসপুরের কর্তৃপক্ষেরই নির্দেশ। স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্যামাপ্রসাদের শুভযাত্রা কামনা করেছিলেন। সেটি ১১ই মে, ১৯৫৩। পুলের ওপারে পেঁছিবামাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হোলো। বিচিত্র সেই গ্রেপ্তার! কাশ্মীর অথবা ভারত—কোন্ পক্ষ কোন্ আইনে এই ভারতপ্রসিদ্ধ আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করলো, ঠিক বোঝা গেল না। তবে শ্যামাপ্রসাদকে মাত্র 'দুমাসের জন্য' আটক ক'রে রাখার সিদ্ধান্তটা একটু নতুন ধরণের, কারণ পরবর্তী ওই দুমাস কাল পণ্ডিত নেহরু ছিলেন বিশেষ ব্যস্ত। তাঁকে যেতে হচ্ছিল ইংল্যাণ্ডে রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের আমন্ত্রণে এবং ইউরোপ ভ্রমণে।

কিন্তু পণ্ডিতজীর মনে বোধ করি স্বস্তি ছিল না। তিনি গেলেন কাশ্মীরে আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু শেখ সাহেব এবার যেন একটু ভিন্ন ধরণের কথাবার্তা বললেন। পণ্ডিতজীর অভ্যর্থনা হোলো না এবার শ্রীনগরে। এর পর বক্সী গোলাম মহম্মদ এবং শ্যামলাল শরফ—এই দুই মন্ত্রীর সঙ্গে শেখ সাহেবের মনোমালিন্য ধূমায়িত হতে থাকে, এবং তিনি কাশ্মীরের নানা স্থানে নানাবিধ অসংলগ্ন এবং হিন্দুভারত-বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান্।

গ্রেপ্তারের একমাস এগারোদিন পরে ২৩শে জুন তারিখে হঠাৎ শেষ রাত্রে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যু স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে কিনা, এই নিয়ে প্রশ্ন তুললো সমগ্র ভারত। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ একেবারেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন নেতা ছিলেন না! পূর্ববঙ্গ থেকে জনাব ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, এমন মহৎ এবং উদারপ্রাণ দেশনিষ্ঠ কর্মী তিনি দেখেননি। তিনি সহোদর বিয়োগের বেদনা অনুভব করছেন। এমন সময় খবর এলো, শ্যামাপ্রসাদের স্বহস্ত লিখিত ডায়েরীখানি কাশ্মীরের পুলিশ হস্তগত করেছে, সেটি আর পাওয়া যাবে না।

ফিরে এলেন নেহরু। তিনি সান্ত্বনা দিলেন শ্যামাপ্রসাদের জননী শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবীকে। কিন্তু বাঙলার শার্দুল স্বর্গত স্যার আশুতোষের সহধর্মিণী সেই সান্ত্বনা গ্রহণ করেননি,—সন্তানবিচ্ছেদাতুরা মহীয়সী মহিলা, অভিযোগ আনলেন ভারত গভর্নমেণ্ট ও পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই অভিযোগের যথাযথ জবাব দেওয়া অথবা শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরকারী ও বেসরকারী লোক নিযুক্ত করা,—এই দুই কাজই পণ্ডিতজীর পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল। সম্ভবত তাঁর মনে এই ভয় ছিল যে, এই তদন্তের ব্যাপার নিয়ে পাছে ভারতে পুনরায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দেয়। কিন্তু ততদিনে শেখ আবদুল্লার গভর্নমেণ্টের প্রতি ভারতের প্রায় সকল রাজনীতিক দলেরই একটি গভীর সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের

গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একথা সেদিন জানা গেল, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষেও একজন সত্যব্রতী, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক দেশহিত-সাধকের মূল্যবান জীবনও সকল সময় নিরাপদ নয়,—যদি তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতদ্বৈধ ঘটে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুপুরী সেদিন দেখে এলুম নিশাতবাগের পিছনে।

বেলা চারটের সময় গাড়ী এসে দাঁড়ালো তাঁবুর সামনে। এবারে নতুন পথ। শ্রীনগর সুন্দর হতে থাকে যদি শহর-বাজার ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। চেনার-উইলোর সারির মধ্যে প্রত্যেকটি পথ কোথা থেকে যেন কোন্‌দিকের ছায়ানিবিড় বনে-বনে হারিয়ে গেছে আমার স্বপ্নজগতের মতো! দেখছি পাইন-পপলার-চেনার-উইলো-ওয়াল্‌নাটের নিকুঞ্জলোক আশে-পাশে,—দেখছি, কিন্তু দেখছিনে! দেখে যাচ্ছে মন, চোখ বোধ হয় নয়। মহাকাব্যের পাতায়-পাতায় মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে এই হিমালয়ের আন্তঃইতিহাস,—যখন ফিরে যাবো, বোবা দেওয়াল থাকবে চোখের সামনে, পাঠ করবো এই মহাকাব্য প্রতিটি পাতা উল্‌টিয়ে। দৃষ্টির সঙ্গে মন যদি সংযুক্ত না থাকে, কিছু দেখা যায় না। 'অন্যমনস্ক চেয়ে ছিলুম'—মানে, দৃষ্টি ছিল, কিন্তু মন ছিল অন্যত্র, তাই কিছু দেখতে পাইনি,—অনেক লোক এই কথা বলে। শকুন্তলা তাকিয়েছিল ক্ষুৎপিপাসা-কাতর দুর্বাসার প্রতি, কিন্তু মনশ্চক্ষু নিবদ্ধ ছিল দুষ্মন্তের দিকে; তাই দুর্বাসাকে সে দেখতে পায়নি। ভূস্বর্গ হিমালয়ের দিকে আমার মন ছিল, তথ্য সংগ্রহের দিকে চোখ ছিল না।

শ্রীনগরের সমতা থেকে একটি উপত্যকার মতো উঠে গেছে যুবরাজ করণ সিংয়ের প্রাসাদের পথ। এখানে-ওখানে পরিচ্ছন্ন উদ্যান। আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়ালো প্রহরীবেষ্টিত প্রাসাদপ্রাঙ্গণে। পশ্চিমে বিশাল দাল হ্রদ—তা'র জলরাশি সূর্যকিরণে ও রঙ্গিন মেঘের প্রতিফলনে ঝলমল করছিল। তা'র একাংশে হরিপর্বতের দুর্গ, অন্য অংশে পাহাড়ের চূড়ায় শঙ্করাচার্যের প্রাচীন মন্দির। উত্তর অঞ্চলে মহারাজা গুলাব সিংয়ের পুরাতন প্রাসাদ। কিন্তু যুবরাজের এই বাংলো প্যাটার্নের প্রাসাদটি নবনির্মিত। যেমন চারিদিকে আধুনিক সুরুচির শোভা, তেমনি সৌন্দর্যবোধের পরিচয়। নগরের কোলাহল থেকে দূরে একটি নিভৃত জীবনযাত্রা। আমরা যুবরাজের বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ করলুম।

সমস্ত ঘরে কাশ্মীরী কার্পেট আর মখমলের কাজ। এখানে ওখানে পড়াশুনার উপকরণ। কোনো কোনো ফুলদানিতে মৌসুমী ফুলের নানাবর্ণের গুচ্ছ রাখা। একটি টেবলে কয়েকখানি ছবি,—রাজেন্দ্রপ্রসাদ-নেহরু-গান্ধী, এই তিনজন। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুশ্রী ছবি টাঙানো। রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাচ্ছিনে।

যুবরাজ এক সময় সস্ত্রীক এসে প্রবেশ করলেন। অতি সুশ্রী তরুণ যুবক। বড় বড় কালো কাশ্মীরী দুই চোখ। একটি পায়ে কিছু খুঁৎ আছে, সামান্য খুঁড়িয়ে চলেন। তাঁর পরণে সম্পূর্ণ শাদা প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট। হাসিমুখে আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। নমস্কার জানালেন।

তাঁর স্ত্রীর বয়স অতি অল্প, আন্দাজ বছর কুড়ি। যেমন সুশ্রী, তেমনি পরমাসুন্দরী তিব্বতী মেয়ে,—তাঁর সঙ্গে এসেছেন জনৈকা ইংরেজ গভর্নেস। তাঁরা বসলেন একান্তে।

মোট দশ বারোজন আমরা ছিলুম। অন্য সকলেই তাঁর অল্পবিস্তর পরিচিত, আমি নতুন। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনি বললেন, আজ আপনি আমাদের নতুন অতিথি। অনেক দূরের মানুষ আপনি। আপনার এই ধুতি পোষাক দেখলে আমরা অবাক হই।

বললুম, এই পোষাকই ছিল ভারত-কবি রবীন্দ্রনাথের। কই, আপনার ঘরে তাঁর ছবি দেখছিনে ত?

হাসিমুখে যুবরাজ বললেন, আর বলবেন না, রবীন্দ্রনাথের ছবির এতই চাহিদা এখানে যে, বার-বার যোগাড় ক'রেও তাঁর ছবি আমার ঘরে রাখতে পারিনি। কেউ না কেউ এসে তাঁর ছবি নিয়ে চ'লে যায়। আবার শিগগিরই তাঁর ছবি আনাবো।

আমরা চামচ দিয়ে খাচ্ছিলুম, যুবরাজ প্লেট্ থেকে হাতে তুলে নিয়ে শিঙগাড়া খাচ্ছিলেন। এক সময় বললেন, আপনার 'যাত্রিক' ছবিটি দেখে ভারি আনন্দ পেয়েছি, জীবিত লেখকের জীবন-কাহিনী এর আগে কখনও ছবিতে দেখিনি। ছবি দেখে চিনেছি আপনাকে! সিনেমায় ভারতীয় ছবি আমার খুব ভালো লাগে।

গুহাতীর্থ অমরনাথের আলোচনা উঠলো। মাত্র গত মাসে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে সেখানে গিয়েছিলেন। পূর্ণ তুষারলিঙ্গের ছবি তিনি তুলে এনেছিলেন। বিস্ময়ের কথা, তাঁর স্ত্রী ওই দুঃসাধ্য পার্বত্যপথে সম্পূর্ণ হেঁটে গিয়ে যাত্রা পূর্ণ করেন। যুবরাজ নিজে গিয়েছিলেন ডাণ্ডিতে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠলো। তিনি প্রত্যাদেশ পেয়ে এসেছিলেন ক্ষীরভবানীতে। তারপর তিনি যান্ অমরনাথে। সেখানে এমনভাবে তিনি আত্মসমাহিত হন্ যে, তীর্থযাত্রীরা তাঁকেই শ্রীঅমরনাথ ব'লে পূজা দেন্। আশ্চর্য সেই মহা-পুরুষ, তাঁর পদস্পর্শে কাশ্মীর ধন্য হয়েছিল!

উচ্ছ্বসিত যুবরাজ এক সময় বললেন, দুঃখ এই, সেই বিবেকানন্দের বাঙলা আমি আজও দেখিনি। মানচিত্রে দেখি বাঙলা অনেক দূর! বাঙলা দেখবার সাধ আমার অনেক দিনের। যদি কখনও যাই, আগে যাবো বেলুড় মঠে, আগে দেখবো শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির! বাঙলা দেশ হোলো ভারতবর্ষের গৌরব।

বললুম, বাঙলাদেশে গেলে আপনার মনে হবে না যে, আপনি কাশ্মীরের

বাইরে এসেছেন। এর বন-বাগান ক্ষেত-খামারের এতই মিল দেখছি বাঙগলার সঙ্গে।

যুবরাজ তাঁর মনের একাগ্র বাসনা প্রকাশ ক'রে বললেন, জানিনে, কোনোদিন বাঙগলাদেশ দেখতে পাবো কিনা।

গল্পগুজব চললো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। কিন্তু তা'র মধ্যে একটিও রাজনীতির কথা ছিল না—যেটি নিয়ে তখন সারা কাশ্মীরে তুমুল ঝড় বইছে।

জলযোগের পর আমরা বাইরে এলুম। যুবরানী সহাস্য নমস্কার জানিয়ে ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ অবধি ফটো তোলাতুলি হোলো। অতঃপর বন্ধুবান্ধব একে একে বিদায় নিলেন। বাগানের একান্তে গেলুম যুবরাজের সঙ্গে,—প্রায় অন্দরমহলের দরজার কাছাকাছি। সেখানে বারান্দার রোয়াকে তিনি একস্থলে উবু হয়ে বসলেন। তাঁর এই সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে বসাটা দেখে খুব আমোদ পেলুম। এটি যুবরাজজনোচিত নয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর কথাটা আমিই তুললুম। তাঁর এই অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ ক'রে বাঙগালী জাতি, অত্যন্ত শোকার্ত অবস্থায় রয়েছে—একথা তাঁকে জানালুম।

যুবরাজ বললেন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন মানুষ ছিলেন—এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। তাঁর মতো ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠ নেতা অতি বিরল। আমি নিজে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ আজও জানতে পারিনি, কিন্তু এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে আমরা বাড়ীসুদ্ধ সবাই শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়েছিলুম। কখনও ভাবিনি এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটতে পারে। সেই মর্মবেদনা আজও আমাদের বাড়ীর কেউ ভুলতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুতে যেন আমাদের পরমাত্মীয় বিচ্ছেদ ঘটে গেছে!

আমার নোটবইটি তাঁর হাতে দিলুম। তারই একটি পৃষ্ঠায় তিনি এই বাণীটি লিখে দিলেন :

"I have been asked by Shri P. K. Sanyal to send a message to the people of Bengal. All I can do is to send the people of that great land my best wishes. I hope to some day visit your State which has played such a noble and dynamic role in the history of our nation.

Karan Mahal, Srinagar.
29th August, 1953

Karan Singh."

যুবরাজের এই বাণীটি যথাসময়ে দিল্লী ও কলিকাতার 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে' প্রকাশিত হয়।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে সারা পৃথিবী উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল কাশ্মীরের একটি নাটকীয় সংবাদে। এই তরুণ রাজকুমার মাত্র এক রাত্রির মধ্যে একটি চলতি গভর্নমেণ্টকে বিশেষ ক্ষমতাবলে নিজের হাতে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে আরেকটি নূতন গভর্ণমেণ্টকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর পিছনে দিল্লীর সহায়তা কতখানি ছিল, অথবা ছিল কিনা, সে-আলোচনা এখানে ওঠে না।

সে যাই হোক, এই সময়টায় আমার লেখা কয়েকখানি 'কাশ্মীরের চিঠি' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে'এ বেনামীতে নিয়মিত ছাপা হ'তে থাকে। তাদের মধ্যে শেষ পত্রে যুবরাজ করণ সিং সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র ছিল : [অনুবাদ]

"His eagerness for visiting Bengal has led me to think that we ought to bring him down to Bengal and give him a befitting reception. I hope such a visit would help to clear up the misunderstanding between Bengal and Kashmir that has cropped up as a sequel to Dr. Mookherjee's sudden death in Kashmir. Perhaps the Yuvaraj also knows this. If the West Bengal Governor Dr. H. C. Mookherjee and Dr. B. C. Roy can consider this suggestion it will be better still."

অতঃপর চার মাসের মধ্যে যুবরাজ করণ সিংকে সাদরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তিনি বেলুড় মঠ এবং এখানে-ওখানে কিছুদিন পরিভ্রমণ ক'রে বিশেষ আনন্দলাভ করেন।

'দেবতাত্মা হিমালয়ের' প্রথম খণ্ডে জনৈক বাঙ্গালী মহিলার উল্লেখ আছে। পহলগাঁওর হোটেলে তিনি এসে আমার সঙ্গে আলাপ করেন। হিমাংশু বসু ছিলেন আমার সঙ্গে। মহিলাটি আধুনিক কালের মেয়ে। নাম শ্রীমতী মায়া। তিনি বিশেষভাবে তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যান্। অতএব অমরনাথ থেকে ফিরে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো তাঁর ঠিকানা নিয়ে শ্রীনগরের শহরতলীর এক বাড়ীতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে-বাড়ীতে চার পাঁচটি পরিবারের মধ্যে দুটি বাঙ্গালী। তিনি আমাদের নাটকীয় আবির্ভাব দেখে সেই সন্ধ্যায় সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর স্বামী বিমান-বিভাগে চাকরি করেন, এবং বর্তমানে আছেন দাক্ষিণ ভারতে।

একটি বাগানবাড়ীর দোতলায় মহিলাটি থাকেন। শহর থেকে প্রায় আড়াই

মাইল দূরে বড়জেলা নামক পল্লীতে। রামবাগের পুল পেরিয়ে মহারাজা গুলাব সিংয়ের সমাধি-উদ্যান ছাড়িয়ে যে পথটি গিয়েছে বিমানঘাঁটির দিকে, সেই পথের ধারে পপলারের বনময় পাহাড়তলীর দিকে এঁদের বাগানবাড়ী। পল্লীটি অতি নিভৃত,—বাড়ীর গা দিয়ে গ্রামের দিকে একটি পথ চ'লে গেছে, অরণ্যজটলা গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের দিকে।

শ্রীমতী মায়া পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না যে, তাঁর এখানে আমি কয়েকদিনের জন্য আতিথ্য নিতে বাধ্য। সঙ্গে যদি হিমাংশুও থাকেন তবে তিনি পরম কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু হিমাংশু তখনই জানিয়ে দিলেন যে, হাউস-বোটে কিছুদিন বাস করার বাসনা নিয়ে তিনি এসেছেন কাশ্মীরে, তাঁর সেই সাধ পূর্ণ হওয়া একান্তই দরকার। হাউসবোট আমার নিজের ভালো লাগেনি। দাল হ্রদের আনাচে কানাচে এবং বদ্ধজলার দলজড়ানো নোংরা জলে হাউসবোটের বাহ্যিক চেহারা দেখে মানিকতলার খালের মহাজনী নৌকার কথা আমার মনে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, মাঝিমাল্লার হাতে স্বাধীনতা তুলে দিয়ে জলের মাঝখানে গিয়ে হাত পা গুটিয়ে থাকা পছন্দসই হয়নি। অবশ্য প্রত্যেক বোটের অধীনে 'শিকারা' নামক ছোট ছোট ঘেরাটোপের ডিঙিগ মোতায়েন আছে বটে, যখন খুশি পারাপারও হওয়া চলে। কিন্তু যতই হোক, যত কাব্যই ওর সঙ্গে যুক্ত থাকুক, স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা পদে পদে কুণ্ঠিত হয়— এই আমার বিশ্বাস। তাঁবুতে থাকতে গেলে পাহারা লাগে। সুতরাং হোটেল সর্বাপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যকর।

আমরা সেদিন চা পান ক'রে পুনরায় আমাদের তাঁবুতে ফিরে এলুম। কথা রইলো পরদিন সকালে মায়া আসবেন আমাদের তাঁবুতে। সুন্দর বাগান-বাড়ীর গাছপালা এবং ফুলবাগানের মধ্যে আমাদের তাঁবু, কিন্তু বোধ করি, উপকরণের কিছু অভাব থাকার জন্য আবহাওয়াটা খুব উৎসাহজনক ছিল না। হিমাংশুর স্বাস্থ্য ফেরাবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা ছিল,—তাঁর মাথার কাছে কিছু ফল-পাকড় থাকলেই তিনি পরিতুষ্ট হন্। আমি থাকি নিত্য অসন্তোষ নিয়ে। নধর শয্যার আরামদায়ক উত্তাপের মধ্যে শুলে আমার পিঠে চিরদিন কাঁটা ফোটে। পদে পদে নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটলে সুস্থ থাকিনে। প্রচুর আহারাদির আয়োজন দেখলে মুখে অরুচি আসে। ফল-পাকড় খেলে শরীর ভালো হয়, একথা শুনতে পেলে ফল আমার দুচোখের বিষ হয়ে ওঠে। আমি আরাম চাইনে, আনন্দ চাই।

বাগানবাড়ীর ভিতর ও বাহিরের আবহাওয়াটা পরদিন সকাল থেকে আমাদের ভালো লাগেনি। ভিতরে থাকেন ব্যাঙ্কের এজেন্ট মিঃ রায় ও তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। মিসেস রায়ের আগ্রহাতিশয্যেই হিমাংশু এখানে তাঁবুর ব্যবস্থাদি করেছেন। সকালবেলায় বৃদ্ধ মিঃ রায় বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে কতক্ষণ আলাপ ক'রেও গেলেন, কিন্তু কোথায় যেন বাতাসটা একটু থমথমে।

সকাল প্রায় ন'টায় এলেন মায়া এবং কুণ্ডু স্পেশালের শ্রীমান্ শঙ্কর। তাঁবুর সামনে আমাদের বসিয়ে শ্রীমান্ ছবি তুলতে লাগলো একটির পর একটি। শ্রীমতী মায়ার শাদা রেশমের শাড়ীর উপযুক্ত [illegible] রৌদ্রের আভায় ওঠে না, এই ছিল মস্ত সমস্যা। তাঁবুর সামনে [illegible] সকালের চায়ের আসর ব'সে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে স্থির করা গেল, আজ আমরা মোগল গার্ডেনস্ দেখতে যাবো। শঙ্কর জিদ ধ'রে এই প্রস্তাব করলো, আজ আমরা তিনজনে তা'র সারাদিনের অতিথি। তা'র আতিথেয়তা স্মরণ ক'রে রাখার মতো।

শহরের যে অংশটা জনবহুল সেটি নোংরায় আর সঙ্কীর্ণতায় অপরিচ্ছন্ন; ছোট ছোট অন্ধকারের খোপের মধ্যে অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা,—ওর মধ্যেই বহু ধিক্কৃত জীবন কিলবিল করে। গলি-ঘুঁজি নোংরা জলে বস্তির যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ভারতের প্রায় প্রত্যেক শহরের আশে-পাশে, এখানেও তা'র ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেজন্য ক্ষয়রোগ নানা স্থানে প্রবল। এর বাইরে গেলে তবে ভূস্বর্গ। যারা কাশ্মীর দেখতে যায়, তা'রা কিন্তু কাশ্মীরীদের প্রকৃত জীবনযাত্রার চেহারা দেখতে চায় না। তা'রা গিয়ে টাকা ছড়িয়ে আমোদ কিনে নিয়ে আসে। ময়লা ঘরে, নোংরা সজ্জায়, ছেঁড়া বিছানায়, উচ্ছিষ্টের আনাচে কানাচে, শিকারা আর হাউসবোটের পাটাতনের আড়ালে, দোকানের তলায়, হাটবাজারের অলিগলিতে, গাড়ীর আড্ডায়, বিতস্তার ঘাটে ঘাটে, সাঁকোগুলির আশে-পাশে, কুটিরশিল্প-কেন্দ্রগুলির আড়ালে আবড়ালে,—যে ক্ষুধার্ত দরিদ্র ও হতাশ নরনারী এবং শিশুরা চলাফেরা করে, তা'রা হোলো প্রকৃত কাশ্মীরী,—তা'রা ভিক্ষে করে টুরিস্টদের কাছে হাত পেতে। যেখানে যাও ভিক্ষে, যেখানে যাও বকশিস। ছুটে গিয়ে গাড়ী ডেকে দিল, দাও বকশিস। রাস্তাটা দেখিয়ে দিল, দাও ভিক্ষে। চললো সঙ্গে সঙ্গে—যদি পায় ছিটে-ফোঁটা, যদি পায় এঁটো-কাঁটা। গৃহস্থ-ঘরের বউ, বাড়ীর গৃহিণী, ক্ষেতখামারের চাষী,—এরা ছুটে এলো পথের ধারে—কেননা টুরিস্ট যাচ্ছে, যদি দুচার পয়সা 'বকশিস' পাওয়া যায়। রান্না করতে করতে ছুটে এলো, বিছানা ছেড়ে রোগী ছুটে এলো, খেলা ছেড়ে বালকবালিকা ছুটে এলো, খামারে জলসেচনের কাজ ফেলে শ্রমিক ছুটে এলো। এলো বাঁকা-নয়না, এলো মধুরভাষিণী, এলো লজ্জাবতী, এলো হাস্যমুখ বালক, এলো অশীতিপর বৃদ্ধ,—এলো চারিদিক থেকে হিমালয়ের সন্তান। ওরা শুনতে পেয়েছে এই পথ দিয়ে যাবে ইউরোপীয় টুরিস্ট, ভারতীয় শেঠ আর মহাজন,—ওরা আশায় আশায় পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা ভূস্বর্গবাসী, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধার ধারে না। বোঝে না রাজনীতি, জানে না সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। ওরা জেনে এসেছে চিরকালের মারখাওয়া দৈন্য দারিদ্র্যের নরককুণ্ড কাশ্মীরকে। ক্ষুধার অন্নে ওরা খুশী, নিরুপায় জীবনযাত্রায় একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য পেলেই ওদের আনন্দ। ওদের এই ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখলে যেন কান্না পায়।

শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে মাইল তিনেক এগিয়ে গেলেই একে একে মোগল-গার্ডেনগুলি পাওয়া যায়। পাশেই বিস্তৃত দাল-হ্রদ। জলজ লতাদলে আচ্ছন্ন থাকে, তাই এই বিশাল জলাশয়ের নাম দাল, কিংবা দল, কিংবা ডাল। কমবেশী পনেরো বর্গ মাইল এর পরিধি। কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট লতাদলের উপর রাশি রাশি মাটি ফেলে এক একটি ভাসমান বাগান প্রস্তুত করা হয়েছে। ফুলে-ফলে সেগুলি আচ্ছন্ন। কোথাও কোথাও ভেসে চলে শ্বেত ও রক্তপদ্মের দল,—তাদেরই উপর দিয়ে চারিদিক থেকে হ্রদের উপর ছায়া পড়ে এক একটি পর্বত-চূড়ার। সূর্যাস্তের নানাবর্ণ জলের উপরে নিবিড় হতে থাকে।

আমরা একটির পর একটি উদ্যান দেখে বেড়ালুম। পাহাড়ের কোলে এই উদ্যানে নানা কৌশলে আনা হয়েছে এক একটি ঝরণা। এ বাগানগুলি মোগল আমলের। চশমাসাহি, শালীমার, নিশাতবাগ, নাসিমবাগ ইত্যাদি। এগুলি মোগল আমলের রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রতীক। শ্রীনগর থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে একটি নিরিবিলি বনময় অঞ্চলে এসে আমরা পেলুম হরবন। এটি সংরক্ষিত এক বিশাল জলাশয়। এখান থেকে রাজধানীতে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়। এর চেহারা দেখেই মনে প'ড়ে যায় জামশেদপুর থেকে আট মাইল দূরের 'ডেম্‌না' হ্রদটি,—কেউ বলে, ডেম্‌লা! দুটি হ্রদের একই উদ্দেশ্য। এখানেও পর্বতবেষ্টিত উপত্যকা ও শস্যক্ষেত্র; সেখানেও তাই—দল্‌মা পাহাড়ের কোল। আমরা হরবনের বাঁধের উপর থেকে নেমে এসে অদূরে একটি সরকারী 'ট্রাউট্‌' মৎস্য চাষের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলুম। অরণ্যজটলার ছায়াকুঞ্জলোকে পাহাড়ী পাখীদলের কুজন-গুঞ্জন চলছে। শঙ্কর ছবি তুললো আবার আমাদের দাঁড় করিয়ে।

শ্রীমতী মায়ার এসব অভিজ্ঞতা নতুন। বন্ধুমহলের সঙ্গে একবার মাত্র বেরিয়ে তিনি গিয়েছিলেন পহলগাঁওয়ে—মাত্র দিন পনেরো আগে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিল একটি দম্পতি তাদের শিশুকন্যাসহ। তা'রা হোলো মদন-লাল আর সৎবতী। এ ছাড়া আরেকটি যুবক, নাম বাহাদুর সিং। ওদের সঙ্গে আমারও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আজ বাইরে এসে তিনি মুক্ত বিহঙ্গী। পাহাড়ের ঝরণা ছিল অবরুদ্ধ, এবার যেন সেটি ঝরঝরিয়ে নেমে এসেছে। স্বামী সঙ্গে নেই, সেজন্য তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ, কিছু বা আনমনা, কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ উল্লাসপ্রিয়তা ওতে বাধা পায়নি। আমাদের সঙ্গে তাঁর নতুন আলাপের সংবাদটি তিনি ইতিমধ্যে ভারতের দূরদূরান্তরে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুমহলে প্রচার ক'রে দিয়েছেন। স্বামীকে জানিয়েছেন সর্বাগ্রে।

সকাল থেকে সারাদিন মোটরবিহার চলেছে আমাদের। মোটর প্রায় সর্বত্রগামী, পথ অতি মনোরম। হাজার হাজার বর্গমাইল হিমালয়ে ঘুরেছি, কিন্তু এখানে যেন পথ ভুলে এসে পড়েছি নাচের আসরে, গানের মজলিশে। এখানে শুনি নূপুরের ঝনক হিমালয়ের নীচে নীচে, পদে পদে শুনি ঠুংরীর বোল।

হিমালয়ের সেই মহাগম্ভীর অরণ্যালোকের প্রশান্ত উদার গাম্ভীর্য চোখে পড়ছে না, সেই কলমন্দ্রমুখরা জননী জাহ্নবীর পুণ্য পার্বত্যলোক ব্রহ্মপুরা নয়, জটাভস্মমাখা নগ্নদেহ সন্ন্যাসীদলের সেই বেদমন্ত্রধ্বনিমুখরিত পার্বত্য গুহা-গহ্বর দেখছিনে কোথাও,—এ যেন সহস্র ভোগবিলাসে, উল্লাসে, আলসে, লালসে, বিবশা মদিরেক্ষণা রসরঙ্গীন উপত্যকা। এখানে টাকা ছড়াছড়ি যায়, আমোদ গড়াগড়ি যায়। প্রতিটি পাহাড়ের আনাচ কানাচ হোলো প্রমোদ কানন, প্রতিটি তাঁবুর রহস্য অন্তরালে প্রাণ নিয়ে খেলা, চেনার-উইলো-পাইনের বনান্তরালে মধ্যরাত্রির ছায়ানিবিড় জ্যোৎস্নায় কোথাও কোথাও উচ্ছ্বসিত অনুরাগ আপন বাসনার অসহনীয় যন্ত্রণায় মাতাল হতে থাকে। সুখের আর লোভের এমন দেশজোড়া আয়োজন হিমালয়ের আর কোথাও নেই। সেই কারণে কাঁচা পয়সা হাতে নিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে যে সব রঙ্গীন প্রজাপতি এখানে বেড়িয়ে যায়, তা'রা কাশ্মীরকে বলে, প্রাচ্যের নন্দন কানন!

ক্লান্ত সন্ধ্যা নেমে আসছে দাল-হ্রদে। হরিপর্বতে আর শঙ্করাচার্যের চূড়ায় আরক্তিম আভা লেগেছে। হরমুখের দিকে বাদলের মেঘ দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস হু হু ক'রে বইছে ওদিক থেকে।

শঙ্কর হাসিমুখে এবার বিদায় নিল। এই মহিলাকেও যেতে হবে অনেক দূর। কিন্তু টাঙ্গায় উঠে তিনি বললেন, শ্রীনগরের ইলেকট্রিক আলো কত কম, দেখছেন ত? তারপর ময়দান ছাড়ালে আর আলো নেই। একলা যেতে আমি পারবো না, আমাকে পেঁছে দেবেন চলুন। পথ অনেকটা।

অনেক পথ সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানকার পথঘাটে ভয়ও নেই। আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের মধ্যে চোর-ডাকাতের উৎপাত সব চেয়ে কম কাশ্মীরে—এমন নিরাপদ অঞ্চল খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। পয়সা কড়ি এরা চেয়ে নেয়, বকশিস নেয়, এমন কি কৌশলে ফেলে হয়ত দোহনও করে, কিন্তু ছিনিয়ে নেয় না। এমন স্বভাব-ধার্মিক সম্প্রদায় সহসা চোখে পড়ে না, এবং এমন ভীরুপ্রকৃতি জনসাধারণও সচরাচর দেখা যায় না।

আমিরা-কদল পেরিয়ে বাঁ দিকের বস্তিবাজার ছাড়িয়ে ময়দানের ধার দিয়ে আমাদের টাঙ্গা চলেছে রামবাগের দিকে। শ্রীমতী মায়া বললেন, আজ রাত্রে আবার চিঠি লিখবো ওঁর কাছে, আমাদের বেড়াবার কথা জানিয়ে। আপনি কাল সকালে আমার ওখানে আসছেন ত?

সকালে নয়, দুপুরে।

বেশ, তাই আসুন। আমার বড় দুর্ভাগ্য, আপনি আর মাস দেড়েক আগে এলেন না। উনি ছিলেন,—আমরা সকলেই খুব আমোদে থাকতুম। উনি সকালে যান আপিসে, খাবার সময় আবার আসেন। ব্যস, সমস্ত দিন ছুটি।

বললুম, টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আসতে হুকুম করুন।

তবেই হয়েছে!—মায়া বললেন, এ যে মিলিটারির চাকরি, নিয়ম-নীতি অন্যরকম। উনি গিয়েছেন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে। এই পরীক্ষায় উৎরে গেলে একটু উন্নতির আশা আছে।

কাশ্মীরের তথা ভারতের বিমান বিভাগে বাঙ্গালী আছেন, এ সংবাদটি উৎসাহজনক। সত্যি বলতে কি, ভারত সরকারের দুটি বিশেষ বিভাগ প্রধানত বাঙ্গালীর হাতের তৈরি। একটি বিমান বিভাগ,—এটি প্রথম একদল সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর চেষ্টায় গোড়ার দিকে বেসরকারীভাবে বাঙ্গলাদেশে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সে প্রায় ত্রিশ বছর হ'তে চললো। দ্বিতীয়টি হোলো, বেতার বিভাগ। এ বিভাগটি অনেকাংশে বাঙ্গালীর সৃষ্টি, এবং এটির জন্ম হয় কয়েকজন বেসরকারী বাঙ্গালীর চেষ্টায়,—তাঁরা সরকারী লাইসেন্স নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে গ'ড়ে তোলেন। কিন্তু এর প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য ক'রে তৎকালে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়ে, এবং তাঁরা একটি বিশেষ আইন-বলে এই বেতার প্রতিষ্ঠানকে হস্তগত করেন।

শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, যদি অভয় দেন্ তবে একটি প্রশ্ন করি।

বলুন?

এমন সুন্দর দেশে সপরিবারে এলেন না কেন?

হাসলুম। বললুম, চারদিকে যেরকম কাঁচা পয়সা ছড়িয়ে চলতে হয়, তাতে ঘটি বাটি পর্যন্ত না বেচলে এখানে সপরিবারে আসা চলে না। তাছাড়া কাশ্মীর বেড়ানো ঠিক আমার এ যাত্রায় উদ্দেশ্যও ছিল না। আমি এসেছিলুম অমরনাথে।

তিনি এবার বললেন, দেখুন, এদিকটা কি রকম অন্ধকার হয়ে এলো! দেখছেন ত', লোকজনও নেই। আমাকে অবিশ্যি নিয়মিত আনাগোনা করতে হয় না, তাই রক্ষে। উনি যাবার আগে মোটামুটি সব ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।

হাসিমুখে বললুম, আপনি যে অতিথিশালা খুলবেন, এ ব্যবস্থাও কি তিনি ক'রে গেছেন?

সে আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। একজন বুড়ো পণ্ডিত আছে, সে ডাকঘরে চাকরি করে। সে দু'একদিন অন্তর আমার সমস্ত জিনিসপত্র এনে দেয়। আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। আরেকটা কথা হয়ত আপনি ভাবছেন, সে আমি জানি। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, সেবার পহলগাঁও থেকে ফিরেই ওঁকে জানাই যে, আপনি আমার এখানে আতিথ্য নিতে রাজি হয়েছেন। উনি তা'র উত্তরে কি চমৎকার চিঠি লিখেছেন, কাল আপনাকে দেখাবো।

রামবাগের পুল পেরিয়ে গাড়ী ঘুরলো ডান দিকে। এ পথটা সোজা গেছে শ্রীনগরের বিমানঘাঁটির দিকে। নীচে দিয়ে নদীর ধারা পাহাড়তলীর পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে কোথায় চ'লে গেছে ঠাহর হচ্ছে না। যেখানেই যাক্ এ ধারা মিলেছে মূল বিতস্তায়।

মহারাজা গুলাব সিংয়ের সমাধি এবং শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালী স্বামী

ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ মঠ'-এর পাশ কাটিয়ে টাঙ্গা এক সময় এসে পৌঁছুলো সেই বসতি-বিরল বাগানবাড়ীর গেটের সামনে। গাড়ী থেকে নেমে শ্রীমতী গুপ্তা কথাটা পাকা ক'রে নিলেন,—কাল জিনিসপত্র নিয়ে দুপুরের দিকে সোজা চ'লে আসবেন। কোনও সঙ্কোচ করবেন না।

আমাকেও একথা পাকা ক'রে নিতে হোলো, তিন চারদিনের বেশী আমার পক্ষে কাশ্মীরে থাকা আর সম্ভব হবে না। তাড়াতাড়ি আমাকে হিমাচল প্রদেশ ঘুরে দিল্লী ফিরতে হবে।

তিনিও জবাব দিলেন, বেশ, তিন রাত্রের বেশি অতিথিদের থাকতে নেই, এই কথা আমি মনে রাখবো। মোটকথা আপনার আসা চাই, নৈলে গুপ্তসাহেব আমার ওপর ভীষণ রাগ করবেন।

টাঙ্গা-গাড়ীর আলোটুকুতে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা চলছিল। শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, সব কথার ওপরেও আরেক কথা আছে। সত্যি বলছি আপনাকে, লেখক-মানুষকে কখনও দেখিনি। তা'রা কেমন, কিচ্ছু জানিনে। কেমন ক'রে তা'রা বই লেখে, কেমন ক'রে কল্পনায় সব আনে,—ভাবলে অবাক লাগে। আপনাকে কাছে থেকে না দেখলে আমার কিছুতেই চলবে না!

হাসিমুখে এবার গাড়ীতে উঠলুম।—বেশ, কাল আসবো।

দাঁড়ান্ একটু, আগে আমি ভেতরে যাই।—এই ব'লে তিনি ভীরু পদক্ষেপে ছুট্ দিলেন অন্ধকার বাগান পেরিয়ে ভিতর মহলে। সেখানে দোতলার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা—এবার যান্—কাল কিন্তু আপনার জন্যে রান্না ক'রে রাখবো!

টাঙ্গা ছেড়ে দিল। আশ্চর্য, তখন আমার একটিবারও মনে হয়নি, হিমালয়ের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার এই ভ্রমণে একটি নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করবে।

*

* *

কাশ্মীরের আকাশে বাদলের ছায়া দেখা দিয়েছে। মেঘেরা ভেসে চলেছে পীর পাঞ্জালের কোলে-কোলে, হরমুখ আর হরমহেশের চূড়ায়-চূড়ায়, জাস্কার আর দেবশাহীর স্তবকে স্তবকে। ছায়া পড়েছে বিতস্তায় আর সতীসায়রে—যার আধুনিক নাম হোলো দাল হ্রদ।

হরমহেশের কৃষ্ণজটার অন্ধকারে গুরু গুরু ডম্বরুধ্বনি শোনা যাচ্ছে; দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চিরকালের সর্বহারা সন্ন্যাসী 'নাঙ্গার' রুদ্র নয়নের ক্বচিৎ কালকটাক্ষ। অসুরনাশিনী চন্ডী আর মহিষাসুরের রণডঙ্কা বেজে চলেছে হরমুখের কোলে-কোলে। পাইন আর পপলারের অরণ্য মেঘের মধ্যে দিশাহারা হয়ে গেছে।

আজ জন্মাষ্টমী। আগষ্ট ৩১, ১৯৫৩।

বাগানবাড়ীর তাঁবু তুলে দিলেন হিমাংশু। ওর মধ্যে আমাদের দুদিনের

অনির্দিষ্ট এলোমেলো সংসারযাত্রা ছিল একটু হাস্যকর। হিমাংশু চাকরি করেন কলকাতার ইম্পীরিয়ল্ ব্যাঙ্কে, সুতরাং তা'র এই শাখা আপিসের বাগানে তাঁর যেন কতকটা নৈতিক অধিকার ছিল। কিন্তু এবাড়ীতে তিনি ভাত খেয়েছেন যত, বাজারের ফল চিবিয়েছেন তা'র চেয়ে অনেক বেশী। এবার তাঁবুর কারবার বন্ধ করতে হোলো। আমরা পুনরায় খালসা হোটেলে গিয়ে বাসা বাঁধলুম। কথা চলছে, সুবিধামতো হাউসবোটের ঘর পেলেই হিমাংশু দাল হ্রদের অগাধ জলে গিয়ে পড়বেন! কিন্তু আজ এবেলা আমি হিমাংশুর অতিথি, অপরাহ্ণে চ'লে যাবো শ্রীমতী মায়ার ওখানে। ঠাণ্ডায় কনকনিয়ে উঠেছে শ্রীনগর।

ভ্রাম্যমাণ জীবনে হিমাংশুর মতো সুহৃদ্ সচরাচর মেলে না। সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি রেলগাড়ীর কামরায় উঠে একটুখানি আরামের লোভে সহসা স্বার্থপর হ'তে থাকে—এ দেখা আছে। সর্বত্যাগী নাঙ্গা সন্ন্যাসী আগে ভাগে এগিয়ে একটি ঘাঁটি-আগলানো বটবৃক্ষের নীচে আসন নেয়,—এও দেখা। এসব ছোট ছোট লোভ, ছোট ছোট স্বার্থ,—এসব ক্ষুদ্র দৈন্য অনেক বরেণ্য ...র প্রকৃতির মধ্যেও জড়ানো থাকে; যথাসময়ে এসব ত্রুটি ধরা পড়ে দৃষ্টির অনুবীক্ষণে। এই প্রকার ক্ষুদ্রতা থেকে হিমাংশু অনেকটা মুক্ত। দুঃসাধ্য এবং দুস্তর পাহাড়ে তীর্থযাত্রাপথে মানুষের স্বার্থপরতা যেখানে অবশ্যম্ভাবী, সেখানেও এই ব্যক্তিকে দেখেছি। হয়ত তিনি সংসারধর্মী হ'লে এইসব গুণপনা কমে যেত।

অল্প অল্প বৃষ্টি নামলো মধ্যাহ্নের আগেই। কাশ্মীরে বৃষ্টির পরিমাণ বাঙলা দেশের মতো নয়। মৌসুমী বায়ু আসে বটে পশ্চিম পাকিস্তান আর রাজস্থানের উপর দিয়ে। কিন্তু মরুভূমি ও শুষ্ক ভূভাগের উপর দিয়ে আসবার কালে সেই বায়ু যায় শুকিয়ে। সুতরাং অবশিষ্ট বায়ু পীর পাঞ্জালের দক্ষিণ কোল পেরিয়ে উত্তরপথে পেঁছিয় সামান্য। সেই কারণে পঁচিশ থেকে ত্রিশ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি কাশ্মীরে নেই। আজ দেখতে দেখতে বৃষ্টির সঙ্গে ঝাপসা আকাশ থেকে নেমে এলো ঠাণ্ডা হাওয়া। সে-ঠাণ্ডা আকস্মিক,—যেমন পাহাড়ে সচরাচর ঘটে,—কিন্তু তা'র ঝলক বড়ই উপভোগ্য। উপভোগ্য হলেও ভাবনার কারণ আছে বৈকি।

আমাদের হোটেলের ঠিক পশ্চিমে কয়েকটি দরিদ্র ঘরকন্নাযুক্ত একটি বস্তি-পল্লী চোখে পড়ে প্রায় সারাদিন। সেখানে প্রতিবেশীমহলে বিবাদ বেধেছিল সকাল থেকে। ঘরোয়া বিবাদে মেয়েদের ভূমিকা যেমন সর্বত্রই প্রধান, এখানেও তাই। কিন্তু সর্বপ্রকার উত্তেজনার মধ্যে কোনো কোনো মেয়েকে হাসতে দেখছি, এইটি হোলো কৌতুকের বিষয়। কাশ্মীরি 'বোলি' কাশ্মীরের বাইরে বিশেষ কেউ বোঝে না। কিন্তু এই 'বোলি'র উৎপত্তি হোলো সংস্কৃত থেকে। এর সঙ্গে হিন্দি আর উর্দু দুই মিলেছে, যেমন মিলেছে ফার্সী। বাঙলা দেশেও এই। 'মগ' বাঙলাভাষা মিলেছে চট্টগ্রামে এসে। চাটগাঁর বাঙালী পাশে দাঁড়িয়ে যদি

পরস্পর আলাপ করে, আমার পক্ষে বোধগম্য হয় না। ব্রহ্মদেশে বসবাসকালে আমার এই অভিজ্ঞতা ঘটে। ময়মনসিংহ থেকে মেদিনীপুর অবধি বাঙলা ভাষা বহুবার বদলায়। দার্জিলিংয়ে এবং দক্ষিণ নেপালে কান পেতে থাকলে শোনা যাবে বাঙলা ভাষা বলছে হিন্দির মিশ্রণে। পশ্চিম-দক্ষিণ আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর আর মিথিলা, উৎকল আর মগের মুলুক, কোচবিহার আর দক্ষিণবিহার, তেজপুর আর ভোজপুর,—বাঙলা ভাষাই হেঁটে বেড়িয়েছে এর-ওর সঙ্গে গলা ধরাধরি করে। ভাষার স্বাস্থ্যসবলতা থাকলেই সে হাঁটে, পাঁচজনের হাত থেকে সে পাঁচরকম শব্দ নিয়ে নিজেকে অলঙ্কৃত করে। সেখানেই তার প্রাণশক্তি। যে-ভাষা তা'র জাতিচ্যুতির ভয়ে আলোবাতাসের পথরুদ্ধ ক'রে নিজের গন্ডীর মধ্যে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকে, এককালে গিয়ে সে ভাষা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ইংরেজ শুধু যে ইউরোপ আমেরিকায় ঘুরে-ঘুরে নিজের ভাষার শব্দসম্পদ্ বাড়িয়েছে তাই নয়, ভারতবর্ষীয় শব্দও সে আহরণ করেছে। ইংরেজি অভিধানে এর নমুনা আছে ভুরি ভুরি। বাঙলা ভাষায় যে শতকরা প্রায় তেত্রিশ ভাগ আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দি এসে জায়গা পেয়েছে, এবং সাহিত্যে তাদের স্থান নির্দিষ্ট,—অন্ধ প্রাদেশিকতার আত্মাভিমানে সেকথা আমরা ভুলে যাই।

কাশ্মীরি 'বোলি' থেকে কাশ্মীরের কাব্যসাহিত্য এবং লোকসঙ্গীতের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল এককালে। এর থেকে মেয়েরা সৃষ্টি করেছে নাচের গান আর প্রণয়গীতি,—সেই গান অনেক সময় অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনায় পরিণত হয়েছে। ধানের মাঠে, দর্জির পাড়ায়, গয়লাদের ঘরে, মাঝিমাল্লার দলে, পসারিনীদের মসলিশে, ছুতোরের আড্ডায়, মজুরদের বস্তিতে,—দলবদ্ধ হয়ে লোকসঙ্গীত গায় মেয়ে আর পুরুষ। গান গাওয়া হয় আঁতুড় ঘরে আর অন্নপ্রাশনের উৎসবে। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে শিশু দোল্নায়।

বিরহিনী মেয়ে তা'র আকণ্ঠ অনুরাগে ডাক দেয় বিতস্তার এ প্রান্ত থেকে : "অরণ্যে অরণ্যে ধরেছে প্রস্ফুটিত মুকুল, হে প্রিয়, তুমি কি শোনোনি শুধু আমার সংবাদ? গিরিউপত্যকায় তরসায়রে অগণ্য রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো,— তুমি কি আমার সংবাদ শোনোনি কিছু?"

ও প্রান্তের অরণ্য থেকে দয়িতের ডাক শোনা যায় : "মুক্তা এনেছি সাগর মথিয়া তোমার দন্ত সাজাতে, তোমার অধরে রক্তিম আভা আমার প্রাণের শোণিতে।"

বৃষ্টি নেমে এলো মধ্যাহ্নের পর থেকে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়-প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে,—যেমন শীলংয়ে, যেমন দার্জিলিংয়ে। তফাৎ এই, এখানে তুষার চূড়ারা খুব সন্নিকট, সেজন্য হু হু ক'রে বরফানি বাতাস নেমে আসে। নগরের উপরে তুহিনের একটি ছায়া পড়ে। অপরাহ্ণের দিকে ফিরে এসে হিমাংশু

প্র[illegible]েন, আকাশের চেহারা ভালো নয়, আপনার এখনই বেরিয়ে পড়া উচি[illegible] দেরি করলে ভদ্রমহিলা বিব্রত বোধ করবেন।

বন্ধুবর মিঃ ধারের সঙ্গে বন্দোবস্ত হোলো এই যে, আগামীকাল সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন বক্সী গোলাম মহম্মদের ওখানে। তাঁর বাড়ীতেই আলাপচারী হবে। দু একজন মন্ত্রী ও কয়েকজন সরকারী কর্মচারীও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। অতএব আজ আমার ছুটি। সুতরাং অধিককাল বিলম্ব না ক'রে আমি বেরিয়ে পড়লুম রামবাগের পথে। সন্ধ্যার তখন বিলম্ব নেই। সাপটে বৃষ্টি নেমেছে। ভিজে ভিজেই যেতে হবে।

রামবাগের পুল পেরিয়ে গুলাব সিংয়ের সমাধি ছাড়িয়ে যখন বড়জেলায় এসে পৌঁছলুম, তখন মেঘেরা নেমে এসেছে বিস্তৃত বন বাগানের পপলারের জটলায়। পথে জনমানব কোথাও নেই, বাগানবাড়ীর দরজা জানলা সব বন্ধ। দোতলার সামনের ঘরখানায় সমস্তগুলি জানলাই কাচের শার্সি'র। তারই একটির সামনে শ্রীমতী মায়া দাঁড়িয়েছিলেন। টাঙ্গায় আমাকে আসতে দেখে নেমে এলেন। টাঙ্গার গাড়োয়ানের সাহায্যে মালপত্র গিয়ে উপরের ঘরে উঠলো। ঠান্ডায় হাত পা অবশ।

অভ্যর্থনাটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ। সে কথা থাক্। দুটি শিশুকে দেখছি, আর কেউ কাছাকাছি নেই। বাড়ীর নীচের পিছনদিকের ফ্ল্যাটে থাকেন আরেকটি বাঙ্গালী পরিবার, এ শিশু দুটি তাঁদেরই। উপরতলার একটি অংশে থাকেন এক মারাঠি পরিবার, তাঁদের সাড়াশব্দ কম। এ ফ্ল্যাটে শ্রীমতী মায়া একা। তাঁর হেপাজতে এই দুটি ঘর। এ ঘরটি প্রায় একেবারেই শূন্য থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে এ ঘরে এসেছে একটি চারপাই, তার উপরে একটি তোষক এবং একখানা লেপ ও বালিশ।

শিশু মেয়ে দুটিকে খুব ভালো লাগছিল। তা'রা যেন এ তল্লাটের মরুভূমির মধ্যে এনেছে স্নেহছায়া। শিশুর মতো এমন নিঃসঙ্গতার অবলম্বন আর কিছু নেই। ওদের সঙ্গে বসে গল্প জুড়ে দিতে হোলো। শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, এখানে আপনার আড়ষ্ট হয়ে থাকার কিছু নেই। দাঁড়ান্, বড্ড ভিজে এসেছেন আপনি, আমি চা ক'রে নিয়ে আসি।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে ঝমঝমিয়ে। মেঘের দল নেমে এসেছে নীচের বাগানে, —ঝাপসা হয়ে গেছে সব গাছপালা। তখনও অতি সামান্য পরিমাণ দিনের আলো অবশিষ্ট রয়েছে, কিন্তু তা'র চেহারাটা ধূমেল,—কেমন একটা অনৈসর্গিক আভা। যেন আদি সৃষ্টির ঊষাকাল। ঠান্ডা প্রচুর পড়েছে বাইরে। জানলার শার্সিগুলি ঝড়ের ঝাপটায় মাঝে মাঝে ঝন ঝন ক'রে উঠছে,—কিন্তু এত ঝাপসা যে, বাইরে কিছু দেখা যায় না। এ বাড়ীর উত্তর দিকে মাত্র একঘর বস্তি,—তার বাইরে চতুর্দিকে মাইলের পর মাইলের মধ্যে ঘনমেঘলুপ্ত পপলারের বিস্তৃত অরণ্য-

জটলা। সামনেই পাহাড়তলীর গা বেয়ে গেছে জলানদী বাবলাবনের নীচে দ্ল ।।
কোথাও জনমানব নেই।

দুরন্ত বায়ুর বেগ এবং মুষলধারাবৃষ্টি বেড়েই চললো। অন্ধ মূঢ় দিগ-দিগন্ত সব একাকার। আকাশ ডাক দিচ্ছে মুহুর্মুহু তা'র বিদ্যুৎলতার ঝলকে। শিশু দুটির সঙ্গে গল্প জ'মে উঠলো।

এক পেয়ালা গরম চা এবং টোস্ট-অমলেট্‌সহ শ্রীমতী গুপ্তা এসে ঢুকলেন। পরে ওঘর থেকে একখানা হাল্‌কা চেয়ার এনে নিজে বসলেন। বললেন, গুপ্ত সাহেব আমারই মতন সাহিত্যের খুব ভক্ত, শুনে রাখুন। তিনি থাকলে আজ ধেই-ধেই ক'রে নাচতেন। আপনার কথা জানতে চেয়ে আজও তিনি চিঠি লিখেছেন। সত্যিই বলছি, লেখক আমরা কখনও দেখিনি। এখন দেখছি আপনি ত' আমাদেরই মতন মানুষ!

উচ্চ হাস্যে তাঁর ঘর এবার মুখরিত হোলো।

বললুম, আচ্ছা, ওসব কথা এখন থাক্। আপনি একা এইভাবে থাকেন, অসুবিধে হয় না?

শুনুন তবে। এই বাচ্চা দুটি আমার প্রায় সারাদিনের বন্ধু। আর ওই যে বলেছিলুম বুড়ো পন্ডিতের কথা, ও হোলো আমার আশা-ভরসা,—অবিশ্যি কিছু কিছু দিতে হয়। তবে এখানকার পোষ্টমাষ্টারও মধ্যে মাঝে খবর নেন্। আজ-কাল কোনো কোনো দিন আসে সৎবতী আর মদনলাল,—ওদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসি। তবে ওরা ত' নতুন, ওরাও আজকালের মধ্যে চ'লে যাচ্ছে। আমার কাছে বিদায় নিয়ে গেছে।

ঠান্ডায় চা বেশ ভালো লাগছিল। বললুম, এ বাচ্চাদুটির মা-বাবা কোথায়?

এরা থাকে নীচে। এদেরও এই। মিঃ মুখার্জি এখানে নেই। মিলিটারির মুস্কিল হোলো, তা'রা এক জায়গায় স্থির নয়। এখানে ত' ভালো, বাড়ীঘর, সুযোগ সুবিধে রয়েছে। অন্য জায়গায় ক্যাম্প ছাড়া কিছু নেই। আমাদের জীবন শুধু ভেসে বেড়ানো। স্থায়ী ঘরকন্না কা'কে বলে আমরা জানিনে।

ঘরের সামনে সিঁড়িতে কা'র যেন সাড়া পাওয়া গেল। মায়া উঠে গেলেন, তারপর ফিরে এসে মেয়েদুটিকে পাঠিয়ে দিলেন নীচে। ওদের খাবার সময় হয়েছে। কে যেন ডেকে নিয়ে গেল।

ওঁর স্বামী ফিরছেন কবে এ প্রশ্নের উত্তরে মায়া বললেন, উনি আছেন মাইসোরে, ফিরতে এখনও দুমাস। সত্যি, উনি ভারি খুশী হতেন আজ এখানে থাকলে, নাচতেন মনের আনন্দে। আজ তাঁর চিঠি আবার পেয়েছি। আমাকে এভাবে থাকতে হচ্ছে, ওঁর যে কী দুঃখ কি বলবো। উনি থাকলে আপনাকে নতুন জিনিস দেখাতে পারতুম।

মুখ তুললুম।

শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, উনি নিজেই সেই নতুন জিনিস। এমন উদার

ধার্মিক ছেলে আপনারা সচরাচর দেখতে পান না। আমার স্বামীর মতো লোক মিলিটারিতে বেমানান।

হাসিমুখে বললুম, বুঝতে পারা যাচ্ছে আজকাল মিলিটারিতে ভদ্রলোকরা ঢুকছে।

নিশ্চয়। কাশ্মীরের মিলিটারি সবচেয়ে ভদ্র। এরা এদেশে এত প্রিয় কি বলবো। বসুন, আমি আসছি।—উনি বেরিয়ে গেলেন।

কুণ্ঠা আমার যাচ্ছে না। ফাই-ফরমাসের লোক নেই। মহিলাকে একাই সব করতে হচ্ছে। উৎসাহ ক'রে অতিথিকে ডেকে আনা এক জিনিস, কিন্তু তার জন্য সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করা অন্য বস্তু। আমি একটু বিব্রতই বোধ করছিলুম। আজকের রাতটা অবশ্য কাটুক, কিন্তু ঠিক এইভাবে হাতপা গুটিয়ে দু'চারদিন বন্দী দশার মধ্যে আট্‌কে থাকাটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা তাই ভাবছিলুম।

ঝড়ের ঝাপটা লাগছে শার্সিতে। ঘড়িতে দেখছি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সমগ্র কাশ্মীর বাইরে যেন লণ্ডভণ্ড হচ্ছে; পপলারের ঘন অরণ্য মহারাক্ষসীর মতো অন্ধ আক্রোশে মাথার চুল ছিঁড়ছে, তারই সেই হিংস্র নিশ্বাস ঝাপট দিয়ে যাচ্ছে শার্সি'র বন্ধ জানলায়।

এই হোলো হিমালয়ের দানবীয় বিপ্লব। ভয়াল করাল তুহিন ঝটিকা সর্বব্যাপী মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে ছুটে আসে চারিদিক থেকে,—গর্জনে, স্বননে, রণনে তা'র প্রলয় নাচন চরাচরের কোনও বস্তুকে ক্ষমা করে না। উড়িয়ে ভাসিয়ে তাড়িয়ে মাড়িয়ে যেন লক্ষ লক্ষ মত্ত হস্তীর মতো পর্বতে-পর্বতে অরণ্যে-অরণ্যে দাপাদাপি করতে থাকে। ভয়ার্ত মানুষ আতঙ্কিত চোখে ওর দিকে তাকায়।

খরপদে মায়া আবার এলেন।—আপনাকে একলা বসিয়ে রেখেছি। বৃষ্টিতে সব মাটি হোলো। গতকাল আপনাদের ওখানে সারাদিন কাটলো,—ঘরকন্নার খোঁজ রাখিনি। আজ এই বৃষ্টি, পণ্ডিতের পাত্তাই নেই। কী যে অসুবিধে, বলতে পারিনে। কত যে কষ্ট হবে আপনার!

আপনার সমস্যাটা কি, বলুন দেখি?

না, সে আপনাকে বলতে পারবো না। শুধু ব'লে রাখি, আপনার যদি অসুবিধে হয়, সহ্য ক'রে যাবেন।

বললুম, বটে, অতিথিকে ডেকে এনে অসুবিধেয় ফেলছেন, একথা জানলে আপনার স্বামীও বরদাস্ত করবেন না!

স্বামীর উল্লেখমাত্রই তিনি আনন্দ পান্, তাঁর মুখে চোখে দীপ্তি ফুটে ওঠে। বললেন, সে সত্যি, আমারও কোনও অসুবিধে তিনি কখনও বরদাস্ত করেননি। আজ তিনি উপস্থিত থাকলে ঝড়-জল কিছুই মানতেন না,—আমার মানরক্ষার জন্যই ছুটতেন।

একটি অতি-আধুনিক সাজসজ্জাকরা মেয়ের মুখ থেকে তাঁর অনুপস্থিত

স্বামীর সম্বন্ধে এই প্রকার শ্রদ্ধানুরাগ আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলুম। অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস, এবং উল্লাসের অতি-চাঞ্চল্যও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু স্বামীর আলোচনা ওঠামাত্রই তাঁর কণ্ঠ শান্ত ও নম্র হয়ে এসেছে, প্রসন্ন আভা ফুটছে মুখে চোখে। মনে হয়েছে একটি নির্মল আনন্দ যেন তাঁর মনে স্থিতিলাভ করেছে। এর পর বসে-বসে শুনলুম গুপ্তসাহেবের গল্প। তিনি সদালাপী ও কষ্টসহিষ্ণু। বিবাহ অল্পদিনের, কিন্তু এ বিবাহ সার্থক। এমন উদারচরিত্র স্বামী অনেক মেয়ের ভাগ্যেই মেলে না। ক্ষমা ও ধৈর্যের তিনি প্রতিমূর্তি।

দাঁড়ান্, একটি জিনিস আপনাকে না দেখিয়ে থাকতে পারছিনে। আগে থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।—এই ব'লে তিনি বেরিয়ে গেলেন, এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যেই মস্ত এক তাড়া চিঠি এনে হাজির করলেন। সোৎসাহে বললেন, না না, পড়ুন আপনি যেখানা খুশি। আমি একটুও লজ্জা পাবো না। এসব চিঠি সাধারণ স্বামীর লেখা নয়।

হাসিমুখে বললুম, কিন্তু আপনার স্বামীর অনুমতি নাও থাকতে পারে!

কেমন ক'রে জানলেন তাঁর অনুমতি নেই? এমন চিঠি কোনদিন তিনি লেখেননি যা আপনাকে পড়ানো চলে না।

এবার আর তামাসা না ক'রে পারলুম না। বললুম, তাহলে এক কাজ করুন। প্রথম সম্ভাষণের গোটা দুই শব্দ এবং শেষের গোটা দুই ছত্র চেপে রাখুন,—মাঝখানটা প'ড়ে নিই।

শ্রীমতী গুপ্তা এবার হেসে ফেটে পড়লেন। অবশেষে একটির পর একটি চিঠি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, সেগুলো ছড়িয়ে পড়লো ঘরময়। ওদের ভিতর থেকে হঠাৎ একখানা চিঠি খুলে তিনি বললেন, এই দেখুন, আপনার সম্বন্ধে উনি কি সুন্দর লিখেছেন!

যে-শার্সিটা এতক্ষণ বাতাসের ঝাপটে মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছিল, এবার সহসা সেটি সশব্দে খুলে গেল। ঝড়বৃষ্টির যে উদ্দাম রণরঙ্গ বাইরেটা তোলপাড় করছিল, এবার হঠাৎ তারই একটা প্রবল ঝলক উন্মত্ত চেহারায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে আছাড় খেয়ে। উভয়েই আমরা হতবুদ্ধি,—পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে শ্রীমতী গুপ্তা দুই পাল্লা এক ক'রে চেপে ধরলেন। বললেন, আপনার খাট-বিছানা একদম ভিজে গেল। কাঠের ছিট্‌কিনিটা ভেঙে গেছে ঝড়ের ধাক্কায়,—এটা যা হোক ক'রে আট্‌কে দিন্ ত? ওকি করছেন, খাটখানা দাঁড় করাচ্ছেন কেন? ওতে কি হবে?—তিনি প্রায় বিদীর্ণ হাস্যে ভেঙে পড়ছিলেন। বললেন, আপনি চেপে ধরুন, আমি দেখছি।

আমি গিয়ে জানলা চেপে ধরলুম। তিনি ছুটলেন ওঘরে। কিন্তু সহসা কোনো উপায় হোলো না। হাতুড়ি-পেরেক—কোথাও কিছু নেই। ইতিমধ্যে বায়ুর ঝাপটায় চিঠিগুলি ছড়িয়েছে এখানে ওখানে, তাড়াতাড়িতে পা লেগে

চায়ের পেয়ালা ভেঙেগছে ঝনঝনিয়ে—ঘর একেবারে ছত্রখান। অবশেষে আমার নিরুপায় অবস্থা দেখে তিনি হেসে গড়াতে গড়াতে গিয়ে এনেছেন উনুন জ্বালাবার কাঠের টুকরো, আলুকাটা ছুরি, রান্নার খুন্তি এবং কাগজের কুচি। শার্সি বন্ধ করতে গিয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ। এবার রাগ ক'রে বললুম, এর পর আর কোনও অতিথিকে ডেকে আনবার আগে ছুতোর মিস্তিরিকে ডাকবেন!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি গা ঢাকা দিলেন।

কিন্তু খোলা জানলার ওই অবসরটুকুর মধ্যে বাইরের উদ্দাম অন্ধ চেহারাটা একবার দেখে নিলুম। ঝড়ের সমুদ্রে একদা ভ্রমণ করেছি বঙ্গোপসাগরের জাহাজে। নৈশসমুদ্র ছিল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। কালিঝুলিমাখা সেই দিগন্ত দোলার বিভীষিকা দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল অনেকে; অনেকে সেই রোলিং-এর মধ্যে শুয়ে প'ড়ে অবশ্যম্ভাবী জাহাজডুবীর প্রহর গুণেছে। আজ রাত্রে দেবতাত্মার চেহারায় দেখছি নটরাজের সেই রুদ্রতাণ্ডব,—তিনি তাঁর এক অভিনব স্বরূপকে প্রকাশ করছেন। সমস্ত আকাশজোড়া অসুরশক্তির দাপাদাপি,—যক্ষ রক্ষ প্রেত পিশাচ দৈত্য দানব ডাকিনী শঙ্খিনী—সবাই নাচছে উন্মত্ত বিভীষিকায়। রাক্ষসীরূপিণী রাত্রি এসেছে রুদ্রাক্ষ মহেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে। এপারে ওপারে পীর পাঞ্জাল আর হরমুখের কোলে-কোলে সর্বনাশিনী সেই মহাকালী আপন কালো এলো-চুলের রাশি ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে পিশাচীনৃত্যের উন্মাদনায় দিগবিদিক-জ্ঞানশূন্যা। ছিন্নমস্তা আপন মুণ্ড নিয়ে অন্ধকারে ছিনিমিনি খেলছে!

সমস্ত রাত্রি সমানে চললো সেই ঝড় আর বৃষ্টি। নিদ্রার কথা ওঠে না, ওই প্রবল মাতামাতির দোলা যেন চারিদিক থেকে মাথা কুটোকুটি করতে লাগলো। ঘড়িতে এক সময়ে দেখলুম, ভোর হ'তে বাকি নেই। সকাল হোলো, তখনও জলের ঝাপটা লাগছে শার্সিতে। অস্পষ্ট পপলারের সারি তখনও ঝটাপটি করছে তুমুল দ্বন্দ্বে। বনে ও বাগানে পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ নেমে আসছে। সেই একই দুর্যোগ।

এক সময়ে স্নান ক'রে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমতী গুপ্তা। তাঁর মলিন বিমর্ষ মুখ। পণ্ডিত আসেনি, আসার সম্ভাবনাও কম। খানিকটা বাসি দুধ আছে চায়ের জন্য, সামান্য আনাজপত্র আছে ঘরে, ডিম বুঝি আছে দুতিনটে। এ ছাড়া ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। বললেন, আপনার কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই।

কিন্তু একবার যখন মুখ দেখালেন তখন চা আনুন।

মিনিট পনেরো পরে অবশ্য তিনি চা এনে হাজির করলেন। প্রশ্ন করলুম, চা'ল আর নুন আপনার ঘরে আছে কিনা।

আছে।

ব্যস, নিশ্চিন্ত থাকুন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত তিনি রইলেন না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিপ্লব বাধিয়ে তুললেন। জলযোগের ব্যবস্থা কই? দুধ, মাখন, মাংস, মাছ কই? শুধু ভাত আর সব্জিসিদ্ধ হলেই কি সব হোলো? আমাকে জব্দ করার জন্যই যেন বৃষ্টি নেমেছে! শ্রীমতী গুপ্তার চোখে কান্না এলো। হতভাগা সেই বুড়ো পণ্ডিত নিশ্চয় মরেছে। সে মরুক, তা'র মরাই ভালো। এঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে নীচের তলায়,—মায়া ছুটোছুটি করতে লাগলেন। ব্যাপারটা আমার পক্ষে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠলো।

স্নান সেরে একসময় তাঁর রান্নাঘরে গিয়ে বসলুম।—কই, দেখি আপনার কি আছে এঘরে? আমিই রেঁধে দিচ্ছি।

তিনি ত' শশব্যস্ত। ভয়ানক প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। অবশেষে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হোলো। চেয়ে দেখি, কোনও অসুবিধা নেই। ডিমের অমলেট্, আলুকপির ঝোল, টমাটোর চাট্নি, মুলোসিদ্ধ, শেষ পাতে বাসি দুধ। আর চাই কি? আপনি জোগাড় দিন্, আপনাকেই আমি রেঁধে খাওয়াবো।

মিথ্যে বলবো না, ঘরকন্নায় তিনি বেশ পারদর্শিনী। নুন আর মসলা থাকে কাগজে, গামলায় খাবার জল, চায়ের প্লেটে ভাত খাওয়া, দুধের কড়াইয়ে দুধভাত, মাটির ভাঁড়ে তরকারি,—সুতরাং আমোদ পাওয়া গেল প্রচুর। তাঁর স্বামীও এসব তুচ্ছ ঘরকন্নার অনুরাগী নন্। তিনিই তাঁর স্ত্রীকে নাচগান সাহিত্য শিল্প ও বাদ্যযন্ত্রচর্চায় সর্বপ্রকারে উৎসাহ দিয়ে থাকেন, এবং শ্রীমতীর চেহারায় যে শ্রী ও লাবণ্য, তাতে ঠিক রান্নাবান্না অথবা বাসনমাজা-কাপড়কাচা মানানসই হয় না।

আমি ঈষৎ বস্তুতান্ত্রিক তথা বাস্তববাদী। সুতরাং তাঁকে কথা দিলুম, পণ্ডিত যদি না আসে তবে রাত্রের মধ্যে যেমন ক'রেই হোক, আমি তাঁর জন্য কিছু-কিছু বাজার-হাট ক'রে দেবো।

প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বেলা তিনটার সময় একখানা জীপগাড়ী এসে বাগানের দরজায় থামলো, এবং বর্ষাতি চড়িয়ে মিঃ ধার ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এলেন। গাড়ীখানা সরকারি, এবং আসছে 'নারাপিরস্থান' নামক এক পল্লী থেকে। আমাকে এখনই যেতে হবে তাঁর সঙ্গে।

খবর পেলুম বৃষ্টির অবস্থা ভালো নয়, বিতস্তা আজ মধ্যাহ্ন থেকে ফুলতে আরম্ভ করেছে এবং পীর পাঞ্জালের সংবাদ উদ্বেগজনক। বাজার হাট আজকে সবই বন্ধ। গতকাল কোনও প্লেন্ আসেনি দিল্লী থেকে, এবং আজও এখান থেকে কোনও প্লেন্ ছাড়েনি। ডাক বন্ধ।

আন্দাজ তিন মাইল পথ। প্রতাপ সিং কলেজ ছাড়িয়ে ময়দানের পাশ দিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়ালো সরকারি বার্তাবিভাগের আপিসে আমাদের পূর্ব পরিচিত

বন্ধু মিঃ শর্মার ঘরের সামনে। তিনি এই বিভাগের সর্বময় কর্তা। এখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করতে এঁরা বাধ্য করলেন। ঘণ্টা দুই পরে সেই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আন্দাজ দেড় মাইলের মধ্যে একটি নিরিবিলি পথে ঢুকে বক্সী গোলাম মহম্মদের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলুম। প্রহরা মোতায়েন রয়েছে আশে পাশে, কিন্তু সমস্তটাই বিস্ময়জনকভাবে অবারিত। সাধারণ ভদ্রলোকের একটি উদ্যানবাটি। যে কোনও শ্রেণীর লোক ঘুরছে যে কোনও ঘরে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপিসের এক বড়বাবুর কোনও পার্থক্য নেই। গাড়ীওলা, মজুর, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক, মন্ত্রী—সব একাকার। আমরা বাঙালী, ইংরেজ আমল থেকে লাট-বেলাট আর মন্ত্রীর সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী দেখে অভ্যস্ত। এখানে তা'র চিহ্নও নেই। শেখ আবদুল্লা মাত্র তিন সপ্তাহ আগে গদিচ্যুত হয়েছেন,—তিনি ছিলেন শের-ই-কাশ্মীর। বক্সী গোলামকে বলা হয়, কাশ্মীরের 'লৌহমানব'। ইতিমধ্যে খবর শুনেছি, বক্সীজী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃতদেহ নিজের কাঁধে নিয়ে গেছেন বিমানঘাঁটি পর্যন্ত এবং তাঁর নিজের একটি কন্যার নাম রেখেছেন, শ্যামা। এমন অকুণ্ঠ এবং ভয়হীন সত্যভাষী সংখ্যায় বড় কম। তিনি বলেন, কাশ্মীর মানেই ভারতের একটি অংশ—যেমন হায়দারাবাদ, যেমন মণিপুর, যেমন ভূপাল। জম্মু-কাশ্মীরে হিন্দু মুসলমান ব'লে কিছু নেই, আছে শুধু কাশ্মীরী। প্রজাপরিষদে অনেক মুসলমান আছেন,—যেমন ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সে ডোগরা আর পণ্ডিতের ছড়াছড়ি। সমগ্র কাশ্মীর তাঁর নখদর্পণে। মাঠে ঘাটে বাজারে—তিনি সর্বত্রগামী। কোথাও ঝগড়াঝাঁটি হ'লে তিনি আগেই গিয়ে হাজির, আপিসের কেরানি অসুস্থ হ'লে তিনি ওষুধ কিনে নিয়ে যান্,—দোকানদারদের আড্ডায় গিয়ে তিনি একবেলা হয়ত গল্পই ক'রে এলেন। ফষ্টিনষ্টিতে তাঁর জুড়ি নেই, তিনি মাঠে গিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলে সুরসিক শ্রোতারা হেসে লুটোপুটি। তিনি চিরদিন কর্মী আর স্বেচ্ছাসেবক ব'লেই সকলের কাছে পরিচিত। আজ হঠাৎ অতি পরিচিত ঘরের লোক প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, সেজন্য সবাই ছুটে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে।

রাত আটটার সময় বক্সীজির ওখান থেকে হাতচিঠা বেরুলো, সমগ্র শ্রীনগর বন্যায় বিপন্ন। সাতটি অঞ্চলে বাঁধ ভেঙেছে, জল ছুটে আসছে চারিদিক থেকে। কাশ্মীর সভ্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কাশ্মীরের বেতারকেন্দ্র থেকে এই অশুভ সংবাদ ঘোষণা করা হোলো। শ্রীনগরের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর অঞ্চল সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। শস্যক্ষেত্র ও গ্রামাঞ্চল জলে পরিপূর্ণ।

সেদিন সবান্ধবে পাশে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কাশ্মীরের লৌহমানবকে। বাইরে মুসলধারে বৃষ্টি, অন্ধকার শ্রীনগর, তিনদিকের পাহাড় থেকে নেমেছে বন্যা, নদীনালা ও জলাশয় স্ফীতি-বিস্তার লাভ করেছে, নগরের চারিদিকে বাঁধ

ভেঙেগেছে। সেই শক্তিপরীক্ষার কালে অসীম আশ্বাস আর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পথে নেমে এলেন বক্সী গোলাম আর শ্যামলাল শরফ। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে। না, মোটর নয়, জীপ নয়,—দলবল নিয়ে সেই তুহিন শীতার্ত রাত্রের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে চললেন বক্সীজি,—পরণে তাঁর সামরিক পোষাক। আমরাই বা আশ্রয়ের মধ্যে থাকবো কেমন ক'রে? আমরাও বেরিয়ে এলুম তাঁর সঙ্গে। এর নাম উদ্দীপনা, এরই নাম নেতৃত্বের প্রেরণা। পথে বেরিয়ে দেখি, চারিদিক জন-হীন, যানবাহনবিহীন,—দুর্যোগের রাত্রে ঘরবাড়ীর জানলা-দরজা সব বন্ধ। কিন্তু নগরবাসী কেউ জানলো না, তাদেরই প্রধানমন্ত্রী ছুটলো তাদেরই নিরাপত্তার জন্য। বৃষ্টিতে ভিজছেন বক্সী গোলাম, কিন্তু ওরই মধ্যে কাছে দাঁড়িয়ে দেখলুম, লৌহমানবের মুখে প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য, দেখে নিলুম কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ। সুখ্যাতি করতে ভয় পাই, কারণ শেখ আবদুল্লা আমাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সে-রাত্রের সেই বন্যাসঙ্কটের নাটকীয় মুহূর্তকালে মনে হয়েছিল, এমন বলিষ্ঠচেতা, স্বাস্থ্যবান, ভয়হীন ও অক্লান্তকর্মী মুসলমান জননেতা সমগ্র ভারত ও পাকিস্তানে বোধ করি আর দ্বিতীয়টি নেই। লৌহমানবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য আমার পক্ষে এই প্রকার দুর্যোগেরই দরকার ছিল।

ছুটতে ছুটতে চললুম গাড়ীর আড্ডায়। বৃষ্টি পড়ছে। গায়ে পট্টুর কোট এবং গরম প্যাণ্ট ভিজে থকথক করছিল। শেষ টাঙগাখানা অনেক তোষামোদের পর পাওয়া গেল। ওর ভয়, আমাকে পৌঁছে দিয়ে ওকে একা ফিরতে হবে এই অন্ধকার দুর্যোগে।' সুতরাং তিনগুণ ভাড়া কবুল করলুম। গাড়ী ছোটে না, পাছে ঘোড়ার পা পিছলায়। আমিরা-কদলের উপরে উঠে দেখি, পুলের পাশের দোকানগুলি জলে ডুবে গেছে, ঝিলমের জল উঠেছে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচুতে। নদীর ধারের পাড় ভেঙেগ পড়ছে। আমার গাড়ী চললো পাশের বস্তির পথ ধ'রে ময়দানের দিকে। মনে আছে শ্রীমতী মায়ার ভাঁড়ারের জন্য খাদ্যসামগ্রী কিনতে হবে। মাইল খানেক এসে গাড়ী থামলো। গাড়োয়ান নেমে গিয়ে এক হাঁটু কাদা ভেঙেগ একটি দোকানের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো। দোকানদার দরজা খুললো, কিন্তু বিশ্বাস করলো না যে, এমন 'অপার্থিব' সময়ে কারো চা'ল-ডাল-ঘি-মসলার দরকার হতে পারে। যাই হোক, এক রাশি খাদ্যসামগ্রী কিনে আবার গাড়ীতে এসে উঠলুম। সর্বাঙ্গ কাদায় আর জলে জবজব করছে। দু'হাত জোড়া, সিগারেট খাবার উপায় নেই। গাড়ী আবার চললো।

সহসা অন্ধকারে দেখি, গাড়ীর দুই ধারে আতঙ্কিত জনতা ছুটছে বিপরীত দিকে। সঙেগ গরু বাছুর ছাগল ভেড়া পুঁটলী বিছানা বাক্স। শিশুর দল নিয়ে ছুটছে মেয়ে, বালক বালিকা ছুটছে, বোঝা নিয়ে ছুটছে পুরুষ। শত

শত, সহস্র সহস্র। কারো মাথায় কাঠের বোঝা, কারো কাঁধে ঘরবাঁধার সরঞ্জাম। প্রাণভয়ে ছুটছে, ছুটছে বন্যার তাড়নায়। ছুটছে পাগলের মতো।

হাত অবশ হয়ে আসছে ঠাণ্ডায়। আরও এক মাইল এসে টাঙ্গাওয়ালা রামবাগ পুলের এপারে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ী আর যাবে না। পিছন ফিরে দেখি অনেকগুলো পেট্রোমাক্স জ্বলছে দূরে দূরে। বিপুল জলস্রোতের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটি সম্পূর্ণ নূতন নদীর জন্ম হয়েছে। একশত বর্গমাইলব্যাপী গ্রামাঞ্চল ভেসে এসেছে। বক্সী গোলাম আর মন্ত্রী শ্যামলাল সর্বাগ্রে এসে পেঁাছেছেন। খবর পাওয়া গেল, পূর্তবিভাগের দুইশত লোক এবং প্রায় আটশত কুলী এখানে কাজে নেমেছে।

ওপারে যাবার আর কোনও উপায় নেই। জনৈক অফিসার বললেন, আপনাকে মাথায় তুলেও পার করা যেতো, কিন্তু মাথা ছাড়িয়েও দশ ফুট জল। আপনি চলে যান্, জল ছুটে আসছে এদিকে।

কিন্তু আমাকে বড়জেলায় যে যেতেই হবে!

অসম্ভব। বড়জেলার উপর দিয়েই বন্যা এসেছে। ঘরবাড়ী ভেঙে দিয়ে নদী বইছে। আপনি আর দাঁড়াবেন না।

পা উঠছে না। উত্তেজনা চেপে অস্থিরভাবে প্রশ্ন করলুম, সেখানকার খবর? আমার লোক আছে যে ওদিকে?

ভদ্রলোক দৌড়ে চ'লে যাবার আগে ব'লে গেলেন, কিছুই বলা যাবে না। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিন্। ডুবে গেছে সব।

ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলুম। হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে, এমন সময় হঠাৎ আবার জনতার ধাক্কা এলো। জল ছুটে আসছে সামনে। গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে গাড়ীতে তুললো, এবং আর এক সেকেণ্ড বিলম্ব না ক'রে এবং আমার আপত্তি না শুনে গাড়ী ছোটালো বিপরীত দিকে। তা'র জানা আছে এরকম ঘটনা। নিরুপায় হয়ে খাদ্যসামগ্রীগুলি তা'কেই এক সময় উপহার দিলুম। সে যেন আমার আড়ষ্ট দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো।

ফিরে এসে খালসা হোটেলে উঠে হিমাংশুর ঘরের দরজা যখন ঠেললুম, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

ঘুম চোখে দরজা খুলে তিনি অবাক।—এ কি, আপনি? ফিরে এলেন যে? মালপত্র কই? ইস—এত ভিজেছেন বৃষ্টিতে?

বন্যার খবর তাঁকে দিলুম। তিনি বললেন, বন্যা? সে কি? কোথায়? কই, কিছু খবর পাইনি ত?

হাসিমুখে বললুম, রাত্রির অন্ধকারে কত কি ঘটে, নিশ্চিন্ত লোকেরা কতটুকু জানে তা'র?

আসুন, আসুন—ভেতরে আসুন। ভিজে একেবারে গোবর। যত দুর্যোগ

কি শুধু আপনার কপালেই ঘটে? সে-মহিলার বিপদ ঘটলো কিনা কে জানে! হয়ত ছুটোছুটি করছেন, হয়ত বা কান্নাকাটি লাগিয়েছেন! কিন্তু...তাই ত'... আজ আর কোনও উপায় নেই। নিন্, আপনি সুস্থ হোন্। চা আর জলখাবার আপনাকে ঠিকই খাওয়াতে পারবো!

হিমাংশু আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি, দুর্যোগ শান্ত হয়ে গেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আছে, কিন্তু মেঘের জোট ভেঙ্গে গেছে। সূর্যের আভা পাওয়া যাচ্ছে। হিমাংশুর প্রস্তাবক্রমে বেলা দশটার সময় দুজনে অগ্রসর হওয়া গেল! তিনি নিলেন কিছু খাদ্য এবং এক বালতি পানীয় জল। বন্যা-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। আজ অপরাহ্নে তিনি যাবেন হাউসবোটে,—তিন সপ্তাহ বসবাসের মতো ঘর পাওয়া গেছে। আজ রাত্রের পর হোটেলে তাঁর মেয়াদ ফুরিয়ে যাচ্ছে।

রামবাগ পুলের কাছে এসে দেখি বিচিত্র জগৎ। তিনদিন ধ'রে যে পথ দিয়ে গাড়ীতে আনাগোনা করেছি, সেই পথে নদী আর নৌকো। পুল আছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু অগাধ নদী বইছে সেইখানে, যেখানে কাল রাত্রে আমার টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। জলের বালতি নিয়ে আমরা নৌকাযোগে ওপারে গিয়ে এক বনময় পথ ধ'রে বড়জেলার সেই বাগানবাড়ীর ধারে এলুম। পাশের বস্তি ও গৃহস্থের চিহ্নমাত্র নেই। ঘর ভেঙ্গেছে, লোক পালিয়েছে। আমাদের দেখেই শ্রীমতী মায়া চীৎকার ক'রে উঠলেন। তাঁর বাড়ীর দোতলার সিঁড়ি অবধি বন্যা উঁচু হয়ে উঠেছিল। নীচের ঘর-দোরে সেই বাঙ্গালী পরিবারটিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁরা ঘরদোর ছেড়ে কোথায় গেছেন জানিনে। পানীয় জলের সংযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে।

আমরা উপরে এলুম। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিনিদ্রায়, উপবাসে, আতঙ্কে শ্রীহীন। বোধ করি সারারাত কান্নাকাটি ক'রে চোখ ফুলেছে। প্রথম রাত্রে তিনি নদীর ওদিকে গিয়ে চীৎকার করেছেন আমার নাম ধ'রে, তারপর জলের তাড়নায় একপ্রকার সাঁতরে তিনি ফিরে আসেন। বন্যা এসে অতঃপর এ বাড়ীকে ঘিরে ফেলে চারিদিক থেকে। কিন্তু তাঁর অতিথি কোনও এক সময় অবশ্যই ফিরবেন, এজন্য সবাই চ'লে গেলেও তিনি এ বাড়ী ছেড়ে যাননি। প্রায় আটফুট জল যখন নীচের থেকে উঁচু হয়ে ওঠে, তখন তিনি কেবল অন্ধকারে সারা দোতলা ছুটে বেড়িয়েছেন। ইলেকট্রিকের আলো আর জলের পাইপ সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে। অতিথির জন্য অধীর প্রতীক্ষায় তাঁর রাত কেটেছে।

কেঁদে ফেললেন শ্রীমতী মায়া। তারপর বললেন, না, আমি আর এখানে কিছুতেই থাকবো না, এ বাড়ী আমি ছেড়ে দেবো। হয়ত আবার বৃষ্টি

আসবে পাহাড়ে। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, আমি শহরে গিয়ে থাকবো।

আমার কাহিনী তাঁকে বললুম, কিন্তু তিনি সান্ত্বনা পেলেন না। এক রাত্রির আতঙ্কময় জীবন তাঁকে যেন ভীষণ ক'রে তুলেছে।

আমরা অপেক্ষা ক'রে রইলুম, তিনি নিজের হাতে নিজের ঘরকন্না ভেঙে বাঁধাছাঁদা করতে লাগলেন। হিমাংশু বোধ করি আড়ালে গিয়ে তাঁকে আমার সম্বন্ধে দুএকটি কথা ব'লে থাকবেন, সুতরাং এক সময় তিনি কাছে এসে বললেন, নিজের উত্তেজনার মধ্যে আপনার কথাটা শুনিনি, কাল যে আপনি আমার জন্যে জীবন বিপন্ন করেছিলেন, এ কখনও ভাবিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।

বললুম, বিলক্ষণ। আমার কষ্ট আর কতটুকু? কিন্তু আপনি যে এ বাড়ী থেকে নড়েননি, এ যে অসমসাহসিক কাণ্ড! আপনার সাহসের তুলনা নেই!

কতকগুলো মালপত্র নিয়ে হিমাংশু আগেই অগ্রসর হলেন। তিনি গিয়ে হোটেলে ঘর ঠিক করবেন, এবং জিনিসপত্র গোছাবেন। শ্রীমতী মায়াকে অনেক ছুটোছুটি করতে হোলো। মারাঠি পরিবারের হাতে এ বাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিলেন, ধোপার খোঁজ নিলেন, পণ্ডিতকে গালি দিয়ে তা'র প্রাপ্য রেখে গেলেন, জমাদার বিদায় করলেন। অবশেষে আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় মাইল খানেক দূরে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পোস্টমাস্টারের কাছে বিদায় নিয়ে এলেন। গ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে বন্যার তাড়না আঘাত করেনি।

নদীর ঘাটের ওদিক থেকে জনদুই কুলি ডেকে আনলুম, এবং তাঁর বাড়ী থেকে মালপত্র সমেত বেরিয়ে আসতে বেলা প্রায় তিনটে বাজলো। ভাগ্যের পরিহাস হোলো এই যে, সেদিন সন্ধ্যায় হিমাংশুকে নিয়ে যখন আমাদের ঘরের সামনের বারান্দায় চায়ের আসর বসলো, তখন দেখা গেল, কোমল মখমলের মতো নীল আকাশে হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্যোতিষ্ক-নক্ষত্রেরা ঝলমল করছে। কোনওকালে দুর্যোগ ছিল আকাশে, কোনওকালে বৃষ্টি ও বন্যার আতঙ্কে জনতা পালিয়ে যাচ্ছিল,—তা'র আভাসমাত্র নেই। মায়া উঠেছেন আমাদের পাশের ঘরে। প্রচুর লটবহরে তাঁর ঘর ভ'রে গেছে।

শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ পশ্চিমের পথে আটাশ মাইল। পথ অতি মসৃণ এবং প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম। কিন্তু মোটরপথ পাহাড়ে ওঠে না, টানমার্গ পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে চড়াইপথে ঘোড়া কিংবা পায়ে হাঁটা। চারিদিকে পীর পাঞ্জালের পাইন বন,—মাঝখানে নিরিবিলি গুলমার্গ। এই ক্ষুদ্র জনপদটি 'গল্ফ'খেলার জন্য পৃথিবীখ্যাত। এর সমস্ত চেহারাটা সাহেবী ধরণের, এবং এই নয় হাজার ফুট উঁচুতে যারা আসে, তা'রা ইউরোপীয় রুচি ও প্রকৃতি নিয়েই থাকে। বস্তুত কাশ্মীরের প্রকৃত সৌন্দর্যের পরিচয় আরম্ভ হয় শ্রীনগরের সমতা থেকে যত উঁচুতে ওঠো। সোনামার্গ, গঙ্গাবল, গান্ধারবল,

মহাদেবচূড়া, বিষ্ণুসায়র, গড়সায়র, বলতাল, জোজিলা অথবা কোলাহাইয়ের পথ, পহলগাঁও,—এরা হোলো নির্ভুল স্বর্গলোক। গঙ্গাবলহ্রদ কাশ্মীরী হিন্দুর গঙ্গাতীর্থ,—এটি ঠিক শেষনাগের মতো। তুষারনদী নেমে আসে উপর থেকে, সরোবরের বর্ণ নীলাভ থেকে সবুজে পরিণত হয়, সূর্যের আলোয় রঙ্গীন মেঘের টুকরো নেমে এসে ওর জলচুম্বন করে। জ্যোৎস্নায় অপার্থিব মায়ালোকে পরিণত হয়। কাশ্মীর এখানেই ভূস্বর্গ।

হরিপর্বতের দুর্গপ্রাকারের নীচে দিয়ে মোটরে যাচ্ছিলুম ক্ষীরভবানীর দিকে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী মায়া। অদূরে গান্ধারবল পর্বতের চূড়া, তা'র নীচে একদিকে ফতেপুর বস্তির দক্ষিণে আন্‌ছার হ্রদ—ওখান থেকে একটি প্রণালী চ'লে গেছে ডালহ্রদের দিকে। আমাদের পথের দুধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র-গুলি ফসলে এখন পরিপূর্ণ। মায়া আছেন অনেকদিন কাশ্মীরে, কিন্তু পহলগাঁও ছাড়া আর কোথাও তাঁর যাওয়া হয়নি। রৌদ্র ঝলমল করছে পথে ও প্রান্তরে। সেদিনের দুর্যোগে পাহাড়ে পাহাড়ে তুষারপাত ঘটেছে। মধ্যাহ্ন-কাল পেরিয়ে গেলেও বাতাস অতি স্নিগ্ধ।

বনময় একটি গ্রামের ভিতর দিয়ে গাড়ী এসে পেঁছিলো ক্ষীরভবানীর মন্দিরের কাছাকাছি। ভিতরে চেনার বৃক্ষগুলির ছায়া ঝিলমিল করছে। আশে-পাশে সিন্ধুনদীর শাখা-প্রশাখা নানা প্রণালীপথে বয়ে চলেছে। ভিতরে ঢুকে সহসা দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর দৃশ্য চক্ষে ভেসে ওঠে। মন্দিরপ্রাঙ্গণের তিনদিকে ক্ষীরসায়রের জলের প্রবাহ চলেছে। কোনো কোনো স্ফীতকায় চেনারবৃক্ষের কোলে বেদী বাঁধানো। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর হিমালয় পরিভ্রমণ কালে প্রত্যাদেশ পেয়ে এখানে আসেন এবং তাঁরই পরিচালনায় ও মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের চেষ্টায় এই তীর্থস্থানটি প্রতিষ্ঠালাভ করে। এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলমূর্তি স্থাপিত; তার সঙ্গে আছেন পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি। অনেকের ধারণা যুগলমূর্তিটি পাওয়া যায় মন্দিরসংলগ্ন কুন্ডটির তল থেকে। কুন্ডটি রেলিং দিয়ে ঘেরা। শোনা গেল, তিথি-মাহাত্ম্য অনুযায়ী এই কুন্ডের জল আপন বর্ণ পরিবর্তন করে। কখনও শাদা, কখনও বা লাল। মন্দিরের উত্তরপূর্বে একটি যাত্রীশালা। ক্ষীরভবানীর উত্তরে বিরাট পর্বতপ্রাকার।

আমাদের অপরাহ্ণকাল কেটে গেল সেদিন এখানে ওখানে। অনেক দেখা বাকি রয়ে গেল, অনেক দৃশ্য পিছনে প'ড়ে রইলো। এবার স্বর্গ থেকে বিদায় নেবার কাল উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীমতী গুপ্তা জানতেন, আমার এ যাত্রা সম্পূর্ণ হয়েছে। মুখ্য ছিল গুহাতীর্থ অমরনাথ, গৌণ ছিল এই যা কিছু দেখে বেড়াচ্ছি। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্বল্পকালের, এবং আমাদের গতি বিপরীতমুখী। হঠাৎ তিনি তাঁর সংসার তুলে দিলেন বন্যাপীড়িত হয়ে,—সে-বন্যা এখন আর নেই। কিন্তু সেই পরিত্যক্ত বাসভূমে তিনি আর ফিরতে চান না, এই আমার ধারণা। তাঁর

স্বামী আছেন অন্তত দুহাজার মাইল দূরে দক্ষিণ দেশে,—তাঁর সঙ্গে দেখা হতেও এখনও দুই তিন মাস বাকি। সুতরাং তাঁর সঠিক কর্মসূচী আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

হোটেল থেকে হিমাংশু চ'লে গেছেন হাউসবোটে, সুতরাং তাঁর ঘরটি আমার দখলে ছিল। রাত্রে খাবার টেবলে ব'সে মায়া বললেন, হোটেলের একটি ঘরে এভাবে আমাকে রেখে আপনার পক্ষে কি চ'লে যাওয়া সম্ভব? আমি যে সম্পূর্ণ একা প'ড়ে যাবো! বড়জেলার ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়াও আর চলে না।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। বললুম, আপনার স্বামীর চিঠি পাবার আগে শ্রীনগর ছেড়ে যাওয়া কি আপনার পক্ষে উচিত হবে?

কিছুক্ষণ তিনি ভাবলেন। পরে বললেন, ভয় পেয়ে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিলুম। দুর্ঘটনা না ঘটলে ওখানে একাই থাকতে পারতুম। কিন্তু আর ওখানে যাওয়া চলে না লজ্জার মাথা খেয়ে। আমার ভাসুর আছেন দিল্লীর লোদি কলোনিতে। ধরুন যদি দিল্লীতে আপনি আমাকে নামিয়ে দেন্?

চুপ ক'রে রইলুম। আমি যে কিছুদিন অবধি হিমাচল প্রদেশে ঘুরবো, একথা তাঁকে আগে জানিয়েছি। কিন্তু তাঁর ঘরকন্নার এমন বৈপ্লবিক বিপর্যয় ঘটবে, তিনি ভাবেননি। সন্দেহ নেই, উনি বিপন্না। পুনরায় তিনি বললেন, আজ সকালে গুপ্তসাহেবকে চিঠি দিয়েছি সব কথা জানিয়ে। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হবেন জানি, তবে আপনি আছেন শুনে তিনি আশ্বস্ত থাকবেন।

এক সময় তিনি হেসে উঠলেন, ধন্য অতিথি আপনি। বানের জলে ঘরকন্না ভেসে গেল! লেখককে দেখবার চেষ্টা এবার সার্থক হোলো।

কথাটা সত্য। আমিও হেসে ফেললুম। বললুম, দিল্লীতে কি আপনার খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দরকার?

শ্রীমতী বললেন, ভাসুরঠাকুরকেও চিঠি দিয়েছি। তিনিও ভাববেন বৈ কি। আপনি কি সত্যিই হিমাচল প্রদেশে যেতে চান্?

আমার প্রোগ্রাম তাই। ওদিকটা ঘুরে যাবো মনে করেছিলুম।

চলুন তবে, আমিও যাই। পথ থেকে চিঠি দেবো গুপ্তসাহেবকে।

কিন্তু আপনার মালপত্র?

যতটা পারি বিক্রি ক'রে যাবো। কিন্তু ভাবছি, আপনার কপালে এই ছিল। হিমাংশুবাবু ঠিক বলেছেন, যত গণ্ডগোল আপনার জীবনে ঘটে। এমন আতিথ্য নিলেন যে, খাওয়া জুটলো না। তা'র ওপর আবার পরের ঘরকন্না কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ফিরে গিয়ে এ গল্প সবাইকে না বলতে পারলে আমার চলবে না। সেদিন আপনি কোন্ মুখে ভাঁড়ারের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন? আপনি না অতিথি? কি করলেন সেগুলো?

হেসে বললুম, তা'রাও বানের জলে ভেসে গেছে!

তিনিও হেসে উঠলেন।

পরদিন হাউসবোটে গিয়ে হিমাংশুবাবুর নৌকাবাস দেখা গেল। একটি দিন কাটাবার পক্ষে বেশ ভালো। দূরে ও নিকটে পাহাড়, প্রাকৃতিক শোভা, ভাসমান দ্বীপ, শঙ্করাচার্যের মন্দির, হরিপর্বতের দুর্গ,—সব মিলিয়ে চমৎকার। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বসবাস ক্লান্তি আনে—এই আমার ধারণা। সেদিন হিমাংশুবাবু প্রচুর পরিমাণে অতিথিসৎকার করলেন, এবং আমরা 'শিকারায়' ঘুরে নিলুম। হাউসবোটের বন্দীদশার চেহারাটা আমার ভালো লাগেনি।

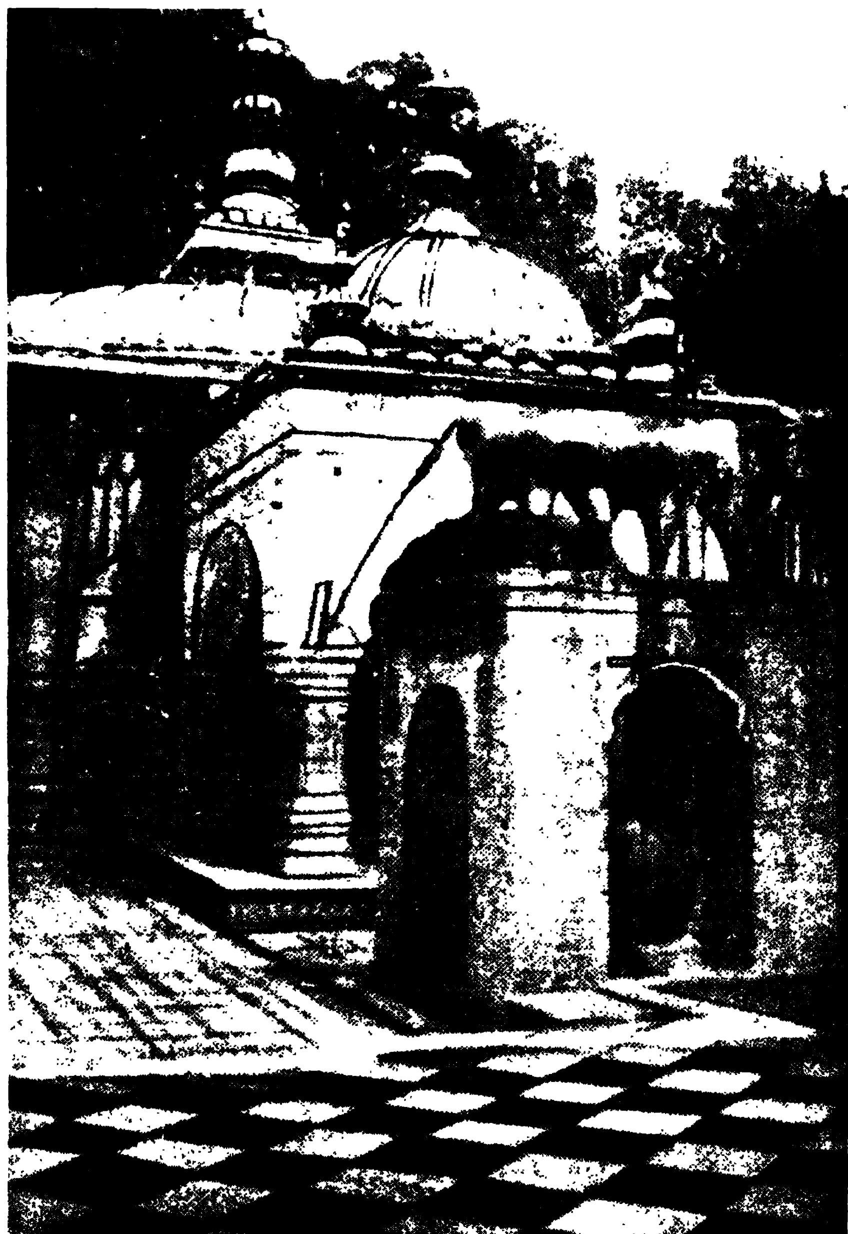
একদিন সন্ধ্যায় ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্কে চায়ের আমন্ত্রণ ছিল। কয়েকজন স্থানীয় বন্ধু সেখানে জড়ো হয়েছেন। মিঃ শরফ, শর্মা, ধার ইত্যাদি। সেখানে পাওয়া গেল দুজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে। একজন হলেন কাশ্মীর গভর্নমেণ্টেরই শিল্পবিভাগের পরিচালক, ডাঃ কানাই গাঙ্গুলি। ইনি আমার পুরাতন বন্ধু। তাঁকে পেয়ে কাশী ও কলকাতার পুরনো আড্ডার কথা উঠলো। তিনি যে এখানে আছেন জানা ছিল না, জানলে তাঁরই ওখানে হয়ত উঠতুম। অপরজন হলেন দামোদর-ভ্যালী-কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, শ্রী এস-মজুমদার, আই-সি-এস। এঁর অমায়িক মিষ্ট আলাপে সেদিন সকলেই আনন্দ পেয়েছিলুম। এঁরই ভগ্নী হলেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। শ্রীমতী মায়ার গল্প শুনে সেদিন দুঃখের মধ্যেও সবাই হাসছিলেন। পরে কানাইবাবু সেদিন সস্ত্রীক আমাদের হোটেলে এসে সুমধুর গল্পের আসর জমিয়ে তুললেন। ইম্পিরিয়ল্ ব্যাঙ্কের এজেণ্ট মিঃ রায়সহ চার পাঁচটির বেশি বাঙ্গালী পরিবার সেদিন কাশ্মীরে ছিল না। কোনও এক নিয়োগী পরিবার ওখানে আছেন, তাঁরা মোটর কলকব্জা ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

কানাইবাবু সস্ত্রীক বিদায় নেবার পর জিনিসপত্র গোছগাছ আরম্ভ হোলো। চললো অনেক রাত পর্যন্ত। পরদিন আমরা বিদায় নেবো।

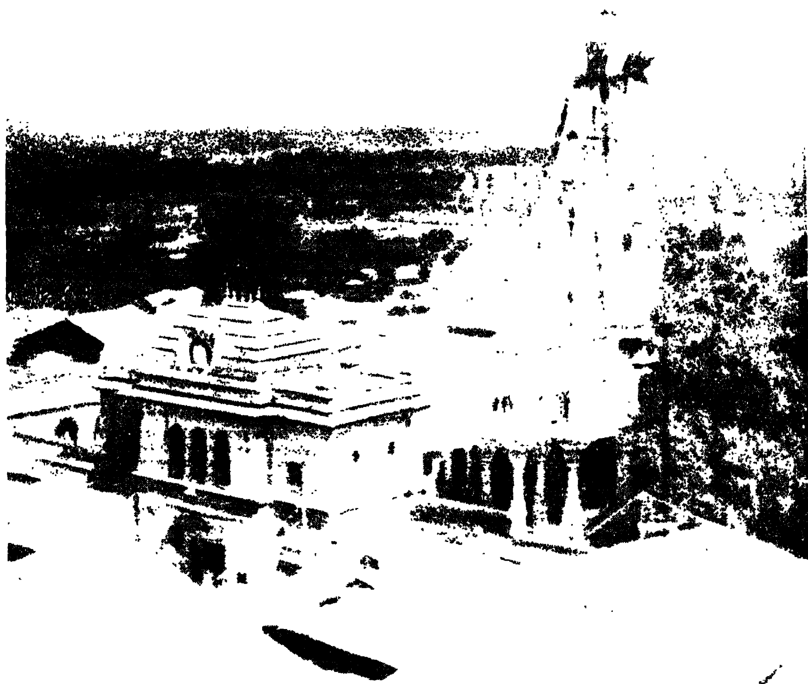
প্রভাতকালে এসে পৌঁছলেন হিমাংশু পূর্বব্যবস্থামতো। আমাদের দুর্যোগের বন্ধু। বন্যাত্রাণকালে জনৈক শ্রমিক হিমাংশুকে 'মহাত্মা' ব'লে সম্ভাষণ করেছিল। অসীম অধ্যবসায় সহকারে 'মহাত্মা' আমাদের উভয়ের বিপুল পরিমাণ লটবহর একটি ঠেলাগাড়ীর সাহায্যে নিয়ে চললেন বাস-ষ্ট্যাণ্ডের আপিসে। 'দিদি' ব'লে তিনি সম্ভাষণ করেছেন শ্রীমতী গুপ্তাকে, সুতরাং ভাইবোনে একটি বোঝাপড়া হয়ে গেছে। উভয়ে নমস্কার বিনিময় করলেন।

বিষণ্ণ হাস্যে শ্রীমতী গুপ্তা বিদায় নিলেন কাশ্মীরের কাছ থেকে। এক সপ্তাহ আগেও তিনি কল্পনা করেননি, বন্যার তাড়নায় তাঁকে সংসার তুলে দিতে হবে। আমরা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলুম, তিনি আবার ফ্ল্যাটে ফিরে যান্। কিন্তু একটি রাত্রির আতঙ্ক তিনি ভুলতে পারেননি। একথা জানতুম কাশ্মীর ছাড়তে তাঁর আঘাত লেগেছিল।

গাড়ী ছেড়ে দিল। আজ রাত্রে পৌঁছবো জম্মুতে। শ্রীমতী গুপ্তা এবার গুছিয়ে তাঁর সীটে বসলেন।—









কার্ডুর [illegible] একটি মন্দির [illegible]

আকার ও আয়তন সৃষ্টি করেছে। [illegible]

॥ ২ ॥

পীরপাঞ্জালের নীচে নীচে পথ। পথের নানা শিরা-উপশিরা, নানান্ শাখা-প্রশাখা। এ গিরিশ্রেণীর মৎপ্রকৃতি বড় কোমল,—মাটির মোহমদির গন্ধে বিবশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে বিবিধ বর্ণের পুষ্পসম্ভার। ওরা তৃণশয্যার নধর কোল পেয়ে আর জেগে থাকতে পারেনি। রঙগীন প্রজাপতি আর পতঙ্গরা প্রলাপগুঞ্জন ক'রে চলেছে ওদের কানে কানে।

পীরপাঞ্জাল এত নরম ব'লেই পা পুঁতে গিয়েছিল অনেকের। তা'রা কেউ ইন্দো-ব্যাক্‌টিরিয়, কেউ বা ইন্দো-পার্থিয়। তারপর মার-মার শব্দে এসেছে শক-হুন-তাতার, এসেছে খোটানি-ইয়ারকন্দি, উজবেকি আর কাজাক, এসেছে তুর্কি-আফগান রক্তমাখা অস্ত্র হাতে নিয়ে,—কিন্তু এই পীরপাঞ্জালে তাদের বিজয়রথের চাকা গিয়েছে ব'সে। তা'রা কেউ নেই আজ। সর্বগ্রাসী রাহু তাদের গিলেছে। সেই রাহু হোলো ভারতের চিরকালীন সংস্কৃতি। সেই রাহু আজও গিলছে একে একে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশীবাদ, ফাসিস্তবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ,—এদের ধাক্কায় ভারত সভ্যতার একখানি ইঁটও খসেনি! মোগলরা গেছে একশো বছর এখনও হয়নি, ইংরেজ গেল এই সেদিন,—মাথা ঠুকে গেল সবাই একে একে। কেউ সমাধিলাভ করলো মাটির তলায়, কেউ বা পালিয়ে বাঁচলো। শক্ত ধাতু আসে বাইরের থেকে, কিন্তু এখানে এসে তা'রা গ'লে যায়। এবার সাম্যবাদের পালা। অধিকাংশ পৃথিবী যার ভয়ে কম্পমান,—ভারতের মাটিতে হয়ত তা'র এবার সমাধিলাভ ঘটবে। এরই মধ্যে 'পঞ্চশিলায়' মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা হচ্ছে সাম্যবাদ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' পথ ভুলে যদি কেউ এসে পেঁছিয়, তা'র আর রক্ষা নেই। পীরপাঞ্জাল তা'র সকলের বড় সাক্ষ্য।

উপরে হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম, নীচের দিকে পীরপাঞ্জাল [illegible] জাস্কার,—এই দুইয়ের মাঝখানে ভূস্বর্গ যেন মদালসা বিবশা দেহের বি[illegible]লতা নিয়ে শয়ান—সাংঘাতিক প্রলোভনের মতো। ডাক দিচ্ছে সবাইকে ডা[illegible]নীর মন্ত্রে। তার ফলে পতঙ্গের দল এসেছে যুগে যুগে, কিন্তু পুড়ে খাব[illegible] গেছে। এই মহাশ্মশান পীরপাঞ্জাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে সেই অগ[illegible] একটির পর একটি। অভিশপ্তা কাশ্মীর,—এর ওপর লোভের হাত বাড়িয়েছে, তা'রা কেউ বাঁচেনি। চতুর ইংরেজও একদা ভয় পেয়ে একটু [illegible] দাঁড়িয়েছিল, এবং রণজিৎ সিংয়ের হাত থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিয়ে সে মহারাজা গুলাবসিংকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি ক'রে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

যেদিকেই তাকাই, শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের স্বভাব আবহমান কাল থেকে। লোভ নয়, আসক্তি নয়, ধ্বংস ও দস্যুতা নয়, সবাই এখানে এসে [illegible] নিয়ে ব'সে যাও তপোবনের নিভৃত শান্তিতে, এখনো হোমকুণ্ড জ্বালিয়ে ওঁংকারধ্বনি উঠছে অবিরাম। এখানকার গবেষণাগারে চলছে সকল দর্শনশাস্ত্রের পরীক্ষা। বৈদিক, বেদান্তীয়, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, জৈন, খৃষ্টীয়, জরোথ্রীয়, কনফুসীয়, ইসলামীয়,—কেউ বাদ যায়নি। দিব্যজ্ঞানের মহা পরীক্ষায় ভারতই হোলো পথ-নির্দেশক। এখানে এসে শুধু জেনে যাও জীবনের ব্যাখ্যা, সত্যের ভাষ্য, ধর্মের নিহিতার্থ।

ভাবতে ভাবতে পথ পেরিয়ে এসেছি অনেক দূর। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আর অপরাহ্ণ ছাড়িয়ে সন্ধ্যার পরে গাড়ী এসে পৌঁছলো জম্মুতে। গাড়ী থেকে নেমে এসে জম্মুর যাত্রীশালায় আমাদের পুরনো বন্ধু মদনলালের সঙ্গে হঠাৎ আবার দেখা হয়ে গেল।

শ্রীমতী মায়া কোন্ সময়ে যেন ওদেরকে আবিষ্কার করলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সহাস্য তর্ক চলতে লাগলো অনেকক্ষণ।

মদনলালের সঙ্গে রয়েছে তা'র তরুণী স্ত্রী সৎবতী, এবং সেই কচি শিশু-কন্যাটি। ছেলেটার অধ্যবসায় অদম্য, কিন্তু তা'র অসমসাহসিকতা দেখে আমি রাগ করেছিলুম। ওই ছয় মাসের শিশুকে নিয়ে মদনলাল গিয়েছিল অমর-নাথে। তিন সপ্তাহ আগে ওদের সঙ্গে আমার আলাপ, কিন্তু শ্রীমতী গুপ্তার সঙ্গে ওদের পরিচয় কয়েক মাস আগে,—ওরা পহলগাঁওয়ে ছিল সবাই একত্রে। আমি বাইরের লোক।

যাত্রীশালা অন্ধকার, সুতরাং মোমবাতিতেই কাজ চালাতে হচ্ছে। নীচে হোটেল আছে, সুতরাং আমরা কেউ অগাধ জলে পড়িনি। বিস্ময়ের কথা এই, হোটেলের প্রায় প্রত্যেকটি লোক শ্রীমতী গুপ্তার সঙ্গে পরিচিত। স্বামীর সঙ্গে বারম্বার দিল্লী-শ্রীনগর আনাগোনার কালে জম্মুতে একদিন কাটাতেই হয়, সেই সূত্রেই এই ঘনিষ্ঠতা। মদনলাল এবং সৎবতীকে দেখে তিনি একেবারে নেচে উঠলেন। শ্রীনগর অঞ্চলে বন্যার ধাক্কায় তাঁর সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, এবং আসবার পথে সারাদিন তাঁর মুখে চোখে বিষণ্ণতা ছিল—যেটি আমার কাছে ধরা দেননি। এবার সৎবতী আর মদনলালকে দেখে তাঁর মঘ কাটলো। ওদের দুজনকে সঙ্গে ক'রে তিনি আমার কাছে এনে হাজির করলেন।

মদনলালের পরণে সেই ময়লা পায়জামা, কিন্তু সৎবতী পরেছে নতুন রেশমী শালোয়ার। মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছে। মদনলাল এসে একেবারে পা মুড়ে কাছে বসলো। বললে, আভি তক্ কসর মাপ কিয়া কি নহি কহিয়ে, দাদাজি!

ওর সঙ্গে আবার সৎবতী যুগিয়ে দিল, বহেনকে উপর বহৎ সা তাং কিয়া আপনে, দাদাজি!

হাসিমুখে বলতে হোলো, তোমাদের পাগলামির জন্যে রাগ করেছিলুম। ওই কচি মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলে অমরনাথে! ভয় ছিল না? তুমি না ওর মা?

মায়া বললেন, সত্যি, তোরা ভারি অন্যায় করেছিলি!

ওদের গল্পগুজব আরম্ভ হয়ে গেল বারান্দায়। রাত ন'টা বেজে গেছে। কিন্তু ওরই মধ্যে মদনলাল ছুটে গিয়ে এক পুরুয়া চা এনে হাজির করলো। ওর মধ্যেই সে পাত্র যোগাড় ক'রে খাবার জল এনে রাখলো। জম্মুতে বড় গুমোট,—রাত্রে স্নান না ক'রে উপায় নেই।

সৎবতী বললে, বাচ্চাটাকে পাহারা দিয়ে এতদূর এনেছিলুম, কিন্তু জম্মুতে এসে ওর বমি আরম্ভ হোলো। এখন একটু ঘুমিয়েছে।

বাচ্চাটাকে দেখতে গেলুম ওমহলের একটি ঘরে। ভিতরে একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে রয়েছে যেমন তেমন বিছানায়।

সৎবতী বললে, আমরা দুদিন আছি এখানে। কাল চ'লে যাবো।

বললুম, ভালোই হোলো। তোমরা শ্রীমতী গুপ্তাকে নামিয়ে দিয়ে যেয়ো দিল্লীতে। কাল পাঠানকোট থেকে টিকিট কিনে দেবো। আমি যাবো কাংড়ার ওদিকে। তারপর হিমাচল প্রদেশ।

স্বামীস্ত্রী দুজনেই হেসে উঠলো। বললে, তাজ্জব! আমরাও যে যাবো কাংড়া আর কুলুতে! আমরা ওই দেশের লোক, ওখানে আমাদের আদি বাড়ী।

শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, আপনারা দেখছি দলে ভারি হলেন। আমারই বা সখ নেই কেন? আমিই কোন্ কম?

সৎবতী বললে, তোমার স্বামী যদি এখবর শুনে রাগ করেন? আগে তাঁর অনুমতি আনিয়ে নাও?

অন্ধকারে শ্রীমতীর মুখখানা ঠিক দেখা গেল না। একটু ক্ষুণ্ণকণ্ঠেই তিনি বললেন, স্বামীকে যারা চেনে না, তারাই স্বামীকে ভয় পায়। আমার স্বামী হলেন সদাশিব।

মদনলাল ব'লে বসলো, বহুৎ দিককৎ! স্বামীর কথা উঠলে আর রক্ষা নেই। এখন কি করতে চাও তাই বলো।

মায়া এবার হাসলেন। বললেন, সঙ্গে সঙ্গে যাবো, নৈলে এত লটবহর একা সামলাবো কেমন ক'রে? একা যাইনি কখনো। ঘরদোর ভাসিয়ে লেখকের সঙ্গ ধরেছি, দেখি না ওঁর দৌড় কতদূর! ভাসুরের ওখানে তুলে দিয়ে তবে ওর ছুটি।

স্বামীস্ত্রী একেবারে হেসে লুটোপুটি। মাঝরাত্রি পর্যন্ত সৎবতী আর শ্রীমতী গুপ্তার কলকণ্ঠ থামতে চাইলো না। তার পরে তরুণ মদনলাল গান

ধ'রে দিল খাটিয়ায় প'ড়ে প'ড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাচ্চা মেয়েটাকে এনে শোওয়ালো কাছাকাছি। ছেলেটা যেন জন্তুর মতো পরিশ্রম করে।

কাল আবার সকলের নতুন পথে যাত্রা।

পাঠানকোট থেকে রেলপথ চ'লে গেছে যোগিন্দর নগরের দিকে অনেক দূর। এটি হিমালয়ের প্রশাখাপথ,—ছোট ছোট পাহাড়ের অধিত্যকার ভিতর দিয়ে রেলপথ গেছে। প্রথম অংশটা সমতল, তারপর লুপ-এর জটিলতা আরম্ভ হয়েছে।

রৌদ্রদীপ্ত প্রখর মধ্যাহ্ন। আমাদের বসনে-ভূষণে লেগেছে পথের ধূলি-ধূসরতা এবং ক্লান্তি। ওরই মধ্যে এক সময় প্রচুর পরিমাণ লটবহর গচ্ছিত রাখতে হোলো পাঠানকোট ষ্টেশনের ক্লোকরুমে। আহারাদি যেমন তেমন। অতঃপর মধ্যাহ্নে গাড়ী ছাড়লো। অজস্র ভোজ্যবস্তু ও মেওয়াফল জোগাড় করেছে নিত্য উৎফুল্ল মদনলাল। আমার জন্য এনেছে ধূমপানের ব্যবস্থা। এদিকে সৎবতী ও মায়া বসেছেন একরাশি আখরোট আর 'বাগুগোসা' নিয়ে,—ওদিকে মদনলাল সকলের স্বাচ্ছন্দ্যসৃষ্টির জন্য ব্যস্ত। শিশুটি আছে দুই নারীর মাঝখানে,—আজ সে সুস্থ। ওরা ঠাণ্ডা সইতে পারে অনেক, কিন্তু গরমে কষ্ট পায়। মদনলালের পিতা হোলো বুঝি লুধিয়ানার এক রেশম ব্যবসায়ী,—মস্ত শেঠ। ছেলেটি অবাধ্য। বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশের সর্বত্র। বাপের কাজকারবারে ওর মন নেই। ছোট লাইনের গাড়ী চলেছে ধীর গতিতে। পাহাড়তলীর গরমে গুমোট দেখা দিয়েছে প্রখর রৌদ্রে।

ছোট ছোট বনময় পাহাড়ের চূড়ার বাইরে আর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। অনেকটা যেন নীচের দিকে প'ড়ে গেছি। মাইল পঁচিশেক পেরিয়ে পথ সংকীর্ণ হয়ে আসে। তবু পাহাড়তলীর খেতখামার নীলাভ আস্তরণ পেতেছে এখানে ওখানে। অপরাহ্ণ গড়িয়ে যাবার পর গাড়ী এসে পৌঁছলো জ্বালামুখী রোড ষ্টেশনে। এইখানে আমরা এ যাত্রায় রেলপথকে ছেড়ে দিলুম।

এ অঞ্চল পাঞ্জাবের মধ্যে। কিন্তু এর ভৌগোলিক সীমা বড় জটিল। কাংড়ার উত্তরে হিমাচল প্রদেশ, কুলুর উত্তরে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ। শিমলা অঞ্চল পাঞ্জাবে অথবা হিমাচলে,—আজও স্থির হয়নি। যেমন ধরো ডালহাউসী। সবাই জানে, চাম্বার মধ্যে ডালহাউসী,—কিন্তু এই শৈলশহরটি পাঞ্জাবের শাসনাধীন। পেপসু, হিমাচল, কাংড়া, কুলু, চাম্বা,—এদের পরস্পর-পৃথক মানচিত্র ছাড়া এদের সীমানা বোঝবার উপায় নেই।

ষ্টেশন থেকে জ্বালামুখী গ্রাম তেরো মাইল পথ। পথ নিরিবিলি। উঁচু-নীচু খোয়ার রাস্তা সঙ্কীর্ণ। এটা পাঞ্জাব, কিন্তু জনসাধারণ 'পাঞ্জাবী' নয়। মেয়েদের কপালে সিঁদুর, পুরুষের মাথায় লাল পাগড়ী। এরা জাতিতে শাক্ত।

কুলুতেও এই, মণ্ডিতেও এই। পাঁচ ছয় শো বছর আগে পূর্বরাজপুতনা, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে রাজনীতিক ভাঙন ধরেছিল। তাতার, পাঠান আর মোগল,—এরা রাজপুতগণকে মাতৃভূমিতে স্থির থাকতে দেয়নি। তাই ওরা আপন সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে আসে হিমালয়ের আনাচে কানাচে। হিমালয়ের আদিবাসী মহলে তখন ঠিক কি প্রকার চেহারা ছিল জানা যায় না। কিন্তু এই শত সহস্র রাজপুত পরিবার হিমালয়ের বহু অঞ্চলে গিয়ে আপন আপন সমাজ সৃষ্টি করে, এবং রাজ্যপাট বসায়। পেপসু হোলো প্রকৃত পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ হোলো প্রকৃত রাজপুত। এদেরই অংশ আবার ছড়িয়ে পড়েছে কুমায়ুনে আর নেপালে। কাংড়ায় এসে দাঁড়ালে মনে পড়বে পার্বত্য উত্তরবঙ্গ কিংবা আসামের উপত্যকা। সেই মন্দির, সেই শক্তি-পূজা, সেই শিবের আর ভৈরবের আরাধনা, সেই মেয়েদের কপালে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা-নোয়া!

মাত্র তেরো মাইল পথ। কিন্তু বট আর অশ্বত্থের এমন সশ্রদ্ধ পূজো আগে দেখিনি। প্রতি বটের নীচে দেবস্থান, প্রতি অশ্বত্থের নীচে শিব। অতি যত্ন, অতিশয় পরিপাটি। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু কী শান্ত। রানিতালের ছোট্ট একটি হাট,—তাইতেই স্থানীয় লোকরা খুশী। বেশী চায় না, উচ্চাভিলাষী নয়, বিরোধ কোথাও নেই,—প্রাচীনের হাওয়া বইছে পাহাড়ী প্রান্তরের নীচে, আর শস্যক্ষেত্রের উপান্তবর্তী সরোবরে। পশ্চিম আকাশে রৌদ্র ম্লান হয়ে এসেছে।

আমাদের মোটর বাস মাড়োয়ারি ধর্মশালার প্রাঙ্গণে এসে থামলো। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্বালামুখীর 'কালীধর' পাহাড়,—ভারতের অন্যতম প্রধান পীঠস্থান। আশে পাশে সামান্য কয়েকটি দোকান, দুচার ঘর বস্তি। এদিকটা নিরি-বিলি। গাড়ী থামতেই পাণ্ডা এসে দাঁড়ালো। এদিকটা নাকি শহরের বাইরে,—মন্দিরের ওদিকে না গেলে জনসমারোহ পাওয়া যাবে না। মায়া ধ'রে বসলেন, তিনি থাকবেন শহরের মধ্যে; সকলের আগে তিনি ধুলো পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করবেন। এদিকে কিচ্ছু পাওয়া যায় না।

পাণ্ডা এইটিই চেয়েছিল। সে সোৎসাহে নিজেরই উদ্যোগে কুলির সাহায্যে জিনিসপত্র নিয়ে অগ্রসর হোলো। মদনলাল আর সৎবতী সামনের ধর্মশালার নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে ধাবমান হোলো না। কথা রইলো, ওরাও আধ ঘণ্টার মধ্যে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হবে। বাচ্চাটা এখানে এসে গরমে-গুমোটে আবার কান্নাকাটি লাগিয়েছে।

ঠিক সুনির্দিষ্ট একটা আশ্রয়ের দিকে দুজনে অগ্রসর হচ্ছিলুম এমন কথা বলতে পারবো না। আমার আশঙ্কা ছিল, অপরিচিত পাণ্ডার কুক্ষিগত না হই। কারণ এসব স্বার্থের ক্ষেত্রে নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে। কিন্তু মুস্কিল এই, আমি ঠিক পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী নই। আবার এও অসুবিধা,

সঙ্গী হিসাবে আমি একটু বেমানান। শ্রীমতী মায়ার চেহারায় ও পরিচ্ছদে কিছু অতি আধুনিকতা বর্তমান,—চট ক'রে যেখানে সেখানে তাঁর পক্ষে গিয়ে ওঠা অসুবিধাজনক। পাণ্ডা চললো পথ দেখিয়ে। আন্দাজ আধ মাইল দূরে পাহাড়ের নীচে একটি ক্ষুদ্র জনপদ,—বাজারের ভিতর দিয়ে আমরা এক সময় এসে পেঁছিলুম এক গোলকধাঁধাঁর মধ্যে। এইটি পাণ্ডার বসতবাটী। যা ভেবেছিলুম তাই। অন্যের মুখ চেয়ে এখানে থাকা ভিন্ন গতি নেই। চারিদিক শুকনো, কোথাও জল নেই। অতি পুরনো ঘর-দোর,—আগল নেই, আব্রু নেই, আয়ত্তের মধ্যে কিছু নেই। সামনের উঠোনে ব'সে একজন স্ত্রীলোক—সম্ভবত বাড়ীর গৃহিণী,—কি যেন শেলাই করছিলেন। বাড়ীর উত্তর ও পূর্বাংশটা যেন সুড়ঙ্গের মতো। পিছনে সরু ছায়াচ্ছন্ন পথ।

জিনিসপত্র একটি ঘরে রেখে আমরা মন্দিরের দিকে চড়াইপথে অভিযান করলুম। 'কালীধর' পাহাড়ের উপরে মন্দির। ওখানে আছেন দেবী অম্বিকা এবং উন্মত্ত ভৈরব।

দক্ষযজ্ঞের বিপর্যয়ের পর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে এ পথেও এসেছেন দেবাদিদেব শিব। বিষ্ণুচক্রের আঘাতে সতীর জিহ্বা এখানে খসে পড়ে। সেই জিহ্বা আজও জ্বলছে জ্বালামুখীর পাহাড়ের কয়েকটি ছিদ্রে এবং কুণ্ডের মধ্যে। ছোটবেলায় মায়ের মুখে শুনেছিলুম গল্প। কিন্তু স্ত্রীলোকের জিহ্বায় যে এত আগুন জমা থাকে তা জানতুম না!

সরু একটি চড়াইপথ ধ'রে পাহাড়ের উপরে মন্দিরের অঙ্গনে উঠে এলুম। সূর্যাস্ত হয়নি, রাঙ্গা রৌদ্র এসে পড়েছে মন্দিরে। মন্দিরের পারিপার্শ্বিক প্রাচীন নয়, সর্বত্রই নবনির্মাণের চিহ্ন রয়েছে। কিন্তু যেটি মূল মন্দির, সেটি অনেক-কালের,—তা'র অনেক ইতিহাস। কাছেই একটি গুহার মধ্যে ঝরণার স্বচ্ছ জল একটি কুণ্ড রচনা করেছে। রাজগৃহ কুণ্ডের কথাটা মনে প'ড়ে যায়। কুণ্ড পেরিয়ে অগ্রসর হলেই মূল মন্দিরের প্রবেশ দ্বার। এটিও গুহালোক এবং তারই মধ্যে পীঠস্থান। দেওয়ালে ছোট ছোট গর্ত,—এক একটিতে অগ্নিশিখা জ্বলছে। একটি দুটি নয়, অনেকগুলি। এখানে ওখানে এবং আরেকটি সুড়ঙ্গে কয়েকটি শিখা জ্বলছে। ভিতরের আবহাওয়াটি পবিত্র, এবং সন্দেহ নেই—একটি রহস্য অনুভূতি আনে। দেখতে পাচ্ছি সমগ্র পাহাড়টি অন্তরে-অন্তরে ধাতবপদার্থে পরিপূর্ণ। গন্ধক, খড়িপাথর, ফসফোরাস,—এবং বিশ্বাস করি, আরও নানারকম ধাতব পদার্থ রয়েছে এর পাথর আর মাটির ভিতরে-ভিতরে। আমাদের দেশে আগ্নেয়গিরি নেই। কিন্তু অনেক পাহাড়ে তা'র উপাদানের অভাবও নেই। বদরিকাশ্রমে, গৌরীকুণ্ডে, রাজগৃহে, এবং আরও বহু জায়গায় অতি উত্তপ্ত ঝরণা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের সুড়ঙ্গলোক থেকে। কোথাও না কোথাও ধকধক ক'রে আগুন জ্বলছে পাথরের গভীর অভ্যন্তরে,—কেউ তা'র খোঁজ রাখে না।

একটি শিখা হাত দিয়ে নিভিয়ে দিলুম। কিন্তু ভিতরে-নীচে বিপাশার সঞ্চিত রয়েছে, তখন সেই শিখা আবার জ্বলবে। বাইরের দিগ্ গিরিশ্রেণীর আরেকটি জলকুণ্ডের মধ্যে পান্ডা কি যেন নিক্ষেপ করতেই দপ ্কে 'আঘার' মধ্যে একটি শিখা জ্বলে উঠলো। এটি কৌতুকজনক। ঠিক পেট্রছড়ে বন্য আগুন লাগে, এও তেমনি। ওটার মধ্যে শ্রীমতী গুপ্তা ছেলেমানুষেয়রতের একটা নতুন কৌতুক পেয়ে গেলে়া। তিনি বারম্বার শিখাটা জ্বালিয়ে দেক্ষিণ 'র লাগলেন।

বাইরে পাহাড়ের রেখা চ'লে গেছে দূরদূরান্তর পর্যন্ত। দক্ষিণে অস্পষ্ট সমতল, তা'র পরে বিপাশা নদী চলে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ভালো লাগছে এই অপরিচিত পৃথিবী,—এরা হিমালয়ের সর্বশেষ নিম্নস্তর। এরা হোলো তোরণ দ্বার, এখান থেকে যাত্রা সুরু। উত্তরে রয়েছে বিশাল ধওলাধার পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে বিপাশার পরপার থেকে সোলাসিঙ্গ অর্থাৎ শূলশৃঙ্গ গিরিমালা। এই দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যভাগ দিয়ে চলেছে বন্য বিপাশা। তা'র উত্তর ভূভাগ হোলো কাংড়া উপত্যকা এবং দক্ষিণ ভূভাগটি সুবিশাল পার্বত্য মণ্ডিরাজ্য। উত্তর থেকে দক্ষিণপূর্বে শূলশৃঙ্গ গিরিশ্রেণী এক সময় বিলাস-পুর রাজ্যকে নানাদিকে বেষ্টন করেছে।

মন্দিরের অঙ্গনটি অতি পরিচ্ছন্ন আধুনিক। এক পাশে পান্ডাদের গদি, সেখানে পুণ্যকামীরা শ্রাদ্ধতর্পণের ব্যবস্থাদি করে। ওটা ব্যবসায়, ওটায় রস পাইনে। সমগ্র মন্দির অঞ্চল তন্ন তন্ন ক'রে দেখতে সময় গেল। সন্ধ্যা আসন্ন।

কিছু দুশ্চিন্তা ফুটেছিল শ্রীমতী গুপ্তার চোখে মুখে। এতক্ষণ তিনিই সমস্ত ব্যাপারটা পরিচালনা করছিলেন, তাঁর হাতেই হাল ধরা ছিল। এবার বললেন, চলুন, ধর্মশালাতেই ফিরে যাই, পান্ডার এখানে থেকে কাজ নেই। ওর হাতের মধ্যে থাকতে চাইনে। তাছাড়া নানা অসুবিধেও রয়েছে দেখছি।

কিছু পূজা দিতে হোলো বৈ কি। তবে প্রণামীটা এখন বাকি রইলো। পান্ডার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না বটে, তবে অল্পে মুক্তি পাওয়া যেতো না এখানে থাকলে। জিনিসপত্র পুনরায় নিয়ে পথে নেমে এসে কতকটা যেন স্বস্তি পাওয়া গেল। সন্ধ্যার পরে আমরা আবার এসে উঠলুম ধর্মশালায়। অধ্যবসায়ী মদনলাল সেখানে সংবতীকে নিয়ে দিব্য অস্থায়ী ঘরকন্না পেতে বসেছে। বাচ্চাটাকে সুস্থ ক'রে শুইয়েছে দোতলার বারান্দায়। ওরা আগামী কাল প্রাতে যাবে মন্দিরে। আমাদের দেখে সংবতী একেবারে নেচে উঠলো।

মস্ত বাড়ী। নীচে ওপরে দরদালান। ঘরের পর ঘর। অনেক যাত্রী এসেছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের। নীচের তলায় তাদের কলরব চলছে। স্নানের জল পেয়ে আমরা বাঁচলুম। পথের পাশেই দুএকটি ভোজনাগার, সেখানে যেমন-তেমন আহারাদির ব্যবস্থা। ক্ষুধার উগ্রতা থাকলে যে কোনও খাদ্যই

সঙ্গী হিসাবে ভোজ্য ব্যবস্থার দারিদ্র্য দেখে শ্রীমতী গুপ্তা হেসেই খুন।
কিছু অতি নি বললেন, ভয়ে-ভয়ে বলি, শ্রীনগরে আপনি যে আলুকপির
ওঠা অসুবি যা করেছিলেন, সেটি খুব ভালো হয়নি!
পাহাড়ের জটা বোধ করি ভালো ছিল না। ফস ক'রে ব'লে ফেললুম, এখানকার
এসে ধ আলুর ঘাঁটের তুলনায় সেটা কি এতই মন্দ ছিল?
ভে তিনি হেসে উঠলেন। সংবতী এসে যোগ দিল, এলো মদনলাল। ওরা
গাগ্রাসে খেলো সবাই। মদনলাল ওর মধ্যে জোগাড় ক'রে এনেছে দুধ আর আপেল! কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বাচ্চাকে একা শুইয়ে এসেছে দোতলার একটি ঘরে। হারিকেন জেবলে রেখে এসেছে। এবার ফিরতে হবে।

স্নানাহার সেরে উপরে যেতে রাত দশটা বেজে গেল।

মদনলালের উৎসাহ অপরিসীম। কথায় কথায় ধমক খাচ্ছে স্ত্রীর কাছে, ওকে নিয়ে কৌতুক করছি আমরা সবাই, কিন্তু মদনলাল অদম্য। কাজ কেড়ে নিচ্ছে সকলের হাত থেকে,—নিজে করবে সব। আরও বিপদ, ওর মধ্যেই গান গাইবে। কবে শ্রীরাধা যমুনায় কলস নিয়ে জল ভরতে গিয়েছিলেন, তা'র জন্য মদনলালের মাথায় কী যন্ত্রণা! সংবতী রাগে একেবারে আগুন, মায়াদেবী হেসে লুটোপুটি। এক সময় যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন সংবতীর ধৈর্য ধারালো। চেঁচিয়ে বললে, ডান্ডাসে তেরি রাধেকো গাগরা ম্যায়নে তোড় দুঙ্গা!

মদন ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, দেখিয়ে দাদাজি, মেরা বিবিভি নাস্তিক বন্ গই!—আমাদের উচ্চকণ্ঠ হাসি আর বাধা মানলো না।

মদনলাল বিছানা পেতে দিচ্ছে সকলের। জল এনে দিচ্ছে সকলের হাতে। এমন কি সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য সে আমার বিছানার পাশে একটি 'কটোরা'ও এনে রেখেছে। বাচ্চা কেঁদে উঠলো ওরই মধ্যে বার দুই, মদনলাল তা'কে শান্ত ক'রে আবার শোওয়ালো।

বারান্দা আর ঘর মিলিয়ে বিছানা পড়েছে সকলের। এটা যাত্রীশালা, পদে পদে সমাজ-ব্যবস্থার শৈথিল্য ঘটে। তবু এর আভিজাত্য কম নয়। দোতলা পাকাবাড়ী পাহাড়ী দেশে, সুযোগ সুবিধা প্রচুর। অনেককালে অনেকবার কেটেছে পার্বত্য চটির ধারে, অনেক অযত্নে, অনেক ধূলিধূসর আনাচে কানাচে। এখানে চমৎকার। সামনে বারান্দার বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে বিশালকায়া দানবীর মতো জ্বালামুখীর অচল আয়তন, তার উপরে জ্বলছে একটি জ্যোতিষ্ক। চুপ ক'রে আছি আকাশের দিকে চেয়ে। সহযাত্রীদের আর কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ করি ঘুমিয়েছে সবাই।

অরণ্যসমাকীর্ণ কাংড়া উপত্যকার একটি অংশ হোলো জ্বালামুখী অঞ্চল। অতি ক্ষুদ্র এই জনপদটি গ'ড়ে উঠেছে তীর্থমন্দিরটিকে কেন্দ্র ক'রে। এর বাইরে বনময় চাষী-বসতি। এই অরণ্যলোকের কোনও নির্দিষ্ট সীমানা এদিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভীষণতায় জনশূন্যতায় এই অরণ্য প্রসিদ্ধ। হিংস্র

শ্বাপদের অবাধ চলাফেরার পথ চ'লে গিয়েছে পাহাড়ের নীচে-নীচে বিপাশার তীরে-তীরে,—মণ্ডি আর বিলাসপুর রাজ্যে। পশ্চিমে শুলশৃঙ্গ গিরিশ্রেণীর ভয়াল অরণ্যলোক, দক্ষিণে চ'লে গেছে হামিরপুরের পথ, সেখান থেকে 'আঘার' এবং অতঃপর সুন্দরনগর রাজ্যের শেষ সীমানা,—যেখানে বিলাসপুর ছেড়ে বন্য শতদ্রু শুলশৃঙ্গের দক্ষিণে এসে মিলেছে। এ হোলো অখণ্ড অবিভক্ত ভারতের হিমালয়ের সেই দুই হাজার মাইলব্যাপী তরাই অঞ্চল,—হিন্দুকুশের দক্ষিণ থেকে যার আরম্ভ, আসামসীমান্তের পূর্বাঞ্চলে, ব্রহ্মদেশ ও চীনসীমানায় যার শেষ। এখানে কেবল এই নিঃসঙ্গ বিজন অরণ্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অম্বিকা,—যিনি দুর্গা,—মহাচণ্ডী, যিনি অস্ত্রধারণ ক'রে রয়েছেন অসুরনাশনের,—শত্রু-হননে যাঁর দয়া নেই, ক্ষমা নেই, কৃপা নেই, মোহকজ্জল নেই। ওই অন্ধকার 'কালীধর' পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে তিনি ডাক দিচ্ছেন মহা-ভারতকে যুগ থেকে যুগান্তরে। সভ্যতার যজ্ঞ যারা পণ্ড করতে এসেছে, যারা ভারতের জ্ঞানসংস্কারকে কলুষিত করতে চেয়েছে, তপোবনের দর্শনতত্ত্ব-সাধনাকে যারা ইতিহাসের পর্বে-পর্বে হিংস্রতার দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা পেয়েছে, ঐতিহ্যের অমৃতস্বভাবকে যারা আক্রমণ করেছে বারম্বার,—মহাচণ্ডী ডাক দিচ্ছেন যেন এখান থেকে,—তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করো! দৈব-অহিংসাবাদের উপরে দাঁড়াও,—হিংস্রতাকে হনন করো। সেই হবে তোমার সভ্যতার রাজসূয় যজ্ঞ, সেই হবে কল্যাণব্রতের শেষ বাণী। সংহারসাধিকা সেই দেবী অম্বিকার রণ-পিপাসা নিয়ে যিনি এই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের চূড়ায়-চূড়ায় ফিরছেন, তিনি এখানে শিব নন্, সর্বমঙ্গলার কল্যাণের প্রতীক্ নন্,—তিনি উন্মত্ত ভৈরব; তিনি দেবাদিদেব নন্, মহারুদ্র; তিনি রুদ্রাণীর অমাকুন্তলরাশির সঙ্গে মিলিয়েছেন আপন মহাজটা ওই অরণ্যে-অরণ্যে। এখানেও শিব ও শক্তির প্রকাশ।

তন্দ্রাজড়ানো এক প্রকার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম আকাশের ওই জ্বলজ্বলে বড় তারাটার দিকে—সম্মুখের কালীধর পাহাড়ের চূড়ায় যেটা জ্বলছে। সম্ভবত আমি জীবিত নই, চোখ দুটোর মৃত্যু ঘটে গেছে। ইচ্ছার আকারে দেহ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে প্রাণ,—আত্মার অশ্রান্ত ভ্রমণ-পিপাসা নিয়ে; নীলপদ্মের বিশ্বজোড়া অন্বেষণে ভ্রমর যেমন একাকী বেরিয়ে পড়ে। অন্ধকার থেকে অন্ধকারে, সাগরে, প্রান্তরে, সুমেরুলোকে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, সপ্তর্ষির সীমানায়, মহাব্যোমে, ব্রহ্মচেতনায়। ক্ষুধার্ত ভ্রমর ফিরছে একা একা আপন রহস্য-পিপাসায়। বন্ধনহীন, কিন্তু মুক্তিবিহীন,—অস্তিত্বের আর চৈতন্যের কল্পে-কল্পে তা'র নীলপদ্মের অন্বেষণ চলছে।

পরদিন প্রভাতে মোটর বাসে বেরিয়ে পড়েছি। মদনলালরা সঙ্গে এলো না।

বাণগঙ্গার তীরে-তীরে পার্বত্যপথ। প্রাচীন পাথরের জটলা নেমেছে নীচের নদীতে। শরৎপ্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলেছে দেওদারের বনে-বনে। রাঙ্গারৌদ্র স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায়। নীচের দিকে এখনও ছম-ছমে ছায়াবরণ। আলো এসে পৌঁছয়নি।

আমাদের গাড়ী চলেছে পাহাড় পেরিয়ে এক-অজানা থেকে ভিন্ন অপরিচয়ের দিকে। পৃথিবীকে নতুন ক'রে পাই নতুন পাহাড়ে এলে। বৃহতের দিকে যাবার আগে একেকটি তোরণদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়। হঠাৎ পাওয়া যাচ্ছে শালের জটলা, হঠাৎ এসে দাঁড়াচ্ছে দলছাড়া শেগুন আর চীড়। দেখতে দেখতে একটির পর একটি গিরিসঙ্কট, দেখতে দেখতেই আকাশ তা'র দিগন্তের দ্বার খুলে দিচ্ছে। দক্ষিণ থেকে আমরা যাচ্ছি উত্তরে—যেদিকে ধবলাধার।

পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার সীমানা থেকে দক্ষিণ ভূভাগে আরম্ভ হয়েছে শিবলিঙ্গ পর্বতমালা,—এসেছে সোজা দক্ষিণে, এবং প্রসারিত হয়েছে পূর্ব-হিমালয়ে। মধ্যোত্তর ভারতীয় হিমালয়ের প্রধান প্রবেশপথ হোলো এই শিবলিঙ্গ-শ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এটি হোলো হিমালয়ের প্রথম স্তর। কাশ্মীর, উত্তর পাঞ্জাব, হিমাচল, যুক্তপ্রদেশ, নেপাল—সমস্ত ভূভাগই এই পর্বতশ্রেণীর দ্বারা প্রাকাররুদ্ধ। এই শিবলিঙ্গ পর্বতমালারই দ্বিতীয় স্তরে হোলো ধবলাধার গিরিশ্রেণী। কাংড়া, পালামপুর, ধরমশালা এবং যোগিন্দর নগরের উত্তরে হঠাৎ এসে দাঁড়ায় অতি নিকটে এই ধবলাধার,—শ্মশানচারী উলঙ্গ সন্ন্যাসী যেন লোকসমাজে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। দেখলে ভয় করে—ওর সর্বাঙ্গে কোনও স্নেহ নেই, ছায়া-মায়া কিছু নেই,—জন্মের থেকেই যেন সর্বহারা। সবুজের আভা নেই যেন ওর সর্বাঙ্গে, বর্ষায়-বসন্তে ওর ভাবান্তর ঘটে না, ওর গোপনতা কিছু নেই, অরণ্যের কৌপীনও ধারণ করেনি। ও যেন আপন রুক্ষজটার ভিতর থেকে করালচক্ষু মেলে দুর্বাসার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কালের প্রহর গুণছে,—রুদ্রাক্ষের মালায় জপ করছে, কবে আসবে কালান্ত, কবে প্রলয়, কবে আবির্ভূত হবে দশম অবতার, তবে ছারখার হবে সৃষ্টি। ধবলাধারের বিশাল নগ্নতা দেখলে ভয় করে।

পাহাড়ের পর পাহাড় ছেড়ে এলুম, পিছনে রেখে এলুম বাণগঙ্গার অতল-স্পর্শ খদ, আর অশ্রান্ত স্রোতগর্জন, রেখে এলুম দুর্ভেদ্য বনভূমির নৈঃশব্দ্য,—রেখে এলুম ওদের স্তবকে স্তবকে আনন্দের শিহরণ, প্রাণের জয়বার্তা।

পূর্বাহ্নে এসে পৌঁছলুম কাংড়ার মস্ত শহরে।

এটি একটু বড় শহর। সমতলের উপর অবস্থিত। কোর্ট-কাছারি, ডাক ও তারঘর, আপিস-ইস্কুল, দোকান-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য,—নগর সভ্যতার প্রত্যেকটি উপকরণ বর্তমান। তবে সকলেরই আকার ছোট। আমরা শহর-সভ্যতায় মানুষ,—এসব আমাদের চোখে পুরনো। বরং হিমালয় ভ্রমণকালে যদি সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণের অভাবে অসুবিধায় পড়ি, সে সহ্য হয়;

উপযুক্ত আহার এবং আশ্রয় না জুটলে দুঃখবোধ করিনে। কিন্তু শহরে এসে পেৌঁছলে আমাদের দাবি বেড়ে ওঠে, আমরা সব চাই,—এবং না পেলে ক্ষুণ্ণ হই। শহরে কোনও উপকরণের অভাব ঘটলে আমরা রাগ করি।

একজন পান্ডা এলেন। বয়স্ক লোক, নাম মোতিরাম। জ্বালামুখীর পান্ডার নাম ছিল মোতিলাল। তা'র প্রতি খুব খুশী ছিলুম না। কিন্তু এই ভদ্রলোকের প্রসন্ন ব্যবহারে ভারি আনন্দ পেলুম। শ্রীমতী মায়া বললেন, মোতিরামজীর বাড়ীতেই চলুন, স্নান না ক'রে আর থাকা যাচ্ছে না। বড্ড রোদ।

বললুম, কিন্তু মদনলালরা যদি পরের গাড়ীতে এসে মোটর ষ্ট্যাণ্ডে আমাদেরকে দেখতে না পায়?

নাই বা পেলো!—তিনি বললেন, সাড়ে তিনটের আগে যখন বৈজনাথের বাস ছাড়ছে না, তখন তা'রা মোটর ষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করতে বাধ্য। আমরা ঠিক সময়ে এখানে এসে দাঁড়াবো। চলুন—

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সৎবতীর বাচ্চাটা যদি এই পথের কষ্টে আবার অসুস্থ হয় তবেই মুস্কিল। ওরা সন্তানের জনক-জননী বটে, কিন্তু এখনও মা-বাপ হয়ে ওঠেনি। শিশুর স্বাচ্ছন্দ্য এখনও বুঝতে শেখেনি।

মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগলো। তবু শ্রীমতী মায়ার নির্দেশ মানতে হোলো। আমরা অলিগলি আর আনাচ কানাচ পেরিয়ে একটি বস্তির মধ্যে মোতিরামের বাড়ীতে এসে উঠলুম। পাণ্ডাজি সযত্নে পানীয় জল ও মিষ্টান্ন নিয়ে এলেন।

সামনেই একতলার ঘর। প্রখর রৌদ্র থেকে এসে ভারি শান্তি পেলুম। কিন্তু এ-কদিন একটি বিশেষ বিষয়ে আমি অন্যমনস্ক ছিলুম, সেটি আমারই ত্রুটি। ঘরে ঢুকেই শ্রীমতী মায়া প্রথমেই তাঁর চামড়ার ব্যাগ খুলে কাগজ কলম নিয়ে স্বামীর নিকট দ্রুত হস্তে চিঠি লিখতে ব'সে গেলেন। যে-ভাবেই হোক, একটি কথা সত্য। অতখানি শঙ্কিত মনে অত দ্রুতগতিতে একটি সংসার তচনচ ক'রে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয়নি; হয়ত সেই সময়ের দুর্যোগে আরও কিছু ধৈর্যরক্ষার দরকার ছিল। তবে একথা তিনি জানতেন, মাস তিনেকের মধ্যেই তাঁর স্বামী কাশ্মীরে ফিরবেন, এবং দিল্লীতে তাঁর অবিলম্বে বদলী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাঁকে যেতেই হোতো কিছুদিন পরে, কিন্তু বন্যা এসে আগেই তাঁর যাওয়াটা দ্রুত ঘটিয়ে দিল।

চিঠি শেষ ক'রে ঠিকানা লিখে তিনি একবার আমার দিকে তাকালেন। বললেন, আমার স্বামীকে দেখলে আপনি কিন্তু খুব খুশী হতেন ব'লে রাখছি!

হাসিমুখে বললুম, কথাটা যেন তিরস্কারের মতন শোনালো। আমি কিন্তু মনে-মনে আপনার স্বামীর অনুরক্ত হয়ে উঠেছি।

কাগজপত্র গুছিয়ে ব্যাগ বন্ধ ক'রে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, বিশ্বাস করুন, আপনাকে দেখে তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না। মনে নেই, বড়-

জেলায় থাকতে আপনাকে তাঁর চিঠি পড়ালুম? চিঠিখানায় সবই আপনার কথা।

আমাদের স্নানাদির পর মোতিরাম তাঁর খাতাপত্র এনে বসলেন। কোনও দাবি তাঁর নেই, প্রণামী পাবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে প্রস্তুত নন্। আমরা তাঁর এখানে আনন্দ পেলেই তিনি খুশী থাকবেন। খাতা খুলে তিনি একস্থলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর মাতাঠাকুরাণীকে নিয়ে একদা এই পাণ্ডার এখানেই উঠেছিলেন। সেটি সবিস্তারে লেখা রয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলুম।

পাণ্ডাজি অতঃপর আমাদেরকে নিয়ে চললেন মন্দিরদর্শনে। পথ একটুখানি চড়াই। এঁকে-বেঁকে এদিক-ওদিক ঘুরে আমরা বৃহৎ এক মন্দিরের চত্বরে উঠে এসে দাঁড়ালুম।

বাণগঙ্গা পেরিয়ে আসার পর থেকে একটি বিশেষ চেহারা লক্ষ্য করছি। সমগ্র কাংড়া উপত্যকাকে বাঙলা দেশের আত্মিক বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। পূজার্চনার রীতি পশ্চিমী নয়; ব্যবহারে, আলাপে, সামাজিকতায়—বাঙলাকেই দেখতে পাই। সাধারণত আমরা পাঞ্জাবে দেখি প্রধান দুটি দল। একটি বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের উপাসক; অন্যটি শৈবশাক্তে মেলানো। শিখ ধর্মটা নতুন, ওটার বয়স কম। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ দীক্ষার মধ্যে ওটি সীমাবদ্ধ। মুসলমানধর্মে যেমন দেখা যায় বাইরের লোকের প্রবেশ অবাঞ্ছনীয়,—শিখধর্মেও তেমনি, প্রবেশ-পথটি সাধারণের পক্ষে প্রশস্ত নয়। হিন্দুদের ব্যাপারটা ভিন্ন রকমের। যিনিই বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-ষড়দর্শন-পুরাণ পাঠ করেন, যিনিই ডুবে যান্ যোগ-দর্শনে, জ্ঞানে ও সাধনায়,—তাঁকেই আমরা বলি, তুমি পরম হিন্দু। গায়ের জোরে কিংবা পুস্তিকা প্রচার ক'রে হিন্দুরা তাদের স্বধর্মীর সংখ্যা বাড়াতে চায় না, ওটা তাদের ধাতেও নেই, জাতেও নেই। তুমি আমেরিকান, কিংবা রুশ, কিংবা ইংরেজ,—যেই হও, হিন্দুদর্শনের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আছে, এই কারণেই তোমাকে হিন্দু মনে করি। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙকে পরম হিন্দু ব'লে অনেকেই মনে করে। গৌতম-বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুদর্শনের একটি পরমাশ্চর্য উদাহরণ—একথা কে অস্বীকার করবে? সমগ্র কাংড়ায় ঘুরে দেখছি বাঙালীর শাক্ত ও বৈষ্ণবসংস্কৃতি পথে-পথে ছড়ানো। উভয়ে আশ্চর্য মিল, একই সুরে বাঁধা। সুতরাং বাজারে, হাটে, আদালতের পাড়ায়, বস্তিপল্লীর আশে পাশে, খেলার মাঠে আর গৃহস্থ ঘরে,—কোথাও ঘুরে একথা মনে হয়নি, বিদেশে এসেছি। যেমন কাশ্মীরে। গ্রামের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াও,—ঠিক বাঙলার গ্রাম। কলাগাছে মোচা কিংবা কলার কাঁদি ঝুলছে। মাচানের ওপর লাউ,—তলায় তা'র কাঁচালঙ্কার চারা। রোদ্দুরে ব'সে কাঁথা শেলাই,—একেবারে বাঙলাদেশ। উনুন-পাড়ে মেনিবিড়াল, খামারে ছাগল, গরুর সামনে খুদসিদ্ধর পাত্র, ওপাশে গাঁদা আর সন্ধ্যামণির

ঝাড়, সরোবরে শালুক, ছেঁচাবাঁশের বেড়ায় গোবরের চাপড়া,—অবিকল বাঙলা দেশ। কাংড়াতেও তাই। মেয়েরা কুয়ার পাশে মাথা ঘষতে বসেছে, পেয়ারাগাছে চড়ছে ছেলেমেয়ে, ছিপ নিয়ে জলের ধারে বসেছে কেউ, ধান ভানছে চালাঘরে, মুদির দোকানে জটলা চলেছে,—মনে হবে আমি ওদেরই একজন। পথে ঘাটে মানুষের চেহারায় কোনও উগ্রতা নেই,—সমস্তটাই যেমন নিরীহ, তেমনি নির্বিরোধ। পাঞ্জাবের অন্যত্র যাও,—যাও অমৃতশহরে, গুরুদাসপুরে, জলন্ধর কিংবা লুধিয়ানায়, ফিরোজপুর কিংবা ভাতিন্দায়,—চেহারা অন্যরকম। কাংড়ায় এসে যেন পাঞ্জাব কোমল হয়েছে, প্রকৃতিতে এসেছে পেলবতা, মানুষের স্বভাবে এসে পৌঁছেছে শালীনতা।

সন্দেহ নেই, এরা রাজপুতনার রসবোধ এনেছে, কিন্তু পাঞ্জাবের রুক্ষতা পায়নি। সভ্যতার থেকে যতদূরে সরেছে মানুষ, তত সে সরল, ততই সে স্বকীয়। যান্ত্রিক সভ্যতা যে-পোষাক পরিয়েছে মানুষকে, সেই পোষাকটি মানানসই হয়নি তা'র প্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে সকলের বড় ষড়যন্ত্র হোলো, একই ছাঁচে পৃথিবীকে ঢালাই করা। ভদ্র জাপানী আর ভদ্র মিশরীয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাও,—একই জীবনযাত্রা, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক শিক্ষা, এক আশা-আকাঙ্ক্ষা। দাঁড় করাও আমেরিকানের পাশে অষ্ট্রেলিয়ানকে, ইংরেজের পাশে রুশীয়কে, জার্মানের পাশে ফরাসীকে,—বিজ্ঞান সভ্যতা ওদের মধ্যে পার্থক্য রাখেনি কিছু। এসো ভারতবর্ষে,—অনন্ত বৈচিত্র্য আজও দেখতে পাবে। এসো হিমালয়ের পাদপর্বতে,—এই কাংড়ায়। এখানে মানুষ আপন স্বভাবধর্মে বিদ্যমান। এই দেওদার আর ঝাউবনের তলা দিয়ে, পাইনের আশ্চর্য নন্দনকাননের ধার দিয়ে—পথ যেদিকে হারিয়ে গেছে শৈলমালার ভিতরে ভিতরে,—মানুষের স্বভাব সৌন্দর্য দেখে নাও। সভ্যতার স্পর্শ এদের মনে আজও লাগেনি ব'লেই প্রকৃত মানুষকে দেখতে পাওয়া যাবে। পোষাকে ব্যবহারে সামাজিক জীবনে—প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র।

একটি টিলা পাহাড়ের উপরে বজ্রেশ্বরী মন্দির। কয়েক রশি চড়াইপথ। সামনের মন্দির দ্বার একটু উঁচুতে। আমরা এসেছি গঙ্গার দেশ থেকে। ফুল আর চন্দনের সুগন্ধ যদি পাই, ত্র্যম্বকের বীজমন্ত্র যদি পূজার্থীর কণ্ঠে উচ্চারিত হ'তে শুনি—আমাদের মনে প'ড়ে যায় দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গার কূল-প্লাবিনী তটসীমান্ত,—যার তীর থেকে উঠে গেল গৈরিকবাসা ভৈরবী জপ সেরে: ব্রাহ্মণ যার তীরে ব'সে মন্ত্রপাঠ করছে নিত্য, যেখানে ভারতসভ্যতা যুগযুগান্ত অবগাহন ক'রে পুণ্যময় হয়েছে।

পান্ডাজির পিছনে পিছনে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলুম। শ্রীমতী মায়া এতক্ষণে যেন স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করলেন। চূড়ার উপরে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ইনি

হলেন দেবী বজ্রেশ্বরী। সমগ্র কাংড়ায় জ্বালামুখীর পরে বজ্রেশ্বরীই হলেন প্রধান। পাহাড়ের নীচে খরতরা বাণগঙ্গা যেমন এই বজ্রেশ্বরীর পর্বতপাদ চুম্বন করছেন, তেমনি এই মন্দিরের উত্তরলোকে তুষারমৌলী ধবলাধারের কৃষ্ণাভ শৈলমালা প্রসারিত থাকার জন্য এই মন্দিরের উদার মহিমা ব্যক্ত হচ্ছে। মন্দির চত্বরে প্রবেশ করতেই চারিদিক থেকে হিমালয়ের মধুর বাতাস সর্বাঙ্গে তার স্নিগ্ধসান্ত্বনা বুলিয়ে দিয়ে গেল।

জ্বালামুখীতে দেখে এসেছি পাহাড়ের উপরে মন্দির রক্তবরণ,—অম্বিকা, তিনি শক্তির প্রতীক্। তাঁর উজ্জ্বলন্ত লোলাগ্নি রসনা সমস্ত ধাতব পাহাড়ের ফাটলের ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁর মন্দির আছে, কিন্তু মূর্তি নেই। অগণ্য অগ্নিজিহ্বা যাঁর,—তাঁর বিগ্রহকে কল্পনা করো, চিত্রাঙ্কন করো মনে-মনে। তাঁকে দেখে নাও সমস্ত পর্বতে, দেখে নাও তাঁকে চূড়ায়-চূড়ায়। এখানে ভিন্ন কথা। এখানে বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু তার অভিব্যক্তি শান্ত। রুদ্রাণী নয়, পার্বতী। এখানে শান্ত শিব, শক্তি তাঁর বামে। এখানে ওখানে সেখানে—সর্বত্র দেবস্থান। যেমন কাশীর অন্নপূর্ণা। একবার প্রবেশ করো, অনেককে পাবে। যেমন উজ্জয়িনীর মহাকাল। একবার একটু নীচের দিকে নেমে যাও,—দেখবে অনেককে পাশাপাশি। যাও রাজস্থানে, কিংবা হরিদ্বারে, পুরীতে কিংবা দ্বারকায়, মাদুরায় কিংবা শিবসাগরে, অযোধ্যায় কিংবা গঙ্গাসাগরে, করাচীতে কিংবা চট্টগ্রামে। সবাইকে ধ'রে রেখেছে ভারত, কেউ বাদ যায়নি। কাংড়াতেও তাই। ইতিহাস বলেছে যাদের কথা,--যারা ছিল সনাতন ব্রাহ্মণ সভ্যতার যুগে, যারা ছিল বৌদ্ধ আর জৈন আমলে, তা'রা আছে কাংড়ার পাহাড়ে পাহাড়ে। কেউ আছে পাহাড়ের গায়ে খোদিত, কেউ রয়েছে গুহাগর্ভে, কেউ বা আছে মন্দিরে। মৌর্য-বৌদ্ধ আমলে, গুপ্ত যুগে, হর্ষবর্ধনে, শক-হূন-গ্রীকদের কালে, পাঠানে-মোগলে, ওলন্দাজ-পর্তুগীজ-ফরাসী-ইংরেজের আমলে,—কাংড়া নিঃসঙ্গ থেকে গেছে আপন মহিমায়, আপন স্বকীয়তায়, আপন সম্মাননায়। কাংড়ার এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা'র চিত্রকলায়--যার নাম 'কাংড়া স্কুল অফ আর্ট'। স্থাপত্য আর ভাস্কর্যকে তা'রা সুন্দর করেছে, ললিতকলার ব্যাখ্যায় এনেছে আপন লাবণ্য, যার স্বাতন্ত্র্য সর্বদেশে স্বীকৃত। ভারতের অনন্ত বৈচিত্র্য, এখানেও তা'র অভিনবত্ব। কন্যাকুমারী থেকে পামীর; গান্ধার থেকে কৈলাশ; দ্বারকা থেকে ব্রহ্ম আর ইন্দোচীন; নেপাল থেকে যবদ্বীপ আর সুমাত্রা; ব্রহ্মপুত্র থেকে সিংহল,—এর নাম মহা-ভারত। এই অখন্ড, অবিভাজ্য, অব্যয় ভূভাগকে আপন ক্রোড়ভূমিতে ধারণ ক'রে আছেন দেবতাত্মা হিমালয়, যাঁকে কাব্যে ও পুরাণে বলা হয়েছে কুলপর্বত, বলা হয়েছে মেরু-মন্দারমাল্যশোভিত হিমবান।

একা বসেছিলুম একটি নিরিবিলি পাথরের আসনে। শ্রীমতী মায়া ঘুরছেন এখানে ওখানে। পুজো দিচ্ছেন তিনি মন্দিরে, দক্ষিণা দিচ্ছেন ব্রাহ্মণকে। মোতিরাম আছেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। হঠাৎ সামনে আবির্ভূত হলেন সৌম্যকান্ত

এক ব্যক্তি,—পরণে তাঁর কোটপ্যাণ্ট। আমাকে দেখেই তিনি কোলাহল ক'রে উঠলেন সবান্ধবে। ইনি আমাদের বন্ধু এবং প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, সন্দেহ নেই।

আপনি যে এখানে?

ঘোষ মশায় বললেন, বাঃ, আমি নেই কোথায়? যেখানেই যান্, আমি আছি। আমার সরকারী চাকরিই হোলো, আমি সর্বত্রগামী। আসুন, আসুন, এ মন্দিরের পাথরের কাজগুলি একবার দেখে যান্, আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

উঠবো, এমন সময় মায়াদেবী এলেন। উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিলুম। হরিচরণবাবু বাকরসিক ব্যক্তি, তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদেরকে সব বোঝাতে লাগলেন। এ অঞ্চলে বারম্বার তাঁকে আসতে হয়েছে। তাঁর কাজের জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে তাঁকে প্রায়ই রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। বেতনাদি তিনি ভালোই পান্।

বললুম, আশুতোষ কলেজের প্রফেসরি ছাড়লেন কবে?

হরিচরণ বললেন, সে অনেকদিন, বছর কয়েক হোলো। দিল্লী থেকে চাকরি নিয়েছিলুম। ধরুন না, সেই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রিত্বের আমলে। তখন চারিদিকে খুব হৈচৈ।

জন দুই অবাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর সঙ্গে। নতুন মানুষ দেখে খুব উৎসাহ লাভ করা গেল। হরিচরণবাবু নিজে পণ্ডিত এবং সুরসিক। এখান থেকে বেরিয়ে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করবেন। শ্রীমতী মায়ার সঙ্গে তিনি খুব গল্প আরম্ভ ক'রে দিলেন। আবার দল বাঁধলুম আমরা।

মন্দির-চৌহদ্দির মধ্যে আরও কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘোষ মশায় বললেন, থাক্ আর নয়। দেখেছেন, বেলা হয়েছে কত? চলুন, একেবারে খাবারের দোকানে গিয়ে বসা যাক্।

ভোজনরসিকের কথা অমান্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং যেতেই হোলো পথঘাট মুখর করতে করতে। হঠাৎ একসময় তিনি বললেন, একি, উল্টো জামা গায়ে চড়িয়েছেন, সেদিকে লক্ষ্য আছে কি? কই, পকেট খুঁজে বা'র করুন ত?

সহসা আমার প্রতি লক্ষ্য ক'রে মায়াদেবী এবং অন্যসকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। অত্যন্ত কুঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলুম। হরিচরণবাবু তা'র উপরে আবার যোগ ক'রে দিলেন, কাংড়ার সমস্ত ধুলোময়লা নিজের অঙ্গে ধারণ করেছেন? ক্ষৌরকার্যটি হয়নি কতকাল? স্নান করেননি কদ্দিন?

বললুম, ঘণ্টা তিনেক আগে স্নান করেছি!

ও, স্নান করেছেন! আচ্ছা, মিসেস গুপ্তা, আপনার কাছে এক কুচি সাবানও ছিল না?

হাসিমুখে শ্রীমতী গুপ্তা একেবারে শরসন্ধান করলেন,—উনি অন্য কা'রো জিনিস ছোঁন্ না!

প্রতিবাদ জানাতে হোলো,—এবার যেন বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে!

না, হয়নি!—ঘোষ মশায় বললেন, আমরাও একটু আধটু ভ্রমণাদি ক'রে থাকি, কিন্তু এমন সর্বহারা হইনে। এর চেয়ে আঙগুলে পৈতে জড়িয়ে ব'সে পড়ুন পথের ধারে, বামুনের ছেলের ভিক্ষে জুটবে!

এবম্প্রকার লাঞ্ছনা কপালে জুটলো অনেকক্ষণ অবধি। তারপর আমরা বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি একটি হোটেলে এসে উঠলুম। আমাদের ক্ষুধা ছিল প্রচুর, কিন্তু হুঁস ছিল না। এখানে শ্তার অকৃপণ পরিচয় পাওয়া গেল। আহারাদির মধ্যে একসময় হরিচরণবাবু সহসা জানতে চাইলেন, আমার আর কোনও বইয়ের সিনেমাচিত্র হচ্ছে কিনা। আলোচনাটা উঠতেই মায়াদেবী একটু আড়ষ্ট বোধ করলেন। তাঁর পরিচ্ছদ পারিপাট্যে হয়ত এমন কিছু ছিল, যা লক্ষ্য ক'রে সম্ভবত হরিচরণবাবু একথা পেড়েছেন। অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে আমাকে ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে হোলো। হয়ত সুশ্রী চেহারা, নীল চশমা, রেশমী শাড়ী এবং নেইল্-পালিশ ইত্যাদি দেখলে আজকাল মানুষের একটু কৌতূহল হয়!

যাই হোক, বিদেশ বিভূঁয়ে একটি চেনা মানুষকে হঠাৎ পেয়ে আলাপে হাস্যে তামাসায় বেশ কাটলো ঘণ্টা দুই। আহারাদির পর হরিচরণ বিদায় নিলেন, এবং আমরাও পাণ্ডাজির বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হলুম। রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে। পথের পাশে এতক্ষণে একটি ডাকবাক্স পাওয়া গেল। শ্রীমতী মায়া তাড়াতাড়ি তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে স্বামীর চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন। তাঁর প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হোলো, তাঁর স্বামীই যেন বাক্সের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা চেয়ে নিলেন।

পাণ্ডার মিষ্ট ব্যবহারের জন্য তাঁর ঘরটিকেও যেন পুরনো বন্ধুর মতো মনে হোলো। ঘরে এসে শ্রীমতী গুপ্তা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিলেন। তাঁর ক্লান্তি ছিল প্রচুর। কাশ্মীর থেকে আসার সময় তিনি বলেছিলেন, এর আগে লেখক কেমন, আমি দেখিনি। লেখককে কাছে থেকে দেখবার এমন সুযোগ আমি ছাড়বো না!

আমি আড়ষ্ট। কী তিনি লক্ষ্য করছেন আমার জানা নেই। যে-ভ্রমণে আমার আনন্দ, তাতে তিনি উপভোগের ক্ষেত্র পাচ্ছেন কিনা, তাও আমার অজ্ঞাত। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য নেই, স্নানাদির অসুবিধা, নিভৃত বিশ্রামের সুবিধা তাঁর জুটছে না, আহার-নিদ্রা-প্রসাধনের প্রশস্ত স্বাধীনতা পাওয়া যাচ্ছে না,—সুতরাং, আমার বিশ্বাস, তাঁর কষ্টের সীমা নেই। সমস্ত পথ আমি সঙ্গে থাকলেও তিনি একা, এবং বুঝতে পারি তিনি তলিয়ে আছেন নিজের মধ্যে।

ঘণ্টা দেড়েক পরে তিনি উঠে এলেন। আমি একটু অস্বস্তিবোধ করেই বললুম, একটি কথা নিবেদন করি। চলুন, আর এগিয়ে কাজ নেই, এখান থেকেই দিল্লী রওনা হই। আমি না হয় আর একবার আসবো এদিকে।

কেন?

ধরুন, সেখানে সকলেই ভাবছেন আপনার জন্য। জিনিসপত্র নিয়ে অবিলম্বে আপনার ভাসুরের ওখানে পৌঁছনো দরকার।

একটু ক্ষুণ্ণ হলেন মিসেস গুপ্তা,—আমি তবে চিঠি দিলুম কি জন্যে? জম্মু থেকে লিখেছি ভাসুরকে। আপনি আছেন সঙ্গে,—তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস কি, জানেন? আমাকে নিয়ে আপনিই অসুবিধে বোধ করছেন!

খুব হাসলুম। বললুম, যদি বলি কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়?

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে তিনি কঠোর অভিমত ব্যক্ত করলেন, সত্যি হলেও নড়বো না, জেনে রাখুন লেখক মশাই! ভ্রমণের এমন সুবিধে আর পাবো না। যত টাকাই লাগুক, এইভাবেই খরচ করবো। কাঁঠাল যদি ভাঙতেই হয়, ব্রাহ্মণ সন্তানের মাথাটাই উপযুক্ত ক্ষেত্র।

আমাদের হাসির তরঙ্গে মোতিরামও যোগ দিলেন। কিন্তু আর দেরি নয়, সাড়ে চারটের আগেই মোটর বাস ছাড়বে,—আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মোতিরামের হাতে যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম। একটু আগেই যাই, হয়ত সৎবতী ও মদনলাল তাদের বাচ্চাকে নিয়ে এতক্ষণে বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে হাজির হয়েছে। ওদের কুশলবার্তা পাবার জন্য আমরা উভয়েই অস্বস্তিবোধ করছিলুম।

পাণ্ডাজি মালপত্রের হেপাজত ক'রে সমস্ত পথ এসে আমাদের পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন। সমুদ্রসমতা থেকে কাংড়ার উচ্চতা প্রায় দেড়হাজার ফুট মাত্র, কিন্তু শীতকালে এখানে প্রবল ঠাণ্ডা। অবরোধ কোথাও নেই, সুতরাং উত্তরের বাতাস এখানে অবারিত। শীতকালের শীত হোলো বাতাসের জন্য, বাতাস বন্ধ হ'লে তুষাররাজ্যও সহনীয়। কাংড়ায় এখন শরৎকাল, উত্তরের বাতাস ওঠেনি,—অতএব গরম। রৌদ্রে দাঁড়ানো চলে না,—আমরা ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও মদনলাল অথবা সৎবতীকে দেখতে পাওয়া গেল না। আমি একবার এগিয়ে গিয়ে প্রায় সেই কাছারিপাড়ার ধার পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি ক'রে এলুম।

মায়াদেবী বললেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? ছেলেটা আপনাকে ভয় করে, তাই হয়ত দল ছেড়ে পালাচ্ছে! এমন হতভাগা আমি দেখিনি। সৎবতীও দুঃখ পাচ্ছে ওই লক্ষ্মীছাড়ার হাতে।

বললুম, অনেক লক্ষ্মীছাড়ার হাতে অনেকেই দুঃখ পায়!

হঠাৎ সন্দেহক্রমে বাঁকা চোখে তাকালেন মিসেস গুপ্তা। বললেন, বটে, গুপ্ত-সাহেব সঙ্গে থাকলে আপনাকে একথার জবাব দিতুম। আপনি দেখছি আমাকে ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচেন। ওটি কিন্তু হচ্ছে না! আপনার যত সাধ আছে, পাহাড়ে ঘুরে নিন্। দিল্লী ষ্টেশনে পৌঁছে তবে আপনার ঘাড় থেকে ভূত ছাড়বে!

ঠিক ভূত নয় অবশ্য!

ভূত না হয় পেত্নীই হোলো! চলুন, গাড়ী ছাড়ছে!

হাসিমুখে আবার উঠলুম গাড়ীতে। বৈজনাথের দিকে চললুম।











লাদক দুগ্‌পাদের তান্ত্রিক লামা

॥ ৩ ॥

বর্ষাশেষের বাদল ছুঁয়ে রয়েছে কপিশকান্ত ধবলাধারের তুষারচূড়ায়,—মেঘে আর তুষারে একাকার। এমন বিস্ময় হিমালয়ের কোথাও নেই। মোটর পথের অদূরে হঠাৎ উঠেছে ধবলাধার, যার উচ্চতা কমবেশী ষোল হাজার ফুট। ওই শৈলমালার ঠিক নীচে অন্তহীন ফসলের ক্ষেত সমগ্র কাংড়ায় যেন সবুজ মখমল বিছিয়ে রেখেছে। তারই মাঝে মাঝে মিহি জরির ফিতের মতো চলেছে অসংখ্য স্রোতস্বিনী এঁকে-বেঁকে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ছোট ছোট চাষীর ঘরকন্না আর দেবস্থান। পৃথিবী আশ্চর্য মনে হচ্ছে। পাইন আর দেওদারের বনরেখা যেন হৃৎপিণ্ডকে টেনে নিয়ে যায় বহুদূরে,—যেদিকে উত্তর, পূর্ব আর পশ্চিম—তিন-দিকে জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবলাধারের বিশাল গিরিচূড়াদল। এখানে যেন ভারতের একটি ক্ষুদ্র মানচিত্র এঁকে রয়েছে।

পথ সমতল। একদিকে পাহাড়তলীর কোলে অফুরন্ত ফলের বাগান, অন্য-দিকে প্রান্তর আর শস্যক্ষেত্র। কোথাও ছায়া নেমেছে অরণ্যের, কোথাও স্রোতস্বতীর নির্জন তীরে বটের ঝুরি নেমে এসেছে—মহাপ্রাচীন মুনি আপন মনে যেন গণ্ডূষ ভ'রে জলপান করছেন। কোথাও নেমে আসছে লাহুলের পাখী,—যারা হিমালয় ছেড়ে যায় না কোথাও। আমাদের দীর্ঘ ঋজু পথ বনবীথিকার মতো দূর থেকে দূরান্তরে চ'লে গেছে। রেলপথটি এসেছে পাঠানকোট থেকে জ্বালামুখী রোড এবং যোগিন্দরনগর হয়ে নাগরোটা পর্যন্ত। নাগরোটার পরে আর রেলপথ নেই। কিন্তু এ পারের বৈজনাথের পথ থেকে তা'র কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। আমরা চলেছি ছায়াবৃত বনময় পথ দিয়ে। মিসেস গুপ্তা স্থির হয়ে ব'সে রয়েছেন।

অপরাহ্ণ ম্লান হয়ে আসছিল। জনসমাগম এত কম যে, বিস্ময় লাগে। মাঝে মাঝে পুরুষ দেখা যাচ্ছে,—মাথায় তাদের লাল পাগড়ি। স্কুল বালকের দল গান গেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যাচ্ছে তাদের, যাদের নাম 'গদ্দি'। তা'রা এখানকার মাটির সন্তান নয়। আপেলের রক্তিমাভা 'গদ্দি'মেয়ের গালে আর অধরে, বাঁকা নয়নে যেন বন্য অপরাজিতার কটাক্ষ, নধর পেলব কণ্ঠে প্রবালের মালায় পথিকের মৃত্যুর ফাঁস জড়ানো। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, কিন্তু সর্বাঙ্গ আবৃত। মাথায় রাঙ্গা ওড়না। কেউ বলে এরা মোঙ্গল রক্তের ধারা, কেউ বলে আদিম আর্যের অবশেষ। ছেলে-ছোকরা-পুরুষও তাই। রঙীন টুপি মাথায়, শাদা কম্বলের জোব্বা সর্বাঙ্গে, পশুলোমের ফেট্টি বাঁধা তাদের কোমরে। একটু সাবান মাখিয়ে একটু পরিচ্ছন্ন ক'রে দেখো, প্রত্যেকে রূপবান। অরণ্য থেকে ওরা পেয়েছে স্বভাব, ধবলাধারের কাঠিন্য থেকে পেয়েছে স্বাস্থ্য, পার্বতী নদীর ঝনক

ঝঙ্কার থেকে পেয়েছে হাসির উল্লোল, এবং সভ্যতা-চিহ্নলেশহীন পার্বত্য প্রকৃতি থেকে ওরা পেয়েছে চিত্তের সরলতা। গরু ছাগল মেষ ও মহিষ—এদের চরানো হোলো ওদের পেশা। ওরা ফসল কাটতে আসে কাংড়ায়, কুটিরশিল্পের কাজ নেয়, রূপোর অলঙ্কার নির্মাণ করে, পশুর লোম থেকে পশমের গুটি বানায়। এসব ছাড়াও ওরা মজুরি ক'রে যায় এদিকের নানা অঞ্চলে। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে অন্যত্র। ওরা যায় জাস্কার আর ধবলাধার গিরিমালার ভিতর দিয়ে লাহুল উপত্যকায়, কিংবা লাদাখ অথবা তিব্বত সীমানার পার্বত্য লোকে। ওরা ঠিক 'গুজর'দের মতো। বাধাবন্ধ কিছু নেই, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবার ছাড়পত্রের তোয়াক্কা রাখে না। ওরা চিরকাল চেনে হিমালয়কে, রাষ্ট্রকে চেনে না। কোন্ দেশ থেকে কাদের শাসনদণ্ড খ'সে পড়লো, কোন্ রাষ্ট্রের কোন্ সীমানা, কোন্ রাজশক্তির কি পরিচয়,—ওরা তাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। পাহাড়কে ওরা চেনে, চেনে শুধু দুস্তর পথের সন্ধান,—যেখানে সভ্যতার আনাগোনা কম। সূর্যের দক্ষিণায়ন ঘটতে থাকলে ওরা দেশ বদলায়, ঘরের খুঁটি উপড়ে নেয়, তল্পিতল্পা বেঁধে তুষারের গতি-প্রগতি লক্ষ্য ক'রে ওরা দল বেঁধে চলতে থাকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। ওদের ওই যুগযুগান্তরের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ ক'রে সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ পাহাড় অঞ্চলে জরীপ করতে লেগে যায় এবং মানচিত্র প্রস্তুত করে। ওরা ওই হিমালয়ের সংখ্যাতীত শাখাপ্রশাখার মধ্যে শত সহস্র মাইলব্যাপী যে সকল ঊর্ণনাভের মতো জটিল পথ চিহ্নিত ক'রে রেখেছে, তারই উপর দিয়ে চিরকাল ধ'রে অভিযাত্রীরা চলে। মুনিঋষি গিয়েছে, গিয়েছে দার্শনিক আর কবি, গিয়েছে তীর্থপথিক আর রাজভিখারীর দল,—গিয়েছে সবাই যুগ থেকে যুগান্তরে। ওদের পায়ের দাগ দেখে-দেখে এসেছে তাতার আর মোঙ্গল, এসেছে তুর্কী, ইরাণী আর পাঠান, এসেছে শক আর হূন,—এসেছে উত্তর তিব্বতের মরুলোক তাক্লা-মাকানের অগণ্য বিলুপ্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের প্রান্ত থেকে কত অনির্ণীত জাতির মানুষ। ওদেরই পায়ের দাগ পাহাড়ে-পাহাড়ে খুঁজে বের ক'রে এসেছে ইয়ারখন্দি আর সমরখন্দির দল। ওরা শীতে কাঁপে, তুষারঝঞ্ঝার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়, বরফের তলায় ওদের মুখের অন্ন আর কোলের শিশু চাপা পড়ে, পশুর লোমের অভাবে ওদের হাড়-চামড়া বেরিয়ে আসে, তুষারক্ষত দেখা দেয় সর্বাঙ্গে,—কিন্তু তবু ওরা চন্দ্রভাগা আর বিপাশার নীচে-নীচে ভারতের সুশ্যাম সমতলে নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার মধ্যে নামতে চায় না,—পাছে নিম্নলোকের বাতাবরণের চাপে ওরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে। কিন্তু আবার ওই বরফের রাজ্যে শ্বেতচ্ছায়াময় মৃত্যুলোকে যখন নব-বসন্তের সংবাদ আসে, কোনও অচেনা রঙ্গীন পাখী যখন ঋতুরাজের বার্তা বহন ক'রে হঠাৎ ডাক দিয়ে যায় নিস্তব্ধ পাহাড়ের কোলে, দেবতাত্মার জটা শিথিল হয়ে নির্ঝরিণীরা দল বেঁধে নামতে থাকে,—একটি তৃণফলকের ডগায় যখন একটি কুঁড়ি বুকফাটা যন্ত্রণায় মাথা নাড়া দেয়,—তখন আসে ওদের জীবনে মিথুনলগ্ন।

সুনীলনয়না ফেনবর্ণা কটাক্ষবতীরা আবার কানে তুলে নেয় ধাতব অলঙ্কার, রাশিকৃত কম্বল সরিয়ে কটিবাসখানি তুলে নেয় আপন মেখলায়, এবং পুরুষকে ডাক দিয়ে টেনে নেয় আপন স্বর্ণবক্ষের মরণশয্যায়। তারপর আবার দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে ভিন্ন পথে।

শ্রীমতী গুপ্তা স্তব্ধ চক্ষে ওদের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। বাণগঙ্গা পেরিয়েছি একাধিকবার। দূরে কাংড়ার দুর্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। যতদূর মনে পড়ছে, বেলা প'ড়ে এলো নাগরোটায় পৌঁছুতে। ছায়াবৃতা নাগরোটা,—তা'র ছায়ায় আর মায়ায় ছোট ছোট কবিতা যেন উচ্ছ্বসিত। এখান থেকে অরণ্যের সুরু,—এ অরণ্য চ'লে গেছে কাংড়ার প্রধান কেন্দ্র ধরমশালা পেরিয়ে। চেয়ে দেখছি স্বপ্নের মতো,—এ পথ সৌন্দর্যপিপাসুর পক্ষে অমরাবতীর মতো। বহুবার মনে করেছি, যদি মৃত্যু হয় এই পথের কোথাও কোনও কোণে—সেই হবে আদর্শ মৃত্যু। কেউ জানবে না, বিশ্বাস করতে চাইবে না কেউ,—মৃত্যুর পক্ষে সেই হবে মহিমা। ওই অপরিচিত পৃথিবীর ওক্ আর পাইনবনের তলায়—যেখানে অন্তিম দিনমানের রক্তের আল্পনা আঁকা হচ্ছে বনকুসুমের রঙে রঙ মিলিয়ে,—পতঙ্গ প্রজাপতির দৌত্যগিরির পথে-পথে। অপরিচয়ের মধ্যে মৃত্যু গৌরবের হয়ত নয়, কিন্তু আনন্দের। দেওদার বনের হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে যাবে সেই বিরহপ্রলাপ, ঝাউ-পাইনের শাখায়-শাখায় উচ্ছ্বসিত হবে তাদেরই পরমাত্মীয়ের বিচ্ছেদ-বেদনা! কেউ শুনবে না সেই মৃত্যুর ইতিহাস, কিন্তু তুষার-তিতির আর শৈলপারাবতের কণ্ঠে-কণ্ঠে সেই বার্তা ধ্বনিত হবে; ধবলাধারের বিগলিত তুষারের শীর্ণ অশ্রুধারা নেমে আসবে ওই বাণগঙ্গায়! আমি ওদেরই অন্যজন। ওই যেখানে অবেলার করুণ ছায়া নেমেছে কান্নার মতো, যেখানে ঘুরে-ঘুরে গেল ঘূর্ণী হাওয়ারা, নীলপাখী উড়ে গেল অরণ্য সচকিত ক'রে, ডাহুক যেখানে ওই শিশমের নিভৃত শাখায় ব'সে বিদীর্ণ কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে, আর ওই যেখানে শ্লেটপাথরের ছাদের নীচে 'গদ্দি'রা তাদের অস্থায়ী গৃহস্থালী বসিয়েছে,—ওদের সকলের মধ্যে আমি! আমার মধ্যে ওরা বাসা বেঁধেছে চিরকাল। আমার শাখাপ্রশাখায়, শিরাউপশিরায়, অন্ত্রে-মন্ত্রে, শোণিতে-ধ্বনিতে, আমার অস্তিত্বে আর সত্তায়—ওদের চৈতন্য কাজ ক'রে গেছে কাল-কালান্ত!

পালামপুরের চা-বাগান পেরিয়ে চলেছি। এবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মানুষের আনাগোনা, দোকানপাট আর কাজ কারবার। এক-একটি মানুষ,—যাদেরকে দেখছি দুজনে একান্ত অনিমেষচক্ষে, তা'রা যেন অনাদি-অনন্ত কৌতূহলের প্রতীক্। ওরা যেন বহন করছে ধবলাধারের অনন্ত রহস্য, সমস্ত কাংড়ার বিস্ময় প্রকৃতি। বিরোধ কোথাও নেই, কিন্তু স্বচ্ছ আনন্দে মুখর। অদূরে একটি ছায়ানিভৃত জলাশয়ে একই সঙ্গে ফুটেছে শ্বেত ও রক্তপদ্ম। একটি 'গদ্দি' শ্রমিক মেয়ে ঘাটের ধারে লজ্জাবরণগুলি রেখে অবগাহন ক'রে উঠে এলো। ভ্রূক্ষেপ করলো না কোনও দিকে, কিন্তু আপনাতে আপনি উৎফুল্ল।

মাথা ডোবালো না, পাছে বেণী বিপর্যস্ত হয়। এমনি ক'রে স্নানই ওদের সাধারণ রীতি। রাজস্থানে, কাশ্মীরে, গুজরাটে, গাড়োয়ালে, নেপালে,—যেখানেই শ্রমিক নারী, সেখানেই এই। একটিমাত্র মোটা পোশাক ওদের সম্বল,—সেটি জলে ভেজালে কোনোমতেই ওদের চলে না।

বহুদূর পর্যন্ত সমতল, তারপর পথ উঠছে ধীরে ধীরে। সবুজ প্রান্তরকে বাঁ দিকে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। চোখ ছাড়া পেয়ে '। এবার দেখতে পাচ্ছি বহুদূর, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ধবলাধারের পাদভূমি। বন ও কান্তার ওরই কোলে গিয়ে মিশেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসে নানা জন্তু,—তুষারবাসী পার্বত্য চিতা, পিঙ্গল-কৃষ্ণ ভল্লুকের পাল এবং দাঁতাল হরিণ। ওখান থেকে নেমে আসে বনহংস,—পাথরের কোটরে যারা বাসা বাঁধে। আর আসে শৈলপারাবত আর পাহাড়ী মোরগ। আমাদের গাড়ী ঘুরে চলেছে অনেক দূর।

বন্যা এসেছিল কিছুদিন আগে ধবলাধারের পাঁজর থেকে। সেই বন্যায় ভাঙ্গন ধরেছে যোগিন্দরনগরের রেলপথে, গ্রাম ভেসে গেছে, পাহাড় ধ্বসেছে, ফসল নষ্ট হয়েছে। পাহাড়ের বন্যা বিশ্বাসঘাতিনী। আগে থেকে নোটিশ নেই; হয়ত আকাশ জ্যোৎস্নাহসিত, তারকাখচিত; হয়ত বা দিনমানের নির্মেঘ আকাশে সূর্য জ্বলছে—এমন সময় হঠাৎ এলো বন্যা সর্বনাশা। এর কারণ, পাহাড়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে পূর্বদিন, সে-খবর কেউ রাখেনি। সমস্ত পাহাড়ের ইতিহাস এই। বর্ষা নামেনি, কিন্তু বন্যায় বিধ্বস্ত হচ্ছে পাহাড়তলীর গ্রাম ও শহর। যেমন নেপাল থেকে নামে কোশীর বন্যা, ভূটান থেকে শঙ্খোস, সিকিম থেকে তিস্তা, পীরপাঞ্জাল থেকে বিতস্তা, কুমায়ুন থেকে সরযু, তিব্বত থেকে ব্রহ্মপুত্র। এই সকল ভূভাগের ঠিক নীচে যারা থাকে, তা'রা চিরদিন তটস্থ। শুধু যে পর্বত-প্রমাণ জলের দেওয়াল নীচের দিকে ছুটে আসে তাই নয়,—ওর সঙ্গে ভেসে আসে এক একটি গ্রাম, বিরাটাকার পাথরের চাংড়া, হাজার-হাজার টন ওজনের পাহাড়ের ধ্বস, উন্মূলিত বড় বড় বৃক্ষ। ধ্বংস আর মৃত্যুর সেই ভয়াবহ বজ্র-গর্জনের মধ্যে শোনা যায় নিরুপায় প্যান্থার আর ঐরাবতের অন্তিম ডাক, বাঘ আর ভালুকের কান্না, অজগর সাপের ঝাপট এবং তাদেরই সঙ্গে ভাসমান মানুষের বুকফাটা চীৎকার। কেউ বাঁচে না সেই বিভীষিকায়, কিন্তু যদি কোন কোন জন্তু সেই প্রকৃতির সাংঘাতিক তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়—তবে সে ক্ষিপ্তোন্মত্ত হয়ে নিকটবর্তী গ্রাম ও বস্তিকে আক্রমণ করে এবং নিরীহ গ্রাম-বাসীর উপরে প্রতিশোধ নেয়। সেই বন্যা যখন চ'লে যায়, এবং পার্বত্য প্রপাত যখন শান্ত হয়ে আসে, দেখা যায় শত শত বন্য জন্তুর গলিত বিকৃত মৃতদেহ স্রোতের পাথরের আশেপাশে ছড়ানো। হস্তী গণ্ডার ব্যাঘ্র ভল্লুক হরিণ,—কেউ বাদ যায়নি। তাদের সঙ্গে মেলানো আছে মানুষের আর অজগর ময়ালের শবদেহ। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভূটানের ভাঙ্গনে প্রায় দুই হাজার বড় বড় জন্তু, মানুষ এবং সংখ্যাতীত সরীসৃপ বিনষ্ট হয়েছিল।

বৈজনাথে এসে পেঁছিলুম। তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয়নি।

বাজারের কাছে এসে বাস থামলো। পথের দুই পারে কয়েকটি সাধারণ দোকান, দুচারটি ব্যবসায়ীর গদী। শহরটি ছোট, এবং এই রাজপথটির বাইরে গেলে কয়েকঘর বসতি ছাড়া আর বিশেষ তেমন কিছু নেই।

অদূরে বৈজনাথের প্রাচীন মন্দির। কিন্তু মন্দির দর্শনের আগে আমরা মদনলাল ও সংবতীর খোঁজখবর করতে করতে মালপত্রসমেত ডাক বাংলায় এসে পেঁছিলুম। ডাক বাংলাটি হোলো পাহাড়ের নিরিবিলি একটি কোণে। এটির স্থান নির্বাচনটি বড়ই মনোরম। বারান্দার ঠিক নীচে ক্ষীরগঙ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। পার্বত্য নদী পাহাড়ে-পাহাড়ে মাথা কোটে, কিন্তু সে জানে না তার এই আঘাতে আর অপঘাতে কী অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে থাকে। এটি অনেকটা পাহাড়ের চূড়ার উপরে মালভূমির মতো। ক্ষীরগঙ্গা ঘুরেছে উত্তর থেকে পশ্চিম এবং অবশেষে দক্ষিণে। ওপারে একটি পাহাড়ের উচ্চ শিখর এবং দূর পূর্বে গিরিশ্রেণীর গা দিয়ে চড়াই পথে উঠে গেছে মণ্ডিরাজ্যের সীমানা। কাংড়া উপত্যকা এখানেই প্রায় শেষ। এ অঞ্চল পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের সংযোগস্থল।

মালপত্র নামিয়ে কুলি যখন বিদায় নিল, লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল এই ডাক-বাংলারই উদ্যানের অপর প্রান্তে একখানা প্রাইভেট মোটর দাঁড়িয়ে। সম্ভবত কোনও রাজকর্মচারী হবে। কিন্তু ওদিক থেকে কিছুমাত্র সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় চৌকিদার এসে দাঁড়ালো সেলাম ঠুকে। যেমন সর্বত্র, এখানেও তাই। বসবাসের বিলাস কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের মতো। এই নিঃসঙ্গ এবং নিভৃতলোকে যারা এমন সুন্দর আবাসগৃহ বানিয়েছে, তাদের সুরুচি এবং সুবিবেচনার প্রশংসা করি। ঘরগুলির কোলে সুন্দর বারান্দা।

শ্রীমতী মায়া দেখে শুনে খুশী হলেন, এবং চৌকিদার যখন টিফিনের টেবল ও চেয়ার এনে বারান্দায় পেতে দিল, তিনি ব'সে প'ড়ে বললেন, কাশ্মীরের চেয়ে কাংড়া কোনো অংশে কম নয়। সত্যি, চেয়ে দেখুন, এ জায়গাটা অবিকল পহলগাঁওর মতন। কিন্তু লোকজন একেবারে নেই। রাত্রে চৌকিদার থাকবে ত? —তুম রহোগে রাতমে, ক্যা?

জি হাঁ!—চৌকিদার জবাব দিল।

মায়াদেবী চা ও জলযোগের অর্ডার দিলেন। লোকটা যাবার পর তিনি একবার উঠে ভিতর মহলে বসবাসের তদ্বির তদারক করতে গেলেন।

আকাশে আবার মেঘ করেছে। কোনো কোনো পাহাড়ের উপরে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাচ্ছে। অদূরে এই মালভূমিরই প্রান্তে একদল ছেলে খেলা করছিল, আকাশের চেহারা দেখে তা'রা মাঠ ছেড়ে ঘরের দিকে রওনা হোলো। বারান্দার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাগানের সেই ওদিকে মোটরখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। বাস্তবিক, পাহাড় ও

নদীর ধারে এমন নিভৃত এবং নিঃসঙ্গ ডাকবাংলা খুব কমই দেখেছি। ওই খেলার মাঠের প্রান্তভাগে একটি সরুপথ এঁকে-বেঁকে বৈজনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে গিয়ে পোঁছেছে। মেঘের চেহারা দেখে মন্দিরের দিকে যাবার উৎসাহ আসছে না।

কিছুক্ষণ পরে মায়াদেবী ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন। উঠে ভিতরে গিয়ে চারিদিক দেখে শুনে আমি অবাক। মস্ত বড় হল্ঘর, সমস্ত মেঝে কার্পেটমোড়া। ঝকঝকে কয়েকখানা খাট এবং পরিচ্ছন্ন বিছানা। প্রত্যেকটি বড় বড় জানলায় মূল্যবান পর্দা উপর থেকে নীচের দিকে ঝুলছে। হল্-এর ভিতর দিয়ে সাহেবীসজ্জার বাথরুম, ড্রেসিং রুম, এপাশে পার্টিশনের গায়ে মস্ত ডিনার-টেবল, অনেকগুলি দামি চেয়ার, ওপাশে একটি আলমারিতে বিবিধপ্রকার কাচের বাসন ও চায়ের সরঞ্জাম, এধারে ওয়ার্ডরোব, ওখানে মস্ত আয়না, এদিকে আল্না, ম্যাণ্টলপীসের উপর সাজানো কয়েকটি পুতুল ও রঙ্গীন কাচের ফুলদানি,—তার ঠিক নীচে ফায়ারপ্লেস। এমন পরিচ্ছন্ন নূতন ও সুসজ্জিত হল্ঘর দেখে মায়াদেবী একেবারে উৎফুল্ল। বললেন, এখান থেকে কিছুদিন নড়বার ইচ্ছে রইলো না। আপনি এক [illegible] না? গুপ্তসাহেবকে জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দিন্, উনি [illegible] চ[illegible]। আসুন।

হেসে বললুম, না, তামাসা নয়। যদি অনুমতি করেন, এখনই [illegible] দিই! পরশু দিনের মধ্যেই এসে পোঁছবেন।

মায়াদেবী বললেন, বটে। তিনি যদি এ বছর ডিপার্টমেণ্টাল্ পরীক্ষা না দেন্ তবে সে-ক্ষতি আমাকেই সইতে হবে। তার চেয়ে আশীর্বাদ করুন, তিনি যেন পরীক্ষায় পাস হন্। ওইতেই তাঁর ভবিষ্যতের উন্নতি। ওই দিকেই আমি চেয়ে আছি।

প্রশ্ন করলুম, আপনাদের বিবাহ হয়েছে কতদিন?

বিয়ে! তা ধরুন, বছর পাঁচেক হ'তে চললো!

চৌকিদার চা ও টিফিন্ নিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালো! খেতে বসবার আগে তাকে আলোর ব্যবস্থা করতে বললুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে অল্প বয়সের একটি যুবক ও একটি বিবি এসেছে কিনা। চৌকিদার জানতে চাইলো, তাদের সঙ্গে একটি বাচ্চা আছে কি?

মায়াদেবী একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, হাঁ হাঁ, আছে। তারা কোথায় বলতে পারো?

চৌকিদার তার পার্বত্য হিন্দিভাষায় জানালো, তারা এই ডাকবাংলোতেই বিকেলে এসে উঠেছে আমাদের ঘণ্টা তিনেক আগে। তারা আছে ও মহলে।

যাও, শিগগির ডেকে আনো!

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, আপনি [illegible] চা তৈরি করুন।

ও-মহলের শেষ প্রান্তের ঘরে এসে উঠেছে মদনলাল আর সৎবতী। আমাকে দেখেই মদনলাল ছুটে এসে ওদের কায়দামতো হাঁটু ছুঁয়ে আদর জানালো। সৎবতী খাটের উপর প'ড়ে রয়েছে চোখ বুজে, বাচ্চা মেয়েটা নরম বিছানার আরাম পেয়ে হাত-পা নেড়ে মায়ের পাশে শুয়ে খেলা করছে। এ ঘরটিও চমৎকার। বললুম, কি হয়েছে সৎবতীর?

কুচ নহি, দাদাজি। চক্কর লাগা। পেট্রলকা বু বরদাস্ত্ নহি কর্ শক্তা!

কাংড়ায় আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি কেন, একথার উত্তরে মদনলাল জানালো, পাঁচ মিনিটের বেশী ওরা কাংড়ায় ছিল না, কারণ ওই মোটরবাস-ষ্ট্যান্ডে একটু পরেই ওরা বৈজনাথের গাড়ী পেয়ে গেল। ওরা জ্বালামুখীর মন্দিরের মধ্যেও ঢোকেনি। শুনে অবাক হলুম। কিন্তু মদনলাল আমাকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিল, অত মন্দির-টন্দির দেখতে গেলে ভ্রমণ হয় না।

সৎবতী শুয়ে রইলো, মদনলালকে নিয়ে আমি এলুম শ্রীমতী গুপ্তার কাছে। ওকে দেখামাত্রই তিনি রাগে উত্তেজিত হলেন। উপযুক্ত ভাষায় সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তোর পেজোমি আমাদের মাথা ছাপিয়ে উঠেছে, মনে রাখিস মদনলাল!

উভয়েই সমবয়স্ক, সুতরাং মাস তিন চারের ঘনিষ্ঠতার পর নিকট-সম্ভাষণটা সহজেই আসে। মদনলাল বহিনজীর কাছে একেবারে কাঁচুমাচু। কিন্তু বহিনজীর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই তাঁর চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল নিজের জন্যে। ছেলেটা অত লাজলজ্জা-মানসম্ভ্রমের ধার ধারে না। মায়াদেবী হাসলেন।

প্রশ্ন করলুম, যদি পথঘাট আর মন্দির-দেউল না দেখবে তবে ওই ছেলে-মানুষ বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে এত এদেশ-ওদেশ করছ কেন?

মদনলাল বললে, দাদাজি, ঘোরাঘুরি ত' হচ্ছে! 'এক আস্‌লি বাত হ্যায়, শুনিয়ে।'

কি বলো।

সে বললে, হাজার ছয়েক টাকা বাবাকে ঠকিয়ে পেয়েছিলুম,—!

বাবাকে ঠকিয়ে! মানে? বাক্স ভেঙেছিলে?

নেহি সাব,—মদনলাল বললে, বাবাকে লুকিয়ে রেশম ষ্টক্ করেছিলুম অনেক টাকার। 'বড়া এক শেঠসে কুচ প্রাইভেট্ খবর মিলা। পিতাজিকো মালুম নেহি থা।—ব্যস, ঝট্‌সে তেরা হাজার রুপ্যা বিলাক্ মার্কেটসে নাফা মিল গিয়া!—তখন বাবাকে জানালুম। তিনি হাজার টাকা বকশিস দিতে চাইলেন, আমি বেঁকে বসলুম,—আরো পাঁচ হাজার চাই! উন্‌কো সমঝা দিয়া কি আট হাজার রুপ্যা আপকো একদম ফোকট্‌সে আ গিয়া!

মায়াদেবী হেসেই খুন। শুধু একসময় মন্তব্য করলেন, পাজির পা ঝাড়া! শ্রীনগর আর পহলগাঁওয়ে থাকতে ও কি আমায় কম জ্বালিয়েছিল? অমন

চমৎকার মেয়েটিকে বিয়ে করেছে, একটু ওর দিকে নজর নেই। একেবারে হতভাগা!

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মায়াদেবী ও-মহলে গেলেন, এবং মিনিট পাঁচেক পরে সৎবতীকে নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালেন। সৎবতী লজ্জায় জড়োসড়ো। কাছে এসেই আমার হাঁটু ছুঁয়ে নমস্কার জানালো। মায়াদেবী বললেন, আমি যা সন্দেহ করেছিলুম ঠিক তাই। আপনার ধমকের ভয়ে তখন সৎবতী চোখ বুজে পড়েছিল,—ঘুমোয়নি। জিজ্ঞেস করুন এই শ্রীমানকে, পেট্রলের গন্ধ-টন্ধ সব বানিয়ে বলেছে।

আমরা চারজনেই হেসে উঠলুম। একটি রুমালে বাঁধা কী যেন ছিল সৎবতীর হাতে, সেটি আমার হাতে দিয়ে সৎবতী বললে, আপকাবাস্তে কাংড়াসে মোল্‌কে লায়া!

খুলে দেখি কিসমিস। ব্যাপার কি?

মায়াদেবী বললেন, ব্রাহ্মণসন্তানের মুখবন্ধ করার চেষ্টা!

হেসে বললুম, আচ্ছা, ভয় পাবার দরকার নেই। ওখানে যে মেয়েকে একলা রেখে এলে?

বাচ্চা ঘুমিয়েছে।—সৎবতী হঠাৎ স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, ইন্‌কো কান পাকাড়কে কহিয়ে, দাদাজি—হিঁয়া ম্যায় দোদিন ঠহর যায়েঁ! পায়েরমে এৎনা দরদ মালুম হোতি হ্যায়।

মদনলাল ফস ক'রে বললে, সমঝিয়ে কি মুঝেকো গালি দেতা হ্যায়! ফাল্‌তু বাত করেগা ত' ফিন্‌ গাহানা ধর্‌ দেগা!

মায়াদেবী বললেন, সর্বনাশ, সৎবতীর হয়ে আমিই ক্ষমা চাইছি তোর কাছে, তুই গান ধরিসনে, মদনলাল।

হাসিতে মুখর হয়ে উঠলো সন্ধ্যারাত্রির সেই নিঃসঙ্গ বারান্দা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এবম্বিধ দ্বন্দ্ব-কলহ খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠছিল সন্দেহ নেই। মোট কথা, ওই ছয় হাজার টাকা খরচ না ক'রে মদনলাল কিছুতেই জলন্ধরে ফিরবে না। প্রায় চার মাস সে ঘুরছে, এখনও নাকি তা'র কাছে ছয় সাতশো টাকা আছে। তা'র ভ্রমণকালের মধ্যে ওই কচি মেয়েটার বয়স বেড়ে উঠলো।

উৎসাহী মদনলাল তা'র জিনিসপত্র নিয়ে এমহলে উঠে এলো। শীত পড়েছে বেশ সন্ধ্যার পর থেকে। দেখতে দেখতে মিসেস গুপ্তা আর সৎবতী মিলে দিব্যি দুদিনের মতো ঘর গুছিয়ে তুললেন। মদনলাল এমন সব ভোজ্যবস্তুর ফরমাস দিল ওই চৌকিদারকে ডেকে যে, পিত্রালয় হ'লে তাকে হয়ত বা জাতে ঠেলতো। সৎবতী ওসব খায় না, কিন্তু সে স্বামীকে সতর্ক ক'রে রাখলো, ফের যদি আমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করো তবে বাড়ী ফিরে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো,—ব'লে রাখলুম। বেতমিজ কাঁহাকা!

মদনলাল ওর মাথার লম্বা বেণীটা ধ'রে সকলের সামনে একবার টান দিয়ে পালিয়ে গেল। ওর কাণ্ড দেখে আমরা অবাক।

অনেক রাত্রে চৌকিদার ওরফে খানসামা ওরফে বাবুর্চি বাসনপত্রগুলি মেজে-মুছে গুছিয়ে রেখে বিদায় নিয়ে গেল। ওরা সবাই যে যার নেয়ারের খাটিয়া আশ্রয় ক'রে ঘুমিয়েছে। একটু আগে বৈজনাথের মন্দিরে ঘণ্টার শব্দ থেমে গেছে। আজ আর মন্দিরে ঢোকা হোলো না, কাল যথাসময়ে যাবো।

পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দজগৎ একেবারে স্তব্ধ। সামনের বড় পাহাড়টা দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে অতিকায় দানবের মতো। অমাবস্যার কাছাকাছি,—শুধু তারকারা জ্বল্‌ছে। সন্ধ্যার দিকে মেঘলা ছিল, এখন আকাশ পরিষ্কার। ক্ষীরগঙ্গা নীচে দিয়ে চলে গেছে অনেক দূর,—দুদিকের দুই অংশ তার মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে,—অনেকটা যেন আমার অতীত ও ভবিষ্যতের মতো। বুঝতে পারা যাচ্ছে শক্তি এসেছে ক'মে, বয়স যাচ্ছে ফুরিয়ে। বাকি রয়ে গেছে এখনও অনেক পাহাড়,—অনেক স্বর্গ আজও দেখা হয়নি। ক্লান্ত পা টেনে-টেনে চলছি, কেমন যেন উপলব্ধি করছি, সময় এবার ফুরিয়ে এলো। অনেক বাকি রয়ে গেল, অনেক ক্ষুধার তৃপ্তি হোলো না। পাথরের পাঁজরে-পাঁজরে আমার নিশ্বাস আর নৈরাশ্য ছুঁয়ে রইলো, চিরতুষারের প্রত্যেকটি ধবলশিখরে প্রণাম রেখে গেলুম,—ওরা মনের সামনে রয়ে গেল দেবসিংহাসনের মতো। একথা ব'লে যেতে পারবো, আমার পথহারা প্রাণ হারিয়ে গেছে হিমালয়ে বারম্বার। হারিয়ে গেছে কালী আর কর্ণালীর তীরে তীরে, শারদা-সরযূ আর অলকানন্দার কূলে-কূলে, বিষ্ণুগঙ্গা-মন্দাকিনী আর ভাগীরথীর তটে তটে। অমরাবতী থেকে সিন্ধু, অরুণ থেকে সপ্তকোশী, নীলধারা থেকে নীলগঙ্গা, চন্দ্রভাগা থেকে রামগঙ্গা, আমার অণুপরমাণু ছড়িয়ে রইলো সকল হিমালয়ে। আগামীকালের যারা তীর্থপথিক, যারা অভিযাত্রী, যারা মুমুক্ষু, যারা আত্মার অভিব্যক্তিলাভের ক্ষুধায় অস্থির হয়ে চ'লে এসেছে, যাদের দৃষ্টি চিরবিরহবেদনায় বিষণ্ণ, পরম পিপাসার জন্য সংসারের কোনও ক্ষেত্রে যারা মানানসই হয়নি,—তাদের জন্য রইলো আমার ওই চূর্ণবিচূর্ণ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ। তা'রা পদদলিত ক'রে যাবে, এই আমার আনন্দ।

পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম ডাকবাংলার খেলাঘর ফেলে। ওরা আঘাত না পায় সেদিকে চোখ ছিল। ভয় ছিল মনে, পাছে আমার তিলমাত্র বিরক্তি প্রকাশ পায়। ঘরকন্নাটা অস্থায়ী বটে, এবং ওটার আয়ু বড় জোর ছত্রিশ ঘণ্টা-মাত্র, কিন্তু ওটা বেমানান ব'লেই ভালো লাগছিল না। আমি চাইছিলুম বুনো পাথরের গন্ধ, যে-গন্ধটা জড়িয়ে থাকে লতাগুল্মে আর চীড়-দেওদারের বনে,

যেটা মিলিয়ে থাকে গিরিনদীর শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের তলায় তলায়,—সে-গন্ধ ডাকবাংলার ঘরের অজস্র তৈজসপত্রে আর বিলাসসামগ্রীর মধ্যে নেই।

ডাকবাংলাটি যারা নির্মাণ করেছে, তাদের সৌন্দর্যবোধ এবং সুরুচির তারিফ করি। এটি পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু একটি ত্রিকোণ পেয়েছে। তলা দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীরগঙ্গা, এবং ওপার দিয়ে এসেছে রেলপথ। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে প্রবল বন্যা নেমেছিল ক্ষীরগঙ্গা এবং বাণগঙ্গায়—তারই জলের ধাক্কায় ভেঙেছে পাহাড়ের গা এবং লোহার লাইন। ফলে, লাইন ঝুলছে উঁচুতে সঙ্কটজনকভাবে, গাড়ী চলাচল বন্ধ। এখান থেকে যোগিন্দরনগর নিকটেই। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মাইল পনেরো হবে। যোগিন্দরনগর তার জল-বিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্য একপ্রকার পৃথিবীপ্রসিদ্ধ বলা চলে। ধবলাধার পর্বতের ভিতর থেকে বহুদূর বিস্তৃত সুড়ঙ্গপথ ধ'রে এই জল প্রায় আটহাজার ফুট পাহাড় থেকে সবেগে নীচে নেমে আসে। সেই জল থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টির কাজ চলছে সর্বক্ষণ। 'উহল্' নামক একটি ভিন্নপথগামিনী নদীর থেকে এই জল নিত্য সরবরাহ হচ্ছে। এক শতদ্রু ভিন্ন হিমালয়ের বিশেষ অপর কোনও নদীকে নিয়ে এভাবে কাজে লাগানো হয়নি। যোগিন্দরনগর এজন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

পাঠানকোট থেকে রেলপথটি পাহাড়পর্বতের উপত্যকা পেরিয়ে নদী ডিঙিয়ে এঁকেবেঁকে এসেছে যোগিন্দরনগর পর্যন্ত। কিন্তু এখানেই তার শেষ। মোটর-পথ বরাবর এসেছে নাগরোটা পালামপুর বৈজনাথ হয়ে যোগিন্দরনগরে, এবং সেখান থেকে চ'লে গেছে দক্ষিণের মণ্ডিরাজ্যের দিকে। যারা দক্ষিণলোক হয়ে কুলু যাবার জন্য ঘুরে যেতে না চায়, তাদের জন্য একটি শর্টকাট্ এখানে আছে। কিন্তু এটি সুগম পথ নয়, এবং মোটর যায় না। পাহাড়ে যেমন সর্বত্র ঘোড়া, এখানেও তাই। তীর্থপথ হ'লে হেঁটে যেতো অনেকে, কিন্তু এখানে সেকথা ওঠে না। পাহাড়ীলোকেরা হাঁটে, পর্যটকরা ঘোড়া নেয়। এই পথ ধ'রে যোগিন্দরনগর থেকে কুলু অর্থাৎ সুলতানপুর হোলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল,—ঘোড়ায় গেলে দুদিনের কম হয় না। এই পথের মাঝখানে পড়ে ভাবুগিরিসঙ্কট,—সেখানে নয় হাজার ফুটেরও বেশী দুস্তর চড়াই পেরোতে হয়। চড়াই তখনই কষ্টকর, যখন সে হঠাৎ সামনে এসে হাজির হয়। যেমন খিলানমার্গ থেকে লাডাখের পথ কিংবা টানমার্গ থেকে গুলমার্গের চড়াই। ভাবুগিরিসঙ্কটের আগে আসে জাতিংরি, তারপর আরও মাইল বারো গেলে শীলভাদোয়ানী। শীলভাদোয়ানী থেকে ভাবুর চড়াই আরম্ভ। এখানে চারিদিক থেকে ধবলাধারের বিশাল চূড়ারা যেন বেষ্টন করতে থাকে। ওরই ভিতর দিয়ে পথও হারিয়ে যায়, মানুষও অদৃশ্য হয়। মাঝে মাঝে এমন নৈঃশব্দ্য যে, চমক লাগে; এমন অপার্থিব যে, হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়। আমাদের অভ্যস্ত চক্ষু শহর-নগরে স্বাচ্ছন্দ্য পায়, বড় জোর একটু বন-বাগান, বা নদী-প্রান্তর। কিম্বা ওরই মধ্যে একবার বিন্ধ্যাচল, অথবা একবারটি শীলং-দার্জিলিঙ। এখানে সে-রাজ্য নয়, এরা

পৃথিবীকে চেনে ধবলাধারের উপত্যকায়,—তার বাইরে সভ্যতার সংবাদ কমই শুনেছে। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায় কোথাও থেমে নেই। মানুষ জানতে যায় এবং চিনতে চায় ওরই ভিতর দিয়ে,—অসাধ্য এবং দুস্তর ব'লে ফিরে আসে না। রেলপথ আজ পর্যন্ত হিমালয়ে পৌঁছেছে সমুদ্রসমতা থেকে আট হাজার ফুট পর্যন্ত, মোটরপথ প্রায় গেছে দশ হাজার ফুট অবধি,—কিন্তু প্রকৃত হিমালয় সেই সীমানা থেকে আরম্ভ। দার্জিলিঙে ঘুম, হিমাচলের শিমলা এবং কাশ্মীরের বানিহাল গিরিসঙ্কট,—রেলপথ এবং মোটর এদের উচ্চতা থেকে আর এগোয়নি।

শীলভাদোয়ানী থেকে কারেওন হিমালয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মানুষের চেহারা নতুন, নতুন ধরণের সাজসজ্জা, নরনারী অতিশয় সুশ্রী,—কিন্তু মুখের কাটুনিতে আসে মঙ্গোলীয় ধরণের ছাপ; এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের সংসারযাত্রার চেহারাও বদলাতে থাকে।

কারেওন থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উৎরাই পথে নেমে কুলু উপত্যকায় পৌঁছনো যায়।

বস্তি-বাসিন্দা বৈজনাথ শহরটিতে কম। কিন্তু সমতল ক্ষেত্র পাওয়া গেলেই মানুষের বসতির সংখ্যা বেড়ে ওঠে। পাহাড়ীরা সমতল পেলে ভারি খুশী। সমতল পেলেই ওরা আগে বানায় মন্দির, একটি শিবস্থাপনা করে, তারপর পাথরের ডেলা সরিয়ে নরম মাটি বা'র করতে থাকে। এ কাজে মেয়ে-মরদ বালক-বালিকা—সকলের স্বার্থ সমান, সুতরাং কেউ ব'সে থাকে না। বলদ যদি না জোটে, নিজেরাই মাটি আঁচড়ায়; ঝরণা কাছাকাছি পেলে সেখান থেকে বিশেষ কৌশলে জল টেনে আনে,—তারপর শস্য ফলায়। পাহাড়ী ছাগল ওদের মাল বয়; ভেড়ার পাল পোষে,—তা'র লোম কেটে বানায় কম্বলের পোষাক। কিন্তু একটিমাত্র ভয় ওদের মনে জেগে থাকে, সেটি হোলো বন্যার ভয়। সমতল ক্ষেত্রে বন্যা স্ফীতিলাভ করে, তখনই ওদের সর্বনাশ। বন্যা এলে ঘরকন্না ক্ষেতখামার সব ফেলে ওরা উঁচু পাহাড়ে গিয়ে উঠে, এবং কখনও কখনও দেখা যায়, দিনে অথবা রাত্রে মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে একটি সম্পন্ন গৃহস্থ সর্বহারা হয়ে পথে বসেছে। তারপর চোখের জল মুছে আবার নতুন জীবনের সুরু। অদম্য উৎসাহে নরনারী আবার কোমর বেঁধে কাজে লেগে যায়।

আজ সন্ধ্যার পরে শীত পড়েছে বেশী। মদনলালের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন মিসেস গুপ্তা,—সারাদিন উনি নাকি হেঁটেছেন অনেক। সৎবতী বুঝি কোন্ রাস্তার ঢালু পথ বেয়ে ক্ষীরগঙ্গার ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে এসেছে তা'র ওই পায়ের ব্যথা সত্ত্বেও। মদনলাল নাকি ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে খানসামার হাত থেকে মুরগীর ডিমের অমলেট্ নিয়ে খেয়েছে। ব্রাহ্মণকন্যা সৎবতীর এবার জাত গেল! স্বামী একেবারে নাস্তিক। ও যেন আর কাছে না আসে।

সৎবতীর জন্য আমি সংগ্রহ ক'রে আনলুম ফল, রুটি আর মালাই। তাই দেখে কী হাসাহাসি সকলের। ওরা কেউ বিশ্বাস করে না, আমি গার্হস্থ্যধর্মী। তাড়া ক'রে এলেন মিসেস গুপ্তা,—এবার বুঝি কোমর বেঁধে প্রমাণ করবেন যে, আপনারও দয়াধর্ম আছে? কী সৌভাগ্য সৎবতীর!

সৎবতীও তেমনি। তা'র হঠাৎ ধারণা হয়ে গেল, আমি একজন অতি শুদ্ধাচারী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। সুতরাং সকলের নাকের ওপর তুড়ি দিয়ে এসে আমার সামনেই খেতে ব'সে গেল। মেয়েটার মাথার উপর দিয়ে পরিহাসের ঝড় বইতে লাগলো। মদনলাল গিয়েছিল যোগিন্দরনগরের ওদিকে, সেখান থেকে আমার জন্য অতি মূল্যবান একটিন সিগারেট এনেছিল, এবার সেটি উপহার দিল। সিগারেট নিয়ে সহাস্যে শুধু বললুম, সাবধান ক'রে দিচ্ছি, বৌকে আর জ্বালিয়ো না!

বৈজনাথের আশপাশ ঘুরে এসেছিলুম, কিন্তু রাত্রের দিকে শয়নারতি দেখার আকর্ষণ ছিল। মদনলাল আর সৎবতী ঘরে রইলো ওদের শিশুকন্যা রতনকে নিয়ে। মিসেস গুপ্তা যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চললো।

মোটর রোড পর্যন্ত যেতে হয় না, মাঠের ওপ্রান্তে মন্দির। রাত এখনও ন'টা বাজেনি, কিন্তু এরই মধ্যে পাহাড়তলী নিঃঝুম। পার্বত্য জীবনযাত্রা সন্ধ্যার সঙ্গেই নিঃসাড় হয়ে আসে। মেঘ জমেছে আকাশে। চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে এসে মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকলো।

মন্দির দেখে এমন সম্ভ্রমবোধ জাগেনি অনেকদিন। আমি যা খুঁজে বেড়াই, এখানে ঠিক তাই। বজ্রেশ্বরী দেখে এসেছি, কিন্তু তার গাঁথুনির চেহারা অনেকটা আধুনিক, তা'র সাজসজ্জায় হাল আমলের চিহ্ন। ছবি, ফটো, ঝাড়লণ্ঠন, মার্বেলপাথরের কাজ, এখানে ওখানে রংবাহার,—তা'তে ছাপ পড়েছে মাড়োয়ারীর। এখানে কিছু পৌঁছয়নি, একটি আলোও নয়। এমন দরিদ্র মন্দির সহসা চোখে পড়ে না; প্রাচীনের এমন বিশাল সৌন্দর্য বোধ করি সমগ্র পাঞ্জাবে কম। সামনেই বড় দেউড়ী,—সমস্তটাই প্রাচীন পাথরের। রংটা যেন ঘষা পয়সা। পাথরের সঙ্গে পাথরের জোড় আল্‌গা,—ফাটল বেরিয়ে পড়েছে ভিতর থেকে। ধূপধুনাচন্দনের গন্ধ নয়,—গন্ধটা যেন প্রাগৈতিহাসিক,—যে-গন্ধটা পাথরে-পাথরে, বট-অশ্বত্থের শিকড়ে, আনগ্ন দারিদ্র্যভূষণ সন্ন্যাসীর ধুনি-জ্বালনে, মুনি-কি-রেতির তপোবনে, চীরবাসা ভৈরবের মহিষমর্দিনীর গুহাদেউলে,—যে-গন্ধ বারম্বার পেয়ে এসেছি।

ছমছমে অন্ধকার, কিছু ভালো দেখা যায় না। কিছু অস্পষ্ট, কিছু ছায়াচ্ছন্ন, কিছু বা অজ্ঞাত,—কিন্তু ওরই ভিতর দিয়ে বৈজনাথের বিগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। সামনেই পাথরের বিশালকায় বলীবর্দ। কোলের কাছে নাটমন্দির, বিশাল

উঁচু তার খিলান্,—সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোনো সজ্জা নেই, অন্নবস্ত্র জোটে না বৈজনাথের, দান-ভিক্ষা কিছু মেলে না,—তিনি নিত্য উপবাসী।

শয়নারতির আয়োজন চলছে। দর্শনাথীর সংখ্যা অতি কম। দুচারজন পাহাড়ী স্ত্রীলোক, এক-আধজন শ্রমিক, দুএকটি ভক্ত। পূজারী ঠাকুরকে সাজাচ্ছেন গর্ভমন্দিরে ব'সে।

স্থানীয় লোক বলে, দুহাজার বছর আগে মহারাজা বিক্রমাদিত্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দির হিমালয়ের প্রাচীনতম দেবস্থানের অন্যতম। কেউ বলে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই মন্দির নির্মিত হয়। এর প্রকৃত নাম হোলো, বৈদ্যনাথ। ইনি শিবেরই প্রতীক্। পূজারী যিনি আরতির আয়োজন করছেন, তাঁর পূর্বপুরুষরা নাকি তিনশো বছর আগে বাঙলাদেশ থেকে এসেছিলেন।

শ্রীমতী গুপ্তা গিয়ে বসলেন গর্ভমন্দিরের দরজার কোণে। তিনি পরে-ছিলেন চওড়া কালাপাড় শাড়ী, তারই আঁচল গলায় জড়িয়ে হাত জোড় ক'রে বসলেন। তাঁকে যারা শ্রীনগরে এবং পহলগাঁওয়ে দেখেছে, তা'রা এই পূজারিণীর চেহারাটি দেখলে একটু অবাক হয়ে যেতো। আমার বিশ্বাস, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তিনি শ্রদ্ধায় এবং অনুরাগে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তখন থেকে একটি কথাও তিনি বলেননি।

শংখ, ধুনার পাত্র, কিছু ফুল এবং প্রদীপ—এই নিয়ে পূজারী আরতি করলেন। ধীরে ধীরে গুরুগুরু ডম্বরুধ্বনি করতে লাগলেন একজন সহকারী। দর্শনার্থী শান্ত, স্তব্ধমুখ। সেই ধ্বনিমহিমা গুরুগুরুরবে চ'লে যাচ্ছিল সমগ্র হিমালয় পেরিয়ে যেন মানবসংসারের দিকে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। উনি বৈদ্যনাথ, নিরাময় করবেন ধন্বন্তরির আশীর্বাদে। ধিক্কৃত বিকলচিত্ত হিংসাশ্রয়ী বৃহত্তর যে-মানবসভ্যতা পাশব প্রকৃতিকে আজ খুঁচিয়ে তুলতে চাইছে,—এই আরতির বীজমন্ত্র ওই ডম্বরুধ্বনির সঙ্গে হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে যাবে বৈদ্যনাথের আশীর্বাদ ও মঙ্গলবার্তা নিয়ে। মানুষের চিত্ত বিশুদ্ধ ও নির্মল হ'বে, প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটবে।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছিলুম। আরতি শেষ হোলো, কিংবা তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। এমন আত্মবিস্মৃতি সচরাচর ঘটে না। সবাই যেন বহুদূরে কোনও অজ্ঞাত লোকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এবার যেন সবাই আপন আপন দেহের মধ্যে ফিরে এলো। চেয়ে দেখি, শ্রীমতী গুপ্তা মন্দিরের পাথরের চৌকাঠে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করছেন দীর্ঘক্ষণ থেকে। সেই সহকারী ছোট পূজারীটি প্রদীপের পাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে সকলের মাথায় অগ্নির তাপ বিতরণ করছেন। নতমস্তকে সবাই গ্রহণ করছে সেই তাপ। শ্রীমতী গুপ্তা তাঁর আঁচলের গেরো খুলে যা কিছু সঙ্গে এনেছিলেন,

সবই প্রণামী দিয়ে দিলেন। দৃশ্যটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাঁর চোখে মুখে যেন দীপ্তি ফুটেছে।

নগরের সভ্যতায় আমরা মানুষ। প্রতি পদে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ওপর আবরণ টেনে বেড়াতে হয়। চল্‌তি কাল নিত্যই তার পাওনা আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফ্যাশনের সঙ্গে চলতে হচ্ছে, নিত্য নতুনের ঘূর্ণীপাকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, প্রতিদিন নিজেকে নতুন ছাঁচে ঢেলে মানানসই করছি। হাসিমুখে কথা বলছি তার সঙ্গে, যাকে একেবারেই পছন্দ করিনে; দুঃখ জানাচ্ছি তা'র কাছে, যে-ব্যক্তি কপট। জয়গান গাচ্ছি এমন ব্যক্তির, যে-অপদার্থ; তোষামোদ করছি তার, যাকে কুচক্রী ব'লে বিশ্বাস করি। নৈতিক আলোচনা করছি তারই সঙ্গে, যার লোভ এবং আসক্তি সুবিদিত। মেয়েদের বেলাতেও তাই। হীনতা জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে,—উপরে সরলতার আবরণ পড়েছে। কুরুচি এবং স্বভাবের বিকার পরিচ্ছদের পারিপাট্যে ঢাকা। অহঙ্কার এবং আত্মাভিমানে জরোজরো,—উপরে মিষ্টমুখের পালিশ। যথার্থ পরিচয়কে লুকিয়ে রেখেছে সঙ্গোপনে, বাইরে প্রতিপদে প্রতারিত করছে পারিপার্শ্বিককে। একটু স্নেহ, একটু অনুরাগ, একটু রঙ্গীন কটাক্ষ,—এই সব ছোট ছোট উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করছে অনুগ্রহপ্রার্থীদেরকে, চাতুরীর দ্বারা কার্য হাসিল করছে; কিন্তু এদেরই নাম দেওয়া হচ্ছে সামাজিকতা। যে-যত আত্মগোপন-শীল, সে নাকি ততই সামাজিক; যার প্রতারণা যত নিখুঁৎ সে নাকি ততই বুদ্ধিমতী। তথাকথিত সভ্যসমাজে সরলতা, সাধুতা, আড়ম্বরহীনতা, নিস্পৃহতা,—এরা পরিহাসের বস্তু। শ্রদ্ধা, অনুরাগ, স্নেহ, ভালোবাসা,—এদের বাজার-দর নেই। নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব, মহৎ আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম সেবা, অকৃপণ দাক্ষিণ্য,—এরা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। জীবনের এই সর্বনাশা বিকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যদি কেউ সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশে, তাকে আমরা বলি, বাতুল। সে আমাদের হাসি এবং উপেক্ষার পাত্র হয়ে ওঠে!

ফিরবার পথে শ্রীমতী গুপ্তা অভিভূতের মতো চলছিলেন। চৌকিদার যথারীতি আলোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে। তিনি একসময়ে বললেন, এমন ভাবে কোনও মন্দির কোনও দিন দেখিনি। ওঁর কাছে আজ রাত্রেই আমি চিঠি দেবো।

জবাব দিলুম না। সাড়া না পেয়ে মায়াদেবী আবার প্রশ্ন করলেন, আপনার কেমন লাগলো?

এবার আর চুপ ক'রে থাকা চলে না। বললুম, আপনি এত কষ্ট ক'রে এসেছেন, আপনার ভালো লেগেছে, এই আমার আনন্দ!

আমরা ডাকবাংলার বারান্দায় এসে উঠলুম। দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি আমাদের মুখে চোখে লাগছিল। রাত এগারোটা।

মদনলাল এবং সৎবতী ওদের বাচ্চাকে নিয়ে ঘুমিয়েছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করেনি। কিন্তু আশ্চর্য, বিদেশ-বিভুঁয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে শোয়নি। মদনলালের পাশেই আমার খাটিয়া পড়েছে। ক্লান্তি ছিল অনেক, সেজন্য আর কোনোদিকে না তাকিয়ে খাটিয়ায় উঠে কম্বল মুড়ি দিলুম। আলোটা হাতে নিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে মায়া চ'লে গেলেন পার্টিশনের ওদিকে, সৎবতীর খাটিয়ার পাশে। বুঝতে পারা গেল তিনি চিঠি লিখতে ব'সে গেলেন। বৈজনাথ দর্শন ক'রে তাঁর উদ্দীপনা বেড়ে গেছে।

কখন্ বৃষ্টি নেমেছিল মুষলধারায়, বুঝতে পারিনি। প্রত্যুষে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, আকাশ মেঘমলিন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়বার কথা, কিন্তু মদনলালদের কোনও তাড়া নেই। আগের দিনের ব্যবস্থামতো ভোরে উঠে মায়া প্রস্তুত হচ্ছেন, এবং আমার পক্ষেও আর অপেক্ষা করা চলবে না। বুঝতে পারা যাচ্ছে মদনলাল এবং সৎবতী এখানে দু'চারদিন থেকে যেতে চায়। মুখ তুলে একসময়ে মদনলাল মায়াদেবীকে উদ্দেশ ক'রে বললে, যায়েগা ত যায়েগা, ক্যা হায়? আরে, পহিলে চা পিয়ো ত সহি! এৎনা বারিষমে ক্যা,—মরনেকে লিয়ে যাতা হ্যায়?

চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া,—বকবক করিসনে!—মায়াদেবী তাকে ধমক দিলেন।

জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। চৌকিদারের কল্যাণে চা ও প্রাতরাশ ভাগ্যে জুটে গেল। এখানে মদনলাল তার বউকে নিয়ে রইলো। আগামী কাল ওরা যাবে মণ্ডী, সেখান থেকে কুলু। যদি ভাগ্যে থাকে, আবার দেখা হবে। এর পর পা ছোঁওয়া, প্রণাম ও কটূক্তি বিনিময়ের দ্বারা মায়াদেবীর সঙ্গে ওদের সহাস্য বিদায়সম্ভাষণ,—এতেও গেল মিনিট দশেক। আমরা চৌকিদারকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিলুম। সৎবতী তার স্বভাব-মধুর আলাপের দ্বারা বড় আনন্দ দিল।

বৃষ্টি কমেছে একটু, কিন্তু পড়ছে। ছাতা-বর্ষাতি কোনোটাই আমাদের নেই। ঠাণ্ডা প'ড়ে গেছে প্রচুর। এখন সকাল সাড়ে ছ'টা, সাতটায় মোটর বাস ছাড়বে। সুতরাং মদনলালের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হোলো। চৌকিদার এবং কুলি দুজন সঙ্গে চললো।

সামনের মাঠ এবং ঝোপ-ঝাপড়ার পাশ কাটিয়ে যখন বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছলুম, তখন গাড়ী ছাড়তে আর মিনিট দশেক বাকি। ওরা মালের ওপর তেরপল চাপা দিল। আমরা গাড়ীতে উঠে বসলুম।—

হিমাচল প্রদেশে আবার এসে প্রবেশ করলুম। বৈজনাথ ছেড়ে এলেই কাংড়া উপত্যকা শেষ হয়ে গেল। হিমাচল প্রদেশ আরম্ভ হোলো যোগিন্দর-নগরের এলাকায়। একটি শিখর পেরিয়ে তার শিরদাঁড়াপথ ধ'রে নতুন রাজ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললুম। বর্ষামেঘের ফাঁকে ফাঁকে এবার আকাশের নীলাভা দেখ্‌ছি।

বর্ষায় আর শরতে মেলানো পার্বত্যলোক। প্রভাতের কোমল রৌদ্রের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির ঝালর, রামধনুর রঙ্গীন ঝিলিমিলি। উত্তর থেকে দক্ষিণে আমাদের গতি। পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো ধবলাধারের তুষারশুভ্র চূড়া,—মহাকালের অতন্দ্র প্রহরীর মতো। কালোমেঘের বৃষ্টির ঝাপট লাগছে আমাদের মুখে চোখে,—এলায়িতকুন্তলা রমণীর ঝুরুঝুরু ভিজাচুলের রাশি যেন বুলিয়ে যাচ্ছে মুখে চোখে। প্রকৃতির এই পরিহাসের সংবাদ পেয়েছে পাখীসমাজ, তা'রা ওই রৌদ্র-বৃষ্টির খেলার মধ্যেও ডাক দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে হিমালয়ব্যাপী বিশাল শরৎবন্দনাসভায়।

বনচ্ছায়ার পাশ দিয়ে নির্ঝরিণীরা নেমে যাচ্ছে পাহাড়তলীর দিকে,—যেদিকে এখনও ছমছমে ছায়া রয়েছে দেওদারের বনে-বনে; যেখানকার সংসারযাত্রা এখনও তন্দ্রাজড়ানো। আমাদের গাড়ী চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ক্রমশ উপর দিকেই চলেছে।

গত কয়েকদিন খররৌদ্র ছিল কাংড়া উপত্যকায়। বৈজনাথ থেকে পেয়েছি স্নিগ্ধতা। কাংড়ার বনকান্তারের নিভৃত নিকুঞ্জে যেন কুসুমশয্যা রচনা করেছিলুম, কিন্তু সেখানে বাতাস ছিল অবরুদ্ধ,—সেজন্য ওখানকার বিহ্বল প্রকৃতির বাসকশয্যায় দরদর ঘাম ঝরেছিল কপাল বেয়ে, নিবিড় তৃপ্তির মাদকতা লাগেনি দুই চোখে। এখানে এলো অন্য চেহারা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রভাত-কালেই আসছিল দুই চোখে সুখের তন্দ্রা,—গত রজনীর ক্লান্তিশেষের মধুর অবসাদের মতো।

হিমালয় তা'র অন্তঃপুরের দ্বার খুলে দিচ্ছে ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টি-পথে। সেখানে তা'র প্রাণের ভাষা আছে গোপনে,—পরমাত্মীয় এসে না দাঁড়ালে সেই ভাষা অপর কারো কানে-কানে বলা চলে না। আমরা সেই পথে চললুম, যেটি তার গহনলোক, যেখানে বিপাশা নদীর তীরে নিভৃত শিলাসনে ব'সে চিরবৈরাগী ভারত আপন জপের মালায় বীজমন্ত্র পাঠ করছে। জরা, জন্ম, ও জাতকের অতীত যে-ভারত—যার আবহমানকালের ইতিহাসের প্রতিটি পর্ব প্রতি রুদ্রাক্ষদানার জপের সঙ্গে ফিরে-ফিরে চলেছে। এবারে আকাশ তা'র











চিওরাদেজোর প্রবেশপথে প্রথম টাওয়ার কক্ষ



নির্মল নীল শোভা বিস্তার করেছে। উপত্যকায় নেমে এসেছে রঙগীন পাখীরা,—যাদেরকে সচরাচর চোখে পড়ে না সমতল ভারতে।

ভারতের মানচিত্রে জটিলতা দেখা দিয়েছে হিমাচল প্রদেশের এলো-মেলো সীমানায়। স্বাধীন ভারতে এ প্রদেশটি নতুন, এখনও এর শৈশব কাটেনি। কিন্তু এর মর্মে মর্মে এসে প্রবেশ করেছে পাঞ্জাব; এবং এর সীমা-নির্দেশ করতে গেলে পাঞ্জাবের মধ্যে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে হয়। একটি অঞ্চল আরেকটির থেকে বিচ্ছিন্ন। একটির ছিট্‌মহল আরেকটির কোলে প্রবেশ করেছে। উভয়ের মধ্যে ভৌমিক সংলগ্নতা নেই। কুলু উপত্যকা পাঞ্জাবের অন্তর্গত, কিন্তু হিমাচলের এক অংশ থেকে পাঞ্জাবের মধ্যে না গেলে কুলু পৌঁছনো যায় না। চাম্বা এবং ডালহাউসী হোলো হিমাচলের অন্তর্গত, কিন্তু ডালহাউসী আজও কেন পাঞ্জাবের শাসনাধীন, এর জবাব কেউ দিতে চায় না। তবে এর কৈফিয়ৎ সম্প্রতি একটা পাওয়া গেছে। গল্পটা অবশ্য সেই পুরনো আমলের। পাঠান, তাতার এবং মোগলদের সঙ্গে রাজপুতনা কোনদিন পুরো-পুরি হাত মেলাতে পারেনি। এর ওপর ছিল আবার রাজস্থানীদের ঘরোয়া বিবাদ। কেউ কারো প্রাধান্য সইতো না, কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করতো না। অসমসাহসিক বীর্যবত্তা এবং মহৎ আত্মত্যাগে রাজপুতনার ইতিহাস যেমন গৌরবগর্বিত,—অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহবিবাদ, স্বজাতিদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং আত্মঘাতী অদূরদর্শিতাতেও সেই ইতিহাস কলঙ্কমসীলিপ্ত। এদের মধ্যে যারা ছিল অনেকটা নির্বিরোধ এবং স্বকীয়তাসম্পন্ন,—তা'রা তাদের ধন-রত্নসম্ভার, আত্মীয়পরিবারবর্গ এবং লোকলস্কর নিয়ে একে একে চ'লে যায় হিমালয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে তা'রা পার্বত্য আদিম অধিবাসীগণের সঙ্গে হাত মিলোয় এবং এক একটি অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক পাঠান এবং মোগলরাজশক্তি ওদের নিয়ে তেমন আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, কারণ তৎদিনে মুসলমানশক্তি সমতল ভূভাগে যতখানি আধিপত্য পেয়েছিল, ততখানিকেই তাদের বিনামূল্যের লাভ ব'লে মনে করেছিল। যাই হোক, রাজপুতরা হিমালয়ে গিয়ে ক্রমে ক্রমে কুড়ি পঁচিশটি রাজ্য সৃষ্টি করে এবং পাঞ্জাবী রাজ্যগুলির সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব রেখে পাশাপাশি বাস করতে থাকে। বিশাল এক একটি পর্বত এবং তৎসংলগ্ন এলাকা উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। উভয় পক্ষের এই সমুদয় পার্বত্য অঞ্চল এবং রাজপুতনার উত্তর, উত্তরপূর্ব, উত্তরপশ্চিম এবং পশ্চিম,—এই বিরাট ভূভাগ এই সেদিন অবধি অখণ্ড ও অবিভক্ত পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারতস্বাধীনতার সঙ্গে সমগ্র পাঞ্জাব প্রকাশ্যতঃ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিম পাঞ্জাব যায় পাকিস্তানে, এবং ভারতের অধীনে আসে বাকি তিন ভাগ। একটি পূর্ব-পাঞ্জাব, একটি হোলো পেপসু, এবং তৃতীয়টি হোলো হিমাচল প্রদেশ। পূর্বপাঞ্জাব এবং পেপসু হোলো হিন্দু-শিখপ্রধান, হিমাচল প্রদেশ হোলো

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় রাজপুত প্রধান। এ ছাড়া হিমাচল প্রদেশে মিলেছে নানা পার্বত্য-সম্প্রদায়। এই প্রদেশে সমতলভূভাগ একেবারে নেই বললেই চলে, এবং এটি প্রধানত উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত। এই পার্বত্য প্রদেশটির ভিতর দিয়ে পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদী প্রবাহিত,—শতদ্রু, বিপাশা এবং ইরাবতী। উত্তরে ইরাবতী, দক্ষিণে শতদ্রু, মধ্যভূভাগে প্রবাহিত বিপাশা। আমরা বিপাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। বন্য শতদ্রুকে ছেড়ে এসেছি একদা কিন্নর ও বুশাহর রাজ্যে।

ছোট ছোট বস্তি পার হয়ে যাচ্ছি। কোনোটা উঁচুতে, কোনোটা বা অনেক নীচে। জানতে পাচ্ছিনে ওদের সুখদুঃখ, ওদের ঘরকন্নার ইতিহাস। পায়ে হাঁটলে তবেই পর্যটন, নৈলে ছবি দেখে যাওয়া হয় মাত্র,—জীবনদর্শন ঘটে না। যারা বিমানে চ'ড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে,—তাদের প্রশ্ন করো, কিছু জানা যাবে না। পৃথিবী তাদের জন্য, যারা হাঁটতে হাঁটতে প্রতি পদক্ষেপ গুণেছে। মানুষের কাছে গিয়ে তা'রা বসেছে, আতিথ্য নিয়েছে, মন মিলিয়েছে, হাসিকান্নায় ব্যথা বেদনায় অংশ গ্রহণ করেছে। অতিথিকে নারায়ণ বলেছি তখন, যখন সে সেবা করেছে, আনন্দের প্রদীপ তু'লে ধরেছে, শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে, চোখের জল মুছে নিয়েছে। সে নারায়ণ, কেননা সে নিঃস্বার্থ, সে নিরপেক্ষ। পর্যটক হয় তীর্থপথিক, যখন সে বিশেষ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। যে-ব্যক্তি তীর্থের পর তীর্থ পায়ে হেঁটে পর্যটন করে তাকে আমরা বলি, পুণ্যাত্মা। তার পায়ে যে শুধু তীর্থধূলি লেগে থাকে তা নয়, সেই ধূলির মধ্যে মিলিয়ে থাকে মানুষের ইতিহাস,—দুঃখের, ঝড়ের, সঙ্কটের, দারুণের ইতিবৃত্ত; সেই ধূলির মধ্যে পাওয়া যায় ছোট ছোট মানবতা, ছোট ছোট মহত্ত্ব আর হৃদয়ানুরাগ, আত্মোপলব্ধি এবং দিব্যজ্ঞানের ছোট ছোট বিস্ময়াবিষ্কার। পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে যে-পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়, সে হোলো মুষ্টিভিক্ষার ঝুলি,—উপুড় করলেই তা'র শেষ হয়। কিন্তু অন্তর দিয়ে যা দেখেছি পায়ে-হাঁটা পথের দুই প্রান্তে,—সেই ত' পরম দর্শন, দরিদ্র দিনশ্রমিকের ঘরে বিদুরের অন্নগ্রহণ-কালে চারিদিকের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে যা জেনেছি, সেই ত' পরম জ্ঞান। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে দেখেছি আমরা, জীবের মধ্যে দেখেছি শিব, নরের মধ্যে নারায়ণ। ধর্মার্থের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে উপলব্ধির কথা। বস্তুকে সত্য ব'লে জানি, তাই বস্তুর ভিতর দিয়ে বিশেষ উপলব্ধির মধ্যে পৌঁছতে চাই। মাটির পুতুল সরস্বতী, কিন্তু তাকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞান ও বিদ্যার উপলব্ধি। ঐশ্বর্যকে লাভ করি,—লক্ষ্মী থাকেন আমাদের কল্পনায়। ঋষিকে দর্শন করি,—অনুভব করি দর্শনতত্ত্বকে। মানুষের অন্তর্নিহিত দৈবসত্তার সংস্পর্শে আসি, তাই ঈশ্বরকে কল্পনায় আনি। বস্তুকে ধারণ করি, ধারণ করি আকারকে,—তার ভিতর দিয়ে পৌঁছতে চাই বিশেষ লক্ষ্যে। জানাটাকেই সঠিক জ্ঞান বলে না,—উপলব্ধ সত্য হোলো জ্ঞান।

মানুষকে ফেলে যাচ্ছি পিছনে, তাই পদে পদে বঞ্চিত বোধ করছি। জানতে এসেছি হিমালয়কে, কিন্তু মানুষকে জানা হচ্ছে না। ওই চীড়বনের তলায় আসন পাতো, কিংবা ওই জাম্ববনের ওপাশে যেখানে প্রস্তরজটলার ভিতর দিয়ে নেমে চলেছে গিরিপ্রপাত,—ওখানে আসন বিছিয়ে প'ড়ে থাকো বাকি জীবন,—দেখে নাও এই হিমালয়ের জীবনধারা। একটি শিশু-বালক দাঁড়িয়ে গেছে থমকিয়ে পথের ধারে, দেখে নাও ওর চোখে হিমালয়ের পরম বিস্ময়। কাঠুরিয়া চলেছে মাথায় তা'র বোঝা নিয়ে, দেখে নাও অরণ্যের আশ্চর্য রহস্য। একটি আত্ম-অচেতন পাহাড়ী মেয়ে যৌবনসম্রাজ্ঞীর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে,—ওর মধ্যে হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্যসম্ভার আবিষ্কার করে নাও। ডালিম আর আপেলের বনের উচ্ছ্বসিত রক্তিম প্রগলভতা যেন এসে ওর গণ্ডে গ্রীবায় ললাটে অধরে আপন স্পর্শ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু কী জীবনযাত্রা ওদের পিছনে! কতটুকু সীমা, কতটুকু বা প্রয়োজনের জগৎ! পাথরখণ্ড একটি একটি সাজিয়ে তারই দেওয়াল, স্লেট্ পাথরের ছাদ, মাটির হাঁড়ি, লোহার বাসন, কম্বলের সজ্জা, আগাছার দড়ি-পাকানো চারপাই, দু'একটি টুক্‌রির মধ্যে খাদ্যের দানা, পুঁটুলির মধ্যে ভেলিগুড়, ভাঁড়ের মধ্যে নুন, লোহার গাগরায় পানীয় জল। ওরই মধ্যে চিরদারিদ্রা রাজকন্যার গৃহস্থালী, ওরই মধ্যে সর্বহারা রাজশিশুর জন্ম। এক টুক্‌রো ক্ষেত, দুতিনটি গরু মহিষ, পাঁচ সাতটি ভেড়া, গৃহপালিত একটি কুকুর, গোটা দুই-চার মুরগী, দু'একটি পোষা তিতির,—এরাও মিলে রয়েছে ওদের সঙ্গে। সুখী সেই পরিবার,—মালভূমির উপরে যাদের ক্ষেত-খামার,—যেখানে বন্যার ভয় নেই, সর্বনাশের আশঙ্কা নেই। যারা পাহাড়ের নীচের দিকে থাকে,—নিত্য উৎকণ্ঠায় তাদের দিন কাটে। এখানে পথের ধারে কেউ বা দিয়েছে ছোট্ট একটি দোকান—যারা ওরই মধ্যে একটু সম্পন্ন গৃহস্থ। ছোলার বরফির একটি পাত্র,—তার উপর বসেছে অসংখ্য রঙ্গীন বোল্‌তা, কিংবা মাটির সরায় কয়েকটি শুক্‌নো প্যাঁড়া,—যার রস টেনে শুষে নিয়েছে পতঙ্গের দল। কড়াইতে মহিষের দুধ জ্বাল দিচ্ছে ঘরের মধ্যে ব'সে কাজলনয়না গৃহস্থবধূ,—কাঠের তাড়ু ঘোরাচ্ছে ক্ষীরের পাকে-পাকে,—ওর থেকে প্রস্তুত হবে কালাকাঁদ। গৃহপালিত মার্জার পরম নিশ্চিন্তে প'ড়ে আছে বধূর চরণপদ্মে আপন গা ছুঁইয়ে—সেই পা দুখানি মেহেদি পাতার রসে রঙ্গীন। সংসার এখানে মন্থর-গতি, কর্মচক্রের ঘর্ঘরতা কোথাও নেই। শান্ত নিরিবিলি নিষ্কম্প পাহাড়ী জীবন,—উন্দামতার চিহ্ন দেখিনে কোথাও। এখানে লোভের পিছনে মদমত্ত মানুষ ছোটে না, দ্রুতগতির দ্বারা কেউ ঊর্ধ্বশ্বাস নয়। ধান, গম ও যবের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি, কোথাও দেখছি চা-বাগানের টুক্‌রো, কোথাও বা আলু ও আখের চাষ। একদিকে খদ, অন্যদিকে মালভূমি। দূরে উত্তুঙ্গ ধবলাধার,—তার কোলের কাছে শিশুপাহাড়-সম্প্রদায়।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের আর অরণ্যের ছায়া পড়ছে সেই গিরিসঙ্কটে। যেখানে

ছায়া, সেখানেই শীতল বাতাস। সেই ছায়া-ছমছমে জংগল-জটলার মধ্যে ঝিল্লীর ডাক বেড়ে ওঠে। ওরা তারস্বরে ডাকছে রাত্রিকে, ঘনতমসাচ্ছন্ন রজনী ওদের প্রিয়। কাঁচা ডালিম আর কমলার গন্ধ পেয়ে ছুটেছে পতংগের পাল। প্রজাপতিরা কিছু বিমর্ষ, ফুল ঝরে গেছে দ্রাক্ষাকুঞ্জে,—ওদের পাখার বিচিত্র বর্ণে তারই বেদনার রং জড়ানো। ধবলাধারের তলা দিয়ে আসে নীলগাই আর তুষারচিতা, অজগর আসে কাংড়ার অরণ্য পেরিয়ে, কুলুর ওপার থেকে আসে তিব্বতী পীতাভ ভালুক, আলুর ক্ষেতে ঘুরে যায় বন্য শূকর।

আমাদের গাড়ী ছুটেছে অনেক দূর। এই গাড়ী সারাদিনে দুবার আনাগোনা করে। পাহাড়ে-পাহাড়ে এইটি হোলো আধুনিক সভ্যতার সংবাদ। বিচিত্র সামগ্রী মাঝে মাঝে এসে পাহাড়ীদের কাছে পেঁছয়, সেই সব মনোহারী সামগ্রী-সম্ভার পাহাড়ী গৃহস্থের চোখে বিস্ময় আনে। এই একটিমাত্র পথ,—এর বাইরে শত শত মাইলের মধ্যে অপর কোনও প্রকার যান্ত্রিক যান-বাহন নেই। সেই কারণে সভ্যতার স্বাদ ওরা পায় না, যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন ওদের কাছে পেঁছয় না। হাট বসে ওদের পার্বত্য কোনো কোনো গ্রামে, সেই হাটে ফল কিনতে আসে দূরের মহাজন, সেই ফল সমতলে চালান্ যায়। ওই হাটেই বিক্রি হয় জন্তুর আর সরীসৃপের ছাল, পিতল অথবা রূপার অলংকার, বিভিন্ন ওষধি শিকড়, হাড়ের অথবা রঙগীন পাথরের মালা, লোহার বিবিধ অস্ত্র, ভেড়ার লোমের টুপি--কিম্বা মখমলের, তুলোর জামা, টিনমোড়া আয়না, কাঠের চিরুনী, আর হয়ত নাম্দা। আশ্চর্য, মেটে সিঁদুর ওখানে বিক্রি হয়, কিংবা রাঙগা রুলি আর আল্তা। ওরা শিবের পাশে শক্তিকে বসায়, রামের পাশে সীতা, বিষ্ণুর সংগে লক্ষ্মী। সর্বাপেক্ষা পূজ্য সংহাররূপিনী মহাকালী। জন্তু আর পাখীর মাংসে ওদের অরুচি নেই। ওরা সর্বপ্রধান উৎসব পালন করে দুর্গাপূজায় দশমীর দিনে—যেটাকে ওরা নাম দিয়েছে 'দশহরা।' সেদিন সমগ্র হিমাচল প্রদেশের প্রধান পাঁচটি জনপদ,—মণ্ডি, চাম্বা, মাহাসু, শিরমুর ও নব-সংযুক্ত বিলাসপুর,—এরা আনন্দে উদ্দীপনায় কর্মতৎপরতায় এবং প্রাচুর্যে নৃত্য করতে থাকে।

হঠাৎ চমক ভাঙলো,—মিসেস গুপ্তা মাথা তুললেন। পেট্রলের গন্ধ এবং চড়াই-উৎরাই পথের বাঁক—এতে তাঁর মাথা ঘোরে এবং অসুস্থ বোধ করেন। এতক্ষণ তিনি মাথা নীচু ক'রে চোখ বুজে ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, আর কত দেরি?

গাড়ী তখন উৎরাই পথে নামছে। বললুম, প্রায় এসে গেছি।

তাঁর চোখে ঘুমের ভাব ছিল,—গত কয়েকদিনের পথের ক্লান্তি ত' ছিলই। বললুম, আকাট শুক্নো মানুষের পাল্লায় প'ড়ে আপনাকে নাস্তানাবুদ হ'তে

হচ্ছে। মণ্ডিতে পৌঁছে কি খাবেন বলুন? খাওয়ার গল্প এখন ভালো লাগছে।

হাসিমুখে তিনি বললেন, অর্থাৎ ক্ষিধে পেয়েছে আপনার। চলুন, আমিই আপনাকে আজ খাওয়াবো। একটা সুবিধে এই, আপনার খাওয়ার কোনো বাছ-বিচার নেই।

তাই ব'লে এই ঠাণ্ডা দেশে ডাঁটাচচ্চড়ির খোঁজ করতে আমি রাজি নই।

তিনি খুব হাসলেন।

বিপাশা নদীর দিকে নেমে চলেছি। ওপারের পাহাড়ের কোলে-কোলে পাকাবাড়ী দেখা যাচ্ছে। ছোট ছোট বাসা,—ছোট ছোট স্বর্গ। এখানে ওখানে পায়ে-চলা পথ চ'লে গেছে,—কোথায় গেছে, কোনোদিন তাদের ঠিকানা জানা যায়নি। আমরা মুখ বাড়িয়ে সবটা দেখছি উৎসুক চোখে। কোনও অভ্যাগত কিংবা পর্যটক আশা করে না, এখানে শহর পাওয়া যাবে। হিমালয়ের এমন জটিল গহনলোকে এসে পড়েছি যে, মনে হচ্ছে, বোধ হয় হাজার বছর পিছিয়ে গেছি। সভ্যতার মেলা বসেছে জগৎ জুড়ে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চন্দ্রলোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, দশ হাজার মাইল দূরের মানুষ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আণবিক এবং অম্লযান বোমা পৃথিবীর বায়ু, বৃষ্টি, আবহ-স্বভাব ও শীতাতপকে পরিবর্তিত ক'রে দিচ্ছে—এ সকল খবর এদিকে কেউ জানে না। কিন্তু আমাদেরই ভুল। ওই বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ গৌরীশৃঙ্গের চূড়ায় উঠে নিশ্বাস নিতে পেরেছে, নিশ্চিত মৃত্যুকে পরিহার করেছে, সুমেরু প্রদেশে সভ্যতার স্বাদ পৌঁছে দিয়েছে,—সুতরাং এখানেও সেই জগৎজোড়া আধুনিকের ছিটেফোঁটা ঠিক্‌রে আসবে বৈ কি। আমরা উদ্গ্রীব হয়ে দেখছিলুম, শহর আসছে।

গাড়ী নেমে এলো উৎরাই পথে। একটি বাঁক পেরিয়ে পাওয়া গেল বিপাশা নদীর সাঁকো। অনেক নীচে বিপাশার গৈরিক স্রোত প্রবল উচ্ছ্বাস তুলে আবর্ত রচনা ক'রে চলেছে। দেখলে ভয় করে। আমাদের গাড়ী সাঁকোর উপরে উঠলো। এটি সেই একই ডিজাইনের সাঁকো,—ক্যান্‌টিলিভার ব্রীজ। দুই দিক থেকে পাহাড়ের দেওয়াল নিয়ে লোহার কাছি দিয়ে টানা। এটি নিরাপদ ওই কাছিগুলির জন্য। নীচের দিকে এর ভিত্তি থাকে না, কারণ পার্বত্য স্রোতের প্রচণ্ড ধাক্কা ভিত্তিকে চূর্ণ ক'রে দেয়। এই সাঁকো হিমালয়ে অসংখ্য। তিস্তায়, রংগীতে, লছমনঝুলায়, বিষ্ণুগঙ্গায়, ইরাবতীতে,—আরও নানান্ অঞ্চলে।

নদী পার হয়ে আমাদের মোটরবাস মণ্ডির মস্ত শহরে এসে প্রবেশ করলো,—শহর একটু দূরে। এপারে ওপারে বিশাল পাহাড়ের প্রাকার। বৃহতের দিকে তাকালে মানুষের সমস্ত কীর্তিকে অতি ক্ষুদ্র মনে হ'তে থাকে। চারিদিকের এই বিরাট পটভূমিতে মণ্ডি শহর দাঁড়িয়ে। অজানা থেকে অজানায় এসে পৌঁছলুম।

সামনেই চতুষ্কোণবিশিষ্ট ক্লক-টাওয়ার। সেখানে সময় নির্দেশ করছে, বেলা সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। কিন্তু উপরদিকে কানমোড়া ওই চতুষ্কোণ গম্বুজটি প্রথম প্রবেশপথে মন্দির পরিচয় বহন করছে। আমরা এসেছি উত্তর হিমালয়ের প্রান্তে,—যেখানে তিব্বতী স্থাপত্যের প্রকৃতি স্পর্শ করেছে। পশ্চিম তিব্বতের প্রভাব এখানে এসে পৌঁছেছে ভারতীয় মেজাজ নিয়ে। যেমন উত্তর কুমায়ুনে, সিকিম-ভূটানে, দার্জিলিং-কালিম্পঙে, পূর্ব ও উত্তর কাশ্মীরে এবং উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে। নেপালে এই স্থাপত্যের আদর্শ অংগাঙ্গিভাবে জড়িত। এমন কি কাশীর গঙ্গার কূলে সেই ছোট্ট পশুপতিনাথের মন্দিরটিও এই গঠনতন্ত্রকে ধারণ ক'রে রয়েছে। সমগ্র উত্তর হিমালয়ে তিব্বতী ও মঙ্গোল স্থাপত্যের প্রভাব অতি প্রবল।

শহর-বাজার জনবহুল। সমতল পথ-ঘাট রৌদ্রঝলোমলো। নানা পথ চ'লে গেছে নানান্ দিকে। ডাকবাংলা এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে, সুতরাং আমাদের পক্ষে একটি ভদ্র হোটেল পাওয়া দরকার। কুলির মাথায় লট্‌বহর চাপিয়ে আমরা একখানা টাঙ্গা ভাড়া করলুম। সহসা শ্রীমতী গুপ্তা কলরব ক'রে উঠলেন, কই, আপনি যে বলেছিলেন, আমাকে শশা খাওয়াবেন? এই দেখুন, একেবারে এক ঝুড়ি শশা নিয়ে বসেছে! কিনুন, কিনুন—

শশা কেনা হোলো সোৎসাহে। তিনি সহাস্যে বললেন, এটির দিকে তাকাবেন না! যদি আপনার আর্থিক সঙ্গতি থাকে, আরেকটি কিনতে পারেন।

তিনি না হাসিয়ে আর ছাড়লেন না। দু'আনায় দুটি মস্ত শশা কেনা হোলো। কিন্তু খোসা ছাড়াবার মতো সময় শ্রীমতী গুপ্তার হাতে ছিল না!

টাঙ্গা চললো দোকান্ বাজার এবং জনতার ভিতর দিয়ে হোটেলের দিকে। তিনি কথায়-কথায় মদনলাল এবং সংবতীর মুণ্ডপাত করছিলেন। কাছেই একটি প্রান্তর ও খেলার মাঠ। পথের এদিকটায় মহাজনদের পাইকারী বাজার, এবং নগরসভ্যতার সেই বিবিধ পণ্যবিপণি। আমরা ছিটকে এসে পড়লুম বাস্তব জগতে।

এক সময় টাঙ্গা থামিয়ে শ্রীমতী গুপ্তা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটি খুললেন, এবং গতরাত্রে লেখা একখানি চিঠি নিজেই গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে পুনরায় গুছিয়ে ব'সে তিনি বললেন, রাত জেগে আপনার কথাই লিখলুম দু'পাতা। আসল প্রশ্নটা করা হোলো না যে, উনি দিল্লী আসছেন ঠিক কবে! একটি বিষয়ে কিন্তু আমি ভাগ্যবতী,—এমন স্বামী অনেক মেয়েই পায় না।

এবারে আর চুপ ক'রে থাকা গেল না। বললুম, অনেক মেয়ে স্বাধীনতা পেলে স্বামীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়। আপনি কি তাদেরই একজন?

একেবারেই না!—শ্রীমতী গুপ্তা ব'লে উঠলেন, আমাদের বাড়ীতে উনি যেদিন আপনাকে নিয়ে আসবেন সেদিন দেখবেন, আমাদের ঘরকন্না! আমার

সমস্ত ব্যবস্থা আর ইচ্ছা-অভিরুচির সঙ্গে উনি মিলিয়ে থাকেন। উনি আলাদা মানুষ নন্।

স্বামীর প্রসঙ্গে উনি এত গৌরব বোধ করলেন যে, পুরুষমাত্রই আনন্দলাভ করবে। ওঁর একাগ্র তন্ময়তা দেখে একথা সহজেই বিশ্বাস করলুম, এই হিমালয় ভ্রমণ এবং চারিদিকের শোভা সৌন্দর্য ওঁর কাছে কত সামান্য! সত্যি বলতে কি, মুগ্ধ হয়ে গেলুম। এই ভ্রমণের ঠিক এক বছর পরে দিল্লীতে যেদিন তাঁর তরুণ স্বামী মিঃ গুপ্তর সঙ্গে প্রথম আলাপ হোলো, সেদিন অনুভব করেছিলুম শ্রীমতী গুপ্তার বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য। মিঃ গুপ্ত আমাকে তাঁর বাড়ীতে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবার আমার হিমালয়যাত্রা-কালে তিনি যে-বিস্ময় সৃষ্টি করলেন, তা'র কথা যথাসময়ে বলবো।

হঠাৎ সন্দেহ হয় তিব্বত এসে ছুঁয়েছে মণ্ডিকে। শুধু ওই চীন-তিব্বত স্থাপত্যের প্রতীক্ ঘড়িঘরটি নয়,—ওরা অনেক মন্দির ও দেবদেউলকেও ছুঁয়েছে। প্রায়ই দেখছি সেই ড্রাগনের মূর্তি,—সেই তীব্র দাঁত আর মুখব্যাদান, দুদিকে দুই ডানা। সিংহের কেশর, বাঘের দংষ্ট্রা, কুমীরের লেজ, গরুড়ের ডানা, এবং মানুষের ভঙ্গী। শিরা-উপশিরায় প্রচণ্ড তীব্রতা। সমগ্র গঠন, সমস্ত আয়তন,—সমস্তটা যেন বহির্ভারতীয়। কাঠের উপরে আশ্চর্য কারু-কার্য,—তা'র আঙ্গিক ও সুষমা, তা'র সুসঙ্গতি ও ছন্দ,—সারাদিন ধ'রে দেখলেও ইচ্ছা মেটে না। এর ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি বহু হিন্দু-মন্দির। উখীমঠ, ত্রিযুগীনারায়ণ, তুঙ্গনাথ, যোশীমঠ, বদরিনাথ,—প্রায় সমগ্র উত্তর গাড়োয়ালে এই। সমস্ত নেপালে এ ছাড়া কিছু নেই। সিকিমে ভূটানে এই। আলমোড়া নৈনীতালের অনেক অঞ্চলও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি।

বিচিত্র-পোষাক-পরিহিত এক আধজন লামা পথ পেরিয়ে যাচ্ছে। সৌম্য-দর্শন লামাকে দেখলে শ্রদ্ধা জাগে। ওরা এসে অনায়াসে এই ভূখণ্ডে মিলে গেছে। অনেক লামা পুরুষানুক্রমে বাস করে ভারতে,—যেমন অনেক চীনা। নৈনীতাল অঞ্চলের কোনো কোনো পার্বত্য ভূখণ্ডে একদল চীনার প্রচুর জায়গা জমি ছিল এই সেদিন অবধি,—পাহাড়ে পাহাড়ে ছিল কা'রো কা'রো জমিদারী,—আজ তা'রা আছে কিনা জানিনে। এ ছাড়া হূন, আরব, তাতার, এমন কি চেঙ্গিস খাঁর প্রশাখা বংশের ছিটে ফোঁটা,—এরা আজও আছে ভারতে। সেদিনও তাদের দেখে এসেছি পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমিতে। পৃথিবীর আর কোনও ভূভাগে ভারতের মতো বোধ করি এমন জাতি-বৈচিত্র্য নেই,—আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা,—কোথাও না।

অবশেষে যেমন-তেমন একটি হোটেল পাওয়া গেল। নামটি ঠিক মনে নেই, বোধ হয় 'স্বরাজ হোটেল' কিংবা অমনি কিছু। হোটেলের নীচেই বড় রাস্তা,

এইটিই প্রধান রাজপথ,—শহরকে বেষ্টন করেছে। পূর্বদিকে পথের ওপারে ময়দান, তার ওপারে একটি টিলা পাহাড়ের গায়ে সরকারি দপ্তর ইত্যাদি। এটি আগে ছিল রাজধানী, এখন এটি জেলা শহর। সামন্ত রাজার অধিকার দখল করেছেন ভারত সরকারের নিয়োজিত ডেপুটি কমিশনার। রাজা আছেন, প্রিভি-পার্স-ও তিনি পান্। কিন্তু এখন তাঁর দখলে সৈন্যসামন্ত অথবা অস্ত্রসজ্জা কিছু থাকার হুকুম নেই। বোধ হয় জন দুই চার বডিগার্ড তাঁর আছে, হয়ত বা এক আধটা পাখীমারা গাদা বন্দুক,—ওটা সঠিক জানিনে।

হোটেলে জিনিসপত্র নামিয়ে আমরা খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। দুধ, মিষ্টি আর শিঙগাড়ার দোকান পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, ক্ষুধা এবং অধ্যবসায় দুই আমাদের প্রচুর। আহার্যের পরিমাণ দেখে হয়ত স্বয়ং দোকানদারও আড়চোখে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে থাকবে। ভোজনান্তে পানের দোকান দেখে খুশী হলুম। মায়াদেবী পান খান না, কিন্তু নতুন দেশের সঙ্গে সুর না মেলালে চলবে কেন? এর পর আমাদের সময় ছিল কম। ওখানে মস্ত বড় কলেজ আর ইস্কুল—সমস্তই একে একে দেখা দরকার। তিনি ফল-পাকড়ের ভক্ত, সুতরাং পাহাড়ী মেওয়া ফল কিনে বসলেন এক ঝুড়ি। ঘুরে-ঘুরে দেখা গেল এপাড়া আর ওপাড়া। সরু সরু ঘিঞ্জি গলিপথ, ওরই মধ্যে বসবাস করে রাজপুত বংশের মেয়ে আর পুরুষ। মেয়েরা সুশ্রী, পুরুষ শ্যামবর্ণ, মাথায় রাঙ্গা পাগড়ি, পরণে চুড়িদার। মেয়েদের পরণে সাধারণত শাড়ী নয়,—পায়জামা, পাঞ্জাবী আর উত্তরী। গতকাল অবধি নাকি মস্ত হাট বসেছিল, আজও সেই ভাঙ্গাহাটের রাশি রাশি সামগ্রীসম্ভার পথে-পথে থৈ থৈ করছে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা গেলুম অনেক দূর। কিছুদূর এগিয়ে গেলে দুটি নদীর সঙ্গমস্থল দেখা যায়। যারা দেখেছে গাড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ আর রুদ্রপ্রয়াগ—যেখানে অলকানন্দা মিলেছে 'এসে নীলধারায়, অথবা মন্দাকিনী মিলেছে অলকানন্দায়,—তা'রা এ ছবি সহজে কল্পনা করবে। একটি নদী বিপাশা, অন্যটির নাম মনে নেই। শেষেরটি এসেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে,—ওরই পথ ধ'রে দক্ষিণে গেলে 'সুকেত' তথা সুন্দরনগরের বিশাল উপত্যকা। তারপর সেই পথটি আবার গিয়েছে দক্ষিণে—শতদ্রু নদী অতিক্রম ক'রে বিলাসপুর রাজ্যে। অধুনা বিলাসপুর হিমাচল প্রদেশেরই অন্তর্গত।

অনেক পথ রইলো বাকি, অনেক ছায়াবীথিকা রইলো অনাবিষ্কৃত, অনেক নিভৃত নিকুঞ্জলোক যেন পাহাড়ে পাহাড়ে হাতছানি দিল। চারিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, কিন্তু তা'রা দূরবর্তী। বাইরের পৃথিবী চোখে পড়ে না, কিন্তু এই হিমালয়ের প্রাকারঘেরা অবরোধের মধ্যেও এখানকার নিজস্ব জগৎটি সুপ্রসারিত।

বনময় পাহাড়তলীর পটভূমি,—তারই মাঝখানে মহাকালীর মন্দির; ওখান থেকে ডাক দিচ্ছে শক্তিকে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-অরণ্যে, উন্মাদিনী বিপাশার

তরঙ্গরণরঙ্গে। এদিকে ত্রিলোকনাথ, শহরের মধ্যে ভূতনাথ। এরা বহু প্রাচীন, সন-তারিখ হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। আরও আছে নানাবিধ দেবস্থান, আছে মূর্তি, আছে বিচিত্র স্থাপত্য—কিন্তু তাদের সেই অভিব্যক্তির সঙ্গে নিজের প্রকৃতিকে মেলাতে পাচ্ছিনে। এরা ওই তিব্বতী-চৈনিক-মঙ্গোলীয় নয়, এরা যেন আবার আগাগোড়া ভিন্নগোত্রীয়। এদের দেখিনি আগে, এরা ভারতের অন্য কোথাও নেই। সিকিমে-ভূটানে নেই, গাড়োয়ালে-নেপালে ওদের দেখিনি, উত্তর কুমায়ুনে-কিন্নরদেশে এধরণ নয়,—এরা নতুন। এরা আভাস দেয় অতি প্রাচীনের—যখন নদীতীরে ব'সে মানুষ প্রথম জপ করতে শিখেছে, শিলাতল ছেড়ে যখন মন্দির নির্মাণ কল্পনা করেছে,—হয়ত বা এরা সেই যুগের। সেকালের ভাস্কর্যের মধ্যে যে ভাষ্য থাকতো, যে-ব্যাখ্যা তা'রা ক'রে যেতো, পরবর্তীকালে সেই ভাস্কর্য হারাতো আপন অর্থ। কোনও শিল্পীর নাম নেই কোথাও, কেউ কখনও আপন স্বাক্ষর রেখে যায়নি। মহাকালের হাতে তুলে দিয়ে গেছে শ্রদ্ধার সঙ্গে, নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে গেছে। অজন্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছি পদ্মশিথান-শয়ান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ মূর্তি, বোম্বাই সমুদ্রগর্ভে হস্তীগুহার ত্রিমূর্তি, নেপালের স্বয়ম্ভূ, সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ, পূর্বলোকে কোনারক,—কোথাও কোনও শিল্পী রেখে যায়নি আপন স্বাক্ষর। অনেক স্থাপত্য আপন অর্থ হারিয়েছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বিস্ময়ের মতো। মণ্ডিতে এসে চমক লাগে, এ একেবারে নতুন, এর জাতিগোত্র সমতল ভারতে চোখে পড়ে না। পৃথিবীর কোনও দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মানুষের এই আত্মনিবেদন নেই; আনন্দ এবং সৌন্দর্য-বোধের দিকে বৃহত্তর মানবতাকে অনুপ্রাণিত করবার এমন দেশজোড়া স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের আয়োজন কোথাও নেই; মহাজনতার আনন্দ আর উদ্দীপনার জন্য তা'রা উৎসর্গিত।

পাহাড়ী দেশে সর্বত্র যেটি লক্ষ্য করেছি, এখানেও তাই। বিরোধ কোথাও নেই। সংসারযাত্রা নিরীহ। মানুষের মুখে কোনো উত্তেজনা দেখিনে, ছুটছে না কেউ, তাল ঠুকছে না কোনো প্রতিযোগী, কর্মব্যস্ততায় সংঘর্ষ বাধছে না, সমগ্র শহর যেন আনন্দের হাটে মিলেছে। হিমালয়ের হাওয়া মালিন্যকে দাঁড়াতে দেয় না।

অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে ঘণ্টা কয়েক আমরা পথে পথে ঘুরে বেড়ালুম। ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছিল একটি ধোবার দোকান, অর্থাৎ ডাইয়িং ক্লিনিং,—সেখানে মাত্র তিনঘণ্টার চুক্তিতে কতগুলি জামাকাপড় কাচতে দেওয়া হোলো। দোকানদার আমাদের সেই চুক্তি যথাযথ পালন করেছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে হোটেলে এসে উঠলুম। সর্বাগ্রে স্নানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। উপরতলায় এসে সচকিত হয়ে দেখি ঘরটি খোলা। আমরা ভয়ে চমকে উঠলুম। যাবার সময় তাড়াতাড়িতে কুলুপ লাগানো হয়নি। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই চোখ পড়লো টিপাইয়ের ওপর রুমালে বাঁধা শ্রীমতী গুপ্তার টাকার তোড়াটা,

ওটা তিনি ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমরা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। আরও কিছু কিছু মূল্যবান সামগ্রী ছিল এখানে ওখানে ছড়ানো।

পিছনে এসে দাঁড়ালো হোটেলওয়ালা, এবং জানালো আমরা ঘর বন্ধ ক'রে যাইনি, সেজন্য দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই,—সে এতক্ষণ এই ঘরের পাহারাতেই ছিল। তবে ব্যাপারটা এই, এ তল্লাটে কারো কিছু সহজে খোওয়া যায় না!

এমন শান্ত মিষ্ট কণ্ঠে সেই যুবকটি কথাগুলি আমাদের বুঝিয়ে দিল যে, আমরা অভিভূত হয়ে গেলুম।

রৌদ্র ছিল প্রখর, তাই সাবানসহযোগে স্নিগ্ধ শীতল জলে স্নান ক'রে সেদিন বড় আনন্দ পাওয়া গেল। কাংড়ায় হঠাৎ-আবির্ভূত অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ মহাশয় আমার অপরিচ্ছন্ন চেহারা ও পোযাকপত্র দেখে অত্যন্ত লাঞ্ছনা করেছিলেন, আজ তা'র সম্পূর্ণ প্রতিকার করতে বসলুম। দেখে শুনে শ্রীমতী গুপ্তা অত্যন্ত আপত্তিজনক পরিহাস ক'রে বসলেন,—করলেন কি? রাস্তাঘাটে সকাল থেকে যারা আপনাকে দেখেছে, তা'রা যে এবার চিনতে পারবে না? এমন দুর্মতি কেন হোলো আপনার?

আমার উচ্চহাস্যে তিনি জবাব পেয়ে গেলেন।

আহারাদি অল্পবিস্তর বাঙালী ধরনের। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত করায় যুবকটি জানালো, এখানকার খাদ্যরীতি মোটামুটি এই, তবে বনস্পতির তৈরী খাদ্য এখানকার ভদ্রসমাজ ছোঁয় না। দাল্‌দা খেয়ে পাহাড়ী লোকেরা তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। ওটা খেলে নাকি পরিণামে অন্ত্রনালী এবং যকৃতের সর্বনাশ ঘটে!

যুবকটির মুখে চোখে উত্তেজনার আভাস দেখে আমরা হাসি চাপবার চেষ্টা করছিলুম।

বেলা প'ড়ে এলো। আমাদের যাবার সময় হয়ে আসছে। ধোবার বাড়ী থেকে কাপড়চোপড় যথাসময়ে আনিয়ে নেওয়া হোলো। আমাদের গাড়ী ছাড়বে অপরাহ্ণে।

মণ্ডি অবধি যাত্রীর ভীড় থাকে। কারণ শহরটি বড়, এবং হয়ত বা শিমলার পরে দ্বিতীয় রাজধানী হয়ে ওঠার অপেক্ষা রাখে। এই শহরটি থেকে পথ গিয়েছে নানা পাহাড়ে এবং উপত্যকায়। পূর্বদিকে বিপাশা নদীর তীর ধ'রে গেলে প্রসিদ্ধ লারজি উপত্যকার দিকে যাওয়া যায়। এই লারজির পথটি আগে ছিল না। এটি শুধু অগম্য নয়, অসম্ভবও ছিল। একদিকে ছয় হাজার ফুট উঁচু পাথরের পাহাড়,—এবং সেই মৃন্ময়তাহীন পাথুরে পাহাড় অত্যন্ত সংকট-জনক অবস্থায় ঝুঁকে থাকতো বিপাশার স্রোতের উপর। সে-দৃশ্য আশ্চর্য, এবং প্রকৃতির এই অদ্ভুত চেহারার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করতে সাহস পেতো না।

সেদিন লারজির এই বিপাশা-পথ ধ'রে পায়ে হেঁটে কুলু উপত্যকায় যাওয়াটাও ছিল অতীব কষ্টকর। সেই কারণে কুলু যেতে গেলে যোগিন্দরনগর থেকে বেরিয়ে গুমা ও ঘাটাসানি হয়ে যাওয়াটাই ছিল অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। হিমালয় এখানে যেন তা'র আদিম অভিব্যক্তির দিকে পর্যটকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছে। আমরা অবাক হয়েছিলুম।

আমাদের গাড়ী ছাড়লো অপরাহ্ণে যথাসময়ে। কুলুর খ্যাতি ইদানীং কম নয়। অনেকে বলে, কাশ্মীরের পরেই কুলু। এর কৈফিয়ৎ আছে। ভূস্বর্গের সঙ্গে শোভা সৌন্দর্যের তুলনা নয়, এ ছাড়া অন্য কিছু,—যেটি পথিকের পক্ষে পরম বিস্ময়। আসামের উত্তরপূর্ব কোণে মিসমির অজানা অনামালোক ছাড়িয়ে যেখানে বিরাট নামচা-বারোয়ার সীমানা, চমলহরির নীচের দক্ষিণপূর্বে যেখানে ভূটানের অনাবিষ্কৃত এবং মানবচিহ্নহীন রহস্যগর্ভ হিমালয়, শতদ্রু যেখানে পথ কেটেছে শিপকির গিরিসংকট রংচুং এলাকায়—যে-পথ গিয়েছে কিন্নরলোক পেরিয়ে 'ধবলালিঙ্গের' শিখরে-শিখরে, অথবা উত্তর নেপালের জগৎপ্রসিদ্ধ অরুণ-নদ যে-পথ দিয়ে বিশ হাজার ফুট উঁচু পাথর কাটতে-কাটতে নেমে এসেছে,—লারজি এবং কুলুর পথে সেই ধরণের অতি-প্রাকৃত বিস্ময় প্রসারিত। আমরা তন্ময় হয়ে ছিলুম।

বোধ হয় স্থান-কালের প্রভাব পড়েছিল মনে। যে-ভারতবর্ষে বাস ক'রে এসেছি এতদিন, এখানে সেই ভারতবর্ষের ছায়া পড়েনি। অতি প্রাচীনের সংকেত রয়েছে এই সর্বকাল এবং সর্বলোক-বিচ্ছিন্ন হিমালয়ের অন্তঃপুরে। আমি আধুনিক ভারতের সংবাদ এনেছি ওর সামনে, কিন্তু কে শুনছে? অগণ্য শতাব্দীর যোগতন্দ্রায় যেন ওর নিমীলিত দৃষ্টি,—চোখে মুখে অনাদি-অনন্ত-কালের ক্ষমাস্নিগ্ধ শান্ত প্রসন্নতা। মাথা নত হয়ে আসে ওর দিকে তাকালে। একালের রুচি এনেছি সঙ্গে, এনেছি এযুগের বিজ্ঞানের অহঙ্কার, এনেছি আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আবর্জনাকুণ্ড থেকে অধঃপতিত প্রকৃতি বিকার, এনেছি জীবনের অনেক মালিন্যের ধিক্কার,—কিন্তু ওই প্রাচীন অচলায়তন ঋষির ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না! পুরুষপরম্পরায় এসেছে অনেক মানুষ ওর স্নেহচ্ছায়ায়, একটির পর একটি শতাব্দী ধ'রে দলে দলে তা'রা চ'লে গেছে, কত আধুনিক মিলিয়েছে কত অতীতে, কত ভবিষ্যৎ কতবার ঘুরেছে ওর চক্রতীর্থপথে,—কিন্তু নির্বিকার সুপ্রাচীন চেয়ে রয়েছে অপলকচক্ষু মহাকালের মতো, ভ্রূক্ষেপ তা'র কিছুমাত্র নেই। বিপাশার শিলাতলে, প্রাচীন মন্দিরের সোপানে, দেওদারের অরণ্যে, অমিতকায় পাষাণপৃষ্ঠের ভাস্কর্যে, প্রাক্‌বৈদিক ভারতের ছায়াসুনিবিড় অতীন্দ্রিয় চেতনায়—দেখে গেলুম ওই মহাযোগীর চকিত পদসঞ্চার; নিয়ে গেলুম আমার মর্মের রোমাঞ্চ শিহরণে তাঁর নিত্যকালের বাণী : শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌!

ঠিক মনে নেই, আন্দাজ মাইল খানেক দক্ষিণে এসে একটি ঘাঁটি-পাহারা, অর্থাৎ চেক্-পোষ্ট পড়ে। এখানে একটি পুরাতন সাঁকো পেরোবার কালে ড্রাইভারকে সতর্ক করা হয়। একটি লোক পিঠে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে গাড়ীর আগে-আগে হেঁটে চলে, অর্থাৎ স্পীড একেবারেই দেওয়া চলবে না। যদি স্পীড দাও, তবে লোকটিকে চাপা দিয়ে যাও। নীচের দিকে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে প্রবল পরাক্রমে মাতামাতি করছে মদমত্ত বিপাশা,—গৈরিক তরঙ্গ তা'র চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে পাথরে-পাথরে। এটি হোলো দুই নদীর সঙ্গম। সম্ভবত যে-বৃষ্টি হয়ে গেছে গত দুদিন পাহাড়ে-পাহাড়ে, তারই দুরন্ত স্রোত সংহার-মূর্তিতে নামছে দুই ধারায়। ওদের আঘাত-প্রতিঘাতে, সংঘর্ষে, তাড়নায়, হিংস্রতায় এবং বিপ্লব-বিক্ষোভে উৎক্ষিপ্ত শিকরকণায় মুহুর্মুহু ধূম্রজাল সৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ওই আত্মঘাতী প্রাণযন্ত্রণার দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল আরোহীরা।

সাঁকো পেরিয়ে গাড়ী ঘুরলো ডানদিকে এবং ওই ডানদিকেই বিপাশার তীরে-তীরে চললো অতি সংকীর্ণ পথ লারজির দিকে। কুলু উপত্যকায় যাবার এইটিই একমাত্র মোটরপথ।

পথের চেহারা ভালো নয়,—সরু এবং কর্কশ। এমন অসমান যে, মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়। মোটরবাসটি আরামদায়ক নয়। যত বেগে চলে, শব্দ হয় তা'র চেয়ে বেশি। পথটি একতরফা, অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে কোনও গাড়ী আসবে না। বিপাশা এখানে ঘুরেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পূর্বে, তারপর পুনরায় গেছে উত্তরে। আমাদের গতি স্রোতের বিপরীত দিকে।

গাড়ীর মধ্যে উঠেছেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা এবং তাঁর পাশে একটি যুবক। নিঃসন্দেহ, মাতা ও পুত্র। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। এবার ভালো ক'রে না তাকিয়ে পারা গেল না। মহিলাটি বয়সে প্রবীণ, কিন্তু তাঁর আর্যজনোচিত দৈর্ঘ্য, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, শরীরের ধবধবে রং, মিহি বেগুনী মখমলের গাত্রাবরণ, তাঁর আগুল্‌ফলম্বিত শুভ্রবর্ণের গাউন, মাথায় রেশমী ওড়না এবং পায়ের দিকে শাদা মোজা ও ক্যাম্বিশের জুতো,—এদের সঙ্গে তাঁর স্থির শান্ত এবং নির্বিকার চাহনি, সবগুলি মিলিয়ে এমন একটি সম্ভ্রমসূচক ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, যেটি এমন ক'রে আগে দেখিনি। পাশের যুবকটির বয়স অল্প, সে গলাবন্ধ কোট এবং চুড়িদার পরেছে। সবাই মিলে গাড়ীর মধ্যে বসেছি, কিন্তু মহিলার মাথাটি উঠেছে সকলের মাথা ছাড়িয়ে। সকলেই আমরা তাঁর কাছে যেন ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে গেছি। দীর্ঘ বাহু, বিস্তৃত স্কন্ধদেশ, চওড়া মুখের চোয়াল, মাথার উচ্চতা, ছাড়ালো দুই পা,—আর কেউ না হোক, আমি নিজে অবাক। আরেকটি বস্তু ছিল তারিফ করার মতো। তাঁর সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদে লাল, সবুজ, পীত, কৃষ্ণনীলাভ, গৈরিক,—ইত্যাদি বিবিধবর্ণের এমন

সুন্দর সমাবেশ ছিল যে, আমার কৌতূহলের সীমা ছিল না। তাঁর এই অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে সমগ্র গাড়ীখানা যেন অভিনব গৌরব লাভ করছিল।

তাঁকে কেউ দেখছে না, কেবল আমি লক্ষ্য করছি,—এটি শ্রীমতী গুপ্তার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি এক সময় গলা নামিয়ে বললেন, দেখছেন কি? উনি পণ্ডিতানী!

কে?

পণ্ডিতানী! কাশ্মীরী পণ্ডিতবংশের মহিলা! ব্রাহ্মণের মেয়ে। দেখছেন না,—তীর্থে যাচ্ছেন?

বললুম, আপনি চিনলেন কেমন ক'রে?

বাঃ—শ্রীমতী গুপ্তা বললেন, তিন বছর হয়ে গেল আমি আছি কাশ্মীরে; ওদের নিয়ে ঘর করেছি,—আমি জানিনে? আপনি যা হুড়োহুড়ি করলেন, কাশ্মীরে আপনার কিছুই দেখা হোলো না। তা ছাড়া এমন লোকের কাছে আতিথ্য নিলেন, যার ঘরকন্না বানের জলে ভেসে গেল! সব লেখকেরই কি আপনার মতন কপাল মন্দ?

হেসে উঠলুম। এবার চড়াইপথে গাড়ী উঠছে, সুতরাং শ্রীমতী গুপ্তার বাক্যালাপ থেমে গেল। তাঁর ঘূর্ণী লেগেছে। তাঁর কথাটা কিন্তু সত্য, কাশ্মীরের একটি বিশেষ শ্রেণীকে দেখা হয়নি,—যাঁরা বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে সুখ্যাত। তাঁরা বিশেষ শুদ্ধাচারী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। তাঁদের মহিলারা প্রায়শই থাকেন লোকলোচনের বাইরে, শ্রমজগতে এবং জনতার হট্টগোলে তাঁদেরকে দেখা যায় না। তাঁরা অধিকাংশই অভিজাত এবং সম্পদ্‌শালী। এই মহিলাটি সেই সমাজেরই। মাতা ও পুত্রের মুখে-চোখে এমন সুশিক্ষার দীপ্তি এবং প্রসন্ন নম্রতা অভিব্যক্ত যে, আমি অভিভূত হয়ে ছিলুম। কেউ যদি বলতো, পায়ের ধূলো নাও,—আমি রাজি হতুম।

পথ ক্রমশঃ সংকটাপন্ন হচ্ছে। একখানি মাত্র ছোট বাস যাবার মতো অতি সংকীর্ণ পথ। একদিকে গভীর খদ—আমাদের পায়ের নীচে। বিপাশার প্রচণ্ড রণরঙ্গস্রোত বয়ে চলেছে সেই খদের তলায়। একটি অসতর্ক মুহূর্ত, ব্যস—আমাদের গাড়ী ছিট্‌কে পড়বে দেশালাইর বাক্সের মতো পাঁচশো কিংবা হাজার ফুট নীচে,—অবধারিত মৃত্যু! পাহাড়ের পাথর ঠিক যেন অতিকায় সর্পের ফণার মতো মাথার উপরে ঝুলছে। সামান্য খোঁচা যদি লাগে, চলন্ত গাড়ী সেই ধাক্কা কোনোমতেই সামলাতে পারবে না,—টাল খেয়ে ছিট্‌কে যাবে বিপাশায় তলিয়ে। মাইলের পর মাইল এই বিপজ্জনক পথ ধ'রে গাড়ীখানা হোঁচট খেয়ে খেয়ে চললো, এবং আমরা আকণ্ঠ উদ্বেগ, শংকা, অস্বস্তি এবং আতঙ্ক নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কাঠ হয়ে রইলুম।

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য উদ্বেগ ও ভয়ের কথা ভুলে যেতে পারলে এমন একটি রূপজগৎ তা'র রহস্য আবরণ উন্মোচন করতে থাকে যে, আপন অস্তিত্বকে

অবাস্তব মনে হয়। হঠাৎ এসে পড়েছি একটি মায়াচ্ছন্ন লোকে। প্রত্যেকটি পার্বত্য গুহা পেয়েছে মন্দিরের আয়তন, এবং অজস্র বিচিত্র পুষ্পলতা ও গুল্মে আকীর্ণ সেই সব গুহালোকের ভিতরে যে নিঃশব্দে পূজার্চনা চলছে, এটি বিশ্বাস করতে মন প্রবৃত্ত হয়। বিশাল প্রাচীন এক একটি পাথরের স্তবক অবিকল ঋষির আকারলাভ করেছে, এবং আকাশের মেঘস্তূপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে আমরা যেমন নানাবিধ অতিকায় জন্তু এবং বিরাট দেব ও দানবের ছবি চিনে-চিনে বা'র করি,—এখানেও তাই, স্পষ্ট চক্ষে দেখতে পাচ্ছি মুনি ঋষি যোগী এবং অতি-মানবকে। ওরা সবাই যেন স্থির হয়ে আছে, চেয়ে দেখছে নতুন কালের মানুষকে। অসংখ্য প্রপাত এবং নির্ঝরিণী নামছে ওদেরই জটা থেকে, ওদেরই বুকের উপর দিয়ে। এই অতি-প্রাকৃত বিস্ময় একবার মাত্র দেখে এসেছি অমরনাথের তীর্থপথে মহাগুনাস গিরিসংকটে—যেখানে পথের পাশেই একজন 'যোগীশ্রেষ্ঠ' দাঁড়িয়ে। প্রবাদ, তিনি নাকি ছয় হাজার বছর আগে ওদিকে গিয়েছিলেন, এবং পথের শোভা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যান্। তাঁর শরীর হিম-তুষারে আচ্ছন্ন হয়, এবং কালক্রমে সেটি প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। অজস্র ফুলের বিবিধ বর্ণে ও গুল্মলতায় তাঁর বিশাল দেহ ছিল আকীর্ণ। অবাক হয়ে দেখেছিলুম অনেকক্ষণ। এখানে ভিন্ন কথা। সমস্তটাই যেন জীবন্ত, প্রাণময়। বুঝতে পাচ্ছিনে ওদের ভাষা, জানতে পারছিনে ওদের ওই নিঃশব্দ সমাজকে। ঠিকমতো ধরতে পারছিনে আমার অস্তিত্বটা সত্য, কিংবা ওদের ওই নিত্য জাগ্রত অবস্থানটাই বাস্তব। আমি নিজে রূঢ় বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ, আমার এই মতিভ্রম দেখে হাসবে সবাই,—যারা বিজ্ঞানী। কিন্তু এখান দিয়ে পেরোবার সময় তা'রা সত্যি হাসবে কি? যেটা আমার জ্ঞান এবং বুদ্ধির অতীত, সেটাই কি অবিশ্বাস্য? যেটি আজও জানতে পারিনি, সেইটিই কি অশ্রদ্ধেয়? এ অহঙ্কার কেন?

আত্মা সর্বব্যাপী,—বিজ্ঞানের এইটি শেষ আবিষ্কার। প্রাণ আছে পাথরে, হাওয়ায়, পরমাণুতে, চৈতন্যবিন্দুতে,—এই হোলো বিজ্ঞানের সর্বশেষ আলোক-সম্পাত। সেই বিন্দুর বিদারণ মানেই সেই প্রাণের বিস্ফোরণ। সবাই বলছে, থামাও আণবিক আর অম্লজান বোমা,—নৈলে সৃষ্টি রসাতলে যায়! যে-অণুর দ্বারা মানুষের সৃষ্টি, সেই অণুতেই পাথর তৈরী। প্রথমটায় পেয়েছি সৃষ্টির পরম বিস্ময়, দ্বিতীয়টা অনাবিষ্কৃত। পাথর কথা কইবে, গাছের ভাষা শুনবো,—এরই জন্য আজ প্রস্তুত হচ্ছি। একশো বছর আগে কেউ ভেবেছিল মানুষ উড়বে, বেতারে গান গাইবে, পর্দায় মানুষের চেহারা নড়বে এবং তা'র প্রকৃত কণ্ঠস্বর শুনবো? যাদেরকে এতকাল ধ'রে বলা হয়েছে, জড়,— তা'রা কি জড়তা ঘোচায়নি? 'অসম্ভব' কথাটা কি আজও থাকবে অভিধানে?

বন্য গোলাপের ঝাড়, আপেল ডালিমের বন, স্লেটপাথরের পাহাড়, কর্কশ শিলাসম্ভার, রহস্যগর্ভ গুহাপথ এবং আতঙ্কসঙ্কুল বিপাশার খদ,—এদের ভিতর দিয়ে কুলুর দিকে গাড়ী চললো।

॥ ৫ ॥

প্রাচীন ঋষিকুলের মধ্যে প্রধানত আমরা দুজনকে পাই যাঁরা প্রচুর পরিমাণে হিমালয়ে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহাভারত-রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস; অন্যজন সূর্যবংশের রাজগুরু মহামুনি বশিষ্ঠ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য খুঁজে ফিরতেন, এবং পছন্দসই একটি অঞ্চল পেলেই তিনি নদীতীরের শিলাসনে, কিংবা ছায়াচ্ছন্ন গুহাভ্যন্তরে, অথবা কোনও নির্জন তুষারচূড়া নির্বাচন ক'রে নিতেন। রাজগুরু বশিষ্ঠ ত্রেতাযুগের মানুষ ছিলেন। তিনি ভালোবাসতেন তপোবন, পুষ্পাঙ্গন,—এবং একখানি কুটীর। বশিষ্ঠ ছিলেন আশ্রমিক, সুতরাং তিনি যেখানেই গেছেন, একটি ক'রে আশ্রম সৃষ্টি করেছেন। আসামের হিমালয় থেকে কাশ্মীরের হিমালয় অবধি রাজগুরু বশিষ্ঠ অনেকগুলি আশ্রম পরিচালনা করেছিলেন। নবতন একটি আশ্রমসৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে তিনি একদা আসেন হিমাচলের এই অন্তঃপুরে, কুলু উপত্যকার উত্তর প্রান্তে। এখানকার হিমালয়ের অত্যাশ্চর্য নিসর্গ শোভা দেখে তিনি ভাবস্থিত হয়ে যান্ এবং হিমালয়ের কঠোর তপস্যায় যোগস্থবির হন্। সেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রে তিনি উত্তর কুলুর একটি অতি মনোরম নিভৃত অঞ্চলে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কুলুর অন্তর্গত মানালি জনপদ থেকে দুমাইল দূরে রাজগুরু বশিষ্ঠের কুণ্ড ও আশ্রম আজও বিদ্যমান।

ত্রেতা এবং দ্বাপরের মধ্যে কালের ব্যবধান কত, আমার জানা নেই। পাঁজিতে যাই থাক্, অন্তত হাজার দশেক বছর হবে সন্দেহ কি! দ্বাপর যুগে মহর্ষি বেদব্যাস একদা বেরোলেন হিমালয়ে। কিন্তু কূর্মাচল তথা কুমায়ুন গিরি-শ্রেণীর এখানে-ওখানে ছাড়া মহর্ষি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আর বিশেষ কোথাও রেখে যাননি। ব্রহ্মপুরার ভূখণ্ডে ব্যাসদেব সর্বত্র নিত্যস্মরণীয় হয়ে আছেন।

দ্বাপর যুগের স্মরণাতীত কালে হয়ত মহর্ষি বেদব্যাসের মনে এ কৌতূহল এসে থাকতে পারে যে, রাজগুরু বশিষ্ঠ কোন্ স্থলে গিয়ে হিমালয়ের দেবতাত্মাকে এমন ভাবে আবিষ্কার করলেন! হয়ত পুরাকালের মনস্তত্ব ছিল ভিন্ন রকমের। সেকালে হয়ত মানুষের সর্বাঙ্গীন যোগ্যতা প্রমাণিত হোতো অতিমানবতার অভিব্যক্তিতে। তপস্যার কঠোরতা এবং সিদ্ধিলাভ, এই ছিল হয়ত নেতৃত্বের প্রকৃত কষ্টিপাথর। মহর্ষি বেদব্যাস সম্ভবত তাঁর পূর্বাচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এই হিমালয়ের পরমাশ্চর্য এবং অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মানালি থেকে দুমাইল দূরে যেখানে বশিষ্ঠের নামে একটি গন্ধকমিশ্রিত উত্তপ্ত জলের প্রস্রবণ বিদ্যমান, সেই পর্যন্ত গিয়ে মহর্ষি থেমে যাননি। হিমালয়ের মায়াবিনী প্রকৃতি এবং আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ তাঁকে

আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায় আরও দূর উত্তরের ভূস্বর্গলোকে। সেই লতাগুল্মহীন প্রাণীচিহ্নবিহীন তুষারশৃঙ্গে আরোহণ ক'রে তিনি দেবলোকের এবং ব্রহ্মলোকের সন্ধিদ্বার উন্মোচন করেন। পরবর্তীকালে সেই তুষারচূড়ার নাম রাখা হয় ব্যাসঋষিশৃঙ্গ!

ঠিক মনে নেই, মণ্ডি থেকে সুলতানপুর অর্থাৎ কুলুশহর বোধ করি আটত্রিশ মাইল পথ। পথ শুধু নতুন নয়, পৃথিবী নতুন, মানুষও নতুন। এদেরকে কাংড়ায় দেখিনি, হিমাচলেও দেখিনি,—এরা সাজসজ্জা সম্পূর্ণ বদলিয়ে অভিনব চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্নরদেশকে মনে পড়ছে, কিন্তু এরা তা'রা নয়। এমন শিরোভূষণ দেখিনি আগে,—তিব্বতকে যেন কোমল ক'রে এনেছে! রংয়ের বৈচিত্র্য মাথায় ধ'রে এনেছে সবাই। আকাশ থেকে রং পেয়েছে, রক্ত গোলাপের থেকে ধার করেছে, এনেছে বাসন্তীবর্ণ শৈলউপত্যকার বসন্তবাহার থেকে, মেয়েদের চোখ থেকে পেয়েছে অতল কৃষ্ণাভা, আনারকলি থেকে ধার করেছে রক্তবরণ। মাথার টুপি দেখে আমরা মুগ্ধ হয় গেলুম।

তিব্বতী গুম্ফার চতুষ্কোণ গম্বুজে চারটি কোণ যেমন একটু উপর দিকে মোড়া,—এই সুন্দর টুপিগুলির দুই 'কোণ' উপরদিকে ঠিক তেমনি ক'রে একটু মোচড় দেওয়া। তার উপর বর্ণাঢ্যতার ওই বাহার। বর্ণ-সমন্বয় ও সুষমাছন্দে অনেককে ওরা যেন হার মানিয়েছে। পথের মেয়েরা অকারণ হেসে আপন মনে চলেছে। কারো মাথায় কালো, কারো বা লাল কাপড়ের টুক্‌রো কপাল ঘিরে ফেট্টি বাঁধা। পোষাক প্রায়ই শাদা কম্বলের, একটু শীত পড়লে সূতিবস্ত্র ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

মায়াদেবী কুলুর টুপি দেখে মুগ্ধ হলেন। বললেন, আমিও ঘুরেছি নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু এধরণের টুপি দেখলুম এই প্রথম। গোটা দুই কিনে নিয়ে যাবো।

ডালিমের বন পাশে পাশে চলেছে। অপরাহ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পথহারা রঙগীন প্রজাপতিরা এখনও বাসা খুঁজে পায়নি। ডালিম আর আনারের বনে তা'রা এখনও ঘুরছে।

পথ সঙ্কটসঙ্কুল। গাড়ী চলছে অতি সতর্ক হয়ে। পাহাড়ের অতিকায় পাথর এক এক স্থলে এমন ক'রে ঝুলছে যে, দেখলে ভয় করে—পাছে গাড়ীর চালের সঙ্গে তাদের ঘর্ষণ লাগে। পায়ের নীচে বিপাশার খরস্রোত পাথরে পাথরে প্রবল কলহ বাধিয়ে ছুটে চলেছে। কাশ্মীরের সেই পণ্ডিতানী এবং তাঁর যুবক পুত্র বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রয়েছেন। গাড়ী চলেছে এঁকে বেঁকে। আমাদের গন্তব্য এখনও অনেক দূর।

শুধু বিপাশা নয়। আরও দুটি নদী তাদের প্রথম ধারাপথ পেয়েছে এই

পার্বত্য ভূখণ্ডে। একটি ইরাবতী, অন্যটি চন্দ্রভাগা। কুলু উপত্যকার দক্ষিণ পাহাড়ের পিছন দিয়ে বন্য শতদ্রু উত্তরপূর্ব থেকে দক্ষিণে আর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গেছে। সুন্দরনগরের উপত্যকা থেকে কুমারসাঁই যাবার পথে শতদ্রু পেরিয়ে যেতে হয়। কুমারসাঁই থেকে কোটগড় হয়ে নারকান্ডা পেঁছিতে পারলে হিন্দুস্থান-টিবেট্ রোড পাওয়া যায়। অতঃপর রামপুর, ওয়াংটা ও চিনি-কিন্নর হয়ে বুশাহর রাজ্যের ভিতর দিয়ে শিপকির গিরিসঙ্কটে পেঁছিনো চলে। শিপকি থেকে রংচুং উপত্যকার প্রধান ক্যারাভান পথ গারটকের দিকে চ'লে গেছে। গারটক থেকে কৈলাশ পর্বতমালার ভিতর দিয়ে ক্যারাভান পথ সোজা দক্ষিণে পেঁছিছে মানসসরোবরে। এই পথ পনেরো থেকে যোলহাজার ফুট উচ্চ মাল-ভূমি আর পাহাড়তলী অতিক্রম ক'রে চ'লে গেছে। এপথ অতি প্রাচীন। একশো বছরেরও আগে কাশ্মীর মহারাজার প্রসিদ্ধ সেনাপতি জোরোয়ার সিং এই অঞ্চলে সংগ্রাম ক'রে লাডাখ প্রভৃতি পশ্চিম তিব্বত ভারতের পক্ষে জয় করেন, এবং এই অঞ্চলেই তাঁকে হত্যা করেছিল তিব্বতীরা।

'আউট' নামক একটি পাহাড়ী গ্রামে এসে আমাদের মোটর-বাস থামলো। এ গ্রামটি মণ্ডি আর সুলতানপুরের প্রায় মাঝামাঝি পড়ে। রাস্তাটা একতরফা ব'লে বিপরীত দিকের একখানা গাড়ী 'ব্যারিয়রের' ওপাশে এতক্ষণ আমাদের গাড়ীর জন্যই অপেক্ষা করছিল। এবার সেখানা ছেড়ে গেল মণ্ডির দিকে। এ দুখানা ছাড়া আর কোনও গাড়ী আজ চলবে না।

কয়েকটি দোকান এবং পুলিশের ফাঁড়ি নিয়ে ছোট্ট একটি গ্রাম। ছোট ছোট কাঠের বাড়ী,—কিন্তু তাদের উপরে খোদাইয়ের কাজগুলি অতি সুন্দর এবং মনোজ্ঞ। পাহাড়ী দেশের বাড়ীমাত্রই কাষ্ঠপ্রধান। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে, কাঠের সিঁড়ি এবং কাঠের সিলিং। কিন্তু ছাদগুলি অধিকাংশই স্লেট্‌পাথরের। এ পাশের পথ গিয়েছে পাহাড়ী বস্তির মধ্যে। পশ্চিম পাহাড়ের অধিত্যকা অঞ্চলে অল্পস্বল্প ক্ষেত খামার এবং চাষবাস চলছে। অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ মনে হ'তে পারে, কাশ্মীরের কোনও একটি মনোরম অঞ্চলে এসে পড়েছি। ওপাশের একটি ছায়াঢাকা অরণ্যপথ যেন আমারই উদ্বিগ্ন চিত্তের ক্ষুধার বার্তা নিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে এঁকে বেঁকে। কিন্তু ওই পথটি যে কত দুর্গমে গিয়েছে তা'র খোঁজ আমরা রাখিনে। নদী পেরিয়ে ওইটি গিয়েছে লারজি উপত্যকায়, সেখান থেকে উঠে গিয়েছে দক্ষিণ পর্বতের গহনলোকে,—গুহায়, গহ্বরে, জলধারার শিরা-উপশিরায়, শ্বাপদভয়ভীত আদিম পার্বত্য অধিবাসীর আনাচে-কানাচে, অনাবিষ্কৃত ওষধি-পর্বতের লতাশিকড়ের বিচিত্র বন্যগন্ধ পেরিয়ে এই পথ উঠেছে এক সময় বিশাল পর্বতের চূড়ায়—যেখানে 'বানজার' নামক জনপদের প্রান্তে 'বাসলেও' এবং 'জলোরি' গিরিসঙ্কট পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে। অবশেষে এই পথ সুদূর দক্ষিণে গিয়ে শতদ্রু অতিক্রম ক'রে কুমারসাঁইতে গিয়ে মিলেছে। বুশাহর রাজ্য থেকে বণিকের দল এই পথ দিয়ে কুলুতে এসে প্রবেশ করে। এই

পথে বন্য কুকুর, ভয়াল সর্প, হিংস্র চিতা এবং পীতাভ ভল্লুক অসতর্ক পথিককে অতর্কিতে আক্রমণ করে। পাহাড়ী ছাগল এবং অশ্বতরের ক্যারাভান ছাড়া এপথে আগে চলতো অশ্বারোহী পর্যটক, এখন পথ কতকটা সুগম হওয়ায় ছোট জীপ গাড়ী অতিক্রম ক'রে যায়। শীতের দিনে এপথ কঠিন তুষারে আবৃত থাকে।

মোটর পথে বিপদের সমূহ আশঙ্কা ছিল,—সুতরাং আমরা আড়ষ্ট হয়ে এতক্ষণ বসে ছিলুম। 'আউট'-এ এসে গাড়ী থামতেই মায়াদেবী এবার গা ঝাড়া দিলেন। সামনের একটি দোকানে বেশ রুচিকর জলযোগের আয়োজন দেখে আমরা যেন সোৎসাহে মরজগতে ফিরে এলুম। ওপাশ থেকে সেই বর্ষীয়সী পণ্ডিতানী প্রসন্ন নয়নে আমাদেরকে এক একবার লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর চাহনির নির্বিকার স্নেহশীলতা যেন আনন্দদায়ক।

আহারের আয়োজন করা গেল। মায়াদেবী সহাস্যে বললেন, আমাদের মুখের কাজ কিন্তু কোথাও বন্ধ হয়নি, দেখেছেন?

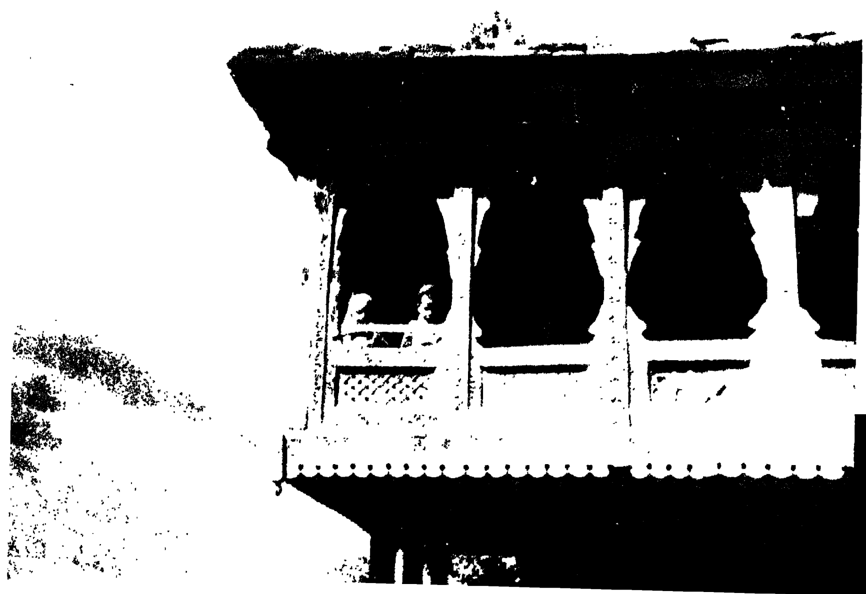
বললুম, শুধু তাই নয়, হজমেরও ব্যতিক্রম ঘটেনি!

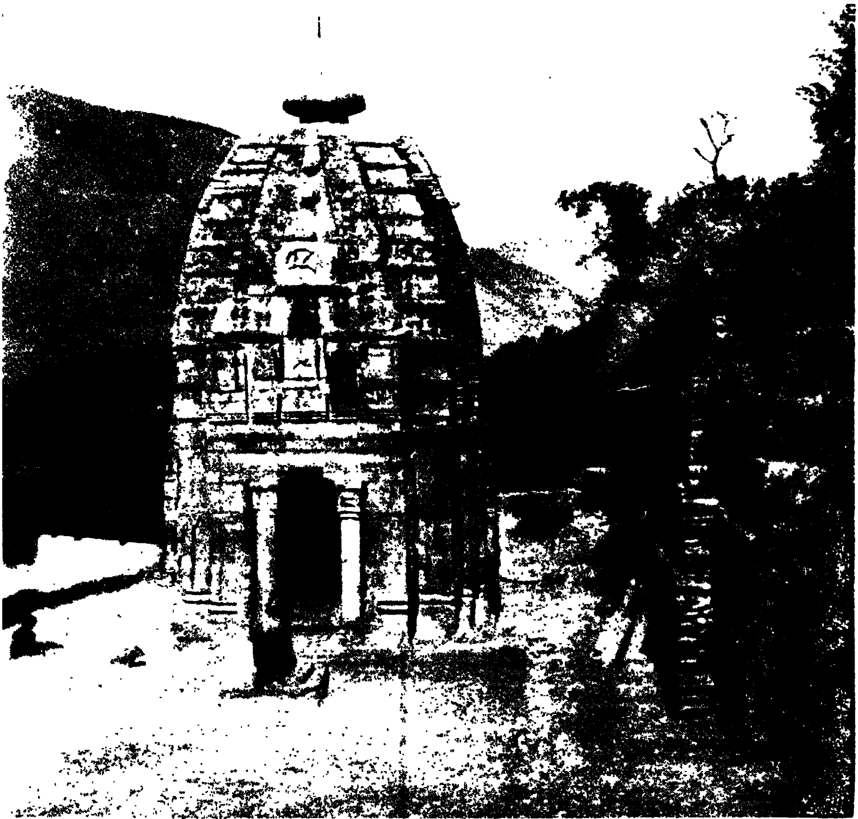
তিনি প্রচুর হাসলেন, এবং অতঃপর ঘৃতপক্ক পুরি ও জিলাবীর সদ্ব্যবহার চলতে লাগলো বহুক্ষণ অবধি।

ঠিক এই কারণেই গাড়ী এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। শরীরতত্ত্ব অনুসারে শোক তাপ দুঃখ ভয় ভালোবাসা অথবা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন নিবিড় হয়, তখন নানাবিধ ক্ষুধা বাড়তে থাকে। এখানে আতঙ্কের থেকে আমাদের ক্ষুধাবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্ত্রতন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলী ভয়ের মধ্যে এতক্ষণ অবধি প্রবল পরাক্রমে আপন-আপন কাজ করেছে, সন্দেহ নেই।

গাড়ী ছাড়লো এক সময়ে। এখনও বেশ বেলা দেখা যাচ্ছে আকাশে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এরপর থেকে পথ কিছু প্রশস্ত হবে। কুলু-টুপি মাথায় দিয়ে চলেছে কত লোক, হাসিমুখীরা চলেছে ওদের পাশে পাশে। পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে লাহুলের ব্যবসায়ী। বস্তুত, কুলু উপত্যকা বলতে যা বোঝায় তা হোলো বিপাশা নদীর দুই পার মাত্র। সেটি কখনও সঙ্কীর্ণ, কখনও বা দীর্ঘ। শেষের দিকে কতকটা সমতল, নচেৎ—চড়াই এবং উৎরাই। কোনো কোনো স্থলে এই দুই পার প্রশস্ত হয়ে দুদিকে একমাইল থেকে দুমাইল আন্দাজ প্রায়-সমতল ভূভাগে পরিণত হয়েছে,—এই মাত্র। সেখানে চাষবাস চলছে। মাঝে মাঝে এক একটি ক্যাণ্টিলিভার অর্থাৎ ঝুলোপুলের দ্বারা বিপাশার এপার-ওপারের উপত্যকাকে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আবার বলি, পৃথিবী এখানে আশ্চর্য। একথা ব'লে যাবো চেঁচিয়ে, এ অঞ্চলের যেখানে-সেখানে স্বর্গের পারিজাত কাননের যবনিকা যেন উত্তোলন করা হয়েছে। সংখ্যাতীত স্বর্গলোকে বিচরণ ক'রে চলেছি,—ব'লে যাবো একথা গলা বাড়িয়ে। সমগ্র সত্তার সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে কে যেন অদৃশ্য হস্তে খুলে ধরছে অমরাবতীর দ্বার! দেখে নাও প্রাণ ভ'রে,—যা স্বপ্নলোকের দিশাহারা পথেও কোনোদিন দেখোনি। ওই নদীর নীচে শিলাসনে







নাগার এর প্রাচীন শিবমন্দির



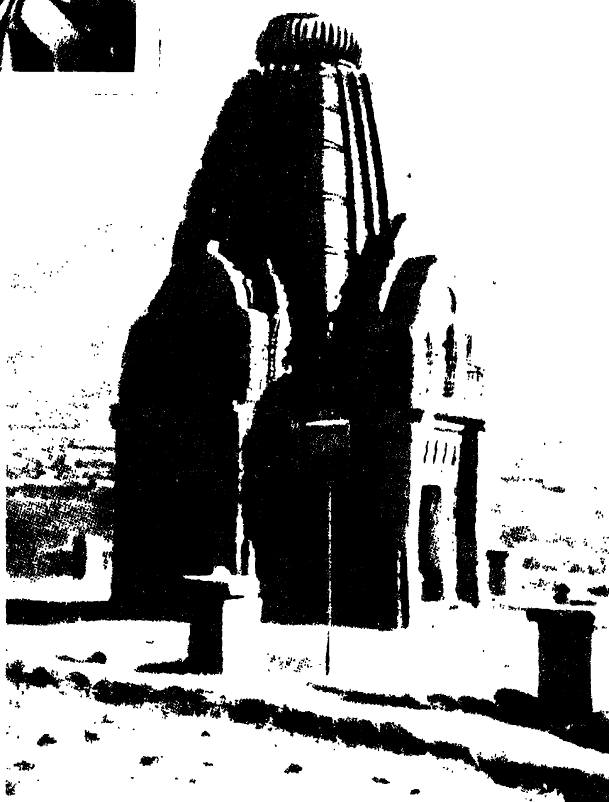












[illegible] বরাকরের
প্রাচীন মন্দির











কোথাও ব'সে যাও, কিংবা এসো বনচ্ছায়ায়,—ওক্, জুনিপার, চীড় কিংবা স্প্রুসের তলায় গিয়ে নির্জনে ব'সো তপস্যায়, আর নয়ত আনন্দের বুকফাটা কান্না কেঁদে বেড়াও ওই গুল্মলতাকীর্ণ প্রাচীন পাথরের আনাচে কানাচে, শুধু যে তোমার জীবন কেটে যাবে তা নয়,—ঈশ্বরকেও হয়ত বা পেয়ে যাবে সহজে!

ঈশ্বর! মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে গেলুম। ঈশ্বরকে ভাবলেই মনে প'ড়ে যায় নানা দৃশ্য। তপোবনে তপস্যায় বসেছেন ঋষি, শাক্যসিংহ অধ্যাত্মক্ষুধায় কেঁদে বেড়াচ্ছেন আর্যাবর্তের পথে-পথে, মৌর্যসম্রাট অশোক অসীম পিপাসা নিয়ে পরিভ্রমণ করছেন আসমুদ্রহিমাচলে, তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিক চেয়ে রয়েছেন অনন্ত প্রশ্ন নিয়ে,—এরা ভীড় ক'রে আসে মনে। এর পরে আবার পট-পরিবর্তন ঘটে। চেয়ে দেখি, মানুষ রুদ্ধশ্বাস হচ্ছে অপমানে, অলজ্জ মালিন্যে তা'র জীবন বিকৃত, নৈতিক অধঃপতনে একটি জাতির ভয়াবহ পরিণাম, হাস্যকর দম্ভে সভ্যতার কদর্য স্বরূপ! ফিরে তাকাও আবার অনেক নীচে। নোংরায় মুখ থুবড়ে রয়েছে কেউ, আর্তনাদ শুনছি নিরন্নের, নিরুপায় শরণার্থীর বীভৎস অপমৃত্যু ঘটছে চোখের সামনে,—ঈশ্বর যেন রয়েছে ওদের মাঝখানে। যন্ত্রণায় দুঃখে সংকটে বেদনায় অপমানে ঈর্ষায় ঘৃণায় পাশবতায় ধিক্কারে,—পলকে পলকে দেখে নিয়েছি ঈশ্বরকে!

পৃথিবীর মধ্যে যে-মন্দিরটি সর্বশ্রেষ্ঠ, দেবতা যেখানে নিত্য জাগ্রত,—সেটি হোলো মানুষের প্রাণ। ওই প্রাণের মূল দণ্ডের থেকে কতবার আমার বাসাছাড়া পাখী রাত্রির অন্ধকারে ব্যোমলোক পেরিয়ে উড়ে গেছে দুর্লভ নীলপদ্মের সন্ধানে, ডাক দিয়েছে অনেকবার ওই মহাশূন্যপথে, তা'র বিদীর্ণ কণ্ঠে রক্ত ঝরেছে অনেক,—ঝড়ের হাওয়ায় অশ্রু উড়ে গেছে অনেকবার। কিন্তু আজ বিপাশার তটভূমিপথে যেতে যেতে তা'র হিসাব নিতে মন কেন চাইবে? তবু এখানে এই অভিনব পটভূমির মাঝখানে দেখতে পাচ্ছি অমরাবতীর সেই আশ্চর্য ছায়া। যদি বলো, এই স্বর্গ—আপত্তি নেই। যদি বলো, উনি আনন্দস্বরূপ—প্রতিবাদ করবো না। উনি অনেকবার আমাকে নিয়ে আনন্দ করেছেন বৈকি। মধ্যরাত্রের ভয়াবহ অরণ্যলোকে উনি আমাকে বহুবার ডেকে নিয়ে গেছেন; ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রির সমুদ্রে উনি দেখিয়েছেন করাল মৃত্যুস্বরূপ; সমগ্র ভারতের পথে-পথে রৌদ্রে ঝড়ে বন্যায় উনি আমাকে বানিয়েছিলেন লীলাসহচর।—তারপর এই হিমালয়ের হাজার-হাজার বর্গমাইলে পোষমানা জন্তুর মতো প্রতি পাথর শুঁকে-শুঁকে অর্থহীন অন্বেষণে পরিভ্রমণ ক'রে ফিরেছি। কাঁদিয়েছেন উনি অনেক, মুখে অন্ন তুলতে দেননি, দুর্যোগের দ্বারা আশ্রয় ভেঙে দিয়েছেন, সঙ্গীকে নিয়ে গেছেন ছিনিয়ে, মৃত্যুকে লেলিয়ে দিয়েছেন পদে পদে।

আজ আবার নতুন চেহারা এসে দাঁড়ালো বিপাশার দুই তটে। নতুন ক'রে আমার চোখের সামনে স্বর্গ রচনা চলতে লাগলো। ওপারের মায়াকানন ডাক দিচ্ছে অমর্ত্যলোকে; এঁকে যাচ্ছে বর্ণের আলিম্পনা। বিপাশার উৎক্ষিপ্ত শিকর-

কণার ধূম্রজালের ভিতর দিয়ে দেখছি, অকাল বসন্তের রুদ্ধ সুরভীশ্বাস উচ্ছ্বসিত হচ্ছে বনে-বনে। প্রতি বৃক্ষচ্ছায়ায় তপোবনের শান্তশ্রী, প্রতি প্রস্তরের গুল্মজড়িত গাত্রে অলক্ষ্য মুনির অবয়ব, প্রতি পার্বত্য নির্ঝরিণীর ঝুমুর-ঝনকে বেদমন্ত্রধ্বনি, প্রতি রঙগীন পাখীর কলস্বনে ঋষিকন্যার কলকাকলী। ওরা আমাকে যেন স্থির থাকতে দিচ্ছে না!

উপত্যকা ঈষৎ প্রসারিত হচ্ছে। দেবভূমে আমরা প্রবেশ করেছি। কুলু উপত্যকার ভিন্ন নাম হোলো, 'দেবভূম,'—Valley of gods. চেতনার উপরে এসে পৌঁছয় শান্ত গভীর একটি প্রসন্ন আনন্দের অনুভূতি,—এটিকে বলা হয়েছে দৈব। এখানে এলে মন ভাবতে থাকে দেবতার কথা, সুতরাং এটি দেবভূম। দেখতে দেখতে আমাদের বাস এসে পৌঁছলো 'বাজৌরার' একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। এখানে বহু শতাব্দীকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব শোভাময় বাজৌরার প্রাচীন মন্দির,—এখানে শৈব ও শাক্তের উপাসনা চলে। মন্দিরের বর্ণ হোলো গৈরিক, এবং এর অনন্যসাধারণ ভাস্কর্য উত্তর ভারতের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সমতুল্য। এককালে চান্দেল্লা রাজপুত গোষ্ঠী যে-কালজয়ী প্রতিভা ও সৌন্দর্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বিন্ধ্যপ্রদেশে 'খাজুরাহোর' মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিল, এ-মন্দিরে যেন তাদেরই ছায়া পড়েছে। 'বাজৌরার' প্রাচীন মন্দির সমগ্র 'দেবভূমকে' যেন পরমার্থ দান করেছে।

এই দেবভূমের আলোচনায় আরেকটি অঞ্চলের কথা মনে প'ড়ে গেল। সেটি হোলো 'পার্বতী উপত্যকা'। মানালি থেকে 'পার্বতী উপত্যকার' দিকে অগ্রসর হওয়াই সুবিধা, কেননা এখান থেকে বাহনের ব্যবস্থা করা যায়। 'ভুন্তারগাঁও' থেকে 'পার্বতী' পৌঁছতে দুদিনের কম লাগে। এই অঞ্চল কুলুরই অন্তর্গত, কিন্তু কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। এর বন্যতাই হোলো শোভা: সভ্যতার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার মধ্যে যে সুপ্রাচীন স্বভাবকৌমার্য আমরা কল্পনা করি,—সম্ভবত সেই বস্তুর চিহ্ন এখানে মেলে। চারিদিকের গগনচুম্বী বিরাট গিরিচূড়াদলবেষ্টিত এই বহুবর্ণা নন্দনসুশোভিতা উপত্যকাকে যারা নাম দিয়েছে 'পার্বতী', তাদেরকে নমস্কার জানাই। এই পার্বতীর ভিতর দিয়ে প্রস্তরসংকট-সংঘর্ষ অতিক্রম ক'রে যে-দুরন্ত নদী নেমে এসেছে, তার দুই পারের জনশূন্য অরণ্যলোকে হিমালয়ের আদিম অতিপ্রাকৃত স্বরূপটি চোখে পড়ে। নদী এসে মিলেছে বন্য বিপাশায়।

বাজৌরা থেকে কয়েক রশি পথ দক্ষিণে এগিয়ে গেলে একটি পথ উত্তরপূর্বে 'মণিকরণের' দিকে চ'লে গেছে। কিছুদূর গিয়ে নদীতীরে-তীরে দুইপারে উত্তুঙ্গ গিরিশিখরলোক। কোথাও কোথাও শস্যক্ষেত্র, এবং তারই পাশে পাশে চড়াই উৎরাই।—এমনি ক'রে অগ্রসর হয়ে গেলে পর্বতপ্রাকারের কোলে 'মণিকরণে'

পৌঁছনো যায়। চিত্রপটের মতো এই ছোট জনপদ। গ্রামের নরনারী অতি সদাশয় এবং অতিথিবৎসল। মানুষের তঞ্চকতা, দুষ্প্রবৃত্তি অথবা নৈতিক অধোগতির সঙ্গে এখানকার স্বল্পতুষ্ট অধিবাসীর কোনও পরিচয়ই নেই। দেবদেউল রয়েছে এখানে ওখানে। অধিবাসীরা সুশ্রী ও ভদ্র। এখানকার প্রসিদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করা বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর। বাতব্যাধি, পক্ষাঘাত, চর্মরোগ এবং অজীর্ণরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পার্বতী উপত্যকাটি 'মণিকরণে'র জন্যই সুবিখ্যাত। কুলু থেকে প্রথম যাত্রারম্ভে পথের ধারেই পড়ে একটি 'শক্তি' মন্দির। উপত্যকার মেয়েরা এখান থেকে সিন্দুর নিয়ে আপন-আপন ললাটে লেপন করে। সিন্দুরশোভিত নারী দেখে চলেছি পথে পথে। বাঙ্গালী মেয়ের স্বভাব ছুঁয়ে রয়েছে ওদের সর্বাঙ্গে।

সায়াহ্নকালে এসে পৌঁছলাম 'সুলতানপুরে।' এইটি আমাদের গন্তব্য। এরই আধুনিক নাম কুলু শহর। বিপাশা নদীর তীরে এখানে উপত্যকা বেশ সুপ্রশস্ত,—একটি ছোটখাটো পার্বত্য শহর নির্মাণের পক্ষে স্থান সঙ্কুলান হয়ে যায়। এই শহর প্রধান সরকারী কেন্দ্র। কাংড়া, ধরমশালা, পালামপুর এবং যোগিন্দরনগরের পরেই সুলতানপুর, ওরফে কুলু। গাড়ী থামলো এসে একটি সুন্দর নাতিবৃহৎ ময়দানের সামনে, মাঠের পশ্চিম সীমানায় ডাকবাংলো। আমাদের সঙ্গেই গাড়ী থেকে নামলেন কাশ্মীরের পণ্ডিতানী এবং তাঁর যুবক পুত্রটি।

এবার একটি স্থূল বিষয়ে আলোচনা করি। বাইরে গিয়ে কুলু উপত্যকা সম্বন্ধে যে-প্রকার প্রচারকার্য চালানো হয়, এবং সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে কুলুকে যে ভাবে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পাশেই বসানো হয়, সেটি সত্য নয়। হোটেল নেই বললেই চলে। খাদ্যাদি একেবারেই সুলভ ও সহজপ্রাপ্য নয়। সারাদিনে দুখানা বাস ছাড়া অপর কোনও প্রকার যানবাহনাদি নেই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী পেতে গেলে দুদিন আগে থেকে গাঁয়ে-গাঁয়ে লোক পাঠাতে হয়। ফলে, কুলু উপত্যকায় সমগ্র বসবাসকালটিতে অসংখ্য কাঁটা পদে-পদে বিঁধতে থাকে।

ডাক বাংলায় জায়গা পাওয়া গেল না। যাত্রীশালাও বহু দূরবর্তী। অবশেষে একটি লোক জানালো, অনুমতিপত্র আনালে 'ফরেষ্ট রেষ্ট্ হাউসে' আশ্রয় মিলতে পারে। তাই করা হোলো। কিন্তু 'রেষ্ট হাউস' অন্ধকার। না আছে ইলেকট্রিক, না কেরোসিন, না বা কোনো আহার্যলাভের সুবিধা। 'রেষ্ট হাউসটি' আবার ওরই মধ্যে একটু টিলা পাহাড়ীপথের বনময় অঞ্চলে। অনেক চেষ্টার পর হারিকেন লণ্ঠন জোগাড় করা গেল। কিন্তু কিছুকাল আগে থেকে পণ্ডিতানীর সম্পর্কে আমরা যে সন্দেহ করেছিলুম, দেখা গেল সেটি সত্যে পরিণত হোলো। তিনি এবং তাঁর ছেলে কোথাও থাকার জায়গা পাননি। অতএব আমি সেই যুবকটিকে এবার আমন্ত্রণ করলুম। মায়াদেবী এগিয়ে গিয়ে সেই মহিলার সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কাশ্মীরী 'বোলিতে' আলাপ করলেন। ওঁরা তীর্থে বেরিয়েছেন, এবং

মানালির বশিষ্ঠ আশ্রম দর্শন করতে যাবেন। আগামীকাল অপরাহ্নে ফিরবেন মণ্ডিতে। সেখানে তাঁদের লোক আছে। মহিলা মায়াদেবীর কাছে যখন শুনলেন, আমি ব্রাহ্মণ, তখন তিনি 'রেষ্ট হাউসে' এসে রাত্রিবাস করতে সম্মত হলেন। আমরা খুশী হলুম, কেননা এই নির্জন বনচ্ছায়াময় বাংলোটিতে আরও দুজন সংগী পাওয়া গেল। দুটি ঘরে আলো জ্বালা হোলো।

আমার স্বর্গতা জননীর মুখের সংগে পণ্ডিতানী মহাশয়ার কেমন যেন একটি সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু সেকথা মায়াদেবীকে জানাবার সময় পাইনি। সন্ধ্যার পরে একটু বাহাদুরীর লোভে যখন পণ্ডিতানীর পূজার জন্য বিপাশা থেকে পিতলের পাত্র ভ'রে জল এনে দিলুম,—আমার সেই পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য ক'রে মায়াদেবী একটু কৌতুকও বোধ করছিলেন। তারপর ওই যুবকটিকে এখানে পাহারা মোতায়েন রেখে আমি যখন চৌকিদারের অলক্ষ্যে অন্ধকার বন-বাগান থেকে মহিলার পূজার জন্য কতগুলি ফুল তুলে আনলুম, তখন তিনি পরিহাস করতে ছাড়লেন না। বললেন, যাক্, বুড়ো হ'লে মেয়েদের একটা সুবিধে,—পথে ঘাটে ছেলে কুড়িয়ে পাওয়া যায়!

কি যেন জবাব দিয়েছিলুম, আজ আর মনে নেই। ফুলগুলি হাতে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, মহিলা তাঁর পূজার আয়োজন করছেন। আমাকে দেখে প্রসন্ন হাস্যে উঠে এসে ফুল নিলেন। ভাংগা হিন্দুস্থানীতে বললেন, বেটা, জিন্দা রহো!

তিনি আরও জানালেন, তাঁর সন্ধ্যাহ্নিকের কিছু বিলম্ব ঘটে গেছে। একটু দূরের থেকে তাঁকে সাষ্টাংগে প্রণাম করলুম। তাঁর প্রশস্ত উন্নত এবং দীর্ঘ দেহ যেন প্রণামলাভেরই যোগ্য।

চৌকিদারের সাহায্যে সেই রাত্রে যেমন-তেমন আহার্য সংগ্রহ করা গেল, এবং আমরা ওই স্বল্পভাষী লাজুক এবং নম্রস্বভাব যুবকটিকে আমাদের আহারের আসরে একপ্রকার জোর ক'রেই এনে বসালুম। সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার্য ব'লেই অবশেষে সে রাজি হোলো। রাত্রের দিকে মায়াদেবী পণ্ডিতানীর ঘরে জায়গা পেয়ে গেলেন। যুবকটি রইলো আমার কাছে।

পাখীর ডাকে ঘুম ভাংগলো। গত রজনীর অন্তিম প্রহরে অরণ্যশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার দাগ লেগেছিল,—পাখীরা ভুল ক'রে ভেবেছিল, ওইটেই বুঝি প্রভাত। ভুল ধরা পড়েছে পরে। কিন্তু ডাক দিচ্ছে সেই থেকে। পাখীর দেশে পৌঁছেছি।

বেলা বেড়ে গেছে বৈকি। 'রেষ্ট হাউসটি' এত নিরিবিলিতে যে, শহরের কোনও শব্দ এসে পৌঁছয় না। ঝিল্লীরব চলছে পিছনের বনে। কিন্তু নদীর

আওয়াজের সঙ্গে সেই রব মিলে এমন একাকার হয়ে গেছে যে, ওদুটোর সাড়া আর কানে পৌঁছয় না।

এক সময় বাইরে এসে দেখি, পাশের ঘরটি শূন্য। সকালের দিকে মানালির গাড়ীতে পণ্ডিতানী এবং তাঁর সেই স্বল্পবাক ছেলেটি চ'লে গেছে। মিনিট পাঁচেক পরেই মায়াদেবী এসে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে তিনি স্নানাদি সেরে নিয়েছেন। বিশেষ কুণ্ঠার সঙ্গেই তাঁ কাছে মার্জনা চেয়ে নিতে হোলো।

চৌকিদারের পক্ষে সকালের চায়ের আয়োজন করা সম্ভব হোলো না, কারণ কিছুই এদিকে পাওয়া যায় না। শহর থেকে এ অঞ্চল নাকি একটু দূরে। অতএব যেমন-তেমন ভাবে প্রস্তুত হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

গতকাল সন্ধ্যায় দেখে গেছি মাঠের পূর্বপ্রান্তে বিপাশা। এদিকে অনেকটা পাহাড়ের অবরোধ। পথঘাট নিরিবিলি, লোকজন তেমন চোখে পড়ে না। আমরা রাজপথ ধ'রে কতকটা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে এক আধটি দোকান পেলুম। থমকে দাঁড়ালেই বুঝতে পারা যায়, স্থানীয় অধিবাসীদের দরিদ্র জীবনযাত্রা। এর পরে অরণ্যজটলার ভিতর দিয়ে বিপাশা চ'লে গেছে অদৃশ্য হয়ে। উপত্যকা এখানে অনেকটা সমতল প্রান্তরে প্রসারিত। এটি হিমালয়ের উত্তর ভূভাগ, সুতরাং উপত্যকার উচ্চতা অল্প হলেও শীতের দিনে এখানে প্রচুর তুষারপাত হয়। এই শরৎকালে এখন এখানে পাখী-শিকারের আয়োজন চলছে। অরণ্যমোরগ, প্রস্তর ও তুষারপারাবত,—এরা নেমে আসবে উত্তর হিমালয় থেকে। সময় থাকতে এবার কুলুর অধিবাসীরা শাকসব্জি শুকিয়ে নিয়ে ঘরে উঠবে। কাঠ আনবে অরণ্য থেকে। এখন থেকে ভেড়ার লোম নিয়ে শীতবস্ত্র বোনা চলছে। ছেলে বুড়ো সকলের হাতেই তকলি ফিরছে। হাওয়া নামতে আর দেরি নেই।

শহরের মাঝখানে এলুম। কিন্তু আঙুলে গুণে বলতে পারি, শহরের অধিবাসী কয়জন। কাজকারবার কিছু নেই, শহর গড়বে কি দিয়ে? ভেড়ার লোম পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু তাই নিয়ে কল-কারখানা বসাবে—কা'র এমন বুকের পাটা? শুধু মাল আমদানি করবে,—টাকা পয়সা কই? শুধু রপ্তানি করবে,—ভাঁড়ার কই? সুতরাং গ্রামের দারিদ্র্য নিয়ে গ্রাম প'ড়ে আছে চোখের আড়ালে। পর্যটকদেরকে লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে দু'দশটাকা যদি ওদের হাতে আসে, তবে তাই ওদের লাভ। সেইজন্য পাঁচজন যাত্রী গিয়ে যদি গাড়ী থেকে নামে, তবে পঁচিশজন কুলি ছুটে আসে। কুলিগিরি কিন্তু তাদের পেশা নয়, তা'রা হোলো স্থানীয় বেকার-সম্প্রদায়। চাষবাস করে, ঘর বানায়, জন্তুর লোম থেকে কম্বল বোনে।

চায়ের দোকান আছে দু'একটি। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী পেতে গেলে কাঠখড় পোড়াতে হবে অনেক। এবেলায় ব'লে রাখলে ওবেলায় মিলতে পারে। গোটা দুই ডিম হঠাৎ পেয়ে যেতে পারো, কিন্তু গোটা দশেক একসঙ্গে চাইলে গ্রামে-

গ্রামে খবর দিতে হবে। মাংস পেতে গেলে আগে জন্তুটা কেনা দরকার। সর্বাপেক্ষা লোভনীয় মাছ হচ্ছে 'ট্রাউট্',—যেমন কাশ্মীরে,—কিন্তু খাবারের প্লেটে সেই 'ট্রাউট্' পেঁছবার আগে মৎস্যশিকারী হতে হবে। এ আর তোমার দার্জিলিং-শিলঙ নয় যে, হাটবাজার আলো ক'রে মৎস্যগন্ধারা সেখানে জাঁকিয়ে ব'সে আছে।

প্রাতরাশ সারা হোলো পূর্বাহ্নে। তারপর চা-ওয়ালার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের চুক্তি ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মানালির গাড়ী যাচ্ছে। এখান থেকে মানালি দূর নয়,—মাত্র চব্বিশ মাইল। পথটি পাকা, এবং এই প্রায়-সমতল উপত্যকা ছেড়ে ধীরে ধীরে উত্তরে উঠে গিয়েছে বনময় পর্বতের অন্তর্লোকে। যেমন সর্বত্র—এখানেও পাহাড় যত দূদিকে উঁচু হয়েছে, নদীর গহ্বর ততই নেমেছে নীচে। প্রকৃতি যতই তা'র রহস্যযবনিকা উত্তোলন করেছে, মানুষের সংখ্যা ততই কমে এসেছে। কুলু থেকে ধীরে ধীরে চড়াই পথে মাইল আষ্টেক গেলে 'রায়সন' নামক জনপদ। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু ছবির পর ছবি। আমাদের চোখে সমস্তটা অবাস্তব, কেননা আমরা এদেরকে অভ্যস্ত সংস্কারের মধ্যে পাইনে। দিল্লী-কলকাতা-বোম্বাই, এদের সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ, চোখ আমাদের তৈরি হয়েছে ওদেরই মাঝখানে। বড় শহরের নক্সায় ইদানীং আর কোনও বৈচিত্র্য নেই। নতুন ভুবনেশ্বর তৈরি হচ্ছে নতুন দিল্লীর ছাঁচে,—চণ্ডীগড়ও তাই। পুরনো দিল্লীর সঙ্গে আগ্রা-মথুরার তফাৎ কম। বোম্বাই-কলকাতার লোক মাদ্রাজে না গিয়েও জানে, তামিল শহরটি কেমন। এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌ একই। গয়া-কাশীতে সামান্যই তফাৎ। লণ্ডনের লোক নিউইয়র্কে কোনও বৈচিত্র্য পায় না; প্যারিস আর বার্লিনের নক্সায় কতটুকুই বা পার্থক্য! কিন্তু এখানে এই দূর হিমালয়ের গহনলোকে অনন্ত বৈচিত্র্য। নীলাভ জলধারার ধারে একটি রক্তকরবী সমগ্র পার্বত্য প্রকৃতির পরমার্থ বহন করে। তুষারচূড়ায় যখন পঞ্চমীর শীর্ণ শশিকলা এসে দাঁড়ায়, মহাকাব্যেও সেই সৌন্দর্য প্রকাশ পায়নি কোনোদিন। একটি বাড়ীর সুন্দর কাঠের কারু-কার্য—সমস্ত জনপদের স্বভাবকে প্রকাশ করে। পাহাড়তলীর ছোট একটি বাঁক, একটি গাছের একান্ত ছায়া, একটুকরো বনান্তরাল, একটি নির্ঝরিণীর মৃদু ঝঙ্কার,—এরা যেন সমস্ত জীবনের নিরুদ্ধ পিপাসাকে জাগিয়ে তোলে।

পর্বতপ্রাচীর এবং অল্পস্বল্প সমতল সংযুক্ত নিঃঝুম বনভূমি। মাঝখানে বিপাশা। পশ্চিমে 'কাটরাইন', এবং পূর্বপারে 'নাগর।' কাটরাইনে নদী পার হয়ে নাগরে পেঁছতে হয়। এ পথে আসে তিব্বতী ব্যবসায়ীরা। পূর্বদিকে বিরাট পর্বতশ্রেণী পার হয়ে গেলে স্পিতি-উপত্যকা। নাগর থেকে পর্বত-আরোহণ করা যায় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুগম পথ হোলো মানালির পথ।

'নাগরের' জনপদটি আপন শোভা আর সৌন্দর্য নিয়ে নদীর অপর পারে তপস্যার আসনে বসেছে যেন স্বভাবসৌন্দর্য নিয়ে। সভ্যতার থেকে অনেক দূর।

এই 'নাগরে' একটি অতি সম্ভ্রান্ত রুশ পরিবারের কাহিনী গচ্ছিত রয়েছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশবিপ্লবকালে একটি ধনী পরিবার ভারতের তদানীন্তন বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। এঁরা বোধকরি সাম্যবাদী বিপ্লবীদলের হাত থেকে নিজেদিগকে বাঁচাবার চেষ্টা পান্। এই বিত্তশালী জমিদারের নাম ছিল, মিঃ নিকোলাস রোয়েরিখ্। তিনি ছিলেন জগৎ-প্রসিদ্ধ শিল্পী এবং স্বনামধন্য পর্যটক। তাঁরা এই কুলু উপত্যকায় আসেন, এবং নাগরে জায়গাজমি কিনে ঘরদোর তৈরি করেন। এঁরই পুত্র জুনিয়র মিষ্টার রোয়েরিখ্ একজন প্রকৃত পণ্ডিত, গুণী এবং চিত্রশিল্পী। এঁর চরিত্রবত্তা, স্বভাবমাধুর্য এবং নম্রসৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে পরলোকগত চিত্র-নির্মাতা হিমাংশু রায় মহাশয়ের পত্নী ভারতপ্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকারাণী দ্বিতীয় পক্ষে মিঃ রোয়েরিখ্কে বিবাহ করেন। বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় বছর দুই হ'তে চললো। একদা শ্রীমতীর আমন্ত্রণক্রমে তাঁর বোম্বাইয়ের অস্থায়ী বাসস্থানে গিয়ে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের আনন্দময় চেহারাটি দেখেছি, এবং সৌম্যদর্শন রোয়েরিখের শান্ত ও সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। বেশ মনে পড়ে, হাসিমুখে দেবিকারাণীকে প্রশ্ন করেছিলুম, এ-জীবন কেমন মনে হচ্ছে? কেমন মানুষ রোয়েরিখ্?

দেবিকারাণী মুগ্ধকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, সত্যি বলবো, যদি কোনোদিন মাথা ধ'রে চুপ ক'রে বিছানায় প'ড়ে থাকি, উনি সেদিন অন্নজল মুখে তোলেন না! আবার উনি সতর্কও থাকেন,—সে-খবর যেন আমার কানে না ওঠে। শান্তিই আমার কামনা ছিল! এমন স্বামী অনেক ভাগ্যে মেলে।

'দেবভূম' কুলু উপত্যকার অপার্থিব সৌন্দর্য এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা ক'রে যেদিন ফিরে আসি, তার পরের দিন বোম্বাইয়ের 'তাজমহল' হোটেল থেকে দেবিকারাণীর একখানি চিঠি পাই :

". . . . . . It was an honour and a privilege—such contacts in life make one feel that there is still a purpose, that there are values of a deeper nature in this very materialistic age, which makes it so much easier to enrich one on the way . . . . ."

দেবিকারাণীর অভিনয় দুচারবার দেখেছি বৈ কি, কিন্তু মানুষটি ভিন্ন প্রকারের। স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে তাঁর একটি সহজাত অধ্যাত্মপিপাসা আমাকে বিস্মিত করেছিল। অতঃপর দিল্লীতে প্রথম ভারতীয় 'ফিল্ম সেমিনার' উপলক্ষ্যে

আমার ডাক পড়ে, এবং সেখানে গিয়ে রোয়েরিখ্ দম্পতির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে।

'নাগরের' পর থেকে একটি ইউরোপীয় পরিবারের নাম সর্বত্রই শোনা যায়। বস্তুত, সমগ্র কুলুর সঙ্গেই সেই নামটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই নামটি হোলো 'বেনন্' পরিবার। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের জনৈক কর্মচারী মিঃ বেনন্ প্রথম আসেন কুলুর পথে দুর্গম ও দুস্তর হিমালয় পেরিয়ে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আরেক বন্ধু ক্যাপ্টেন লী। এই ভূস্বর্গের আকর্ষণ তাঁরা সামলাতে পারেননি,—এবং অবসর গ্রহণের পর তাঁরা এসে মানালিতে বাসা বাঁধলেন এবং সমগ্র অঞ্চলে ফলের বাগান সৃষ্টি করলেন। সেই সব বাগান আজও সুপ্রসিদ্ধ।

পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে 'লী' এবং 'বেনন্' পরিবার এখানে সমৃদ্ধ। বড়াগাঁও এবং মানালিতে তাঁদের হোটেলগুলি বহুজনপরিচিত। প্রত্যেক পাহাড়ীর কাছে ওঁরা 'চিনি সাহেব' নামে প্রসিদ্ধ, প্রত্যেক গ্রামে ওঁরা সুখ্যাত। পার্বত্য নারীকে ওঁরা বিবাহ করেছেন, এবং বহুলাংশে শিক্ষাবিস্তারেও সহায় হয়েছেন। অত্যন্ত বিস্ময় লাগে, হিমালয়ের গহনলোকে গিয়ে যখন এই সাহেব গোষ্ঠীটি পর্যটকের সম্মুখে আবিষ্কৃত হয়। এঁদের বাগানের 'সেও' এবং নাশপাতি সদৃশ 'বাগুগোসা' অতি মধুর।

মন্দির-প্রধান হোলো সমগ্র কুলু উপত্যকা। বিভিন্ন পাল-পার্বণে নানা দেবদেবীকে সমারোহ সহকারে বাইরে আনা হয়। মানালি, নাগর, কাটরাইন, রায়সন, বড়াগাঁও এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে অধিবাসীরা নেমে এসে উৎসবে মাতে। এ ছাড়া লাহুল, তিব্বত, লাডাখ, ইয়ারখন্দ, খোটান, স্পিতি, পার্বতী, —ইত্যাদি নানা অঞ্চল থেকে বিচিত্র পণ্যসম্ভার নিয়ে বণিকরা কুলুতে এসে পৌঁছয়। সমগ্র উপত্যকায় তখন বসে নাচগানের আসর। আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি পূজা আসন্ন; বিজয়াদশমীতে ওদের সর্বপ্রধান উৎসব হোলো 'দশহরা'। তখন চারিদিক থেকে দেববিগ্রহরা এসে পৌঁছবে, এবং সর্বপ্রধান পূজা পাবেন রঘুনাথজী। কুলু উপত্যকায় সেদিন বিপাশার কূলে-কূলে কুলনাশিনীদের নাচের দোলায় অনেকের জীবন-তরী কূল ছেড়ে চ'লে যাবে অকূলের দিকে!

উচ্চ মালভূমির উপর মানালি গ্রাম। পাইন এবং দেওদারের শোভায় চিত্রিত মানালি। উত্তুঙ্গ গিরিমালা স্তরে-স্তরে চ'লে গেছে একদিক থেকে অন্যদিকে। তুষারের চূড়া অতি সন্নিকট ব'লে মনে হয়, কিন্তু সেটি দৃষ্টিবিভ্রম।

কিছুদূর এগিয়ে পথ চ'লে গেছে উত্তরে বিপাশার তীরে তীরে। এর পর ক্রমেই রয়ে গেল হিমালয়ের স্বাভাবিক জনবিরলতা। পথ চ'লে গেছে দূর দূরান্তরের চড়াইয়ের দিকে—যেদিকে 'রেহলা' হয়ে 'রোহটাং' গিরিসঙ্কট।

দশহাজার ফুট ছাড়িয়ে গেলে তৃণফলকের দেখা পাওয়া কঠিন, কিন্তু তুষারধবল গিরিশৃংগদলের শান্ত গম্ভীর প্রকাশটি অনন্ত বিস্ময় বহন করে। এই 'রোহটাং' গিরিসংকটের উত্তরে সমুদ্রসমতা থেকে পনেরো হাজার ফুট উচ্চ ব্যাসঋষিশৃংগ। এই শৃংগেরই তল থেকে রোহটাং গিরিসংকটের আশে পাশে জন্ম নিচ্ছে পাঞ্জাবের দুটি প্রধান নদী—একটি বিপাশা, অন্যটি চন্দ্রা। চন্দ্রানদী আরো দুটি নামে পরিচিত। একটি চন্দ্রভাগা, আরেকটি চেনাব। বিপাশাকে অনেকে বলে, বিয়াস; হিমাচলপ্রদেশীরা বলে, 'বিয়াসা'। ব্যাসঋষির নামটিই হয়ত তারা ধ'রে রাখতে চায়। রেহলার পর থেকে সমগ্র গিরিশিখর এবং অধিত্যকা অঞ্চল বৎসরের অধিকাংশ কাল তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকে। দশ এগারো হাজার ফুটের পরে ঋতু ব'লে বিশেষ কিছু নেই। বরফ জমে এবং বরফ গলে এইমাত্র। শীতের কালে অগম্য, আর কিছু নয়। তুষারঝঞ্ঝা বইতে থাকলে সব ঋতু একাকার। বাতাস যদি না থাকে এবং পরিষ্কার আকাশে থাকে রৌদ্র,—তবে হোক না কেন পাহাড় তুষারমণ্ডিত! কর্ণেল হাণ্ট-এর বইতে পাই, গৌরীশৃংগ-বিজয়কালে মে মাসের শেষের রৌদ্রে 'এভারেষ্ট' অঞ্চলে তাঁরা এক এক সময়ে রীতিমতো গরম বোধ করেছিলেন। রোহটাং গিরিসংকট অতিক্রম ক'রে চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে সোজা উত্তরপথে গেলে পাওয়া যায় উত্তুংগ শিখরলোকে 'বড়ালাচা' গিরিসংকট। এপথ গিয়েছে লাহুলের ভিতর দিয়ে আঠারো থেকে কুড়ি হাজার ফুট উচ্চ গিরিমালা ভেদ করে—যেদিকে 'হানলে' এবং 'রূপসু' উপত্যকার কোলে পাওয়া যায় লবণাক্ত বিরাট 'মুরারি' হ্রদ। লাহুল উপত্যকার উত্তরাঞ্চল দিয়ে জাস্কার পর্বতমালা নেমে এসেছে দক্ষিণে—যেখানে ধবলাধারের পূর্বসীমায় পীর-পাঞ্জাল গিরিশ্রেণীর শেষপ্রান্তভাগ সংযুক্ত। সুতরাং রোহটাং গিরিসংকট এখানে ত্রিমূর্তি সংগমের কাজ করেছে। ভারতীয় সীমানা এখানে অনির্ণীত।

মানালি হোলো এই সকল দুর্গম ও দুরারোহ হিমালয়পথের প্রথম তোরণদ্বার। এখানকার বাতায়নে মুখ রেখে দেখে নেওয়া যায় বিচিত্র দেশের অজানা অনামা অধিবাসীকে। অনেক সময় তারা নামহারা, পরিচয়হারা—তারা শুধু পার্বত্যসন্তান। চিরকাল ধ'রে তারা নিশ্চিন্ত, চিরদিন নিস্পৃহ,—এবং সভ্যতার পর সভ্যতা এসেছে আর চ'লে গেছে,—কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপ করেনি। সভ্য জগতে তারা পৌঁছয়নি কোনওকালে, সভ্যতার স্বাদ কেমন জানেনি, পরখ করেনি, চোখে দেখেনি। ওদের দুর্গপ্রাকারের বাইরে নীচের তলায় ভারত-ইতিহাসে শতশত বছরের বিবর্তন ঘটে গেছে। গৌতম বুদ্ধের পরে আর কোনও মহাপুরুষের সংবাদ হয়ত বা ওদের কানে পৌঁছয়নি!

যেমন 'বাজৌরায়' তেমনি মানালিতে—মন্দির অতি প্রাচীন। কিন্তু বাজৌরার হিন্দু স্থাপত্য এইটুকু দূর মানালিতে এসে মংগোলীয় বৌদ্ধস্থাপত্যের শৈলীতে মিলিয়ে গেছে। এ একেবারে নতুন,—দক্ষিণের সংগে উত্তরের গোত্রের মিল নেই। হিন্দু বটে, কিন্তু সাজপোষাক বদল করেছে। মানালির একটি মন্দিরের সন্ধান

দিয়েছিলেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেটি হোলো 'হিড়িম্বা'র মন্দির। মানালির গ্রাম ছাড়িয়ে দেওদারের গহন বনবেষ্টিত পাহাড়ের প্রাচীন বনস্পতির শাখাপ্রশাখার অন্তরালে এই মন্দিরটি যেন মনোরম দারুশিল্পের প্রতীক্। জনশূন্য বনভূমির মাঝখানে এ মন্দির অনেকটা প্যাগোডার মতো। ছায়াচ্ছন্ন বনে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে চায় না,—চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করলেই দেখা যাবে, রুদ্ধদ্বার মন্দিরের ভিতর থেকে গড়িয়ে এসেছে দরদর রক্তের ধারা! চমকে উঠলে চলবে না,—ভয় পেলেই পরাজয়। অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে, একটি সুন্দরী রমণী আসছে এগিয়ে,—মাথায় তা'র কাঠের বোঝা। অধরে তা'র মধুর হাসির রঙিগমা,—তা'র চেয়েও রঙগীন তা'র বেশভূষা। বড় বড় চোখে সর্বনাশা দৃষ্টি মেলে সেই সুন্দরী সহাস্যে তাকালো! এ মন্দিরের পূজারী কই—এ প্রশ্নের উত্তরে সে জানাবে, সেই পূজারিণী! তারপরে আর কোনও কথা নেই। মেয়েটি একটি গুপ্তদ্বারের ভিতর দিয়ে মন্দিরে ঢুকবে এবং সম্মুখের দ্বার খুলে দেবে। প্রদীপ জেবলে নম্রহাস্যে একটি কোণের দিকে নির্দেশ করবে! প্রদীপের আলোয় আর আবছায়ায় দুরুদুরু বুকে এদিক ওদিক অন্বেষণ ক'রে অবশেষে দেখা যাবে, একখানা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ-বর্ণের শিলা। উনিই দেবী,—ওঁরই উদ্দেশে পশুবলি দেওয়া হয়! দরজার বাইরে তাজা রক্তে এখনও হয়ত তা'র হৃৎপিণ্ডের উত্তাপ জড়ানো।

রহস্যময়ী পরমাসুন্দরীর হাসি দেখে আত্মবিস্মৃত হ'লে চলবে না; ওই হাসিতে হয়ত বা রক্ত অপেক্ষাও গুরুতর বিপদের সঙ্কেত নিহিত,—সেই কারণে রহস্য আরও নিবিড় হয়েছে। নম্রনতমুখে অর্ঘ দান ক'রে শান্তভাবে বেরিয়ে এসো ওই অন্ধকার মন্দিরের বাইরে, তারপর জটাজটিল অরণ্যভূমি পেরিয়ে আবার নেমে যাও মানালির দিকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুটবে তোমার পিছনে পিছনে,—কিন্তু তাদের কোনও মীমাংসা নেই। সেই প্রশ্ন তোমার মধ্যরাত্রির তন্দ্রার মধ্যে হয়ত দুঃস্বপ্ন ঘুলিয়ে তুলবে, হয়ত বা সেই প্রশ্নরা ওই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের শতসহস্রমাইলব্যাপী গুহায় গহ্বরে মঠে মন্দিরে অরণ্যে তপোবনে উপত্যকায় তুষারশৃঙ্গমালায়—সর্বত্র একটি বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্নের আকারে ক্ষুধাতুরা ডাকিনীর মতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে!

এ যাত্রায় আমাদের ভ্রমণের শেষ পর্বে পৌঁছেছিলুম। মায়াদেবীর মুখে চোখে দেখছি ক্লান্তির ছায়া, অবসাদ এসে তাঁকে ঘিরেছে। আমি নিজে অস্থির ক্ষুধা নিয়ে ঘুরেছি নানাস্থানে, তিনি চুপ ক'রে দেখেছেন হিমালয়কে। মন্দির দেখে প্রণাম করেছেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছেন নিঃশব্দে। তামাসা করেছি অনেকবার, —তিনি আধুনিক কালের প্রসাধন-পটীয়সী তরুণী। তিনি হাসিমুখে বরদাস্ত করেছেন আমার পরিহাস, এবং বার বার মুগ্ধমনে হিমালয়ের বহু দুঃসাধ্য অঞ্চলে

গিয়ে একান্ত আনন্দলাভ করেছেন। অনেকবার মনে মনে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছি।

ইতিমধ্যে তিনি দিল্লীতে তাঁর ভাসুরের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন এই মর্মে যে, তিনি নিরাপদে আছেন, এবং অমুক দিন সকালে তাঁর ভাসুরমহাশয় যেন দিল্লী ষ্টেশনে উপস্থিত থাকেন। পাঠানকোট থেকে তিনি ট্রেনে দিল্লী গিয়ে পৌঁছবেন। কুলু থেকে তিনি পুনরায় চিঠি পাঠিয়েছেন স্বামীর কাছে দক্ষিণ ভারতে। যাবার সময় আমরা নূরপুরের পথ দিয়ে যাবো।

স্থানীয় একটি কিশোর বালক তাঁর বড় অনুগত হয়েছিল। মায়াদেবী তাঁকে গত দুদিন ধ'রে নানাবিধ ফাই-ফরমাস করছিলেন। উদ্দেশ্য এই, ওই ছেলেটি যেন কিছু উপার্জন করে! কথায়-কথায় তাকে বকশিষ দেবার জন্য মায়াদেবী বিশেষ ব্যস্ত। ছেলেটির নাম সুখনলাল। তা'র মা নেই, ঘরে আছে বাপ, ছোট ভাই, আর রুগ্ন বোন। সামান্য চাষবাস, যেমন-তেমন ঘরকন্না, সারা বছরের অন্নবস্ত্র চলে না। মায়াদেবী একবার সুখনকে একটি টাকা ভাঙ্গাতে দিলেন, এবং পালায় কিনা পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে ছেলেটা ফিরে এলো।—এত দেরি কেন? ছেলেটা জবাব দিল, তিন মাইল তাকে হাঁটতে হয়েছে টাকা ভাঙ্গানোর জন্য! এদিকে কা'রো এত পয়সা নেই যে, ভাঙ্গিয়ে দেয়! মায়াদেবী বললেন, আমার কাজ হয়ে গেছে, আর ভাঙ্গানো চাইনে। টাকাটা তুই নে।

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ। দু'আনা পেলেই সে মহাখুশী; একটাকা তার পক্ষে অনেক। আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে টাকাটা তা'র পকেটে দিলুম। কিন্তু তখন থেকেই আমাদের একটা কাজ জুটলো। ছেলেটার কাপড়-চোপড় নেই, হয়ত ওর বোনের অসুখে ওষুধ জোটে না, হয়ত খাওয়াও জুটছে না, হয়ত বা রাত্রে গায়ে দেবার কম্বলও নেই! সুতরাং একটা মস্ত কাজ আমরা পেয়ে গেলুম। ছেলেটা আগাগোড়া অবাক। পেয়ে গেল সে গন্ধতেল আর সাবান, খাদ্যসামগ্রীর একটা অংশ, একখানা শীতবস্ত্র, এবং মোটামুটি কিছু অর্থ। ছেলেটা শীর্ণ, রং ফর্সা, মুখের ভাবে অকিঞ্চন এবং অল্পে তুষ্ট।

যে-ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট, তা'কে কিছু বেশি দিতে পারলে আমরা সুখী হই। ভিখারীকে কিছু দেবার হাত সহজে ওঠে না, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীকে ভোজন করিয়ে আমরা আনন্দ পাই। যে চায় না কিছু, সেই সহজে পায়। যে ভোগী নয়, তা'র চারিদিকে আমরা সম্ভোগের উপকরণ সাজাতে বসি। অর্থের প্রতি যার কিছুমাত্র আসক্তি নেই, তা'র চারদিকে টাকা জড়ো হয়। চাইনে বললেই কাছে আসে, কামনা করলেই দূরে পালায়। সুখনলাল কিছু চায়নি আমাদের কাছে, তাই সে পেয়ে গেল তা'র আশাতীত। যতটুকু সে গ্রহণ করেছে, ততটুকুই যেন আমরা কৃতার্থ হয়েছি। দুদিন ধ'রে সে আমাদের কাছে-কাছে ছিল, এবং একজন

অপরিচিতা ও ভিনদেশিনী নারীর করুণ স্নেহচ্ছায়ায় তা'র জীবনের ওই দুটি দিন নিত্যস্মরণীয় হয়ে রইলো।

বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। অপরাহ্নের আলো সুদীর্ঘ ছায়া ফেলেছে পাহাড়ের নীচে। ডাহুকের ডাক শোনা যাচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। আশে-পাশে ছোট ছোট বস্তির জীবনযাত্রা রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত। ওদের সঙ্গে রয়ে গেল আমারও প্রাণের কিছু ভাষা, রয়ে গেল ওই প্রাচীন দেওদারের নীচে আমার ছোটখাটো করুণ আনন্দের সুর কবিতার ব্যঞ্জনার মতো। বনভূমির ভিতরে-ভিতরে ঝিল্লির ঝনকে-ঝনকে রেখে গেলুম—যা কিছু আমার অপ্রকাশিত!

মালপত্র একে একে উঠলো গাড়ীর চালে। গাড়ী ছাড়বে, এমন সময় সুখনলাল এসে দাঁড়ালো মায়াদেবীর উদ্বিগ্ন দৃষ্টির সামনে। কিশোর বালকের মনে কি সেই বেদনাটুকু জন্মেছে, যেটির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের বিধুর বর্ণটুকু জড়ানো? আত্মার অনন্ত রহস্যের তলায় রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল বালকের কোথায় ঘটে গেল এই আত্মিক যোগ? এ কি মায়া মহামায়ার?

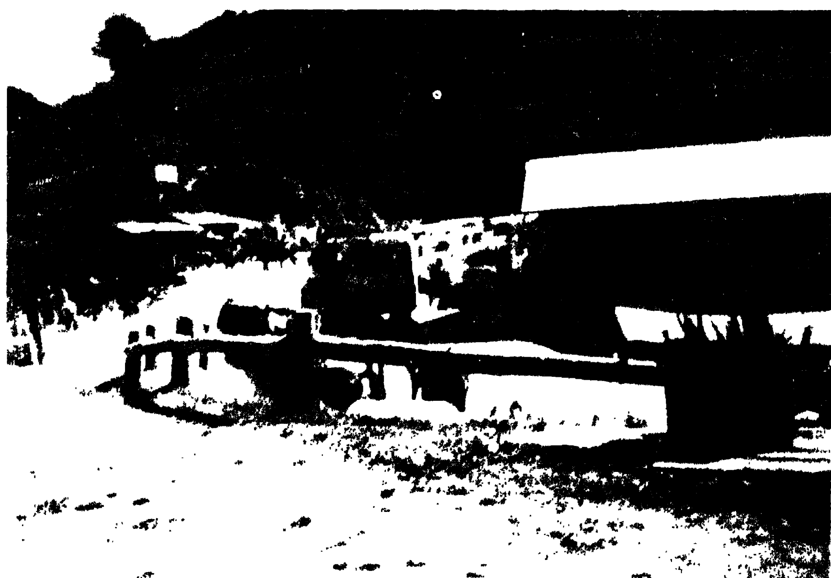
আমি ঈষৎ হাসলুম উভয়ের দিকে লক্ষ্য ক'রে। আরো দুটি অহেতুক টাকা হাতে পেয়েছে সুখনলাল। নির্বোধ মূঢ় চাহনি অকিঞ্চনের আর অর্বাচীনের,—অন্যদিকে চিরকালের সেই অনাদি-অনন্ত আবেদনের সকরুণ চাহনি,—'মনে রাখিস, সুখনলাল!'

গাড়ী ছেড়ে দিল এক সময়ে। বাইরে আর ভিতরে চারটি অপলক চক্ষু মিলে রয়েছে পরস্পর। কিন্তু আমি জানি, গাড়ির ভিতরের দুটো চোখ তখন বাষ্প-থরোথরো। রবীন্দ্রনাথের দুটি ছত্র মনে পড়ে গেল : "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়, হে বন্ধু বিদায়।"









[illegible]

॥ ৬ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যে নেমে এসেছেন অনেকবার। স্বর্গে অথবা মর্ত্যে তিনি ... অপেক্ষা মানবিক চেহারায় অধিকতর প্রকট। তিনি ছিলেন কৌতুক ও পরিহাসপ্রিয় এবং তিনি নৈতিক রক্ষণশীলতার ধার মাড়াতেন না। দেবতা অপেক্ষা মানুষের দিকে টান ছিল তাঁর বেশী। অনেক সময় সক্রিয় কৌতুক-পরিহাসের ভিতর দিয়ে তিনি মানুষের মহত্ত্ব, দাক্ষিণ্য, সততা, আত্মবিশ্বাস এবং ভয়হীন অধ্যবসায়কে পরীক্ষা করতেন।

সৃষ্টিলোকে প্রতিপালকের আসনে ব'সে আছেন শ্রীবিষ্ণু। আনন্দ বেদনা জরা জয়োল্লাস ভালোবাসা ও স্নেহমমতা—এদের ভিতর দিয়ে তিনি এই অনন্ত সৌরবিশ্বলোকের মধ্যে থেকে পৃথিবী নামক একটি ছোট্ট গ্রহলোকে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মানুষের স্বভাববৃত্তিকে তিনি কোনও আইনে বাঁধেননি। তিনি জানেন, মানুষ হোলো স্বেচ্ছাতন্ত্রী, আপন প্রবৃত্তির দাস, আপন প্রকৃতির ক্রীড়নক এবং আপন বিকৃতিরই অন্ধ স্তাবক। দেবরাজ ইন্দ্র আনন্দ পেতেন রাজ্যপাল বিষ্ণুর এই প্রশাসনপদ্ধতিতে। সেই আনন্দলাভের জন্য তিনি মর্ত্যে নেমে আসতেন প্রায়ই ছদ্মবেশে। তিনি হতেন বহুরূপী। মানুষের দরজায়-দরজায় বিভিন্ন বিচিত্র বেশে তিনি এসে দাঁড়াতেন। তাঁর হাতে মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হয়েছে বার বার।

তিনি স্বর্গলোকবাসী বটে, কিন্তু স্বর্গলোকে বৈচিত্র্য কোথা? নিত্য আনন্দময় স্বর্গ,—কিন্তু তা'র মধ্যে দুঃখ-বেদনার স্পর্শে মধুর কাব্যের আস্বাদ নেই। দেবতামাত্রই পুণ্যময়, কিন্তু পাপের মনোহর রঙগীন রূপ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পারিজাত কাননের কোনও কুসুমে কীট নেই, সিংহ-শার্দুলেরা সম্পূর্ণ অহিংস, সর্পের দল সর্বদা নৃত্যশীল, নগ্নকান্তি চিরযৌবনা অপ্সরাদের লীলায়িত তনুলতার সংকেতে আসঙ্গলিপ্সা নেই। শোকে, অনুরাগে, দুঃখে, নৈরাশ্যে, মহত্ত্বে ও ভালোবাসায় ইন্দ্রের স্বর্গ উদ্বেলিত নয়। শ্রীবিষ্ণু তাই শত-সহস্র-অযুত-নিযুত ভূস্বর্গ রচনা করেছেন এই পৃথিবীতে। ঈর্ষান্বিত দেবরাজ একদা স্থির করলেন যে, স্বর্গ এবং মর্ত্যের কোনও এক সন্ধিস্থলে তিনি তাঁর নিজস্ব একটি রাজধানী নির্মাণ করবেন। অতএব ছদ্মবেশে তিনি পৃথিবীতে নেমে ভ্রমণে বাহির হলেন!

শিবলিঙ্গ গিরিমালার মধ্যকেন্দ্রে যেখানে 'মহাভারতীয়' পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম-প্রান্ত, সেই অঞ্চলে আলুলায়িতকেশা যোগভ্রষ্টা 'শারদা' নেমে এসেছেন উত্তর

থেকে দক্ষিণে। তাঁর উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাতে পাথর লুটিয়েছে পায়ে পায়ে; অরণ্য-অটবীর শ্বাপদের দল পরিত্রাহি আর্তনাদ করতে করতে আত্মদান করেছে তাঁর ঝাপটের কাছে। তাঁর রাশি রাশি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের সংঘাতে বৃদ্ধ বনস্পতির অবলুপ্তি ঘটেছে। শারদার উন্মত্ত নাচনে সৃষ্টি রসাতলে গেছে অনেকবার।

কিন্তু 'মহাভারতীয়' শৈলশ্রেণীর প্রান্তে টনকপুরের কাছে এসে শান্ত হয়েছেন শারদা। তখন শোনা যায় ঝনক-ঝনক নূপুর-নৃত্য—সেই নাচনে তরাই অঞ্চলে ব'সে গেছে শস্যশ্যামলতার আসর। ভৈরবীর আত্মঘাতী উন্মাদনা উত্তর প্রদেশের লক্ষণাবতীর উত্তরপ্রান্তে পৌঁছে শান্ত হয়েছে।

টনকপুর হোলো মধ্য হিমালয়ের একটি প্রধান তোরণদ্বার। এই অঞ্চলের পূর্বে নেপালরাজ্যের সীমানা, এবং পশ্চিমে হোলো দক্ষিণ কুমায়ুন—অর্থাৎ নৈনীতাল। এই দুইয়ের মাঝখানে সীমানারেখা টেনেছে শারদারই শিরস্রোত কালীনদী। সুদূর উত্তরের হিমালয়-লোকে ধবলীগঙ্গা ও কালী,—উভয়ে আসকোট নামক পার্বত্য শহরে মিলিত হয়ে দক্ষিণে নেমে এসে শারদা নামে প্রখ্যাত হয়েছে।

ইন্দ্র এসে থমকিয়ে গেলেন এই দক্ষিণ কুমায়ুনের এক প্রান্তে। না, এ দৃশ্য তাঁর সুখের স্বর্গে নেই। সৃষ্টি এখানে পরমাশ্চর্য, এই হোলো স্বর্গ-মর্ত্যের সন্ধিস্থল। এখানকার নিভৃত মায়াকাননে গোপনে নেমে আসে অলকাবাসিনী অপ্সরার দল; এই উদার অনন্ত গিরিশৃঙ্গমালার নীচে বিচিত্র আরণ্যকপুষ্প-শোভিত উপত্যকায় জ্যোৎস্নালোকে ব'সে যায় তাদের নৃত্যসভা। না, এমন জ্যোৎস্না নেই স্বর্গে,--সেখানে কেবল আছে নিত্যজ্যোতির্ময়তা। সেখানে নদী আছে মন্দাকিনী মধুরভাষিণী, কিন্তু এ নদীর মতো আত্মঘাতিনীর বুকফাটা হাহাকার মন্দাকিনীতে নেই। এখানকার ছায়ালোকের অন্ধকারের সঙ্গে মায়া-লোকের জ্যোৎস্নার যে-রঙ্গরহস্য,—এ যে নিখিল বিশ্বেরই বিস্ময়। এর তুলনা স্বর্গে কোথাও নেই। সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে এসে অবশেষে এইখানে দাঁড়িয়ে দেবরাজ স্থির করলেন, রাজধানী নির্মাণের পক্ষে এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি বন উপবন তপোবন গিরিগুহালোক শৈবালাচ্ছন্ন শিলানির্ঝর ব্যাঘ্রভল্লুকাদির অবাধ বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ে অগণ্য গিরিনদীপথ ছাড়িয়ে এসে পৌঁছলেন এক নীলনয়না সরোবরের প্রান্তে। সরোবরের সলিলগহ্বরে বহুকাল ধ'রে বাস করছিলেন নয়নাদেবী। তিনি সেই পাতালগহ্বর থেকে উঠে এসে জ্যোৎস্নাহসিত গগনের নীচে দাঁড়িয়ে দেবরাজকে অভ্যর্থনা করলেন। ইন্দ্র সহাস্যমুখে জানালেন, এই ভূস্বর্গেই তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবে।

নয়নাদেবীর নামে নৈনীতাল হয়েছিল বটে, কিন্তু নৈনীতালের প্রাচীন আর একটি নাম ছিল 'ইন্দ্রপ্রস্থ'। ইন্দ্রপ্রস্থের বিলুপ্তির পর নয়নাদেবী পাষাণ হয়ে যান্। সেইজন্য হ্রদের পশ্চিম পাহাড়ের দেওয়ালে অদ্যাবধি পাষাণদেবীর মূর্তি

খোদিত রয়েছে। তিনি শক্তিরূপিনী, সেই কারণে তিনি সিন্দুরশোভিত থাকেন। পাহাড়ের কোলে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরও দেখা যায়।

'তাল' শব্দের অর্থ হোলো সরোবর। নৈনীতাল প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত। একই হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ,—একটি হোলো মল্লিতাল, যেদিকে নন্দাদেবী, শিব ও গণেশ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদির মন্দির; অন্যটি দক্ষিণাংশ,—যেটি নৈনীতালের প্রবেশপথ। সমগ্র নৈনীতালের শোভা ও সৌন্দর্যের প্রধান কেন্দ্র হোলো নৈনী-হ্রদটি। নৈনীতাল জেলা ভিন্ন দক্ষিণ হিমালয়ের অন্য কোথাও এতগুলি জলাশয় সহসা চোখে পড়ে না। সেজন্য এগুলি হিমালয়ের উপগিরি অঞ্চলে প্রচুর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। এই হ্রদগুলির মধ্যে প্রধান হোলো ভীমতাল, খুরপা-তাল, গরুড়তাল, নল-দময়ন্তীতাল, সুখতাল, রামতাল, লক্ষ্মণতাল, নওকুচিয়াতাল ইত্যাদি। সুন্দর শতদলের শোভা এবং শালুকের গলাগলি 'নওকুচিয়াতালের' একটি প্রধান আকর্ষণ।

একদিকে শতদ্রু এবং অন্যদিকে কালীগঙ্গা, এই দুই নদীর মধ্যভূভাগ নিয়ে সমগ্র কুমায়ুন। কুমায়ুনকে যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায় তবে নৈনীতাল পড়ে দক্ষিণ অংশে। মধ্য অংশে হোলো আলমোড়া, উত্তর অংশে গাড়োয়াল। তবে গাড়োয়াল এবং আলমোড়ার উত্তরপূর্ব সীমানা তিব্বতের সঙ্গে মিলেছে। গাড়োয়াল আগে ছিল পৃথক, কারণ সমতল ভারতে কোথাও গিয়ে তা'র এলাকা পড়েনি,—সে থাকতো বিচ্ছিন্ন। ইংরেজ আমলের পর টিহরী গাড়োয়াল এসে মিলেছে কুমায়ুনে। আসাম থেকে কাশ্মীরের মধ্যে হিমালয়ের অন্য কোনও বিভাগে এতগুলি তুষারাবৃত চূড়া আর কোথাও এত কাছাকাছি দেখা যায় না। সমগ্র ভারতের কোটি কোটি নরনারী হিমালয়ের অপর কোনও খন্ডকে তাদের জীবনে এবং তাদের অধ্যাত্মচিন্তায় এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গেও ঠাঁই দেয়নি। পশ্চিমে যমুনাপর্বত—যেটিকে বলা হয় 'বন্দরপঞ্চ', সেখান থেকে এই শ্বেতগিরি-শিখরগুলিকে জনৈক জার্মান পন্ডিত বলেছেন, 'দেবগণের সিংহাসন।' যমুনা পর্বতের পর শ্রীকান্ত, গঙ্গোত্রি, কেদারনাথ, বদরিনাথ, শতোপন্থ, কামেত, দ্রোণগিরি, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, পঞ্চচুলী, নন্দকোট প্রভৃতি শিখরগুলি জগৎ প্রসিদ্ধ। এদের মধ্যে নন্দাদেবী, কামেত, ত্রিশূল, বদরিনাথ—এগুলি সর্বোচ্চ। এদের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে সংখ্যাতীত গিরিসঙ্কট এবং ক্যারাভান পথ—যাদের ভিতর দিয়ে পশ্চিম তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার দিকে অভিযান করা চলে। প্রধান ও প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কট ঠাগা, মানা, নিতি, কাংড়িবিংড়ি, দরমা, লিপুলেক ইত্যাদি পথে ভারতীয় ও তিব্বতী বাণিজ্যের চলাচল হয়ে আসছে বহুকাল থেকে। বদরিনাথ থেকে মানা গ্রাম হয়ে শতোপন্থ ও কামেতের তলা দিয়ে সোজা উত্তরে গেছে 'মানা' গিরিসঙ্কটের পথ, সেই পথ গেছে শতদ্রু নদের দিকে। শতদ্রুর পরপারে গারটকের পথ পাওয়া যায়।

নৈনীতালের পূর্ব সীমানা হোলো কালীগঙ্গা ওরফে শারদা, এবং

পশ্চিম সীমানা হোলো কোশী নদী। এই কোশীনদীর মূল নাম সম্ভবত কৌশল্যা, এবং যতদূর আমার জানা আছে এটি নেপাল-বিহারের অন্তর্গত সূর্যকোশী, সপ্তকোশী অথবা অরুণকোশীর শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না।

নৈনীতাল প্রবেশের পক্ষে তিনটি প্রধান পথ পাওয়া যায়। পশ্চিম অংশে হোলো মোরাদাবাদ-রামনগর-রাণীক্ষেতের পথ। এটি চ'লে গেছে নৈনীতাল শহরের নীচে দিয়ে আলমোড়ার অভিমুখে। মধ্যপথটি সর্বাপেক্ষা সহজ,—বেরিলী থেকে কাঠগোদাম হয়ে মাত্র একুশ মাইল মোটর পথ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ পথ যেটি সেটি সহজসাধ্য নয়—সেটি হোলো টনকপুর থেকে নৈনীতালের পথ। এই পথে নদী নালা, উপত্যকা, জলপ্রপাত, গহন অরণ্য, অসাধ্য পার্বত্যলোক এবং প্রকৃতির পরম ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার অভিযানকারী পর্যটককে নিত্য অভ্যর্থনা জানায়। টনকপুর থেকে মোটর বাসের পথ গেছে সোজা উত্তরে—চম্পাবত, লোহাঘাট ছাড়িয়ে পিথোরাগড় পর্যন্ত। এই অঞ্চলে জগৎপ্রসিদ্ধ শিকারী ও ভারতপ্রেমিক 'জিম করবেট্' বহুকাল ধ'রে তাঁর বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নামে সমগ্র কুমায়ুন এখনও কৃতজ্ঞতা জানায়। প্রতি বৎসর তাঁরই নামে রুদ্রপ্রয়াগে আজও একটি মেলা বসে।

নৈনীহ্রদটিকে কেন্দ্র ক'রে আধুনিক নৈনীতাল শহরটি গ'ড়ে উঠেছে। উত্তপ্ত ভারতের সমতলে দাঁড়িয়ে সাহেবরা খুঁজে বেড়াতো ঠাণ্ডা অঞ্চল। বস্তুত, ইংরেজের আনুকূল্যেই ভারতে একটির পর একটি সুন্দর পার্বত্য শহর গ'ড়ে উঠেছে। ডালহাউসী, লান্সডাউন, শিমলা, মুসৌরী, শিলং, এমন কি দার্জিলিঙেরও প্রায় ওই একই ইতিহাস। ইতিহাস বলে, ব্যারণ নামক এক সাহেব সাজাহানপুর থেকে বেরিয়ে মাছ ধরবার জন্য এসে পেঁছিন নৈনীতালে—সেটি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ। তিনি এই মনোরম পার্বত্য এলাকাটির সংবাদ দেন্ কর্তৃপক্ষ মহলে। অতঃপর সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে নৈনীতাল সাহেবদের পক্ষে একটি আঞ্চলিক শাসনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। হ্রদের চারিপাশে নৈনীতালের যে শহরটিকে আমরা দেখি, সেটি হোলো অনেকটা নীচের তলা। এখানে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে বাজার, বাসস্থান ও হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত। নানাবিধ কাজ কারবার বাণিজ্য বেসাতি এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। উপর-তলায় রাজধানী এবং সরকারী দপ্তর। আজকে অত্যন্ত প্রয়োজন না ঘটলে প্রাদেশিক সরকার গ্রীষ্মকালে আর লক্ষ্ণৌ থেকে স্থানান্তরিত হয় না। নীচের তলায় শীতের বাতাস কিছু কম বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা প্রচুর। উত্তরপূর্বের একটি অংশ অনেকটা অবারিত থাকার জন্য শীতের দিনে ঠাণ্ডা নেমে আসে, এবং তখন নগরের কাজকারবার বন্ধ ক'রে স্থানীয় অধিবাসীদের মোটা অংশটা নীচের দিকে চ'লে যায়। শীতের দিনে পশ্চিম পাহাড়ের পিছন থেকে জন্তু-জানোয়াররা

হ্রদের চৌহদ্দির বনময় অঞ্চলে নেমে আসে। এই জলাশয়টি নৈনীতালের প্রধান আকর্ষণ।

শহরের নীচের তলাটা চৌবাচ্ছার মতো কিনা, ওখানে দাঁড়িয়ে একথা ভেবেছি অনেকবার। জলাশয়ের শোভা অপরূপ, কিন্তু হিমালয়ের সুদূরব্যাপকতার স্বাদ নীচের তলায় নেই। কাশ্মীরের শেষনাগ, গঙ্গাবল, উলার হ্রদ, ডাল হ্রদ,—এদের চারিদিকে অনন্তের পরিব্যাপ্তি। জগৎপ্রসিদ্ধ হিমালয়বিশেষজ্ঞ স্বামী প্রণবানন্দ বলেন, মানস সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে মানুষের পথহারা কল্পনা কৈলাসশৃঙ্গের চারিদিকে সমস্ত আকাশে আর তিব্বতে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তা'র তুলনায় নৈনীতালের এই জলাশয় যেন অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানে, এই হ্রদের জল স্বাস্থ্যকর নয়, সেইজন্য মাঝে মাঝে এর জল কতকটা নিকাশ ক'রে দেবার জন্য একটি নালী-পথ বানানো আছে, কিন্তু নালীর দক্ষিণে যে প্রবাহপথটি দেখি, সেটি প্রাকৃতিক। এরই আশে পাশে স্থানীয় বস্তির জটলা। পুরনো বাড়ীঘর, গলিঘুঁজি, নোংরা আর নর্দমা। পাহাড়ী শহরের বস্তি অঞ্চল কোথাও সুশ্রী নয়। যেখানে যাও—দার্জিলিঙে, মুসৌরীতে, শিমলায়, আলমোড়ায়—এরা সেই একই পরিচয় বহন করে। বছরে মোটামুটি ছয়মাস হোলো 'সীজন্', বাকি ছয়মাস তারা দারিদ্র্যে ভোগে।

চারিদিকের অবরোধ সম্বন্ধে যে কথা তুলছি, তাদের প্রত্যেকটি হোলো এক একটি পাহাড়ের শীর্ষ। কোনোটির নাম 'আয়ারপট্ট', কোনোটি 'দেওপট্ট'। উত্তর অঞ্চলে হোলো 'চায়না পীক্', এদিকে আল্মা, লারিয়াকান্তা, শের-কি-ডান্ডা,—এরা চারিদিক থেকে ওই হ্রদটিকেই যেন ঘিরে রয়েছে। কিন্তু হাজার খানেক ফুট উপরে উঠলেই পৃথিবী অনেক বড়। যতদূরে তাকাও—উত্তরে অনন্ত গিরিশিখর শ্রেণী—পূর্বেও তাই, পশ্চিমেও তাই। কেবল দক্ষিণে ঠাহর করলে দেখা যায় অন্তহীন হিন্দুস্থানের ধূসর অস্পষ্ট সমতল। পূর্ব-পর্বতের 'টিফিন্ টপের' উপর উঠে সমস্ত দিনমান ধ'রে কেবলমাত্র হিমালয়ের পরমাশ্চর্য মহাশ্বেত শোভা দেখতে দেখতেই দিন কেটে যায়। যারা নৈনীতালে আসে তা'রা জলের ধারে তলিয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করবে, সন্দেহ কি!

ছোট্ট গল্পটি মনে পড়ছে। নৈনীহ্রদে নৌকাবিহারকালে মাঝি বলেছিল : বছর পঞ্চাশেক আগে এক সাধু এখানে আবির্ভূত হয়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এক হৈ চৈ বাধিয়েছিল। সে নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয় যে, এখানে হ্রদের ধারে নয়নাদেবীর মন্দির নির্মাণ না করলে তা'র নিস্তার নেই। সাধু এই দাবি করে যে, এখানে নগরের সম্প্রসারণ কিছুতেই চলবে না। তৎকালীন ইংরেজ গভর্ণর বাহাদুর সাধুর কান ধ'রে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা পান্, এবং সাধুর পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেন্। সাধু ভয় পায়নি। সে বিনামেঘে এমন এক বজ্রাঘাত ঘটায় যে, সমগ্র নৈনীতাল থরথরিয়ে ওঠে। চোখ রাঙিয়ে সে বলে, এমন ভূমিকম্প সে আনবে যে, লাটপ্রাসাদ ধূলিসাৎ ক'রে দেবে! বোধ করি সেই

সাধুর কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল, সেইজন্য ইংরেজ তা'র দাবি স্বীকার করে এবং নয়নাদেবীর মন্দির নির্মাণের জন্য কতকটা জায়গা জমি ছেড়ে দেয়। কিন্তু এর পরেও আবার নানা কারণে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ বেধে ওঠে, এবং সাধুকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য গভর্ণর স্বয়ং যখন পুলিশ ফৌজ নিয়ে অগ্রসর হন, তখন অকাল বর্ষণের ফলে পাহাড়ের গা থেকে এক বিরাট ধ্বস নেমে আসে নীচের দিকে,—চারিদিক ছত্রখান হয়ে যায়। সাধু সেই সময় অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু যাবার সময় এই অভিসম্পাত দিয়ে যায়, চল্লিশ বছরের মধ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্য পৃথিবী থেকে রসাতলে যাবে!

নৌকার মাঝি সগৌরব উদ্দীপনার সঙ্গে মোটামুটি গল্পটা শোনালো। ওখানে আজও একটি সাধু দেখছি বৈকি। তবে সে এক ভক্ত শিষ্যসহ হ্রদের তটের নীচে জলের কোলে একটি গুহার মধ্যে থাকে। জলের ওপরেই তা'র বাসা; এবং ওরই মধ্যে লতাপাতার ছায়ায় গুহাটি ঢাকা,—গাঁদাফুলে ভরা সেই গুহা-মুখ। ওরা নিজেদের সংসারটি বানায় ঠিক সেইখানে, যে-স্থানটি সর্বপরিত্যক্ত। গাছের তলা, নদীর তট, পাহাড়ের গুহা, মন্দিরের পাশ, পথের ধার—যেখানে কা'রো প্রয়োজন নেই, যেখানে কোনও নিষেধ নেই। ভিক্ষে করে না, কিন্তু আকর্ষণ করে। কথা বলে না,—রহস্য ঘনিয়ে তোলে। চোখ তুলে তাকায়,—যেন আত্মার নিগূঢ় জিজ্ঞাসার শেষ জবাব। চুপ ক'রে থাকে,—সৃষ্টিতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্তটা বুঝে নাও। চরসের কল্‌কেটায় দম ভ'রে টান দিল,—ওই সঙ্গে ফুঁকে দিল জীবনটা। এক সময় হঠাৎ ধুনির থেকে ভস্মতিলক তুলে দিল তোমার ললাটে,—ব্যস, আর চাই কি, 'ভাগোয়ানকো' মিল্ গিয়া। নমস্কার জানিয়ে চ'লে যাও।

নৌকা আমাদের ভেসে চললো। 'সন্ধ্যা-সকাল করছি শুধু এঘাট ওঘাট।' সমস্ত দিনমান সুন্দর রৌদ্রে আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক পাহাড় ছায়া ফেলেছে হ্রদের জলে—যেমন ওর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে নীলকান্ত আকাশ। ছবি আসেনা ওদের,—কেননা ছবি অপেক্ষাও মনোরম। অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে নিবিড় অতৃপ্তি যেন জড়িয়ে আছে পাহাড়ে আর ছায়াচ্ছন্ন জলাশয়ে। এখানে শহর বটে,—কিন্তু সমস্তটা শান্ত! জলে আকাশে পাহাড়ে বাতাসে যেন সমস্ত দিন ধ'রে একটা প্রশ্নোত্তর মীমাংসা চলছে,—আমরা যেন তা'র নিঃশব্দ শ্রোতা এবং দর্শক। জ্যোৎস্নালোকে জলাশয়ের তীরে আড়ালে-আবডালে ব'সে আছে সবাই। যেন এবার ইন্দ্রসভার নাচের আসর ব'সে যাবে। আমাদের স্তব্ধ নিমেষনিহত দৃষ্টির পিছনে নিরুদ্ধ উৎকণ্ঠা!

গির্জায়, 'গুরুদোয়ারে', রাধাকৃষ্ণ ও নয়নার মন্দিরে, কিছু যেন খুঁজে ফিরছি। কিছু দেখে যেতে চাই এখানে ওখানে,—কিন্তু তা'র সংজ্ঞাটা সঠিক জানিনে। কৌতূহল আছে, কিন্তু সংশয় আছে অনেক বেশি। সমস্ত জীবন ঘষেছি পাহাড়ের পাথরে-পাথরে,—অরণিকাষ্ঠ যেমন ঘষে আগুন জ্বালাবার জন্য। ছমছমিয়ে এসেছে দিনান্তের অন্ধকার, এসেছে অরণ্যতলের ছায়া রাহুর মতো

মুখব্যাদান ক'রে, শুষ্ক পত্রদলের সরসরানির মধ্যে পায়ে পায়ে লেগেছে রোমাঞ্চ কৌতুক, লেগেছে কম্প, লেগেছে হর্ষ,—বুঝিনি অনেক সময় নিজের মধ্যে এমন অধীর উত্তেজনা কেন, কেন অকারণে প্রাণ এমন ক'রে থরথরিয়ে ওঠে! তখন দ্রুতপদে চ'লে এসেছি ছায়ালোকের বাইরে। যে-বস্তু খুঁজতে গিয়েছিলুম, তাই যেন পাবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

চিত্তের এই বিকার এবং বৈলক্ষণ্য বুঝিনি কোনোদিন।

জলে স্থলে পাহাড়ের কোলে-কোলে আজ সকালে নৈনীতালের হাসি উচ্ছ্বসিত। নীল আকাশের মাঝখানে মেঘের আকারে এসে দাঁড়িয়েছে যেন শ্বেত ঐরাবত সামনের দুই পা তুলে। হেমন্তের নীলিমার নীচে বিরাটের স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে পর্বতের শিখরে-শিখরে। চাঞ্চল্যের বেগ আসছে মনে ক্ষণে ক্ষণে।

বারান্দার নীচে দিয়ে মাঝে মাঝে পেরিয়ে যাচ্ছে বায়ুবিলাসী ঘোড়সওয়ার। মোটরও যাচ্ছে এক আধখানা। পাহাড়ী শহরে এলে পাওয়া যায় ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে। ছত্রিশটি জাত ছড়ানো থাকে সমতল ভারতে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদেরকে সহসা খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এখানকার স্বল্প পরিধির মধ্যে তা'রা স্বপ্রকাশ। এখানে এলে ঘরের চেয়ে বাহির হয় প্রধান। বাইরে আসতে হবে সবাইকে। ধরা দিতেই হবে সকলের মাঝখানে। সেই কারণে হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়ায় আর মধুর রৌদ্রে সর্বব্যাপী আনন্দের যে আসর বসেছে, সেখানে এসে পেঁছেছে মারাঠী আর মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী আর রাজস্থানী, গুজরাটী আর ওড়িয়া। বালক বালিকারা এসেছে লক্ষ্ণৌ থেকে তাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে,—তা'রা যাবে পাহাড়ে পাহাড়ে 'এক্‌স্‌কারশনে।' এদের পাশে বাঙালী ছেলেমেয়ের নির্জীব চেহারা কল্পনা ক'রে লজ্জা পাই। স্বাস্থ্যে শিক্ষায় কর্মক্ষমতায় বাঙালী আজ ভারতের কোথাও বিশেষ নেই। আজ দেশের চারিদিকে—ভিতরে ও বাহিরে—যখন দুরন্ত জীবনের অভিযান ডাক দিচ্ছে তারস্বরে, তখন বাঙালী বাৎসল্যের আঁচলের নীচে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র বাড়াচ্ছে। বদ্ধজলায় বাঙালীর পা পুঁতে ব'সে গেছে, রাজনীতি এনেছে ওদের জীবনে যক্ষ্মা, দারিদ্র্য এনেছে ওদের জীবনে দৈন্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব এনেছে ওদের সমাজ-সংসারে পাশব প্রকৃতি। বাহিরের সরল, বৃহৎ, উদার ও সর্বপ্লাবী প্রাণশক্তির দিকে বাঙালীর চোখ নেই। ওরা আগে চায় চাকরি, পরে চায় ধর্মঘট। স্বাধীনতালাভের জন্য যে-বাঙালী চেয়েছিল মৃত্যু, স্বাধীনতা লাভের পর সেই বাঙালী যেন চাইছে অপমৃত্যু!

সুশ্রী বালকবালিকাদলের আনন্দোজ্জ্বল কোলাহলের দিকে চেয়ে থাকলে ঈর্ষাকাতর চক্ষু এক সময় বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। ওই অবাঙালী ওরা আমাদেরই সন্তান এবং আমারই ভারতের ভবিষ্যৎ—এ সান্ত্বনা মন যেন মানতে চায় না!

ভদ্রসমাজের তথাকথিত আবহাওয়াটাকে ছাড়িয়ে মাটির তলায় গিয়ে নামলে দেখতে পেতুম স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা। বাইরে থেকে এসেছে অনেকে, যারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী। আরও আছে যারা নেপালী কিংবা গাড়োয়ালী। তা'রা মোট বয়, দোকানে কাজ করে, ঘোড়া রাখে, অলিগলিতে প'ড়ে থাকে। নেপালী এসে হোটেলে চাকরি নেয়, ড্রাইভারী করে, কিংবা বায়ুসেবীদের কাছে দাসখৎ লেখে। কুমায়ুনীরা ঘরে কম্বল বোনে, দর্জিগিরি করে, ফল আর সব্জি বেচে, আর নয়ত খাবারের দোকান দেয়। ওদের পিছনে যে-গৃহস্থের জীবনযাত্রা, সেটির দিকে চোখ না পড়াই উচিত। শীতকালের তিন-চার মাস ওরা কুঁকড়ে ঘরের মধ্যে প'ড়ে থাকে। শাকসব্জি শুকিয়ে রাখে ঘরে, ক্ষেত-খামারে কাজ থাকে না, রোগ-ভোগে ওষুধ জোটে না, বাইরের বাড়ীওয়ালারা ওদের কাছে জুলুম ক'রে ঘরভাড়া চায়। চৈত্রমাস পড়লে তবে ওদের মনে আশার সঞ্চার হয়,—'চেঞ্জার'দের প্রতীক্ষায় দিন গোণে। যারা খোঁজ রাখে তা'রা জানে, পাহাড়ী শহরের নীচের তলাটা রোগে আর দারিদ্র্যে পঙ্গু। দার্জিলিংয়ে, মুসৌরী-আলমোড়ায়, শ্রীনগরে—সর্বত্র প্রায় একই ইতিহাস। গভর্নমেণ্ট দেশের খবর রাখেন, পাহাড়ের খবর সকল সময় তাঁদের কানে ওঠে না।

মহাদেবের চূড়ায় গঙ্গা যেমন বন্দিনী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি চেহারায় নৈনী হ্রদটি রয়েছে নৈনীতাল শহরে। ওখান থেকে মাইল সাতেক নীচে নেমে এলে 'ভাওয়ালীর' ছোট শহর। ওপাশ দিয়ে উঠেছিলুম, এপাশ দিয়ে নেমেছি। এটি সেই প্রধান রাজপথ—যেটি রামনগর থেকে এসে আলমোড়ার দিকে চ'লে গেছে। পথটি অতি চমৎকার এবং বনময় পার্বত্য অঞ্চলের আলোছায়ায় অপরূপ। এ আমার পরিচিত পথ। তবু আবার এসেছি অনেক দিন পরে। পুরাতন বন্ধুদের প্রাচীন স্নেহ যেন ডাক দিচ্ছে ওক্ আর দেওদারের বনে-বনে। ঝাউবনে বাতাস উঠেছে, অতীত কাহিনীরা যেন আমায় কাছে পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। একালের নতুন পাখীরা এসে বাসা বেঁধেছে নির্ঝরের আশে পাশে, গিরিনদীর প্রাণধারা শুকিয়ে এসেছে, পাথরের থেকে শৈবাল ঝ'রে গেছে,—নিশ্বাস ফেলছে যেন সর্বগ্রাসী মহাপ্রাচীন। এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি,—আমার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে গ্রহণ ক'রে নিচ্ছে সব। প্রতি গ্রানাইট্ পাথর, প্রতি অর্কিডের চারা, প্রতি পুষ্পের স্তবক, প্রতি নিকুঞ্জের কুসুমলতা,—ওরা থাকে এ পাড়ায় আমার অতিপরিচিত মহলে। কিন্তু সমস্ত পরিচয়ের বাইরেও ওরা আমার চোখে চিরকালের অচেনা। ভালোবাসার পাত্রকে নিবিড় ক'রে বুকের মধ্যে টেনে নিই,—যেন সে নিজের সমস্ত অনাবিষ্কৃত পরিচয় নিয়ে আমার কাছে ধরা দেয়। আলিঙ্গনের মধ্যে পাই যতটুকু, তা'র চেয়ে অনেক বেশি প'ড়ে থাকে বাইরে। সেই কারণে বড় প্রেম হোলো বড় তপস্যার মতো। হাত বাড়ালেও যা পাইনে, হৃদয়ের একূলে ওকূলে যাকে ধরে না,—সেই অনাস্বাদিত অলভ্য অমৃতলাভের আশায় প্রেমের চক্ষে অশ্রু গড়িয়ে আসে।

এদেরকে বুকের মধ্যে নিয়েছি একদিন, কোলে নিয়ে কেঁদেছি কতদিন। যেন জন্ম-জন্মান্তরে দেখেছি, হাজার হাজার বছর ধরে জেনেছি। অগণ্য বংশপরম্পরায় মহাকালের কল্পে কল্পে আমি ওদের দেখে চলেছি বিবর্তনবিধির ভিতর দিয়ে। আমার শিরা-উপশিরাদলের রক্তপ্রবাহে বয়ে গেছে শত-সহস্র গিরি-নির্ঝরিণীরা, আমার অস্থিপঞ্জরের স্তরে স্তরে সংখ্যাতীত শিলাসনে প্রাচীন মুনিঋষির যোগাসন পেতে রেখেছি, আমারই হৃদয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ধারণ ক'রে রয়েছি দেবসিংহাসন হিমালয়ের অগণিত শৃঙ্গমালা। জন্ম আর মৃত্যুর অতীত অখণ্ড চৈতন্য সেই আমি,—সেই আমার আদি চৈতন্য কল্পান্তরে, দেহান্তরে, জন্মান্তরে, যুগান্তরে বিবর্তিত। পুরাণে ইতিহাসে অতীতে আধুনিকে ভবিষ্যতে,—সেই আমি অজর অক্ষয় অব্যয় ভারতাত্মার নিত্য প্রতীক্। আমার ক্ষয় নেই, লয়ও নেই। আমার অহঙ্কার,—ওরা আমাকে এনে ওদের মাঝখানে বসিয়েছে বারম্বার। ওরা ভাষা দিয়েছে আমার মুখে, প্রাণ দিয়েছে আমার দেহে, নিশীথরাত্রির তারায় পাঠিয়েছে আমন্ত্রণ, হেমন্তের হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরভিশ্বাস নিয়ে গেছে আমার বাতায়নে কতবার।

ভাওয়ালীর পাহাড়ের কোলে নিভৃত বনচ্ছায়াময় অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে ভারতপ্রসিদ্ধ যক্ষ্মারোগী-নিবাস। ভাওয়ালী শহরটি ছোট, কিন্তু এই রোগী-নিবাসটির জন্য শহরটি সর্বত্র সুপরিচিত। অসুস্থ না হ'লে এমন একটি মধুর কাব্যপরিবেশ কপালে জোটে না,—এ যেন জীবনের একটি ট্রাজেডি। কলকণ্ঠী পাখী আর সরীসৃপের ডাক ছাড়া সমগ্র অঞ্চল যেন প্রাণীচিহ্নহীন। রোগীনিবাস থেকে সামান্য উৎরাই পথে আন্দাজ আধ মাইল নেমে এলে ভাওয়ালীর ক্ষুদ্র জনপদ। এখানে পথের চৌমাথা,—সামনে পাহারাদার দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করছে। অদূরে মোটরবাসষ্ট্যান্ডের অঞ্চলটি কতকটা প্রশস্ত। গিরিশ্রেণীর সারিবদ্ধ জটলার বাইরে দৃষ্টি বেশিদূর পৌঁছয় না। পাহাড়ের গা বেয়ে একটি ঝিরি ঝিরি ঝরণা নেমে এসেছে।

এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল পথ 'ভীমতাল।' পথ পার্বত্য, কিন্তু অনেকটা উপত্যকাপথ। ডানদিকের একটি পাহাড়ের নীচে গা বেয়ে-বেয়ে পথ চ'লে গেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। ভাওয়ালীর ক্ষুদ্র জনপদটিতে আবার যথাসময়ে ফিরে আসতে হবে।

ভীমতালের পথটি তেমন মসৃণ নয়, কিছু কর্কশ। এখানকার উঁচু কোনও পাহাড়ের শিখরে উঠলে দক্ষিণ কুমায়ুনের তরাইয়ের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে অনেকটা ওই কার্সিয়ং অঞ্চলের ন্যায় ধূসর একটা ছায়ার মতো। এ পথটি ভীমতাল হয়ে এঁকেবেঁকে উপত্যকাপথে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমাদের গাড়ী যখন এসে পৌঁছলো তখন মধ্যাহ্ন পেরিয়েছে।

ভীমতালের হ্রদটির বর্গ পরিমাপ নৈনীতাল অপেক্ষা একটু বড়, এই আমার ধারণা। কিন্তু নৈনীতাল অপেক্ষা প্রায় দু' হাজার ফুট নীচে হওয়ার জন্য এখানে রৌদ্রের উত্তাপ বেশী। উঁচুতেই হোক আর নীচেই হোক, পাহাড় অঞ্চলে রৌদ্রের তাপ অতি প্রখর। হেমন্তকালে হরিদ্বার বাতাসের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু হৃষিকেশ লছমনঝুলো অঞ্চলে গরম। মাত্র পনেরো ষোল মাইলের মধ্যে এই তারতম্য ঘটে। শুধু এখানে নয়, তুষার রাজ্যেও এই। 'পঞ্চচুলীর' শৃঙ্গবিজয় অভিযানে যিনি প্রথম সাফল্যলাভ করেন, দিল্লীর সেই ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি-এন-নিকোর বলেন, "সাড়ে বাইশ হাজার ফুটের উপরে উঠে প্রখর উত্তপ্ত সূর্যরশ্মি তাঁকে যেন ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ করছিল। কিন্তু বাতাস উঠলেই সর্বনাশ। সেই বাতাসে আসবে কুহেলী, এবং অতঃপর তুষারঝটিকা।"

ভীমতাল নাকি অতলস্পর্শ গভীরতার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে এসে দেখি হ্রদটি বড় নির্জন, বড়ই একা। ওপারে একটি বৃহৎ পর্বতচূড়া, এবং ওটির নাম 'হিড়িম্বা' পাহাড়। এ অঞ্চলে কেবল এই হ্রদটি নয়, এখান থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে পর পর সাতটি 'তাল' পাওয়া যায়। তাদের কথা আগে বলেছি। কাছাকাছি এসে দেখি, ভীমতাল সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে একটি প্রাচীন শিব-মন্দির। নাম, ভীমেশ্বর মহাদেব। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম দেখা যাচ্ছে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করেছেন প্রচুর। আসামে হিড়িম্বাপুর (ডিমাপুর), কো-হিমা অর্থাৎ হিড়িম্বা পাহাড়, নেপালে ভীমপেড়ী, হরিদ্বারে ভীমগোড়া,—এর পরেও পাঞ্জাবে আর কাশ্মীরে কি-কি চিহ্ন যেন পাওয়া যায়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নামে উৎসর্গীত একটি দেবস্থানও কই এযাবৎ চোখে পড়েনি। শ্রীরামচন্দ্র ছড়িয়ে আছেন যেমন ভারতের সর্বত্র, তেমনি হিমালয়েরও সর্বত্র। শ্রীনগরের উত্তরপথে সিন্ধু নদী অতিক্রম ক'রে গিলগিটে ঢোকবার তোরণদ্বারই হোলো রামঘাট। পাকিস্তানঅধিকৃত কাশ্মীর এলাকার একটি জনপদের নাম রামপুর। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি বড় শহরের নাম, রামনগর,—যেটি শিয়ালকোটের দক্ষিণ অঞ্চলে চন্দ্রভাগার তীরে। সুতরাং 'রামঘাট' থেকে সেতুবন্ধ 'রামেশ্বরম্' পর্যন্ত ভারতবর্ষ একসূত্রে গাঁথা।

ভীমতাল হ্রদের ঠিক মাঝখানে একটি ক্ষুদ্রদ্বীপ রয়েছে চোখের সামনে,—কলকাতার লেক্-এ যেমন দেখা যায়। গিরিলোকে নদীর সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু জলাশয়ের সংখ্যা বড় কম। সেই দীঘি, হ্রদ, সরোবর—তাদের আকর্ষণ বেশি। এই হ্রদের পশ্চিম পাহাড়ে আদিবাসী পাহাড়ীর মেয়ে ছিলেন পরমাসুন্দরী শ্রীমতী হিড়িম্বা। তিনি বোধ করি ভীমের অসমশক্তির কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে দ্বিতীয় পাণ্ডবকে এখানে আমন্ত্রণ করেন। পাহাড়ী মেয়ের কঠিন যৌবন হয়ত খুঁজেছিল শক্তিমান পুরুষ। ভীম আসেন এখানে, এবং উভয়ে প্রণয়াসক্ত হয়ে বিবাহ করেন। সম্ভবত এই সরোবরের মাঝখানে ওই জনহীন দ্বীপকাননে

তাঁরা মধুযামিনী যাপন করেছিলেন। ঘটনাটি মহাভারতে ঠিক এই ভাবে আছে কিনা মনে পড়ছে না।

একটি প্রাচীরের পিছন দিয়ে ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের চত্বরে উত্তীর্ণ হলুম। বৃক্ষচ্ছায়াময় মন্দিরের অঙ্গন,—অদূরে বস্তি। ঝুরু ঝুরু বাতাস বইছে ছায়ালোকে। ছোট একটি পাণ্ডা-পরিবার এখানে থাকে। শিবের কাছেই পার্বতী। গণেশ থাকবেনই, এবং সিন্দুরমাখা মহাবীর অবশ্যম্ভাবী! হনুমান হলেন শৈবভারতে শক্তির প্রতীক্। বেদীবাঁধানো রয়েছে পাথরের, তারই এক পাশে ব'সে কতক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। মন্দিরের মতো এমন মধুর অনাহত বিশ্রামের ক্ষেত্র আর কোথাও নেই। গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় হিমালয়ের হাওয়ায় নিভৃত মন্দিরের এক কোণে চোখ বুজে শুয়ে থাকা,—তা'র সঙ্গে যদি থাকে আকাশপথের পথিক পাখীর চূর্ণ কণ্ঠস্বর, আর যদি থাকে নিকটবর্তী নালাপথে সরোবরসলিলের কুলুকুলধ্বনি,—তাহ'লে সেই সৌন্দর্যচেতনার শিহরণে আকাশের অনন্ত নীলিমাও শিউরে ওঠে বৈকি। বিশ্বাস করবে না অনেকে,—স্বর্গলাভ করি আমি কথায় কথায়!

ওরই মধ্যে এক সময় দেখে নিলুম ভীমতালের সঙ্গে নালীপথ সংযুক্ত ক'রে 'স্লুইস গেট্' বানিয়ে জলনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। এর পর জ্যামিতিক পদ্ধতি দেখতে সময় গেল। অতঃপর ভাওয়ালীতে ফিরে এসে চললুম এবার রামগড়ের দিকে। ভাওয়ালী থেকে রামগড় নয় মাইল, কিন্তু অধিত্যকা পেরিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই পথ উঠে গেছে। এ পথটি পাকা। নাম, 'নেহরু রোড।' দক্ষিণপূর্ব দিক পেরিয়ে গাড়ী চলেছে উত্তর দিকে। এ অঞ্চলে যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ দেখে মন খুশী হয়। মোটরবাসের প্রথম যুগে মালিক এবং চালকের যে-স্বেচ্ছাচার ছিল—যেমন ছিল কলকাতায়,—এখন আর সেরূপ সহসা চোখে পড়ে না।

ডালিমের বন ঘেঁষে চলেছি। ছোট ছোট কমলা ধরেছে গাছে গাছে। 'বাসনার সেরা বাসা রসনায়'—ফলের বাগানের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ ভীমেশ্বর মহাদেবের কথা ভুলে গেলুম। শুষ্ককণ্ঠে এখনই কিছু ফলের রস সঞ্চারিত না হতে পারলে জীবনটাই ব্যর্থ! দার্জিলিংয়ের ভুটিয়া মেয়ের দুটি গালের মতো টসটসে আপেলে রক্তের ছোপ পড়েছে,—মাথায় থাকুন ভীমেশ্বর! কিন্তু ফলের বাগান নাগালের বাইরে,—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কোনো লাভ নেই। ওইসব রাঙা ফলের পিছনে আছে রক্তলোভাতুর মহাজনের দল। তাদের সঙ্গে আছে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য চক্রান্ত। ফল তা'রা পচিয়ে দেবে সে ভালো, কিন্তু অল্প দামে বেচে বাজার মাটি করবে না। প্রলোভনের ফাঁদ ওরা পেতে রেখেছে নগরে নগরে। কায়েমী স্বার্থের সাফল্যটা ফলের রসে সরস। আমাদের গাড়ী চলেছে চড়াই পথে।

পাহাড়ের নীচে-নীচে দেখে যাচ্ছি, নতুন ধরণের ফলনের কাজ চলছে। কোথাও ফুলের বাগানে চলছে পরীক্ষা, কোথাও বা লতাপাতা নিয়ে নতুন

পদ্ধতির গবেষণা। ওরই মধ্যে পেকে উঠছে ফলপাকড়, ওরই মধ্যে চলছে আলুর চাষ। রেশমের গুটিপোকা ও মৌমাছির চাষ চলছে নানাস্থানে।

একটি চাষীপ্রধান গ্রাম লেগে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। এর নাম বুঝি 'বিনায়ক'। হবেও বা। কিন্তু এখান থেকে একটি পথ গিয়েছে মুক্তেশ্বরে চৌদ্দ মাইল চড়াই আর উৎরাই পেরিয়ে। একথা লোকে বোধ হয় ভুলতে বসেছে যে, মুক্তেশ্বর হোলো একটি তীর্থস্থান। কেননা প্রায় ষাট বছর পূর্বে ভারত গভর্নমেণ্ট মুক্তেশ্বর পর্বতের শিখরে একটি পশুচিকিৎসা ও গবেষণাকেন্দ্র নির্মাণ করেন। আজ সেই প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে উঠেছে, এবং ভারতের নানা অঞ্চল থেকে কর্মী ও ছাত্ররা এখানে বিভিন্ন কাজ নিয়ে আসে। মুক্তেশ্বরের চারিদিকে কুমায়ুনের মনোরম উপত্যকাগুলি বিস্তারিত ভাবে দেখে নেওয়া যায় এবং এই মুক্তেশ্বরে দাঁড়ালে হিমালয়ের চূড়াদলের শত শত মাইল শোভা সমগ্র দিগন্ত জুড়ে দৃষ্টিগোচর হয়। 'বিনায়ক' অথবা 'রামগড়' থেকে মুক্তেশ্বরের পথে এখনও গাড়ী চলে না। পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ার পিঠে বারো চৌদ্দ মাইল পথ যাওয়াই সুবিধা।

আমাদের গাড়ী এসে পেঁছিলো 'রামগড়ে।' এখানে একটি ডাকবাংলা রয়েছে অদূরে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ওটার প্রয়োজন ছিল না। এই রামগড় একটি মস্ত বড় বাণিজ্যের কেন্দ্র। কিন্তু শহর নয়, সামান্য একটি জনপদ, উপরে ও নীচে কয়েকখানা কাঁচা-পাকা বাড়ীঘর দেখা যাচ্ছে। রামগড়ের শিখর-শেষে একটি উপত্যকায় মোটরবাস এসে দাঁড়ালো, এর পরে আর যাবে না। পাহাড়ের অনেক নীচে দিয়ে চলেছে রামগড় নদী। বেশিদিনের কথা নয়, বোধহয় শতেক বছর আগে এ অঞ্চলে কয়েকজন চীনার দখলে ছিল কয়েকটি সম্পত্তি। তারা এখানে চায়ের চাষ করেছিল। আজও 'চায়না-পীক' তাদের প্রতিপত্তির [illegible] দিচ্ছে। এ অঞ্চলটি যাঁর দখলে ছিল তিনি বোধ করি এখানকার [illegible] ল্লা' স্টেটের রাজা কৃষ্ণপাল সিং। আজও রামগড়ের নীচে তাঁর নানাবিধ রাজকীর্তির স্থাপত্যচিহ্ন প'ড়ে রয়েছে। এর পর একে একে আসেন ইংরেজ মিঃ সামারফোর্ড এবং মিঃ য়্যালেন। দেখতে দেখতেই এসে পেঁছে যান্ অজয়গড়ের রাজা, ধনপতি বিড়লা এবং যুগীলাল কমলাপতি। ক্ষুদ্র রামগড়ের আসর একেবারে গরম হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন দেখা দেয়, এত পাহাড় থাকতে এই অপরিচিত অজানা ও অখ্যাত রামগড় অঞ্চলে এঁরা এলেন কেন? একটি উপমার লোভ সামলাতে পারছিনে, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিই। রুধিরের গন্ধে বাঘ আসে! রামগড়ের মাটি সরস, পাথরের ভিড় কম, এবং অতিশয় ফলনশীল। সমগ্র উত্তরভারতে 'নৈনীতালের আলু' ব'লে যেটি প্রসিদ্ধ, এই অঞ্চল হোলো তা'র প্রধান জন্মভূমি। এ ছাড়া কাশ্মীরের পরে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মেওয়াফল নাকি অন্য কোথাও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং প্রতি বৎসর এখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার রপ্তানীর খেলা চলছে।

প্রত্যেকটি পাহাড়ের সানুদেশ বিরাট ও বৃহৎ এক একটি ফলনক্ষেত্র। আলু আর আপেল হোলো প্রধান। তার সঙ্গে আছে আনার, ডালিম, নাসপাতি, কমলা, টমাটো, মটরশুঁটি ইত্যাদি। এদেরই পাশে দেখতে পাচ্ছি, গভর্নমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত ফল ও সব্জি সংরক্ষণ ক'রে রাখার জন্য একটি মস্ত কারখানা। মনে প'ড়ে গেল, আজকাল কয়েকজন লোভী ব্যবসায়ী আরম্ভ করেছে 'কোল্ড্-স্টোরেজের' নামে একটি শোষণচক্রান্ত। কলকাতায় সম্প্রতি এর উৎপাত চলছে। সময়কালের ফল ও সব্জি অসময়ে বেচতে পারলে দু'পয়সার বদলে চার পয়সা লাভ,—সেগুলো মানুষের খাদ্যের উপযোগী থাক্ আর নাই থাক্। শীতকালে আম, বসন্তকালে আনারস, গ্রীষ্মকালে কমলালেবু, বর্ষাকালে বাঁধা-কপি, শরৎকালে লীচু ইত্যাদি কিনে হাসি-খুশী মুখে কেরানীবাবু যখন বাড়ী ফেরেন, তখন সন্ধ্যাদীপ জেবলে পাঁচুর মা গদগদ কণ্ঠে এগিয়ে এসে 'নতুন' জিনিস স্বামীর হাত থেকে তুলে নেন্! সেদিন সারারাত্রিব্যাপী উৎসব। পরদিন পাঁচুর জন্য ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি!

তুষারের চূড়াগুলি অনেক দূর, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার ও সেই চূড়াগুলি মেঘময় না থাকলে এখান থেকে তাদের ছবিও নেওয়া চলে। সেইদিকে মুগ্ধ-চক্ষে চেয়ে যখন একান্তে দাঁড়িয়েছিলুম তখন এক অকিঞ্চন ব্যক্তি এসে জানালো, অদূরে ওই যে উঁচু পাহাড়ের গায়ে ঘরের মতো দেখতে পাচ্ছেন, ওরই একটি বাগানবাড়ীতে কিছুকাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ!

আমার মুখের চেহারা দেখে সে-ব্যক্তি একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় বললে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শোনেননি?—জিন্‌কো 'ভারত-কবি' বোলা যাতা হ্যায়! দুনিয়াভর ইনসানকো প্যারে হেঁ!

সামান্য ব্যক্তির চোখে-মুখে সেদিন ভারতকবির সম্বন্ধে যে-গৌরববোধ দেখেছিলুম, সেটি অবিস্মরণীয়। রামগড় পাহাড়ের চূড়ায় সম্ভবত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বাস করেছিলেন। এখানে ব'সে তাঁর সুদূর দৃষ্টির সম্মুখে তুষারচূড়াগুলিকে রেখে অনেকগুলি কবিতাও তিনি রচনা করেছিলেন। কেবল একবার নয়, কুমায়ুন পর্বতমালার মধ্যে মহাকবি বারম্বার এসেছিলেন। সেদিন একথা জেনে বিস্ময় এবং আনন্দ বোধ করেছিলুম, এখানকার অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথের সেই অবস্থান-কাহিনীকে অতি যত্নে লালন ক'রে চলেছে। কবি যে-বাড়ীটিতে বসবাস করেছিলেন, সেটি তাঁর নিজের কিনা আমার জানা নেই। অনেকে এখন বলে, সেটি বিড়লার বাড়ী।

কাঠগোদাম থেকে আলমোড়া পর্যন্ত মোটরপথ প'চাশী মাইলেরও বেশী পড়ে, এবং রাণীক্ষেত হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এদিক দিয়ে যারা যায়,—অর্থাৎ কাঠগোদাম, ভীমতাল, রামগড় এবং 'ফিউড়া' হয়ে যে-পথটি গেছে আলমোড়ায়,

সেটি মাত্র একচল্লিশ মাইল পথ। অসুবিধা এই, রামগড় থেকে 'ফিউড়ার' পথে আলমোড়া পৌঁছতে গেলে প্রায় কুড়ি মাইল পথ পায়ে হেঁটে, কিংবা উচ্চমূল্য 'ডাণ্ডি'তে অথবা পাহাড়ী টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে হয়। এই পথটি বাঙালী জাতির নিকট অতি পরিচিত। এই পথটি দিয়ে একদা গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধু একা যাননি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, তাঁর পুত্র চিররঞ্জন ওরফে 'ভোম্বল', কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী ওরফে 'বেবি।' ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশবন্ধু ভাগলপুর থেকে 'মায়াবতী আশ্রমের' উদ্দেশে রওনা হন্ এবং ভীমতাল ও রামগড়ের পথ ধ'রে আলমোড়া পৌঁছে আবার সেখান থেকে মায়াবতীর ভিন্নপথে অভিযান করেন। তাঁরা তখন গিয়েছিলেন ঘোড়া, ডাণ্ডি ইত্যাদির সাহায্যে, কেননা তখন ভারতবর্ষের কোনও অঞ্চলে মোটর বাস জন্মগ্রহণ করেনি। মোটরপথও সেদিন ছিল না। দেশবন্ধুর সেই 'মায়াবতী আশ্রম' যাত্রার কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'মায়াবতী পথে' গ্রন্থে।

মোটরপথ অবশ্য আজও 'মায়াবতী' পর্যন্ত নেই। কিন্তু আজ আলমোড়া পর্যন্ত এবং এদিকে রামগড় অবধি গাড়ী রয়েছে। আলমোড়া থেকে মায়াবতী পঁয়তাল্লিশ মাইলেরও বেশি। ইদানীং শোনা যাচ্ছে টনকপুর থেকে পিথোরাগড় পর্যন্ত মোটর বাস চলছে। তা যদি হয় তবে পথেই পড়ে 'চম্পাবত' এবং 'লোহাঘাট' নামক জনপদ। 'মায়াবতী বেদান্ত আশ্রম' লোহাঘাট থেকে আন্দাজ চার মাইল পথ। জনহীন বনভূমি, পার্বত্য ভূভাগের অত্যাশ্চর্য মহিমা, গিরিনদী এবং ঝরণার নয়নাভিরাম দৃশ্যের মাঝখানে 'মায়াবতী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত।

কাশ্মীরে পাঞ্জাবে হিমাচলে নেপালে,—যে-বিষয়টি কোথাও এমন সুস্পষ্ট-ভাবে চোখে পড়ে না,—সেটি প্রত্যক্ষ করা যায় এই কুমায়ুনের তিনটি জেলার পর্বতশ্রেণীর ভিতরে-ভিতরে; ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালে, কূর্মাচল আলমোড়ায় এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নৈনীতালে। বন্য পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সকল স্থানে,—কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন অধ্যাত্ম জীবনের স্বাদ, এমন ভগবৎ ভাবনা, এমন বিবাগী মনের বেদনা কুমায়ুন পর্বতমালার মতো আর কোথাও নেই। যোগী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষু, তপস্বী, দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞানী, বেদাধ্যায়ী, বৈদান্তিক,—বোধ হয় হিমালয়ের অপর কোনও অঞ্চলে এমন অগণিত দেখা যায় না। বোধ হয় হিমালয়ের আর কোনও ভূভাগ থেকে এক-চাহনিতে এতগুলি তুষারশৃঙ্গও পাশাপাশি চোখে পড়ে না। এমন ক'রে হিমালয় আর কোথাও ডাকে না, এমন ক'রে আর কোথাও সে কাছে টানে না। সমগ্র কুমায়ুনে অসংখ্য গঙ্গার আকুলি-বিকুলি চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। গৌরী-গঙ্গা, কালীগঙ্গা, ধবলীগঙ্গা, বিষ্ণুগঙ্গা, দুধগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা,

ভাগীরথীগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, কেদারগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা, পিন্দারগঙ্গা,—আরও অনেক গঙ্গা। কিন্তু সব গঙ্গার জল মিলেছে গিয়ে আর্যাবর্তের মূল গঙ্গায়। ওই একেকটি গঙ্গাপথে সাধুসন্তরা বেঁধেছে আশ্রম লোকলোচনের অন্তরালে; কেঁদেছে অনেক তৃপ্তিহীন মন, ফুঁপিয়েছে অনেক জীবন অকারণ।

জনৈক আমেরিকান মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে একদা মায়াবতীর অরণ্য-প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ান। তুষারপর্বতরাজির শোভা এখানে অপরূপ। কখনও লোহিতবর্ণ, কখনও স্বর্ণাভ, কখনও গৈরিক, কখনও বা তা'রা হীরক-জ্যোতিষ্মান। ভারতবর্ষের আকাশে মেঘের মধ্যে প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যায় যে-বর্ণবৈচিত্র্যের অশ্রান্ত লীলা দেখা যায়, তারই অপরূপ ইন্দ্রজাল মেরু-মন্দার হিমালয়কে বোধ করি সেদিন মায়াচ্ছন্নলোকে পরিণত করেছিল। ওই মহিলা সেই দৃশ্য দেখে মায়াবতীর এই নিভৃত অঞ্চল ছাড়তে চাননি। এখানে তাঁরা দুজনে একটি বাসস্থান এবং একটি কুসুমকানন রচনা করেন। উভয়েরই বোধ করি এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা হিমালয়ের এক প্রান্তে ব'সে অধ্যাত্ম জীবন যাপন করবেন। পরবর্তীকালে যখন সেই মহিলা ভারত ত্যাগ করেন, তখন তাঁর এখানকার সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান ক'রে যান্। মায়াবতী আশ্রমে অদ্যাবধি সেই মহিলা 'মাদার' নামে বিদিত। এই দানশীলা নারীর উদারতায় স্বামী বিবেকানন্দ মুগ্ধ হন্, এবং সম্ভবত ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বামীজি প্রথম মায়াবতীতে যান্। অনেকেরই কাছে শুনেছি, বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ও এক সময়ে মায়াবতী আশ্রমে গিয়েছিলেন।

নৈনীতাল এবং আলমোড়া উভয়ে সর্বত্রই প্রায় সংযুক্ত হয়ে রয়েছে এক একটি সেতুবন্ধে,—কোন্‌টি কোথায় পৃথক এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছি অনেক দূর। সন্ধার আকাশে কখনও জ্ব'লে উঠেছে লক্ষ প্রদীপ, অন্তিম দিনমানকালে শ্বেতচূড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে গৈরিক স্রাব, প্রভাতকালে তা'দের ললাট থেকে নেমে এসেছে ভলকে ভলকে শোণিতের প্রবাহ, কিংবা হঠাৎ মধ্যাহ্নে বিগলিত স্বর্ণস্রোত। জেনেছি চোখের ভ্রম, জেনে এসেছি বায়ুস্তরভেদের মায়া,—কিন্তু তা'রা মনের মধ্যে এনেছে মহিমা, এনেছে সৌর-বিশ্বের আহ্বান, এনেছে সৌন্দর্যলোকের অপার আনন্দ। সমস্ত আকাশকে পেয়েছি আলিঙ্গনের মধ্যে, সমগ্র হিমালয়কে পেয়েছি আপন বক্ষে। সৃষ্টির পরমাশ্চর্য রূপ দেখেছি পথে পথে,—জলে, আকাশে, রৌদ্রে, নির্ঝরে, দেওদারের বনে-বনে, বায়ুর মধুর স্বননে,—সেই অনন্ত বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে বর্ণের সুষমায়। 'রিচি' গ্রামের সেই সঙ্কটসঙ্কুল অবরোহণ, রামগঙ্গার অদূরে সেই 'ঘাটি' গ্রামের বিহঙ্গকাকলীভরা গ্রাম, তারপর সেই 'টৌডমের' পাহাড়ধসা কার্নিশপথ,—সেই আনন্দ আর আতঙ্কের চেতনা আজও বুকের মধ্যে ধকধক করে। 'সোরাল্' পেরিয়ে গেছি,—যেখানে নামহারা গিরিনির্ঝরিণী বনবালিকার

মতো গান গেয়ে চলেছে অতিকায় পাথরের আড়ালে-আবডালে। তারপরে গিয়ে প্রবেশ করেছি বিজন গহন 'কুমারিয়ার' অরণ্যে। ওখানে আবার পেরিয়েছি কোশী 'মোহন সেতুর' উপর দিয়ে। একটি পথ আমার অনন্ত ঔৎসুক্য নিয়ে হারিয়ে গেল 'সাকারের' পথে,—আমার নিজের পথটি নদীর তীরে তীরে চ'লে গেল রামনগরের দিকে।

'গরজিয়ার' গভীর অরণ্যলোকের কথা অনেকেই জানে। শুনলুম কোন না কোনও সময় একটি-দু'টি নরখাদক ব্যাঘ্রের ভয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা থাকে নিত্য তটস্থ। বাঘ হোলো শাসনকর্তা, তা'র একনায়কত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে গ্রামবাসী। বাঘের ভয়ে তা'রা শিবমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানায়; এবং তাদের আক্রমণ ঘটলে তা'রা কপালের লিখন ব'লে বুক চাপড়ায়। ওদেরই গ্রামের ধার দিয়ে চ'লে যেতে হয়েছে অনেক দূর।

বিরাট পাহাড়ের মেরুদন্ড নেমে এসেছে কোশীনদীর পথে। সেই পাহাড় বিরাটতর প্রাকার রচনা করেছে একদিকে, অন্যদিকে গত বর্ষায় তা'র পঞ্জর থেকে নেমে এসেছে লক্ষ লক্ষ টন ওজনের ধস। সেই বিপুল ক্ষয় ও ধ্বংসের মধ্যে যে-বিশালতা দেখা যায়, তাতেও বিমূঢ় হ'তে হয়। আবার মনে পড়ছে, এমনি ধস নেমেছিল দার্জিলিং শহরে গত ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বোধ করি জুলাই মাসের বর্ষায়। একটি রাত্রির সেই ইতিহাস অতি ভয়াবহ। সেই ধসগুলির সঙ্গে অনেক-গুলি বাড়ীঘর চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং কয়েকটির সমাধিলাভ ঘটে। নরনারী ও শিশু কতগুলির মৃত্যু হয়েছিল তা'র সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়নি। মৃৎপ্রধান পাহাড়ের ঠিক নীচে বসবাস করা অনেক সময় বিপজ্জনক।

অরণ্যসমাকীর্ণ রামনগরের পথে যাচ্ছি। বাঁ দিকে কোশীর জলপ্রবাহের ঠিক মাঝখানে পাওয়া গেল মাটি আর পাথর মেলানো একটি মস্ত,—না, মন্দির নয়, কিন্তু তারই মতো একটি আয়তন। ওটা নাকি ভগবতীর 'মন্দির।' ওর মধ্যে আছেন উপাট্টাদেবী। ওই আয়তনটির ভিতরে রয়েছে একটি মস্ত গুহা—নদীর বুকের উপর। ওই গুহায় অনেককাল ধ'রে থাকতো এক সাধু, নাম—'বালক বাবা'। সে ছিল মস্ত তপস্বী। কিন্তু যত বড় তপস্বীই হও, রক্ত-মাংসের দেহধারী মানুষকে প্রকৃতির শাসন, জৈবিক তাড়না এবং পার্থিব দাবি মেনে চলতেই হবে। 'বালক বাবাও' মানুষ। একদা বর্ষারম্ভে এই কোশীতে ছুটে এলো পঁচিশ ত্রিশ ফুট উঁচু জল। পশুপক্ষী মানুষ গ্রাম ক্ষেত খামার সমস্তই সেই সর্বনাশা জলের প্রবাহে ভেসে যেতে লাগলো। মাঝনদীতে রয়ে গেল ওই 'ভগবতীর গুহা' এবং ওই 'বালক বাবা।' ওকে বাঁচাবার জন্য কা'রো মাথা ব্যথা ছিল না। জলরাশি এসে গ্রাস করলো ওই ভগবতীখন্ড,—গুহা এবং বালক বাবা নিশ্চিহ্ন হলো জলের তলায়।

এখানকার লোক বলে, 'বালক-বাবা' সেই মৃত্যুকে স্বীকার করেনি। যতক্ষণ তা'র পক্ষে সম্ভব ছিল, উঁচু জায়গায় গলা বাড়িয়ে সে প্রবল কণ্ঠে

চীৎকার ক'রে বলেছে, বিশ্বাস করিনে! বিশ্বাসবাদীরা চিরকাল ধ'রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছে, তপস্বীর কাছে ধরা দিয়েছেন তিনি চিরকাল। সেসব সম্পূর্ণ মিথ্যে, এ আমি বিশ্বাস করিনে।—'বালক বাবা' চীৎকার ক'রে এই কথা জানাচ্ছিল অবিরত,—বিশ্বাস করিনে!

প্রাণীচিহ্নহীন বিপুল বন্যারাশির মাঝখানে কেবলমাত্র বালক বাবার নিমজ্জিত দেহের উপর শুধুমাত্র তা'র মুণ্ডটি জলের উপরে বেরিয়েছিল। জল যত উঁচু হয়, মুণ্ডটিও তত উঁচুতে ওঠে। জল উঁচু হয় পর্বতপ্রমাণ, মুণ্ডটি ওঠে তারও উপরে। সেই অটল স্থির মুণ্ডটি শেষ পর্যন্তই টিঁকে রইলো।

'বালক বাবার' মৃত্যু হয়নি। বন্যা চ'লে গেল,—বালকবাবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে! ওটা হোলো ভগবতীর গুহা!

দেখতে দেখতে রামগঙ্গার তীরে এসে গাড়ী থামলো। সামনেই রামনগর।

॥ ৭ ॥

সন্ন্যাসী বলছেন, জলন্ত ধূপ এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটি সুগন্ধ রেখে যায় তা'র পরিবেশে। গিরিরাজের অপার বিস্ময়ের মাঝখানে তপস্বীরা যেখানে বীজমন্ত্র জপ ক'রে গেছেন, সেই 'আসনের' আশে-পাশে এসে দাঁড়াও, তোমারও হৃদয় একটি আশ্চর্য অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হবে।

প্রশ্ন করলুম, সে-আচ্ছন্নভাবটি কেমন, মহারাজ?

সন্ন্যাসী হাসলেন।—চুম্বকের আকর্ষণে লৌহচূর্ণ যেমন থরথরিয়ে কাঁপে, তেমনি।

পুরাকালে তিব্বত ছিল বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত। যেমন ছিল গান্ধার, যেমন কম্বোজ আর যবদ্বীপ, যেমন সুমাত্রা আর শ্রীলঙ্কা। ওদের কারো নাম ছিল অমরাবতী, কারো বা স্বর্ণদ্বীপ। তিব্বতকে সেই পুরাকালে বলা হোতো কিম্পুরুষখন্ড, তথা স্বর্গভূমি, তথা স্বর্ণভূমি। স্বর্ণভূমি ত' বটেই,—তিব্বতে আজও অপরিমেয় সোনা প্রায় সর্বত্র নদী আর পাথরের নীচে পুঞ্জীভূত। কিম্পুরুষখন্ড নাম হয়েছিল হিমালয়ের জন্যই, কারণ হিমালয়ের অপর একটি পৌরাণিক নাম হোলো কিম্পুরুষপর্বত। প্রতি তুষারচূড়ায় পুরুষোত্তমের নিত্যকালের সিংহাসন পাতা। পুরাকাল থেকে ইতিহাসের কালে এসে দেখি, একে একে ভারতের সীমানা-ভূখন্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে ভারতের অবয়ব থেকে,—বনস্পতির থেকে শাখা-প্রশাখা ঝড়ের তাড়নায় যেমন ছিন্ন হয়ে ছুটে যায়। গান্ধার, পামীর, নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা, কম্বোজ, সিয়াম ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ,—একে একে সবাই চ'লে গেছে। এই সেদিন গেল শ্রীক্ষেত্র ওরফে ব্রহ্মদেশ,—এখনও পঁচিশ বছর হয়নি। আর যা গেল সম্প্রতি, তারও ক্ষত-স্থান থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। এমনি ক'রে যুগযুগান্তর ধ'রে ভারত ছোট হচ্ছে, সীমানা তা'র সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। শুধু আনন্দের কথা এই,—ধর্মবোধে, অধ্যাত্মভাবে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও তাদের সকলের সঙ্গে ভারতের সমগোত্রিয়তা বর্তমান। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মনে। তবে কি সনাতন এবং বৈদিক ভারত বৌদ্ধদর্শনকে আজও গ্রহণ করতে পারেনি? তবে কি আর্য-দ্রাবিড়ের সঙ্গে মঙ্গোলীয় রক্তের মিল ঘটলো না কোনও কালে? কে কা'কে ত্যাগ করলো?

হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে এর জবাব কোনওদিন মেলেনি। সন্ন্যাসী বললেন, হিমালয়ের মতো এতবড় রণক্ষেত্রও পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না।

কিন্তু সেই রণক্ষেত্র হোলো ধর্মবাদের, দর্শনমতের। সেই রণক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটেনি কখনও, কিন্তু যোগতন্দ্রায় আত্মসমাহিত অনেক তপস্বীর জীবনপাত ঘটে গেছে। সত্যকে যারা অক্লান্তভাবে খুঁজেছে, আলোকের সন্ধানে যারা সর্বত্যাগ ক'রে দুর্গমে আর দারুণের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে,—তাদের চেয়ে রণবীর আর কে আছে সংসারে? তা'রা নিঃশব্দে জয় করেছে মানুষের শ্রদ্ধা, নিভৃতে নির্ণয় করেছে মানবসভ্যতার নিয়তি। তাদের প্রশ্নোত্তর মীমাংসার পথ ধ'রে ভারত-সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে তা'র জ্ঞানের জগতে। বুদ্ধিকে নির্মল করেছে, সভ্যতাকে সুন্দর করেছে।

তিব্বতের প্রবেশপথ এক হাজার বছরের মধ্যে কোনোদিন সহজ হয়নি। পথ দুঃসাধ্য ব'লে নয়, কিন্তু কোনো পর্যটক অথবা তীর্থযাত্রী তিব্বতবাসীর নিকট আজও তেমন কাম্য নয়। মৌর্যসাম্রাজ্যকালে, সিথিয়ান যুগে, ব্যাক্‌ট্রিয়ের কালে, হর্ষবর্ধন-সমুদ্রগুপ্ত-স্কন্দগুপ্তের সময়ে—তিব্বত এবং চীনের দ্বার খোলা ছিল। কিন্তু মগধ সাম্রাজ্যের শেষ দশায় মুসলমান আক্রমণের কাল থেকে সেই অবারিত দ্বার বন্ধ হয়েছে। বিস্ময়ের কথা এই, লাসা নগরীর সীমান্তে 'জো-খাং' নামক বিরাট বৌদ্ধমঠে যে-পঞ্চধাতুনির্মিত অতিকায় বুদ্ধমূর্তিটি পবিত্রতম ব'লে পূজিত হয়, সেই মূর্তিটি ভারতের। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধের জীবনকালেই মগধে এই মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং মুসলমান আক্রমণকালে চীনসম্রাট মগধের রাজাকে সাহায্য করেছিলেন, এবং সেই কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ এই মূর্তিটি চীনসম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়। অতঃপর চীনসম্রাটের কন্যার সহিত যখন তিব্বতরাজের বিবাহ হয়, সেই সময় বধূবেশিনী সম্রাটদুহিতা এই মূর্তিটি তিব্বতে আনেন। তিব্বতের সেই রাজা এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে এই মূর্তিটি স্থাপিত করেন।

বুঝতে পারা যায়, ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে মুসলমান আমলে। ভারতের বৃহত্তর সমতল ক্ষেত্রে পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-ফরাসী-ইংরেজ—এরা জায়গা পেয়ে প্রভুত্ব লাভ করেছিল,—কিন্তু এদের থেকে গোঁড়া বৌদ্ধ-তিব্বত একান্তে সরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তা'রা এতকাল ধ'রে ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসের সঙ্গে পর্যটককেও সরিয়ে রেখেছে যুগের পর যুগ। তিব্বত হয়ে গেল নিষিদ্ধ।

ওরা নাকি পৃথিবীর একমাত্র 'ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়। ওদের দেশব্যাপী গ্রন্থ-ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ পুঁথি আর ধর্মগ্রন্থ। ওরা জানে পৃথিবীর অন্তিম পরিণাম, সভ্যতার আদিঅন্ত ইতিহাস। হিমালয়ের ওপারে ওরা দাঁড়িয়ে আছে ষোল হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে,—ওরা হোলো পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। একটির পর একটি সভ্যতা এসে চ'লে গেছে, হাজার হাজার বছরে শত শত রাজ্যের

অভ্যুত্থান এবং অবসান ঘটেছে,—ওরা ভ্রূক্ষেপ করেনি। চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, কাশ্মীর, নেপাল, রুশিয়া, তুর্কিস্তান,—এদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড় আর বিপ্লব, অরাজকতা আর প্রলয়,—কিন্তু তিব্বত তাদেরকে গ্রাহ্য করেনি। ওরা চিরকাল পুঁথি পড়েছে আর মন্ত্র জপেছে; 'মণিচক্র' ঘুরিয়েছে আর প্রেত-পিশাচ তাড়িয়েছে। মানুষের চেয়ে মন্ত্র ওদের কাছে অনেক বড়। ওরা মন্ত্র পড়তে-পড়তে মানুষের মৃতদেহকে তরবারির দ্বারা টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে কাটে, এবং শৃগাল-শকুনি আর কুকুর যখন সেগুলি ভোজন করে—ওরা তখনও মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। চীন ওদের উপর গায়ের জোরে প্রভুত্ব করতে চেয়েছে, ওদের ঘরে ঢুকে তম্বি করেছে, তাই ওদের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রীয় মন-কষাকষি চিরদিনের। ওরা যে কেবল স্বাধীন থাকতে চায় তা নয়, ওরা পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতেও চায়। বৌদ্ধভিক্ষু ছাড়া কেউ না ঢোকে ওদের সমাজে, সাহেব না ঢোকে, মুসলমানছোঁওয়া হিন্দু না ঢোকে, বিজ্ঞান না ঢোকে, আধুনিক সভ্যতার হাওয়া না ঢোকে। দু'চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া তিব্বতের ঘৃণা বয়ে বেড়ালো প্রায় সবাই চিরকাল।

তিব্বতের বিরাট মালভূমির উপরে যেমন শত শত তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া, তেমনি সংখ্যাতীত লবণহ্রদ। লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যে মানুষ কিছু কিছু আছে, কিন্তু গাছপালা নেই বললেই ভালো হয়। ভারতের তুলনায় তিব্বত হোলো প্রায় জনশূন্য। প্রতি বর্গমাইলের হিসাবে মাত্র সাতজনের বেশি মানুষ নেই। খাদ্য খুঁজে পাওয়া যায় না,—ক্ষুধার্ত তিব্বত। পূর্ব তিব্বতে বাঁচবার পথ আছে, যেখানে ব্রহ্মপুত্র সৃজন করেছে অরণ্য, শস্যক্ষেত্র আর নিম্নভূমি। বালুপাথরে, কাঁকরে, লবণে, সোডায় এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থে তিব্বত পরিপূর্ণ,—কিন্তু স্নেহ নেই কোথাও, কুঞ্জ-কাননের মায়া নেই, তমাল-তালী-বনরাজিনীলার ছায়া নেই। আছে আত্মনিগ্রহী অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্ম, এবং অন্ধ আচারঅনুষ্ঠানের কঠোরতা। পূর্বতিব্বতে প্রকৃতির সঙ্গে ওদের স্বভাব কতকটা কোমল হয়ে এসেছে,—তাই রাজধানীও গ'ড়ে উঠেছে 'কাইচু' নদীর উত্তরে লাসায়। সেখানকার পোটালা প্রাসাদে থাকেন সর্বাধিনায়ক দলাই লামা।

'মণিচক্র' ঘুরেছে লামাদের হাতে-হাতে যুগের পর যুগ,—আজও ঘুরছে। কিন্তু কলের চাকা কিংবা গাড়ীর চাকা কখনও ঘোরেনি তিব্বতে। আজ সভ্যতার ধাক্কা আসছে গণতন্ত্রী চীন থেকে। তা'রা গাড়ী চালাতে চায় তিব্বতে, তা'রা আলো ফেলতে চায় অন্ধকারে, ধর্মের উপরে মানবতার দাবিকে তা'রা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই দাবি স্বীকার করাবার জন্য তা'রা সৈন্যসামন্ত এনে ফেলেছে এই দুস্তর ভূখণ্ডে। এবার হয়ত কলের এবং কালের চাকা ঘুরবে!

মধ্যতিব্বত সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা বৃথা। সেখানে আছে নুন, দামি পাথর, ভূগর্ভের স্বর্ণভাণ্ডার, আর জনবসতির এখানে ওখানে আদিমকালের

কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুম্ফা। প্রচণ্ড হাওয়ায়, তুহিনের ঝাপটায়, প্রখর সূর্যে, নির্মল জ্যোৎস্নায়, ক্ষণমজী প্রাকৃতিক চটুলতায়, আকাশের অত্যুগ্র নীলিমায়,— তিব্বত অপার্থিব রহস্যে আচ্ছন্ন। উত্তরে তার আদিঅন্তহীন 'তাকলামাকান' আর 'গোবি' মরুভূমি, দক্ষিণে হিমালয়ের সংখ্যাতীত তুষারচূড়া,—ধবলগিরি, মুক্তিনাথ, মানসলু, গোঁসাইথান, গোরীশংকর, এভারেষ্ট, মাকালু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাঞ্চনঝাউ, পাউহুনরি, চমলহরি,—এমনি আরো অনেক। এই সব চূড়া থেকে বেরিয়ে গেছে অনেক নদী,—এরা তিব্বতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রকে বলশালী ক'রে তুলেছে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম তিব্বতকে ভারতের সঙ্গে পৃথক ক'রে রেখেছে কারাকোরাম, লাডাখ, জাস্কার এবং কৈলাস পর্বতমালা। কৈলাসপর্বতশ্রেণী নেপালসীমানা অবধি চ'লে এসেছে।

তেরোশো বছর আগে তিব্বতের রাজদূত আসেন ভারতে, এবং ভারতের ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সেই কালে মগধে এবং বাঙলাদেশে যে 'নাগরী' বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, সেই বর্ণমালা তিনি নিয়ে যান্ তিব্বতে। সংরক্ষণশীল তিব্বতে সেই বর্ণমালা আজও প্রচলিত রয়েছে, কেবল একটু আধটু চেহারার অদলবদল হয়েছে মাত্র। কিন্তু সম্পর্কটা ওখানেই থেমে যায়নি। বাঙলার সঙ্গে তিব্বতের নাড়ির যোগ সেই কাল থেকেই চ'লে এসেছে। এর পরে যশোরের রাজপুত্র সর্বত্যাগী 'শান্তরক্ষিত' বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ ক'রে তিব্বতে যান্, এবং তৎকালীন নরপতি তাঁকে প্রথম তিব্বতীমঠের মোহান্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই গৌরব আজও আছে তিব্বতে। অদ্যাবধি তিব্বতীরা শান্তরক্ষিতকে আচার্য বোধিসত্ত্ব-মহাগুরু আখ্যা দিয়ে গৌতমবুদ্ধের মতোই তাঁকে পূজো করে। অতঃপর বাঙলাদেশ থেকে কয়েকজন বৌদ্ধপণ্ডিতও যান্ তিব্বতে। তাঁরা গিয়ে যে কেবল ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাই নয়,—বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলিকে তিব্বতী ভাষায় [illegible]দও করেছিলেন। রাজশক্তির আনুকূল্য ছিল ব'লেই সেকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। হিন্দুদর্শনের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাই যে বৌদ্ধদর্শন—এ কথা আজ আমরা ভুলতে বসেছি। গৌতমবুদ্ধ তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি হিন্দু ছিলেন, এই সত্যও মনে রাখিনে।

এর পরে যে মহাপুরুষের কথা ওঠে, তিনিও বাঙালী। তাঁর বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে,—তিনি ঢাকার লোক। তাঁর নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আচার্য শঙ্করের প্রতিভায় একদা সমগ্র ভারত যেমন মুগ্ধ হয়েছিল, দীপঙ্করও তেমনি ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণকে তৎকালে অভিভূত ও মুগ্ধ করেছিলেন। বহু দেশ ও বিদেশে তিনি ভ্রমণ করেন, এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় ভারতবর্ষে তৎকালে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তাঁর বয়স যখন ষাট তখন তিব্বতের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান্ এবং বৌদ্ধদর্শনের অভিনব ব্যাখ্যা ক'রে সমগ্র তিব্বতের হৃদয় জয় করেন। তিনি বিশুদ্ধ 'মহাযান' মতবাদ প্রচার করেছিলেন

এবং তিব্বতকে বহু কুসংস্কার এবং তান্ত্রিক পন্থা থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীপঙ্কর সেখানে 'কদম্পা' নামক একটি নূতন লামা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন, সেই সম্প্রদায়টি অদ্যাবধি তিব্বতে সর্বপ্রধান। দীপঙ্কর তেরো বৎসরকাল তিব্বতে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এখনও তিনি সেখানে একান্তভাবে শ্রদ্ধেয় এবং পূজ্য। বুদ্ধের পরেই তিনি বোধিসত্ত্ব-স্বরূপ। তিব্বতীরা তাঁর মূর্তি পূজা করে। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, সেখানে আজও রয়েছে তাঁর সমাধিমন্দির। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর দেহত্যাগ করেন।

ভারতের সঙ্গে তিব্বতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বোধ করি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানেই শেষ হয়। এর পরে ইতিহাস অনেকটা যেন হারিয়ে গেছে। ভারতের হাত থেকে ওরা পেয়েছে ভাষা, শাস্ত্র, ধর্মদর্শন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের মধ্যকার যেটি প্রাণধারা, সেটি পাঠান আমল থেকেই শুকোতে থাকে। যারা মুসলমান ও তাতারের আমলে সমতল ভূভাগ ছেড়ে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে গিয়ে বাসা বেঁধেছিল, তাদের সঙ্গে তিব্বতীদের কিছু কিছু যোগাযোগ থেকে গেছে অনেককাল ধরে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে ভারতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি ব'লেই তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাজশক্তির সহায়তার অভাব এবং ভারতে বিধর্মীর প্রভুত্ব—তিব্বতকে হারাবার মূলে এই কারণ দুটি প্রধান। যারা দূরে স'রে গেল, তা'রা অদৃশ্যলোকেই মিলিয়ে রইলো। তিব্বতের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘুচে গেল।

প্রায় দেড়শো বছর আগে একজন মাত্র ইংরেজ তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম টমাস ম্যানিং। অতি অল্পকালের জন্য তিনি লাসায় থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন. কিন্তু তাঁর কোনও বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাঁর যাবার তেত্রিশ বছর পরে দুজন ফরাসী মিশনারী লাসায় স্বল্পকালের জন্য প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরাও কোনো বিবরণ রেখে যাননি। আত্মাভিমানী ইংরেজের মনে এই বিক্ষোভ বহুদিন অবধি ধূমায়িত হতে থাকে। এদিকে ভারতের উপরে ইংরেজের প্রভু[illegible] চক্ষুশূল ছিল, এবং যাদের সাহায্যে ইংরেজ ভারতসাম্রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থা চালাচ্ছিল,—সেই সব ভারতীয়দের প্রতিও তিব্বতের প্রবল বিরাগ ছিল। কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে ভারতের এমন কোনও বিষয়ে কোনও যোগাযোগ ছিল না, যার জন্য বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া চলতে পারে। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে গোর্খারা তিব্বত আক্রমণ করে এবং গোর্খাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতের ইংরেজ সৈন্যরা। গোর্খারা তিব্বতীদের নিকট পরাজিত হয়। পুনরায় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নেপাল এবং



লাসা নগরীর নিকটবর্তী 'জো-খাং' মন্দিরের প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি

ফটো : আনন্দবাজার পত্রিকা

[illegible]

[illegible]



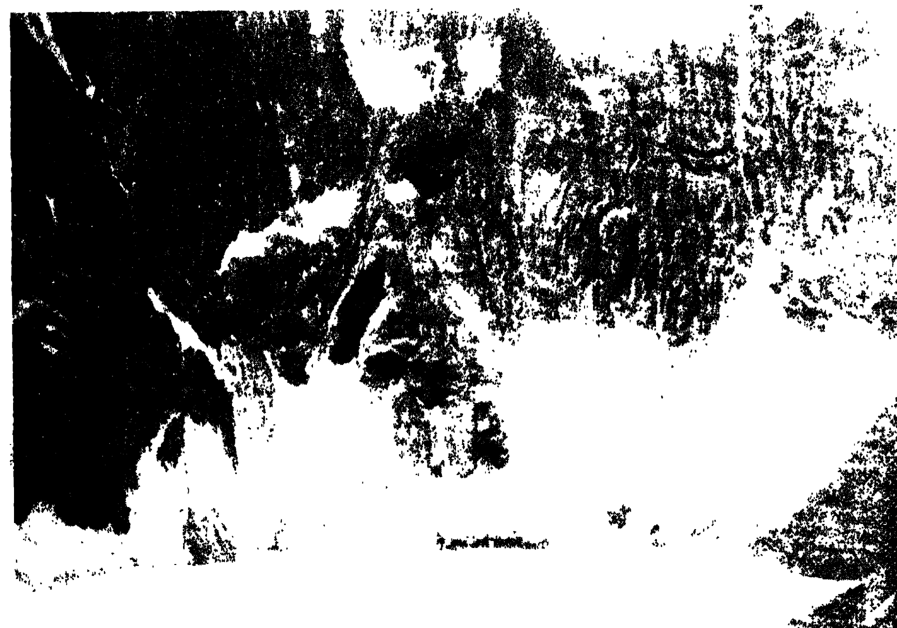










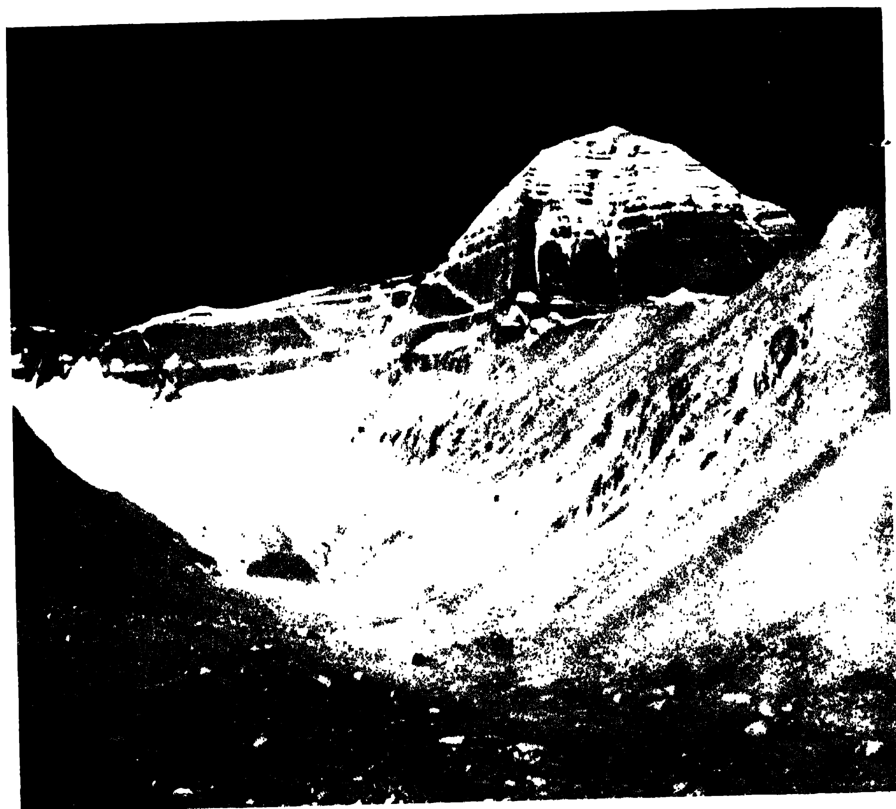


[illegible]



শিগার্চি গুম্ফা ও বাজার

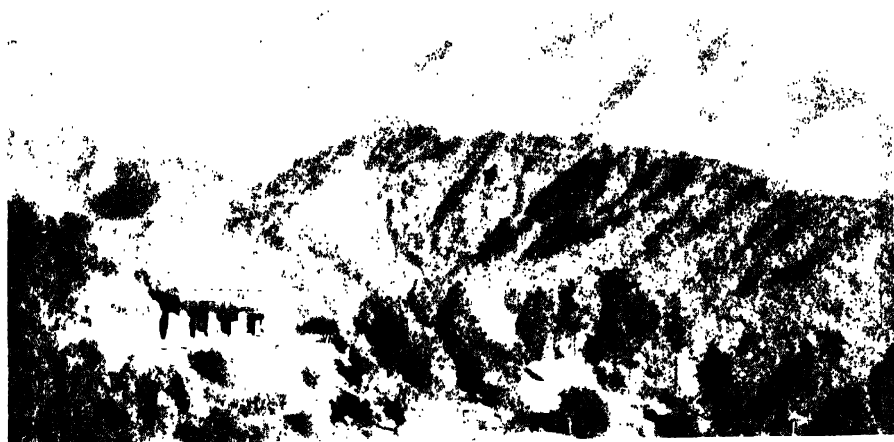










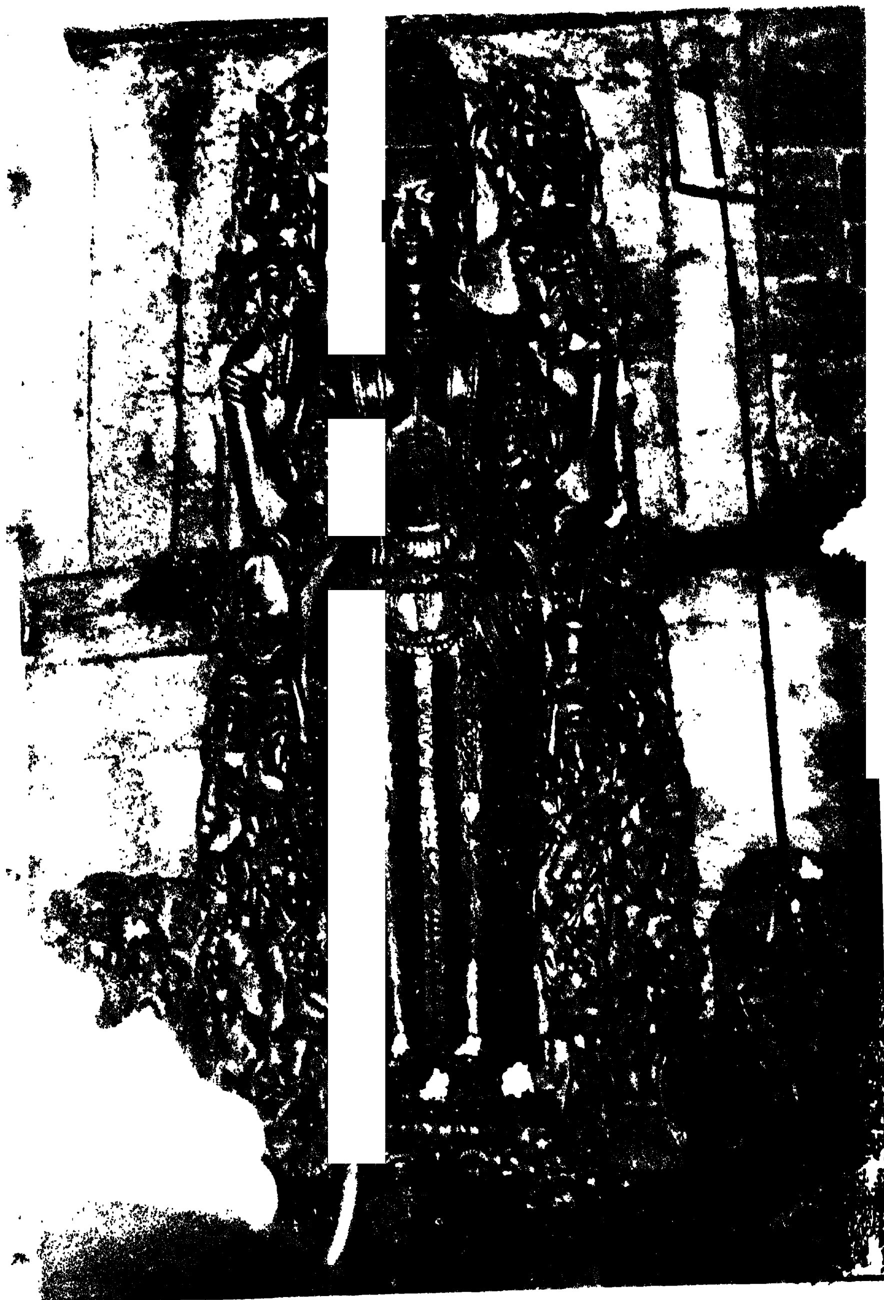






[illegible]





কৃষ্ণচন্দ্রপুর গড়ে বৈদ্যনাথ মন্দিরে অন্নপূর্ণা তথা পার্বতীর শ্বেতশিলামূর্তি













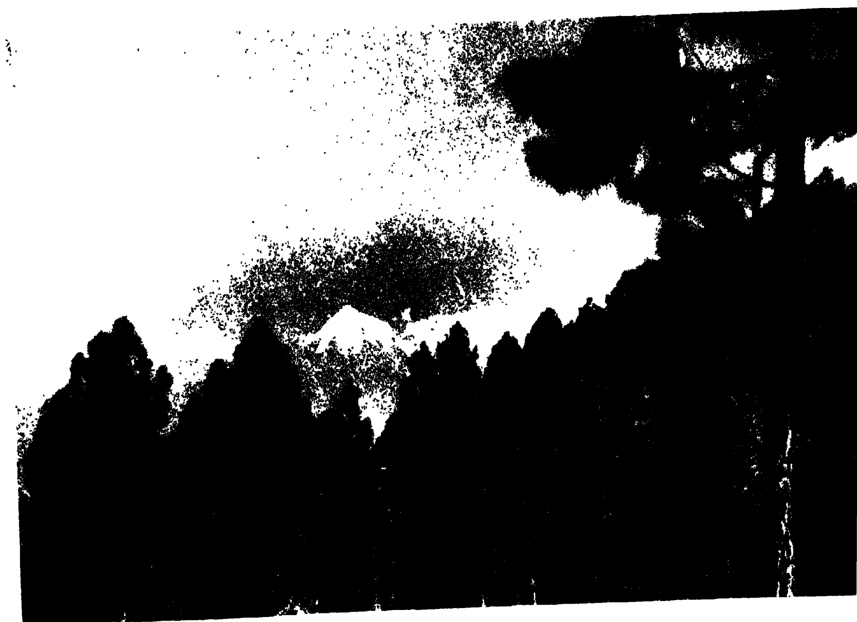


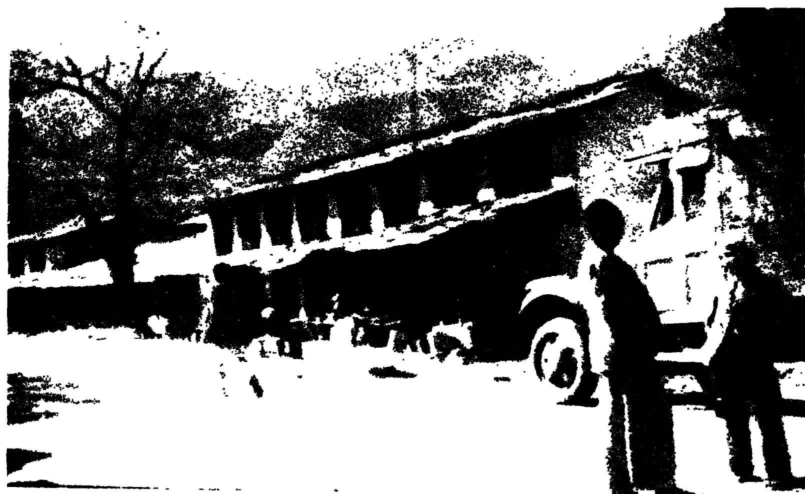












তিব্বতের মধ্যে লড়াই বাধে, এবং বহুলোকের ধারণা এর মধ্যে ইংরেজের উস্কানি ছিল। নেপাল পরাজিত হয়, এবং নিয়মিত 'ক্ষতিপূরণ' অর্থাৎ নমস্কারী পাঠাতে স্বীকার পায়। এর পর অপমানিত ইংরেজ দীর্ঘকাল চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্বালা করে তা'র মন।

শোনা যায় ঊনিশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন তিব্বতের দিকে অভিযান করেছিলেন, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই। সুদীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিং স্কুলের এক অসমসাহসিক শিক্ষক শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁর এক 'লামা বন্ধুর' সহায়তায় তিব্বত প্রবেশের অধিকার পান্। শরৎচন্দ্রের এই অভিযানের পিছনে ভারত গভর্নমেণ্টের সহায়তা ছিল। তিনি তাঁর অভিযানপথের পরিমাপ করবেন, এবং খোঁজখবর আনবেন—এই ছিল সর্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন,—নয়ন সিং ও কিষণ সিং। আর্কিবাল্ড উইলিয়মস্ বলছেন,—"These men were the emissaries of the Indian Government, their duty being to survey with all possible accuracy such parts of Tibet as they should traverse. The most extensive results came from the expeditions of Kischen Singh . . . who in four years crossed Tibet from North to South, and from East to West . . . . and managed to draw out a detailed plan of Lhasa. His survey is considered to be very accurate."

বলা বাহুল্য, এ'রা সকলেই ছদ্মবেশে এবং অতি সাবধানে তিব্বত ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র এনেছিলেন তিব্বতের প্রকৃত পরিচয়। তিনি ছয়মাস কাল তিব্বতের অন্তর্গত 'তাসিলানপোতে' সংস্কৃত ও তিব্বতী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা অঞ্চলের অতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ ক'রে আনেন। তাঁর সঙ্গে পানচেন্ রিন্‌পোচের প্রধান লামা পুরোহিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পুনরায় আমন্ত্রিত হয়ে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে তিনি আবার তিব্বতে যান্। এবার তিনি বরাবর লাসায় উপস্থিত হন্। শুধু লাসা নয়,—প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন তিব্বতীয় শহরে ভ্রমণ ক'রে প্রকৃত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ ক'রেন। কিন্তু তিব্বতের কর্তৃপক্ষ ঘূণাক্ষরেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য একটুও জানতে পারেননি। রাজনীতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, আধ্যাত্মিক এবং কূটনীতিক,—সর্বপ্রকার তথ্য এবার তিনি তাঁর ঝুলিতে ভ'রে এনেছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁকে এক বিশেষ উচ্চ উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেন, এবং 'রয়াল জিয়োগ্রাফিকাল সোসায়েটির' নিকট থেকে তিনি অর্থসাহায্যও পান্। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনকালে,—'তাসিলানপো' থেকে ভারত প্রবেশের পথে,—সহসা লাসা কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁরা 'পানচেন্ রিন্‌পোচের' প্রধান লামাপুরোহিত

সর্বজনশ্রদ্ধেয় 'সিন্‌চেন্‌লামাকে' গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা পাঠান্‌। এ
কাহিনীটি নিয়ে আমি অন্যত্র কিছু কিছু আলোচনা করেছি, তবু এখানে সংক্ষেপে
সেটুকু বললে বেমানান হবে না। 'সিন্‌চেন্‌লামাকে' গ্রেপ্তার ক'রে তুষারগুহায়
রাখা হয়েছিল। অতঃপর চাবুক মারতে-মারতে তাঁকে মৃত্যুমুখে আনা হয়
এবং তাঁর অন্তিমকালে তাঁর হাত দুখানা পিঠের দিকে বেঁধে ব্রহ্মপুত্রের তুষার-
গলা জলে নিক্ষেপ করা হয়। সিন্‌চেনের যে কয়জন ভৃত্য ছিল, তাদের শাস্তি
আরও বীভৎস। প্রত্যেকের হাত এবং পা একটি-একটি ক'রে কেটে নিয়েও
কর্তৃপক্ষ বোধ হয় খুশী হননি, অধিকন্তু তাদের প্রত্যেকের চক্ষুও উপড়ে ফেলা
হয়েছিল।—এখানে ব'লে রাখা দরকার, শরৎচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'সিন্‌চেনও'
জানতেন না! শুধু এরা নয়, আরও অনেকে শরৎচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য
এইভাবে কঠোর 'শাস্তিলাভ' করেছিল। তারা কেউ বাঁচেনি। এই সমস্ত
ঘটনাগুলি নিয়ে পরবর্তীকালে দাস মহাশয় একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে যান্‌—
"Narrative of a journey to Lhasa".

এই ঘটনার পনেরো বছর পরে সুইডেনের জগৎপ্রসিদ্ধ অভিযানকারী ডাঃ
সোয়েন হেডিন্‌ মধ্যএশিয়ার 'তাক্‌লা মাকান' মরুভূমি পেরিয়ে তিব্বতে ঢোকেন
এবং লাসার দিকে অভিযান করেন। কিন্তু তৎকালীন দলাই লামার আদেশে
তাঁকে লাসার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে সদলবলে বিতাড়িত করা হয়। হেডিন
সাহেব লাডাখ এবং কাশ্মীর হয়ে ভারতে আসেন (১৮৯৯ খৃঃ) এবং লর্ড
কার্জনের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় অল্পকালের জন্য পদার্পণ করেন। তাঁকে
বহু সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর হেডিন সাহেব বছর দশেকের মধ্যে
হয়ত লাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন। কিন্তু ততদিনে তিব্বত
বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব
হেডিনের সেই অভিযানের আলোচনা এখানে আর ওঠে না।

তিব্বত এককালে নামেমাত্র চীনের অধীন ছিল। শুধু আজ নয়, চীনের
নিকট কোনওদিন তিব্বত বশ্যতাস্বীকার করেনি। চীন একথা জানতো,—কিন্তু
আপন অধিকারটুকু অব্যাহত রাখার জন্য তিব্বতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাকে
বহুকাল অবধি হিংসার আশ্রয়ই নিতে হয়েছে। চীনবিরোধী তিব্বত পাছে
স্বাধীন ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রিক ও সামরিক সংযোগ স্থাপন করে, সেই কারণে
১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীন-সামরিক বিভাগ তিব্বতকে একপ্রকার অবরোধ করে। এর
কারণ ছিল। কম্যুনিষ্ট চীন নেহরু-গভর্নমেণ্টকে প্রথম দিকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা
করেনি। পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল, চীন-ভারত চুক্তি সম্পাদন ক'রে নেহরু-
গভর্নমেণ্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গত (Tibet region of
China) ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন, সেইদিন থেকেই চীনের ভারত-প্রীতি
বেড়ে উঠলো। প্রায় প'য়তাল্লিশ বছর পরে চীন পুনরায় তিব্বতের উপর তা'র
দখল ফিরে পেলো।

আগেকার আলোচনাটুকু শেষ করি। স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বত সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণগুলি তৎকালীন বৃটিশ ভারতের অধিনায়ক লর্ড কার্জন কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরই হাত থেকে পরোয়ানা নিয়ে সেনাপতি মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রবর্ণিত পথঘাট দিয়েই তিব্বত অভিযান করেন, এবং তিব্বত তাঁর যথাসম্ভব 'মৃদু আক্রমণের' নিকট পরাভূত হয়। সম্ভবত এই সাফল্যের জন্যই মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড পরবর্তীকালে 'নাইট' উপাধি লাভ করেছিলেন।

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী কাইচুর তীর ধ'রে উত্তরে গেলে নদীর পরপারে লাসা। লাসা নিজেই প্রধান তীর্থ। বস্তুত, তীর্থকেন্দ্রিক ব'লেই লাসার এত প্রাধান্য। এই রাজধানী একটি উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে, এবং এরই মাঝখানে পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গপ্রাকারের মতো 'পোটালা' প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত। রাজপ্রাসাদ ব'লে যে সকলে এটিকে সম্মান করে তাই নয়, এটি তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরুর বাসস্থান,—যাঁর নাম দলাই লামা। 'দলাই' শব্দটি মোগল শব্দ,—উৎপত্তি বোধ করি মঙ্গোলীয়। এর অর্থ হোলো যিনি সর্বোচ্চ, সর্বপ্রধান। যেমন হলেন রোমের পোপ, যেমন জেরুসালেমের গ্র্যান্ড মুফতি, ভারতের শঙ্করাচার্য, ইত্যাদি। কিন্তু এ'দের বাইরে রাষ্ট্র আছে,—তিব্বতে দলাই লামাকে বাদ দিয়ে সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনোটাই লোকস্বীকৃত নয়। এককালে পাশ্চাত্য দেশ এবং প্রাচ্যের বহু অঞ্চল এই রীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোতো। বিলাতে এটি আজও চালু আছে। ধর্মমন্দিরের পুরোহিত সম্মতিদান করেননি ব'লে অষ্টম এডোয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে তবে স্বামীপরিত্যক্তা নারীকে বিবাহ করতে হয়েছিল; গির্জার সম্মতি না থাকার জন্য এই সেদিন রাজকুমারী মার্গারেটকে প্রণয়-বিবাহ নাকচ করতে হোলো। ধর্মদর্শনের আদিভূমি ভারতে কিন্তু এই মধ্যযুগীয় অন্ধতা নেই। ভারতের সনাতনী যুগেও মানুষের আত্মিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল স্বচ্ছন্দ। আজ থেকে একুশশো বছর আগে তক্ষশীলায় গ্রীক রাজত্ব ছিল। সেই রাজ্যের কুমার হেলিয়োডোরাস মালোয়ারাজ্যে আসেন হস্তীসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল মালোয়ায় বসন্তোৎসব। রাজকন্যা মাধবিকা সখীদল সহকারে ঝুলনের দোলনায় দুলছিলেন। তরুণ সুদর্শন হেলিয়োডোরাস মাধবিকাকে দর্শন ক'রে মুগ্ধ হন্, এবং রাজকুমারকে দেখে মাধবিকাও অনুরাগে অভিভূত হন্। অতঃপর নানা নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে উভয়ের বৈবাহিক মিলন ঘটেছিল। মধ্যভারতে গোয়ালীয়রের অন্তর্গত ভীলসার নিকটে দু'হাজার বছরেরও আগে কুমার হেলিয়োডোরাসের নির্মিত 'গরুড়স্তম্ভ'টি আজও তা'র সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বহন করে।

একশো বছর ধ'রে গির্জাতন্ত্রী ইংরেজ সমস্ত পৃথিবীতে রটনা করেছিল, ভারতবর্ষ হোলো যোগী-ফকির, মারণ-উচাটন, যাদু-ভোজবাজি, বাঘ-ভাল্লুক-সাপ-কুমীর আর কিম্ভূতকিমাকার রাজা-রাজড়ার দেশ। এখানে সতীমেয়ে আগুনে

ঝাঁপ দেয়, কাঁটার ওপর ঝাঁপ দেয় ন্যাংটা সন্ন্যাসী, লতাপাতার সঙ্গে গোবর খায় দেশের লোক, সাপ নিয়ে খেলা করে সাপুড়ে, এবং নাগা-ফকিররা 'শিরাসন' ক'রে ঠ্যাং দুখানা শূন্যে তুলে রাখে। কিন্তু এই কথাটা কোথাও তা'রা বলেনি,— উল্‌কির ছাপ সর্বাঙ্গে মুদ্রিত ক'রে ইংরেজ নরনারী অর্ধনগ্ন চেহারায় নর্মাণ্ডির তীরে-তীরে নৌকা নিয়ে যখন 'বোম্বেটে' হয়ে ঘুরে বেড়াতো, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তখন জগতের শীর্ষস্থানীয়। মানবাত্মার অবারিত মুক্তিসাধনায় আজকের মতো সেদিনও ভারতবর্ষ সর্বাগ্রগণ্য ছিল!

প্রাচীন ভারতকে নিয়ে জাবর কাটতে বসিনি, কিন্তু এ কথাগুলি মাঝে মাঝে মনে করা ভালো।

তিব্বতের কথায় ফিরে আসি। শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় পাই, একটি বৌদ্ধমঠ মানে একটি ছোটখাটো শহর, লামা-নিয়ন্ত্রিত। সেই শহরে যেন ভূত প্রেত পিশাচ না ঢোকে—এই চেষ্টা প্রধান। সোয়েন হেডিনকে তিব্বত থেকে তাড়াবার সময় এক প্রধান লামা বলেছিলেন, আমরা 'সভ্য' হতে চাইনে, কারণ 'সভ্য' জগতকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পারিনে। আমাদের ধ্যানধারণা জপতপ বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমরা সকলের থেকে তফাতে থাকতে চাই; আমরা কা'রো সঙ্গে মেলা-মেশা করতে চাইনে। দয়া ক'রে একা থাকতে দাও।

শরৎচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে কয়েকটি কথার এখানে পুনরুক্তি করি। "তিব্বতের পথেঘাটে নগরে মঠে ও জনপদে প্রসন্ন বুদ্ধমূর্তি শত সহস্র। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমগ্র জীবন বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত। দেবাসুরের সংগ্রামে দৈবশক্তির জয়— এই হোলো সাধনা। এই সাধনার জন্য তুহিন ঠাণ্ডা গুহাগহ্বরের অন্ধকারে সংখ্যাতীত ভিক্ষু লুক্কায়িত।"

'জো-খাং' নামক প্রধান মন্দিরের কথায় শরৎচন্দ্র বলছেন, দেড় হাজার বছর হ'তে চললো মন্দির। পুরাতন কাঠের মোহাচ্ছন্নকর প্রাচীন পৌরাণিক গন্ধ তা'র ভিতরে। অন্ধকার দেওয়ালগুলি অদ্ভুতভাবে চিত্রাঙ্কিত। পূজার স্বর্ণপাত্রগুলি দপদপ করছে ঘৃতপ্রদীপের ধূমেল শিখার আভায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একদা কোনও এক অপরাহ্নে ইয়ংহাসব্যাণ্ড এই মন্দিরে প্রবেশ ক'রে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ান্। এখানে ব'লে রাখি, ইয়ংহাসব্যাণ্ড যদিও সমর-অধিনায়ক ছিলেন, তবু তিনি ছিলেন ভগবদ্‌ভক্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং একজন বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদী। আধুনিক কালের যোগিশ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরীতে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ রক্ষা ক'রে যোগনিমীলিত হন্, সেই সংবাদের পর স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড বিলাতে শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতিসমিতির সক্রিয় সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস মাত্র কিছুকাল আগে বৃদ্ধবয়সে পরলোক গমন করেন।

স্যর ফ্রান্সিস তাঁর গ্রন্থে মুগ্ধকণ্ঠে বলছেন, এই মন্দিরে অধ্যাত্মবাদী তিব্বতের অন্তরাত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেদীপ্যমান। মন্দিরের সুবিশাল প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে আমি উদার উদাত্ত গম্ভীর ডম্বরুর গুরুগুরুধ্বনি শুনলাম,—তারই সঙ্গে পূজারীগণের করুণ মধুর এবং ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ এবং পার্বত্য উপত্যকার অসীম বিস্তারলোকে দূরদূরান্তরের শঙ্খঘণ্টারব! দেখলাম ভক্তিনম্র অনুরাগের ভাবাবিষ্ট বিহ্বলতা! সহসা আমারও সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করলাম, এই অপরূপ দৈবপ্রেরণার উৎস।......তিব্বতের অন্তর্নিহিত দৈবসত্তাকে আবিষ্কার করলাম এই পরম বিস্ময়কর জরাব্যাধিবিকারবিহীন 'জোখাং' মন্দিরে!

দেখে নিতুম সে কেমন দেশ, যেখানে মানুষ কোথাও স্বীকৃত নয়। দু'একজন ভিন্ন এমন কোনও মানুষ তিব্বতে শ্রদ্ধালাভ করেনি, যে-ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মগত নয়। বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে একবার দেখে নিতুম সেই দেশকে, যেখানে মানুষ অবিশ্রান্ত কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে বুদ্ধভগবানকে,—কিন্তু মানুষের নারায়ণ যেখানে শ্রদ্ধালাভ করছে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 'লামা' হয়ে ওঠে! বলা বাহুল্য, অস্থির ক্ষুধায় তিব্বতকে দেখতে চেয়েছি অনেকবার। মানার গিরিসঙ্কটে, কুলুতে, কিন্নরে, জোজিলায়,—কতবার ঘাড় উঁচু ক'রে তা'কে দেখবার চেষ্টা করেছি। সিকিমে, ভূটানে, কুমায়ুনে,—তিব্বতের গন্ধ পেয়েছি অজস্র। দেখতে চেয়েছি কেমন সেই আশ্চর্য জগৎ—যেখানে পিশাচ-লোকের প্রতীকও পূজ্য,—কিন্তু গণদেবতা আরাধ্য নয়!

মনে প'ড়ে গেল একশো বছরেরও আগের থেকে একালের কথা,—১৮৪০ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। মহারাজা গুলাব সিংয়ের প্রধান সেনাপতি আক্রমণ করেছিলেন পশ্চিম তিব্বত। সে-আক্রমণ নৃশংস—তা'র মধ্যে দয়া ছিল না। তিনি মঠ গুম্ফা মন্দির জনপদ--কোনও কিছুকে ক্ষমা করেননি। তিনি বীর কিনা জানিনে, কিন্তু তিনি ইতিহাসপ্রখ্যাত জোরোয়ার সিং। ধ্বংসের পর ধ্বংস,—ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল পশ্চিম তিব্বতের বহু অঞ্চল। সেটি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ। জোরোয়ারের নির্মম হাতের মার খেয়ে তিব্বতের হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই সাংঘাতিক আক্রমণের ফলে পশ্চিম তিব্বত ওরফে 'লাডাখ' এলো ভারতের মধ্যে। কিন্তু জোরোয়ারের উপরে ভাগ্যের বিদ্রূপ সঞ্চিত ছিল। পরের বছরে বিজয়ী জোরোয়ার সৈন্যসামন্তসহ 'তীর্থাপুরী' থেকে গিয়েছিলেন 'তাকলাকোটে।' সেখানে তাঁর ক্যাপ্টেনের জিম্মায় সৈন্যদলকে রেখে জনকয়েক অনুচরসহ তিনি তাঁর স্ত্রীকে রাখতে গেলেন 'গারটকে।' ফিরবার পথে বিরাট চীনা সৈন্যদল তিব্বতীদের সহযোগে জোরোয়ারকে পথিমধ্যে আক্রমণ করে। জোরোয়ারের অতিমানবিক শক্তি ও যুদ্ধপ্রতিভা দেখে সবাই ছিল হতবাক, এবং তিব্বতীদের ধারণা—জোরোয়ার একজন তান্ত্রিক যাদুকর,—পিশাচসিদ্ধ! ওরা

সেই পথের উপরেই জোরোয়ারকে গুলীবিদ্ধ ক'রে মারে। সে-গুলীটি সিসার নয়, সেটি স্বর্ণমণ্ডিত। ওরা জোরোয়ারকে টুকরো টুকরো ক'রে কাটে এবং তাঁর শরীরের এক একটি মাংসখণ্ড নিয়ে তাঁরই স্মৃতিফলক ও সমাধিমন্দির নির্মাণ করে। আজও 'শিম্বিলিং' ও 'শাক্যগুম্ফায়' জোরোয়ারের দেহের একটি বিশেষ টুকরো এবং একখানা কাটা হাত সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র আজও লোকে প্রদর্শনীতে দেখে। জোরোয়ার 'অসুর' ব'লেই তিব্বতে অতিখ্যাত।

এই ঘটনার তেষট্টি বছর পরে কর্নেল ইয়ংহাসব্যাণ্ড পূর্ব তিব্বত আক্রমণ করেন—একটু আগে যেকথা বলেছি। সেই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার তিব্বতীর মৃত্যু ঘটে, এবং দলাই লামা 'পোটালা' প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যান্। অতঃপর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, এবং ইংরেজ তিব্বতের উপর চীনের 'দখল' (Suzerainty) সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। প'য়তাল্লিশ বছর এইভাবে কাটে। ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। চীন পুনরায় এসে তিব্বতে প্রভু[illegible] প্রতিষ্ঠা করে এবং ইংরেজ সম্পাদিত সর্বপ্রকার চুক্তি নাকচ ক'রে নেহরুগভর্ন[illegible] ইয়াটুং, গেয়ানৎসী ও গারটকের ভারতীয় বাণিজ্যসংস্থাগুলিসহ সৈন্য[illegible] ব্যবস্থাও প্রত্যাহার ক'রে নেন।

মাত্র পনেরো বছর আগেকার আরেকটি গল্প বলি। সেটি দ্বিতীয় [illegible] যুদ্ধের কাল,—১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। রাশিয়ার অন্তর্গত 'কারগিজ কাজাক' [illegible]ক তিন হাজার মুসলমান যাযাবর দস্যু চৈনিক তুর্কীস্তানের ভিতর দিয়ে অগ্[illegible] হয়ে সমগ্র পশ্চিম তিব্বত আক্রমণ করে। মানস সরোবর অঞ্চলের আটটি প্রা[illegible] মঠ তাদের হাতে লুণ্ঠিত হয় এবং তীর্থাপুরী গুম্ফা ধ্বংসস্তূপে পরিণত [illegible] ভারতীয় অন্ধ্রপ্রদেশী সন্ন্যাসী প্রণবানন্দ সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে ছিলেন। [illegible] ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। দেশব্যাপী লুটতরাজের পরে দস্যুদল [illegible] লাডাখে পেঁছয় তখন তাদের দখলে রয়েছে "এক লক্ষেরও বেশী ভেড়া[illegible] ছাগল, চার হাজার ঝব্বু, দুহাজার ঘোড়া ও অশ্বতর, পাঁচ শত রাইফে[illegible] বন্দুক, হাজার-হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত বিগ্রহ, অলঙ্[illegible] মণিরত্নাদি এবং সোনা রূপা ও রৌপ্যমুদ্রা।" তা'রা লাডাখের সীমানায়[illegible] পেঁছলে কাশ্মীর গভর্নমেণ্ট তাদেরকে নিরস্ত্র ক'রে ভারত প্রবেশে অনু[illegible] দেন্। তৎকালে বৃটিশ-রুশ মৈত্রীচুক্তি বলবৎ থাকায় বৃটিশ ভারত গভর্ন[illegible] সীমান্তের 'হাজারা' জেলায় তাদের বসবাসের জন্য নির্দেশ করেন, এমন কি তা[illegible] জন্য খরচপত্রেরও দায়িত্ব নেন্। কিন্তু তৎকালে দুটি 'ঘরের শত্রু' ছিল ভারতে[illegible] তা'রা হায়দারাবাদের নিজাম ও ভূপালের নবাব। তাঁরা উক্ত দস্যুদলকে আ[illegible] আপন অঞ্চলে পরিপোষণ করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু হাজারা জেলা[illegible] তাদের উপযুক্ত বাসস্থান ব'লে মনোনীত হয়। এই দস্যুদলই ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের সাহায্যে প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ করে।

পশ্চিম তিব্বতের উত্তর অঞ্চলটি হোলো লাডাখ। বৌদ্ধ-হিন্দু সম্রাট ললিতাদিত্য—যিনি ছিলেন অত্যুত্তর ভারতের অধিপতি—তিনি মধ্য এশিয়া ও তিব্বতে অভিযান করেন। লাডাখসহ অধিকাংশ পশ্চিম তিব্বত তাঁর অধিকার-ভুক্ত ছিল। সেটি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পরে সম্ভবত মুসলমান আমলে পশ্চিম তিব্বত ভারতের বাইরে যায়। এখন মাত্র লাডাখ ভারতের সীমানাভুক্ত। ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মালভূমিপ্রদেশ হোলো লাডাখ। এর উচ্চতা অনেক স্থলেই পনেরো ষোল হাজার ফুট। লে-শহর এগারো হাজার ফুট উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রদেশ আগাগোড়া তিব্বতী। সংস্কারে, সামাজিক চেহারায়, আচার আচরণে ও ধর্মনীতিতে—তিব্বতের সংগে লাডাখের পার্থক্য কম।

লাডাখ হোলো উত্তর ও দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট পার্বত্যভূভাগ—যেটি মূল হিমালয় ও কারাকোরামের মধ্যবর্তী জাস্কার এবং লাডাখ গিরিশ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। লাডাখের দক্ষিণ সীমানা অনির্দিষ্ট। শিপকির গিরিসংকটে রংচুং উপত্যকায় পা বাড়ালে হয়ত বা তিব্বতের এলাকা—যেটির ক্যারাভান পথ গারটক অবধি প্রসারিত। এটি তিব্বত-ভারতীয় বাণিজ্যপথ। কিন্তু রূপসু, হানলে, দেমচোক ও রংচুং ইত্যাদি উপত্যকার 'মা-বাপ' আছে কিনা বলা কঠিন। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কর্ণেল ল্যাম্বটন্ ভারতের প্রথম জরীপ করেন। তাঁর সেই পরিমাপটির অদ্যাবধি কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা, এবং ভারত গভর্মেণ্টের এ ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক নীতি গ্রহণ করা আছে কিনা বলা কঠিন। উত্তর লাডাখ এবং উত্তর ও পশ্চিম কাশ্মীর আজ পাকিস্তানের দ্বারা অবরুদ্ধ। এর মধ্যে পড়ছে স্কার্দু, বালতিস্তান, ব্রাল্দা, হুঞ্জা, গিলগিট, দারেল, টাঙ্গির, সোয়াত কোহিস্তান, চিত্রল, কাফিরিস্তান ইত্যাদি। এগুলি এক একটি বিরাট পার্বত্য ভূভাগ, অসংখ্য নদীপ্রবাহিত উপত্যকা এবং মালভূমি; অসংখ্য হিমাঙ্গ এলাকা, সংখ্যাতীত ছোট বড় পার্বত্য হ্রদ,—এবং এই সকল অঞ্চলে সর্বপ্রকার সংবাদ চলাচলের বাইরে বৌদ্ধ ও হিন্দুকীর্তির অগণিত ভগ্নাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে থাকলেও অনেক ভূভাগে শত শত বছরের মধ্যে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। উত্তর লাডাখের বাল্তিস্তান এলাকার উত্তরপূর্বাঞ্চল আবহমানকাল থেকে হিমবাহের দ্বারা অবরুদ্ধ। পৃথিবীর উচ্চতম শিখর গৌরীশৃঙ্গের দক্ষিণবাহিনী নদীগুলি তুষারস্তূপে পরিণত হয়নি, কিন্তু মধ্যএশিয়ার সর্বনাশা তুহিন [illegible]রিত পথ পেয়ে কারাকোরাম শৈলশ্রেণীর ক্রোড়ভূভাগে শত শত মাইল অবধি বিপুল পরিমাণ জলধারা কঠিন হিমবাহে পরিণত হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বিয়াফো, হিসপার, সিয়াচেন, বালটোরো, রাইমো, বাটুরা, চোগো ইত্যাদি বিশালকায় দেশজোড়া হিমবাহগুলি প্রধান। এগুলি কখনও গলে না। এই হিমবাহলোকের ভিতরে-ভিতরে একেকটি তুষারমণ্ডিত গগনচুম্বিত শিখরলোক,—এবং তাদের প্রত্যেকটি

কারাকোরাম ওরফে কৃষ্ণগিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। এই অনধ্যুষিত মনুষ্যপদ-চিহ্নহীন হিমপ্রবাহের ভিতর দিয়ে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় অধ্যাপক 'দেশিয়োর' নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী 'গডউইন অষ্টিনের' শিখরে (২৮,২৫০ ফুট) আরোহণ করতে সমর্থ হন্। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বত-শৃঙ্গ। এই অভিযানে একাধিক অভিযাত্রীর অপমৃত্যু ঘটে। পাকিস্তান-অবরুদ্ধ কাশ্মীর এলাকা কেবল যে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত তা নয়,—সিন্ধুনদের পরপারে সমগ্র কাশ্মীরের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব এলাকাও তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ। 'স্কার্দু' অঞ্চল থেকে তার আরম্ভ এবং 'চিত্রলের' দক্ষিণে 'অর্ণব' অঞ্চল ও 'কুনার' নদীর প্রান্তে তা'র শেষ। আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং কল্পনা অপেক্ষা কাশ্মীর ভূভাগ অনেক বড় এবং পূর্ব-পশ্চিমে অধিকতর প্রসারিত—যার সুনির্দিষ্ট জরীপ আজও অসমাপ্ত ও অমীমাংসিত।

পশ্চিম তিব্বতে 'গারটক' হোলো একটি অতি প্রধান সম্মেলনক্ষেত্র। লাডাখ থেকে এখানে এসেছে সিন্ধুর সীমানাপথ সোজা দক্ষিণে। টিবেট্-হিন্দুস্থান-পথ এসেছে পশ্চিম থেকে শিপ্‌কির ভিতর দিয়ে। পূর্বপথে তিব্বতের প্রসিদ্ধ সোনার খনি 'থোক্ জালুং' থেকে একটি পথ এসে এখানে যুক্ত হয়েছে। এই সবগুলি একত্র হয়ে সোজা দক্ষিণে ষোল হাজার ফুট উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে মানস সরোবরের দিকে চ'লে গেছে! একথাগুলি হিমাচল শিমলা ও কিন্নরের আলোচনায় পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ব'লে এসেছি।

মানস সরোবর! সংশয়াগ্রহীকে থমকে দাঁড়াতে হোলো!

মানসের প্রাচীন পৌরাণিক নাম, 'অনবতপ্তা'—আবার কোথাও এর নাম 'পদ্মহ্রদ'। অনেকে বলেন, এ দুটি নাম প্রাচীন বৌদ্ধ এবং জৈনদের দেওয়া পরমাশ্চর্য আলোকের পরকলায় স্বর্ণকমলের দল চিরকাল মানসের উপরে টলম' ক'রে উঠেছে তীর্থযাত্রীর অশ্রুসজল দৃষ্টিতে! অথচ এটি নিছক চোখের ভ্রম সবাই জানে। কিন্তু উচ্চ ভূভাগের বায়ুস্তরে সূর্যরশ্মির বৈচিত্র্যহেতু এবম্বিধ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতে থাকে। কৈলাসের চূড়ায় আদি অন্তহীনকাল ব'সে রয়েছে 'বজ্র-বরাহী',—শিব এবং পার্বতী,—পুরুষ ও প্রকৃতি। তাকলাকোটের পথ ধ' গেলে কুড়ি মাইল দূর থেকে ভূ-প্রকৃতির প্রধানতম বিস্ময় আলোক-বৈচিত্র্যব' মানস ও রাবণসরোবরের ঊর্মিতরঙ্গায়িত জল ঝলমল ক'রে ওঠে,—ত' প্রখর স্বচ্ছতার মধ্যে আরও কুড়ি মাইল দূরবর্তী বজ্র-বরাহী কৈলাসের ধবলমূ' প্রতিবিম্বিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের ইতিহাস কত লক্ষ বছরের জানিনে, কিন্তু মানব ইতিহাসের প্রথম আবিষ্কৃত হ্রদ হোলো মানস,—যেখান থেকে রাজহংসের দল স্বর্ণপক্ষ বিস্তার ক'রে অনন্ত নীলিমায় বলাকার আয়তনে উড়ে যায়। কোটি কোটি মানুষের চক্ষে এই সরোবর "সর্বাপেক্ষা পবিত্র, সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও

প্রেরণাদায়িনী, পৃথিবীর সকল হ্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং প্রথম মানব-বংশের জন্মকাল থেকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।" ভারতীয় জরীপ কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রাক্তন কর্ণধার এবং হিমালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ হেডেন বলেন, "ভূগোলের প্রথম পরিচিত হ্রদ হোলো মানসসরোবর। হিন্দুপুরাণে মানস প্রসিদ্ধ। বস্তুত, সভ্য মানুষের কাছে ইউরোপের জেনেভা হ্রদ সুখ্যাতি লাভ করার বহু শতাব্দী পূর্বে মানসসরোবর মানবজাতির নিকট যশোলাভ করে। ইতিহাসের উষা-কালেরও পূর্বে মানসসরোবর অতি পবিত্র প্রতিভাত হয় এবং এই ভাবেই এই সরোবর রয়ে গেছে চার হাজার বৎসরকাল।"

আলমোড়া থেকে উত্তরপূর্বে দুস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে শারদা, কালী ও ধবলীগঙ্গার তীরে-তীরে উপত্যকার পাশ কাটিয়ে এবং আসকোট, ধরচুলা প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম ক'রে 'গার্বিয়ং' নামক উপত্যকায় পৌঁছতে হয়। এখান থেকে তুষারসীমানা ও দুঃসাধ্য চড়াই আরম্ভ। গার্বিয়ং থেকে তিব্বতের তাকলাকোট ত্রিশ মাইল। সরকারি হিসাবে প্রায় ১৬,৭৫০ ফুট উঁচুতে (সমুদ্র-সমতা থেকে) লিপুলেক গিরিসংকটে তুষারমণ্ডিত হিমালয়ে আরোহণ করতে হয়। এখানে কোনও একটি বিশেষ স্থলে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় দক্ষিণে অনন্ত গিরিমালাময় ভারতবর্ষ, এবং উত্তরে 'রৌপ্যমণ্ডিত' শুভ্রতুষারাবৃত তিব্বতের গিরিশৃঙ্গদল উজ্জ্বলন্ত নীলিমার নীচে প্রখর সূর্যালোকে দেদীপ্যমান। আলমোড়া থেকে কৈলাস ও মানস সরোবরের দূরত্ব হোলো যথাক্রমে দুশো আটত্রিশ ও দুশো আঠারো মাইল, এবং লাসানগরী থেকে আটশো মাইল। কৈলাসের তিব্বতী নাম, 'কাং রিন্‌পোচে।' মানসসরোবর সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। এর গভীরতা হোলো তিনশো ফুট, পরিধি চুয়ান্ন মাইল এবং মোট দুশো বর্গমাইলে সীমাবদ্ধ।

কৈলাসের যিনি আদি দেবতা, তিনি 'ধর্মপাল।' ব্যাঘ্রচর্মাবৃত এবং নরকপাল-ভূষিত। এক হাতে তাঁর ডম্বরু, অন্য হাতে ত্রিশূল। যিনি শক্তি, তিনি 'বজ্রবরাহী',—তিনি ধর্মপালের সহিত ঘন অচ্ছেদ্য আলিঙ্গনের মধ্যে 'যৌন-সংযোগে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হয়ে রয়েছেন।' কৈলাসের শিখরলোকে কান পেতে থাকলে শোনা যায় অপার্থিব শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ও খঞ্জনী করতাল এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতঝঙ্কার।

যিনি মানস-রসিক সন্ন্যাসী, যিনি প্রকৃতভাবে যুক্তিহীন সংস্কার থেকে বর্জিত, যিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাবাবিলতা থেকে যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত—তিনি বলছেন, বিশ্বাস করো,—"যত তীর্থ আছে হিমালয়ে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হোলো কৈলাস ও মানস। চতুর্দিকব্যাপী সমগ্র অঞ্চল পরমাশ্চর্য লোক। হও তুমি অস্থির অসন্তোষে নিত্য চঞ্চল; তুমি যে কোনো ধর্মের, জাতির, সমাজের হও; তুমি সংশয়াচ্ছন্ন অবিশ্বাসবাদী হও, হও আস্তিক কিংবা নাস্তিক—এক সময় হয়ত তুমি উপলব্ধি করবে, অজ্ঞানে অচৈতন্যে অপ্রতিরোধ্যভাবে কখন্

যেন তুমি একাগ্রমতি হয়ে উঠেছ। কেউ তোমাকে পিছন থেকে ঠেলছে সম্মুখের মহাদেবতার নাটমন্দিরে,—সে হয়ত ঝড়ের হাওয়া, হয়ত অদৃশ্য শক্তি, হয়ত-বা বিশাল বিশ্বের কেন্দ্রানুগ মহৎ কামনা।"

সন্ন্যাসী বলছেন, "আজন্ম যার ঘ্রাণশক্তি পঙ্গু,—গোলাপের গন্ধ কেমন, সে জানে না! বেতারযন্ত্রের কাঁটা বিশেষ বিন্দুর উপরে নির্দিষ্ট না থাকলে দূর দেশের কোনও সঙ্গীত-অনুষ্ঠান শোনা যায় না। কিন্তু এখানে এসে দাঁড়াও! পঙ্গুনাসা মানুষ প্রথম 'গোলাপের' গন্ধ পেয়ে শিউরে উঠবে। তা'র সত্তার মধ্যে একটি নিগূঢ় অধ্যাত্মবাসনার কাঁটা একটি বিশেষ বিন্দুর উপরে এসে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকবে।"

বুকফাটা আর্তনাদ ক'রে চলেছে সিন্ধু উত্তর-কৈলাসের পথে। সিন্ধুর আদিঅন্ত দিশাহারা। মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি ওর অনেক তীরে শত শত বছরে। সভ্যতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না—এমন অজানা অনামা ভূভাগের ভিতর দিয়ে চলেছে সিন্ধু। সিন্ধু অপরিণামদর্শী। ভারতের ভৌগোলিক সীমানাকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সিন্ধুনদ। সিন্ধুর উৎপত্তি কৈলাস-মানস অঞ্চলেই।

সিন্ধু চ'লে গেছে লাডাখের ভিতর দিয়ে। বহু উচ্চমালভূমির উপরে লে শহর। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুম্ফা সমগ্র লাডাখে বর্তমান,—তাদের মধ্যে ফিয়াং, কাউচি, লিকির এবং হেমিস প্রধান। হেমিস গুম্ফা লে-শহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দুস্তর ও লোকশূন্য পার্বত্যপথের উপরে অবস্থিত। এটি একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। এই গুম্ফার মধ্যেই মহামানব যীশুখৃষ্টের ভারতভ্রমণের প্রকৃত তথ্যাবলীসমন্বিত প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত পুঁথি আবিষ্কার করেছিলেন জনৈক রুশ পর্যটক ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তুর্ক-রুশযুদ্ধের কালে তিনি একাকী ককেশাস ও মধ্যএশিয়া পেরিয়ে ভারত প্রবেশের পথে লাডাখের একটি অঞ্চলে পাহাড় থেকে প'ড়ে গিয়ে আহত হন্। তাঁকে হেমিসগুম্ফায় এনে দীর্ঘকাল শুশ্রূষা করা হয়। সুস্থ হবার পর তিনি একখানি দুর্লভ গ্রন্থের সন্ধান সেইখানেই পান্ এবং দোভাষীর সাহায্যে তিনি পুঁথিখানি পাঠ করেন। তাইতে জানা যায় কিশোর বয়সে যীশুখৃষ্ট বিবাহবন্ধনে ধরা না দিয়ে মধ্যএশিয়ার বণিকদলের সঙ্গে বেরিয়ে গোপনে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি আবাল্য গৌতমবুদ্ধের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ভারত ভ্রমণে তাঁর প্রায় ষোল বছর কাটে। তিনি পুরী, কাশী, কপিলা-বস্তু, কুমায়ুন, নেপাল এবং কাশ্মীরে ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল কথা—জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষই সমান, এই নীতি প্রচার করতে থাকেন। সনাতনীদের সঙ্গে যীশুর বিরোধ বাধে। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে যীশুখৃষ্ট

॥ ৮ ॥

গাগর গিরিশ্রেণীর নীচে-নীচে পথ চ'লে এসেছে অনেকদূর। কোথাও কোথাও ছোটখাটো উপত্যকা, সেখানে পথটি নানা শাখায় প্রসারিত। পাহাড়ের পর পাহাড়, তাদেরই ভিতর দিয়ে মানুষের পায়ের দাগ চ'লে গেছে শিরা-উপশিরার মতো। পাহাড়ের গায়ে ফসলের ক্ষেতগুলি এক একটি ধাপের মতো উপর থেকে নীচে অবধি স্তরে স্তরে সাজানো।

'কাইণ্ড' আর 'রাতিঘাট' পেরিয়ে যাচ্ছিলুম। অরণ্যসীমানার গা বেয়ে 'গাধেরা' নামক গিরিনদী ঝিরঝিরিয়ে চলেছে। নানাবর্ণের পাথরের প্রদর্শনীতে নদীর সর্বাঙ্গ ভরা। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, কালো,—সব রকমের পাথর। ওর মধ্যে কষ্টিপাথর খুঁজতে আসে নানান্ দেশের লোক। ওপারে বনখেজুরের অরণ্য, তারই সঙ্গে চীড় গাছের জটলা। উপত্যকার রঙীন পাখীরা নদীতে নেমে এসেছে, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দল বেঁধে স্নান করতে ব্যস্ত। চাষী মেয়ে এখানে ওখানে পাথর সাজিয়ে নালীপথে জল নামিয়ে আনছে ছোট্ট খামারটিতে। ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ছোট ছেলে। নদীর কাছাকাছি নেমে এলে সংসারযাত্রার চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন বন্য কৌমার্য,—চারিদিকে সতেজ তারুণ্য। মুগ্ধচক্ষু কেবল যেন কিছু খুঁজে বেড়ায়,—এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে মন বসাবার চেষ্টা পায়।

কুমায়ুন পর্বতমালা বিশ্ববিশ্রুত। অনেক পর্যটক আর পণ্ডিত বাইরে থেকে এসে ব'লে যায়, কুমায়ুন প্রাচ্যের ভূস্বর্গলোক! কেউ বলে, শোভা ও সৌন্দর্যের অমরাবতী,—ভারতের ললাটে কুমায়ুন যেন বৈদূর্যমণির মতো ঝলমল করছে। এই ভূখণ্ডের উত্তরে গাড়োয়াল, মধ্য-উত্তরে আলমোড়া, দক্ষিণে নৈনীতাল; দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগটি হোলো গাড়োয়ালেরই সীমানা। উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, প্রাণীশূন্য তুষার-উপত্যকা, ভয়ভীষণ অরণ্যানী, ভয়াল গভীর খদ, বন্য পার্বত্য নদীর উন্মত্ত রণরঙ্গ,—এরা এই ভূভাগকে পরমাশ্চর্য ক'রে রেখেছে। আবার অন্যদিকে পুরাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে উঠে এসেছে ঋষির তপোবন, নিঃসঙ্গ উপত্যকায় হরিণ আর ময়ূরের আনাগোনা,—পতঙ্গ সরীসৃপদলের বিশ্রম্ভালাপ। গিরিনির্ঝরিণীর সুস্বাদু জল, বনে বনে ফুলের শোভা, গাছে গাছে সুমিষ্ট ফল। জন-মনুষ্য যে-পথে নেই, হঠাৎ ফিরে দেখো—সাধু ব'সে রয়েছে জপের আসনে, নয়ত জেবলেছে ধুনি, আর নয়ত সংসারহারা বৈরাগী বানিয়েছে মনের মতন আশ্রম। কোনও গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ের ধারে ডালপালা আর পাথরের সাহায্যে 'কুট্‌রী' বানালো সন্ন্যাসী,—মাথার উপরে

ছায়া বিস্তার ক'রে রইলো 'পিপল' গাছ, —সেখানে সে র'য়ে গেল অনেকদিন। অধিকার কিছু নেই, দাবিও জানায় না,—কিন্তু কোনও না কোনও অনুগত এগিয়ে এলো গ্রাম থেকে। 'ভুরা' কিংবা চরসের কল্‌কেতে আগুন দিয়ে সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে দিল। সেই চরস টানলো সন্ন্যাসী তা'র বুক ভ'রে। দেখতে দেখতেই 'অসার খলু সংসারঃ।' জয় শিব শম্ভো! ভিজা 'সাঁপি'-জড়ানো আঙ্গুলের মতো সরু কল্‌কেটি হাত-ফেরতাই হয়ে চললো কিছুক্ষণ। কেউ বা বললে, 'অওর এক ছিলম্‌ বনা দে।' ওর মধ্যে কেউ নিয়ে এলো কাঁচা তামাক, কেউ বা কাঁচা সিদ্ধি। আগে 'মৌজ' হওয়া চাই, পরে মুখ খুলবে। আগে গৌরচন্দ্রিকা, পরে কীর্তন। নেশায় বুঁদ হওয়া চাই, নৈলে সংসারকে 'মায়া' ব'লে প্রতীতি হবে কেমন ক'রে? ছেলেপুলে, কর্তা গিন্নী, ঘর-সংসার,— এদের স্বীকার করি, সেইটিই ত' মায়া! তারই বাঁধন মনে-মনে। চরসের ধোঁয়ায় এই মায়াময় মনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে, নাভিকেন্দ্রে প্রলয়-বিপর্যয় দেখা দেয়। সেই মধুর 'প্রলয়ের' মধ্যে হয়ত বা এসে বসলেন গ্রামের গৃহিণী সাধুর আকর্ষণে। তিনিও ওই কল্‌কেতে গোটা দুই টান দিয়ে অনিত্য সংসারের মায়াবন্ধ জীব সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনায় যোগ দিলেন। গ্রামে সাধু এসে পৌঁছলেই গ্রামের পুণ্য, গ্রামের যশ। গ্রামবাসীর সেইটিই খোলো বৈঠকখানা, সেইটি বৈচিত্র্য। সাধুর অবমাননা কুমায়ুনে নেই।

মেঘ ক'রে এসেছে পাহাড়ের কোলে-কোলে, কিংবা চূড়ায়। মেয়েরা উতলা হয়ে উঠলো। ডাক দিল পাহাড়ে-পাহাড়ে। 'ভেড়ী-বক্‌রিরা' গিয়েছে অনেক দূরে, কিন্তু তা'রা ওই মেয়ের গলার আওয়াজ চেনে। মালভূমির তলা থেকে ডাক শুনে তা'রা মুখ তুলে তাকায়। মহিষের পিঠে চ'ড়ে উঠে এলো ছোট ছেলে-মেয়ে। ঘণ্টা বেজে উঠলো ছাগলের গলায়। দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে এলো এ পাহাড়ে আর ও পাহাড়ে।

বয়েল্‌-গাড়ী কোন্‌ দূর দেশ থেকে ছেড়েছে এক মাস আগে। শরৎকালের শেষ দিকে পাহাড়ী-শ্রমিক তা'র সংসার নিয়ে উঠেছে ওই গাড়ীতে। দশ-বিশখানা গাড়ী এক সঙ্গে যাত্রা করেছে এক মুলুক থেকে অন্য মুলুকে। ওরা চলেছে ফসল কাটতে ভিন্‌ দেশে। দুমাস ধ'রে চলবে ওদের গাড়ী। ওরা শ্রমিক। গাড়ীর ভিতরে থাকে শিশু, কিংবা মেয়ে। পাহাড়ে-পাহাড়ে রাত্রিবাস, গাছের ছায়ার নীচে রান্নাবান্না আর বিশ্রাম, গাড়ীর নীচে শয়ন-শয্যা পাতা। লাঠি আর সড়কি নিয়ে পুরুষ পাহারা দেয় রাত্রিকালে—পাছে জন্তু-জানোয়ার আসে। গরু-ছাগল-কুকুর—সকলের গলাতেই ঘণ্টা বাঁধা। কোনটা আক্রান্ত হ'লেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হ'লে ওরা এই পথে আবার ফিরবে। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ বছরের সংস্থান ক'রে নিয়ে আসবে। যেতে-যেতে পথে দেখেছি একদল পর-পর গাড়ীর মধ্যে কয়েকটি পরিবার দিনের বেলায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে, এবং বলদগুলি আপন মনে গাড়ী টেনে-টেনে

চলেছে পাহাড়ের সংকটসঙ্কুল পথে। বাঁকে বাঁকে। চালকের কোনও তোয়াক্কা তাদের নেই। বলদ চলেছে, চলেছে ওদের কাঁধে-কাঁধে সংসারযাত্রা,—ওরই মধ্যে কোনও নারী প্রসব করেছে, কারো হয়ত মৃত্যু ঘটেছে, কারো পিঠে পাহাড়ী চিতা ধারালো নখের আঁচড় দিয়ে গেছে, হয়ত বা কোনও গাড়ীর একটি বয়েল্ হঠাৎ মারা পড়েছে,—ওরা দমেনি। দানা চিবিয়ে, বাজরা-জোয়ারের ডেলা কিংবা 'মাক্কাই' পুড়িয়ে খেয়ে ওরা চলেছে আপন পথে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছি, ওদের ওই পথের উপরে চিরকালের একটি গতির স্পর্শ লেগেছে; জন্ম-মৃত্যুর অবিশ্রান্ত বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ওদের ওই মন্থর গতি কতদিন আমার ভাবনাকে দিশাহারা ক'রে দিয়েছে। আমার বক্ষোপটে ওরা রেখে গেছে আবহমান কালের পায়ের চিহ্ন।

পথের বাঁক একটু ফিরলেই আবার সেই নিবিড় স্তব্ধতা। কোনও একটি উড্ডীন পাখীর ডাক, সরীসৃপের সাড়া, ঝিল্লির ঝনক—সেই স্তব্ধতাকে আরও গভীর ক'রে তোলে। চারিদিকের ব্যাপক বন্যতায় ছমছমিয়ে ওঠে মন। কিছু যেন দেখছি আশে পাশে, কেউ যেন লক্ষ্য করছে আমাকে প্রতি পাথরের অন্তরাল থেকে। আমি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি একটি বিচিত্র সংসারে। প্রতি ঝোপের অন্ধকারে, প্রতি গুহার গহ্বরে, প্রতি বৃক্ষের কোটরে,—আছে কেউ, যাকে চিনিনে, জানিনে, বুঝিনে। একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহসা যেন নিঃশব্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, কথা বলছে না কেউ, সাড়া পাচ্ছিনে কোথাও,—আমি যেন তাদেরই পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে চলেছি। পাছে ওদের ধ্যানভঙ্গ হয়, তাই সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়েছি।

কুমায়ুনের পশ্চিমসীমানা বোধ করি তমসানদীর দ্বারা চিহ্নিত। 'বন্দর-পঞ্চ' পর্বতমালা থেকে নেমে দক্ষিণে হরিপুরে এসে তমসা নদী মিলেছে যমুনার সঙ্গে। এই বন্দরপঞ্চেই হোলো যমুনোত্রিতীর্থ। হরিপুর থেকে একটি পথ গিয়েছে চক্রতায়, এবং সেখান থেকে সেই পথটি সোজা উত্তরে অন্তহীন গিরিমালা ও উপত্যকার ভিতর দিয়ে চ'লে গেছে 'রাওয়াইন্' ও 'পাখড়ি' হয়ে কিন্নরদেশের দিকে শতদ্রুতীরবর্তী 'ওয়াংটায়'। পাখড়ি থেকে ওয়াংটার পথ খুবই দুঃসাধ্য। কুমায়ুনের উত্তর ভূভাগ হোলো পশ্চিম তিব্বতের সীমানা। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালার প্রায় দুই হাজার মাইল দৈর্ঘ্যের মধ্যে কুমায়ুনের মতো এত অধিক-সংখ্যক ঘনসন্নিবিষ্ট তুষারচূড়া অন্য কোথাও নেই। এমন গৌরব-গরিমা, এমন সৌন্দর্যশ্রী, এমন গিরিনির্ঝরিণীর শোভা, এমন অধ্যাত্ম আনন্দ এবং উপলব্ধির পটভূমি—অন্য কোথাও দেখিনে। কুমায়ুনের প্রতি পর্বত দেবতার মতো, প্রতি জলধারা গঙ্গার মতো, প্রতি প্রস্তরখন্ড বিগ্রহের মতো, প্রতি গুহাটি মন্দিরের মতো। সাধু, মহাত্মা, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষু, সেবক,—এদের নিয়ে

কুমায়ুন পরিপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি অধিবাসী ধর্মসেবী, সত্যবাদী, সরল এবং অতিথিপরায়ণ। হিমালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুমায়ুনেরই অন্তর্গত। কৈলাস মানসসরোবরের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও নিরাপদ পথটি কুমায়ুনেরই ভিতর দিয়ে চলেছে। এই কুমায়ুনে উত্তরমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যে-তুষারচূড়াগুলি প্রতিনিয়ত মানুষের পূজা পায় তাদের মধ্যে যমুনাপর্বত, শ্রীকান্ত, গঙ্গোত্রি, কেদারনাথ, শতোপন্থ, বদরিনাথ, নীলকান্ত, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, দ্রোণগিরি, কামেত, হাতীপর্বত, গৌরীপর্বত, পঞ্চচুলী, নন্দাঘুণ্টি, নন্দকোট—এইগুলি অতি প্রধান। এর বাইরে আছে শত শত গিরিশিখর, এবং শত-সহস্র মন্দির। আছে তুষার উপত্যকার কোলে সাধুর আশ্রম, আছে সন্ন্যাসীর তপোবন, আছে বৈরাগীর কুটীর, আছে মৌনীর গুহা। দার্শনিক, পণ্ডিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যোগী, নাঙ্গা, ভাবুক, সত্যাশ্রয়ী, সর্বত্যাগী, নৈরাশ্যবাদী, আশাহত, ব্যর্থপ্রণয়ী, সন্তানশোকাতুর, পুণ্যকামী, তীর্থবাসী, মৃত্যুকামী, শিল্পী, কবি, রাজনীতিবিদ্—কে নেই কুমায়ুনে? কুমায়ুনের আকাশ নিত্য 'শিবশম্ভোর' নামে মন্দ্রিত, প্রতি গিরিনদীর কলতানে গঙ্গার স্তব মুখরিত, প্রতি পাখীর কণ্ঠে দেবতার মন্ত্র গুঞ্জিত,—কুমায়ুন ভারতের শ্রেষ্ঠতম তীর্থলোক। কামনায়, বাসনায়, বেদনায়, পিপাসায়, তুমি জরোজরো,—এসো কুমায়ুনে, শীতলশ্বাস মধুর সমীরণে তোমার সমস্ত দহনের উপরে শান্তির প্রলেপ যাবে বুলিয়ে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে তুমি পঙ্গু, এসো নীলধারার কোলে,—নবজীবনের আশ্বাস খুঁজে পাবে। এখানকার মৃত্তিকায় চন্দনের গন্ধ, তপোবনের কুসুমশয্যায় দেবসৌরভ, লতায় পাতায় বীজমন্ত্রের কানাকানি, মন্দিরে-মন্দিরে উদাত্ত ওঁঙ্কারধ্বনি। প্রতি তুষারশিখরে দেবসিংহাসন। প্রতি পথের বাঁকে শিব ও শক্তি, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর বন্দনা।

কোশী নদীর তীরে-তীরে চলেছি। কেউ বলে এ নদীর নাম 'কৌশিক', কেউ বা বলে 'কৌশল্যা।' ছোট্ট রামগড় পেরিয়ে যাচ্ছি,—আশে-পাশে সামান্য পাহাড়ী বস্তি। তারপরে পাচ্ছি বিশ্রাম নেবার মতো গ্রাম—'গরমপানি।' আবার এগিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে। নালানদী ছাড়িয়ে আদিম অতিপ্রাকৃত বন্যতা দেখে যাচ্ছি ওপারের পাহাড়তলীর ছায়ায়-ছায়ায়। মন কেঁদে উঠেছে কতবার মায়ার কাঁদনে। ভিতরের পাখী পোষ মানেনি কোনোদিন। হিমালয়ের বৃহত্তর প্রাকৃতলোকে এসে ভিতর থেকে সে ডানা ঝটপটিয়ে উঠেছে, ডাক দিয়েছে বিদীর্ণকণ্ঠে আকাশলোকের দিকে তাকিয়ে। পিঞ্জরের বিহঙ্গ নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েও স্থির থাকতে চায়নি। আপন জগৎকে সে আবিষ্কার করছে থেকে-থেকে।

দক্ষিণ বাঁকপথে ঘুরে সামনেই পাওয়া গেল 'খয়েরনা' সাঁকো। এপারে দক্ষিণ কুমায়ুন, ওপারে মধ্যকুমায়ুন। 'খয়েরনা' হোলো নৈনীতাল ও আলমোড়ার অন্যতম সংযোগ-সেতু। দেখতে দেখতে এসে পেঁছিলুম 'পিলখোলি'-র ঘাঁটি পাহারায়। এখানে খাজনা দিয়ে সেলাম ঠুকে যেতে হবে। চড়াইপথ এখান থেকে চ'লে গেছে রানীক্ষেতের দিকে।

এ আমার পরিচিত পথ। পরিচিত, কিন্তু চিরকালের অচেনা। প্রতি পাহাড়ের বাঁক চব্বিশ বছর ধ'রে নতুন ভাষ্য দিয়েছে আমাকে। বৃক্ষ পরিণত হয়েছে বনস্পতিতে, নতুন কালের ঝরণা নেমে এসেছে, নদীর পাথর আরেকটু মসৃণ হয়েছে,—মহাকালের ধারাবাহিকতা ওদের উপরে রেখে গেছে তা'র গতির দাগ,—তবু অজানা রয়ে গেল যা কিছু প্রাণের প্রিয়। ওই পাথরে কান পেতে শুনে গেছি যেন কতবার কা'র পায়ের ভাষা. নদীতে-নদীতে আগমনী, ঝাউ-পাইনের বনে-বনে মন্ত্রপাঠ,—আর চারিদিকের অনাদি অনন্ত অখন্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে কোথায় যেন কা'র পরম আহ্বান। জানিনে কিছু, ভাষা ছিল না কণ্ঠে, নির্দেশ দিল না কেউ, খুঁজে পেলুম না কিছু কোনোদিন,—কেবল আমার মর্মলোকের বাসাছাড়া সেই পাখী এক আকাশ থেকে অন্য আকাশপথে রক্তঝরা কণ্ঠে ডেকে-ডেকে ক্লান্ত হয়ে এলো।

চড়াইপথ উঠে এলো অনেক দূর। দিগন্ত এবার বিস্তৃত হয়েছে। অবরোধ স'রে গেছে। হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া উঠেছে গিরিশিখরে। উত্তর পথের বাঁক পেরিয়ে 'রানীক্ষেত' শহরে এসে পৌঁছলুম। হিমালয়ের তুষারচূড়ারা আবার সামনে এসে দাঁড়ালো।

পুরণো বন্ধু যেন দু'হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল আপন আলিঙ্গনে। এবার এসে দাঁড়ালুম অনেক দিন পরে। প্রাচীন প্রসন্ন স্নেহের দ্বারা যেন মধুর অভ্যর্থনা জানালো 'রানীক্ষেত'—ভালো আছ ত?

মনে মনে জবাব দিতে হোলো,—না, ভালো নেই। কোনোদিনও ছিলুম না। পায়ে কাঁটা ফুটেছে অনেক, মাথা ঠুকেছে তা'র চেয়েও বেশি। চোখ বেয়ে ঝরেছে অনেক রক্ত, বুক বেয়ে নেমেছে অনেক বেদনা। কপালে বলিরেখা, সর্বাঙ্গে জরা! চেয়ে দেখো মুখ তুলে।

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী আছে কি ললাটে লেখা?"

হঠাৎ ছিটকে এসে পড়লুম আধুনিক উপকরণের মধ্যে। ঠিক বলা কঠিন,—বোধ হয় রানীক্ষেত সমস্ত কুমায়ুনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর শহর। মন নেচে উঠলো স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে। অনেক মানুষ দেখছি একত্র, পাকা ঘর-বাড়ী সর্বত্র, পাইনের বনে-বনে সাহেবসুবোর বাংলো, এখানে ওখানে সরকারি ব্যারাক। মস্ত বড় মার্কেট্।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মোটর ষ্ট্যাণ্ডের সামনে 'লতিফ মঞ্জিল' নামক বাড়ীটি আমার পরিচিত। আজ আমি রাজসিক চেহারা আর পোষাক নিয়ে এসেছি।

একা নই, সঙ্গে আছেন বন্ধুবর শশাঙ্কমোহন চৌধুরী। তিনি দড়াদড়ি ছিঁড়ে এবার বেরিয়ে পড়েছেন। আমরা 'লতিফ মঞ্জিলে'র দোতলায় একটি ঘর নিলুম। সমস্তই এবার সহজলভ্য। এবার পাচক আসুক, চাকর আর চাপরাশি আসুক।

লোভের উপকরণ চারিদিকে সাজানো। চারপাই খাটিয়া জুটলো কপালে,—একেবারে স্বর্গরাজ্য। ভোজ্যবস্তু যখন যা কিছু চাই। কাঁচের প্লেট্ সাজানো হোটেল্, পেয়ালা-পিরিচের ঠুনঠুনানি, বেতারে বোম্বাই গান, দোকানে-দোকানে রঙ্গীন পানীয় ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্বসিত। সমস্তটাই সহজলভ্য এবং অনায়াস। কোথাও পরোয়া নেই, কেউ প্রশ্ন করছে না, কৌতূহল দেখাছিনে কোথাও,—চারিদিকে ভোগের উপকরণ থরে থরে সাজানো। বাজারে যা খুশি কেনো, যা চাও এনে দিচ্ছে, যাকে খুশি ডাক দাও, যখন খুশি বেরিয়ে পড়ো।

প্রশস্ত উপত্যকার টুকরো রানীক্ষেতে কোথাও নেই। এর ঠিক উল্টো,—শীলং শহরে গিয়ে মনে হয় না যে, পাহাড়ে আছি। এমন কি দার্জিলিংয়ের ওই চাঁদমারী বাজারও অনেকটা প্রশস্ত সমতল, আরেকটু নেমে গেলে লেবং-এর ময়দান। শিমলাতেও পাওয়া যায় আনানদেলের মাঠ। রানীক্ষেত সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। হয় ওপরে ওঠো, নয়ত নীচে নামো। উত্তর দিয়ে উৎরাই পথে একটু নেমে গেলে সামান্য সমতল,—নৈলে রানীক্ষেত শহর হোলো পাহাড়ের গা। পথের দুধারে দোকান, উপর দিকে অভিজাত পল্লী, নীচের দিকে জনবসতি। সমুদ্রসমতা থেকে রানীক্ষেত হোলো ছয় হাজার ফুট উঁচু, এবং কাঠগোদাম ষ্টেশন থেকে পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী।

প্রশস্ত সমতলের ক্ষুধা চিরস্থায়ী হয়ে রানীক্ষেতে থেকে যাবে, ইংরেজ গভর্নমেন্ট এটি বরদাস্ত করেনি। রানীক্ষেতের প্রচুর অরণ্য, জলের সুবিধা, প্রাকৃতিক শোভা এবং জল-বায়ুর আশ্চর্য গুণপনা লক্ষ্য ক'রে এককালে লর্ড মেয়ো ভেবেছিলেন, শিমলার বদলে রানীক্ষেতকে বড়লাটের পার্বত্য কেন্দ্র বানালে মন্দ কি? তাঁর সেই অভিপ্রায় অবশ্য কার্যে পরিণত হয়নি, তবে এই শহরটিকে প্রায় একশো বছর আগে ইংরেজ সৈন্যসামন্তের ছাউনীতে পরিণত করা হয়েছিল, এবং এখানকার গোরা হাসপাতালটি ভারতবিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। একান্তভাবে ইংরেজদের জন্যই অতঃপর রানীক্ষেতের উপর তলার দিকে কুচ-কাওয়াজের মাঠ, পোলো খেলা ও গল্ফ্খেলার ময়দান নির্মাণ করা হয়। এ ছাড়া পাইনবনের মধ্যে স্বল্পনগ্না তরুণী মেমদের চলাফেরার জন্য পুষ্পবীথিকা, আমোদ আহ্লাদের জন্য নিভৃত নিকুঞ্জ, শীতের দিনে মধুরহাসিনীদের স্নানের জন্য স্ফটিকাধার তপ্তধারাকুণ্ড, এবং গিরিশিখরচূড়ায় উন্মুক্ত আকাশতলে জ্যোৎস্নারাত্রি যাপনের আনন্দের জন্য 'রক্তকমলদলকে' আনা হোতো অনেক দূরের থেকে। তাদেরই ছিন্ন পাগড়ীর অবশেষ আজও খুঁজলে পাওয়া যাবে কোনো কোনো শূন্য বাংলোর আশে পাশে।

"জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল।
জানি তা'র পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।"—

রবীন্দ্রনাথ যাবার আগে ব'লে গিয়েছেন। আজ অবশ্য তল্পিতল্পা নিয়ে ইংরেজ চ'লে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে তা'র রুচি। প্রত্যেক পাহাড়ী শহরকে ইংরেজ যেমন অতি যত্নে অলঙ্কৃত ক'রে গেছে, তেমন আর কেউ করেনি। মুসৌরী, নৈনীতাল, ডালহাউসী, শীলং, শিমলা, সর্বত্র ইংরেজেরই রুচির পরিচয়। যেখানটিতে দাঁড়ালে হিমালয়ের শোভা সব চেয়ে ভালো ভাবে দেখা যায়, ইংরেজ ঠিক সেখানে 'আসন' নিয়েছিল। শিমলায় 'মাসোব্রা', নৈনীতালের টিফিন্-টপ, মুসৌরীর লান্ডুর, দার্জিলিংয়ের রাজভবন, ডালহাউসীর উপর-তলাটা,—এমন কি ওই সোমেশ্বর থেকে এগিয়ে 'কৌসানী' পাহাড়ের চূড়ায় ডাকবাংলাটি,—ইংরেজের রুচি সর্বত্র সমানভাবে কাজ করেছে। কৌতুকের বিষয় এই, ইংরেজের পক্ষে এ দেশে পার্বত্য শহরে বসবাসের ব্যাপারে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানরা সাহায্য করেছিল বেশী। হিন্দুরা ওদের শাসনযন্ত্রে থেকে মুন্সীর কাজ নিয়েছিল, আর মুসলমানরা মোতায়েন ছিল ওদের ঘরোয়া জীবনে। হোটেলেই হোক, বাড়ীতেই হোক, আর লাটপ্রাসাদেই হোক,—ওদের পাচক, ভৃত্য, আরদালি, চাপরাশি ইত্যাদি সবাই মুসলমান। এর প্রধান কারণ হোলো, গরু। গরু খায় ওরা উভয়েই। সামাজিক জীবনে আহার্যের ব্যাপারটা খুবই প্রধান। সুতরাং গোমাংস ছিল উভয়পক্ষের রুচির সংযোগসেতু। ওদিকে হিন্দুরাও শূকর ঘাঁটে। অনেক হিন্দু শূকর খায়, এবং ইংরেজও শূকরভক্ত। অতএব শূকরেরাও অনেক সময়ে হিন্দু আর ইংরেজের মিলন ঘটাতো। মুরগীর কথা বাদ দিচ্ছি। এটার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান সবাই পাশাপাশি পাত পেতে ব'সে গেছে! যাই হোক, আগে অতটা লক্ষ্য করিনি। কিন্তু প্রত্যেকটি আধুনিক পার্বত্য শহরে এলেই একটি মুসলমান সমাজের দেখা পাই। তাদের অধিকাংশই আগে ছিল মাংসবিক্রেতা, রুটিওয়ালা, হোটেল-বয়, বাবুর্চি, আরদালি ইত্যাদি। সমগ্র ভারতীয় হিমালয়ে মুসলমানের দেখা মেলে খুবই কম, কিন্তু শহরে এলেই ওদেরকে ওইসব কাজে নিযুক্ত দেখা যায়। ইংরেজ চ'লে যাবার পর মুসলমানদের অনেক কাজ চ'লে গেছে। এ আলোচনায় আমি কাশ্মীরকে বাদ দিচ্ছি।

রানীক্ষেত শহরটি অনেকটা যেন বারান্দার মতো। উত্তর অংশটা সম্পূর্ণ অবারিত। এই বারান্দায় দাঁড়ালে তুষারমৌলী হিমালয়ের অনেকগুলি চূড়া পাশাপাশি দেখা যায়। নীলকান্ত, বদরিনাথ, হাতীপর্বত, গৌরীপর্বত, ত্রিশূল, নন্দাদেবী ও নন্দকোট—একটির পর একটি সাজানো। কখনও দুগ্ধশুভ্র, কখনও

গৈরিক, কখনও স্বর্ণাভ, কখনও পীত-নীলাভ, কখনও বা মেঘময়। রূপে, বর্ণে, সৌন্দর্যে, মহিমায়,—সে যেন নিত্যকাল ধ'রে রানীক্ষেতকে অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছে। বস্তুত, কুমায়ুনের আর কোনও শহর থেকে এমনভাবে দিগ্বলয়-প্রসারিত হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য দেখা যায় না। দিন দুই আমরা তন্ময় হয়ে ছিলুম।

রানীক্ষেত থেকে একটি পথ উত্তর পশ্চিম দিয়ে নীচের দিকে চ'লে গেছে, এইটি বদরিনাথ যাবার প্রধান পথ,—'বদরিনাথ মার্গ।' একদা কেদার-বদরি পরিক্রমায় হৃষিকেশ থেকে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে ঠিক এই পথের মুখে পৌঁছতে চারশো মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল। আজ এ পথ পরিত্যক্ত, কারণ 'কোটদ্বার' থেকে 'কর্ণপ্রয়াগ' হয়ে এখন 'চামোলি' পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে। রানীক্ষেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে সোজা বদরিনাথ ছিল পায়ে হাঁটা একশো সাতাশ মাইল পাহাড়। আজ আর এপথে কেউ যায় না। পুরনো কথা স্মরণ করে' আমি গেলুম কিছুদূর, এবং দেখতে দেখতে অনেক নীচের দিকে। চিনতে পারলুম না বিশেষ কিছু,—কেননা চ'লে গেছে অনেককাল। পথ ভেঙে পাথর বেরিয়ে পড়েছে, শ্রী নেই কোথাও। বস্তির চিহ্ন নেই, এক-আধখানা পরিত্যক্ত চালাঘর। কাঠের খুঁটি গেছে ভেঙে, ছাদ ধ'সে পড়েছে। মানুষের সমাগম সহসা চোখে পড়ে না। নিতান্ত দেহাতী ছাড়া যাত্রীরা কেউ আর এপথ মাড়ায় না। মাইল দেড়েক দূরে গিয়ে পাওয়া গেল 'কোট্‌লি' আর 'কিল্‌কোট' চটি। এক আধটি দোকান, দু'একটি লোক। এ আমার গত জীবনের পথ। জন্মান্তরে এসে আর কিছু চিনতে পারিনে। এই পথে ঝুলি কাঁধে নিয়ে একদা ফিরেছিলুম। আনন্দে, ভাবনায়, নৈরাশ্যে, কৌতূহলে—এই পথে ছিল সেদিন অনন্ত বিস্ময়। আকাশের অগ্নিবর্ষণে, জ্যোৎস্নাকিরণে, ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে, যন্ত্রণায় আর অগ্নি-বাসনায়, ভ্রান্তিপ্রমাদে আর আশীর্বাদে,—এই দুঃসাধ্য কর্কশ পিপাসার্ত পথ সেদিন ছিল প্রাণের প্রলাপে উদ্বেলিত।

পথ প্রশস্ত ও প্রসারিত, কিন্তু তা'র 'বেন্ড'গুলি বিপজ্জনক। একটির পর একটি বেন্ড্। শুধু ভয় করে না, সমস্ত মন ও শরীর ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে। একটু অসতর্কতা, একটু অনবধানতা, হিসাববোধের ঈষৎ গরমিল,—আর রক্ষা নেই। এই বিপজ্জনক পথ আরম্ভ হয় 'মাজখালি' এবং 'কালিকা' এস্টেট পার হয়ে গেলে। পথ সুন্দর, মসৃণ, চিক্কণ—কিন্তু উদ্বেগজনক। প্রতি বিপদ-সঙ্কেতের মুখ থেকে গাড়ী যেন নিজকে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে। নীচের দিকটায় অনেক সময় তল দেখা যায় না। যখন দেখা যায়, তখন শীতের দিনেও কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে চিড়-পাইনের অরণ্য, মাঝে মাঝে নদীর পাথুরে খদ,—প্রকৃতি যেন সর্বত্র ইন্দ্রজাল বুনে রেখেছে। বাঁদিকে মাঝে মাঝে তুষার-

শৃঙ্গগুলির সুদূরবর্তী শোভা, মাঝে মাঝে অস্তিত্বের আবরণের বাইরে অমর্ত্য মহিমা, নন্দনের সিংহদ্বার।

দেখতে দেখতে আমরা আবার এলুম প্রায় কোশী নদীর তীরে। এখান থেকে পথ গিয়েছে উত্তর পশ্চিমে। সকালের তরুণ সূর্যের আলো পড়েছে নীল নদীতে। চারিদিকের পাহাড়ের নীচে নদীর সুবিস্তৃত দুই পারের উপত্যকায় চাষের কাজ চলছে। সভ্যতার সীমানা থেকে অনেকদূর। মহাকাল যেন এখানে স্তব্ধ কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নদীর কোলে-কোলে সেই বিচিত্র বর্ণের পাথর, দূরে দূরে চিরকৌমার্যব্রতধারী মহারণ্য দাঁড়িয়ে যেন অতিকায় কালপ্রহরীর মতো। তারই নীচে-নীচে শিশু মানব আর মানবী যুগ থেকে যুগান্তরে আপন আপন অন্ন খুঁটে খেয়ে চলেছে। প্রত্যেকটি গৃহপালিত পশুর চোখেও যেন সৌরবিশ্বের সৃষ্টিরহস্যের পরম বিস্ময়।

একে একে 'পাট্‌লিবাজার,' 'সাকার', 'মানান' ইত্যাদি জনপদ পেরিয়ে যাচ্ছি। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে নরনারী ও শিশুর মুখের আকার বদলাচ্ছে। গরুর মুখের ও শিরদাঁড়ার ভঙ্গী, শিংয়ের আকার ও গঠন, মেয়েপুরুষের মুখের চোয়াল এবং গালের হাড়—একে একে ভিন্ন চেহারা নিচ্ছে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মঙ্গোলীয় রক্তের ধারা এখানকার হিমালয়ের দক্ষিণ সীমানাতেও এসে পেঁছেছে। পরিবর্তনের এই দ্রুতগতি দেখে অনেক সময় বিস্ময়বোধ করেছি। দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ী 'রান্‌মান্‌' ও 'টানা'গ্রাম পিছনে রেখে শিবের মন্দির আর ছোট ছোট বস্তি-বেসাতি ছাড়িয়ে চললো অনেকদূর।

হিমালয়ের গহনলোকে এটি একটি বিস্তৃত অধিত্যকা এবং সমস্ত পাহাড়ের দ্বারা অবরুদ্ধ। হিমালয়ের বন্যা এখানে অতি বিস্তারলাভ করে, এবং সেটি ভয়ের কথা। এখান থেকে গাছকাটা গুঁড়ি, পাথর এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সম্পদ্‌ বাইরে চালান যায়। লগ্‌গুলিকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। জ্বালানি কাঠ এবং পশুর খাদ্যও নিয়ে যায় এখান থেকে।

'সোমেশ্বরে' এসে পেঁছলুম। এটি ক্ষুদ্র শহর এবং চারিদিকের এই অধিত্যকার মাঝখানে কোশীর প্রান্তে এটি অনেকটা নাভিকেন্দ্রের মতো। সোমেশ্বর হোলো স্থানীয় তীর্থ। নিকটেই সোমেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। চারিদিকেই পাহাড়, শহরটি শান্ত। মন্দিরের পিছনে ক্ষেতখামার। কথায় কথায় আমরা মন্দির দেখতে পাচ্ছি, কথায় কথায় পাহাড়তলীর আশে পাশে শিবস্থাপনা। সোমেশ্বর শহরের ভিতর দিয়ে আন্দাজ চার মাইল দূরে হোলো 'ছেন্দাগ্রাম।' পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শুভ্রায়তন শিবমন্দির। মাঝপথে পাওয়া গেল একটি 'গান্ধী আশ্রম।' তারপরে ছাড়িয়ে চললুম কোশীর একটি পুল। আমরা কোশী ধরেই যাচ্ছি। নদী না পেলে জনপদ সহসা দাঁড়ায় না। জল হোলো জীবনের পরিচয়। একবার উঠছি, আবার নামছি। বাঁকে-বাঁকে নদী, পাশে পাশে খদ, চলতে চলতেই চড়াই আর উৎরাই। আমরা

'কৌসানী' পাহাড়ের চূড়ার নীচে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এ অঞ্চল বনময় নির্জন। বনের ভিতর দিয়ে দুই পাহাড়ের ফাঁকে হঠাৎ এক এক সময় দূর আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে তুষারচূড়া,—ত্রিকোণাকার 'ত্রিশূলের' শোভা ঝলমলিয়ে উঠছে। ছবির মতো মনে হচ্ছে, একথা বললে ঠিক বোঝানো যায় না। নিজেদের চক্ষুকেও অবিশ্বাস করছি, কেননা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে এমন সুষমামণ্ডিত, এরূপ ক্বচিৎ দেখা যায়। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাইনবনের কোলে কোলে নেমে গিয়েছে সুদূর গভীর অধিত্যকা অন্তত পঁচিশ মাইল দূরে। এই পঁচিশ মাইল অধিত্যকা-প্রান্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি—যেন এই 'বাতায়ন' থেকে। সেই শস্যপ্রান্তরশীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবলতুষারমৌলী ত্রিশূলশৃঙ্গের বিরাট সর্বকালজয়ী গৌরব। আনন্দে আমাদের কণ্ঠ শুকিয়ে উঠছে বার বার।

উৎরাই পথ ধ'রে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একসময়ে আমরা এসে পৌঁছলুম 'গরুড়' শহরে। এইটি হোলো এ অঞ্চলের শেষ শহর—এর পরে কোনও চাকার গাড়ী হিমালয়ের মধ্যে আর প্রবেশ করে না। পাহাড়ের অবরোধের মাঝখানে এই বিশাল 'কাত্তুরী' অধিত্যকা, কিন্তু সমুদ্রসমতা থেকে এটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু—সুতরাং একে মালভূমি বলতে অসুবিধা নেই। 'গরুড়ের' বাজারটি বড়। এখান থেকে পশম, কাঠ ইত্যাদি চালান যায়। কাছেই 'গরুড় নদী'। আমরা পায়ে হাঁটা পথ ধ'রে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলুম। 'কাত্তুরী' রাজাদের আমল থেকে এই অধিত্যকাকে 'কাত্তুরী' বলা হয়।

তিনটি নদী হিমালয় থেকে নেমে এখানে এসে মিলেছে। 'গরুড়' ছাড়া আর দুটি হোলো 'কোশী' এবং 'গোমতী'। আমরা যাচ্ছিলুম 'বৈজনাথ' মন্দির দর্শনে। প্রায় মাইলখানেক পথ। 'কোশী' পুলের পর এখানে আমরা গরুড় এবং গোমতীর সাঁকো পার হলুম। মানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্নার সংসার ফেলে এসেছি অনেক পিছনে, এসে পড়েছি বিরাটের কোলের মধ্যে—যেখানে দাঁড়িয়ে কোনও একটা মহৎ জীবনকে ডাক দেওয়া যায়। উদার অনন্ত গিরিমালা, বিশাল এক একটি অতিকায় পাথর, উপলাহত নীলাভ স্রোতস্বতী, অনন্ত নৈঃশব্দের মধ্যে রঙগীন পাখীদলের কুজনগুঞ্জন,—এদেরই মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি। মুখ বুজে চারিদিকে যেন স্তবপাঠ চলছে। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে গোমতীর লৌহসেতু অতিক্রম ক'রে বৈজনাথের মন্দির এলাকায় এসে দাঁড়ালুম। চেয়ে দেখছি হিমালয় থেকে গোমতী প্রথম নেমেছে মর্ত্যে বিশাল গর্জের বাঁধন ভেদ ক'রে। এই সংযোগস্থলে বৈজনাথের গৈরিকবর্ণ প্রাচীন মন্দির দাঁড়িয়ে। এখানে নদীর দুই পারে মন্দির। বৈজনাথের 'তল্লীহাটে' লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও 'রাক্ষস দেউল'। এখানে মোট সতেরোটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। সমস্তই প্রাচীন পাথরের, তোড়জোড় একেবারে আল্‌গা —বড় একটা ভূমিকম্প, গোমতীর একটা বড় বন্যা,—তারপরে হয়ত আর কিছু থাকবে না। কিন্তু এইভাবেই নাকি চ'লে এসেছে প্রায় সাত আটশো বছর।

এ মন্দির প্রথম নির্মিত হয় চন্দ্রবংশের কোনও এক রাজার আমলে। তা'র কোনও ইতিহাস আছে কিনা জানিনে। যেমন কাংড়ায় দেখে এসেছি 'বৈজনাথকে',—এখানেও ঠিক তেমনি। বৈজনাথকে 'বৈদ্যনাথও' বলা হয়। এ ছাড়া রয়েছে 'বামনী' ও 'কেদারনাথের' দেউল। ভিতরে একটি শ্বেতবর্ণা 'পার্বতী'র মূর্তি, কেউ বা বলেন অন্নপূর্ণা,—মূর্তিটি জয়পুরী ছাঁচে নির্মিত—কিন্তু এমন সুশ্রী সুন্দর ও পেলব শ্বেতপাথরের মূর্তি হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। বৈজনাথ এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। নিকটবর্তী পাহাড়ে এক মাইল থেকে দেড় মাইলের মধ্যে 'রানচুলকোট' দুর্গ, 'ভ্রামরীদেবী' ও 'নাগনাথের' মন্দির। বৈজনাথ থেকে বাগেশ্বর হোলো তেরো মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে—সেই পথ গিয়েছে গাড়োয়ালে। চব্বিশ বছর আগে রুদ্রপ্রয়াগের আশ্রমে ব'সে সন্ন্যাসিনী নারায়ণগিরিমায়ি আমাকে 'বাগেশ্বর' হয়ে কৈলাসের পথ নির্দেশ করেছিলেন। এই পথ হোলো সেই। এখান থেকে সোজা উত্তরে দুস্তর গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে কর্ণপ্রয়াগের দিকে—যেখানে 'পিন্দার' গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম। 'বাগেশ্বর' জনপদটি হোলো এই গোমতী এবং সরযূর সঙ্গমস্থলে অতি রমণীয় অঞ্চল। সেই সঙ্গমের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাগনাথ, ভৈরবনাথ, গঙ্গামাতা এবং দত্তাত্রেয় মন্দির। সরযূর উপরে অত্যাশ্চর্য প্রকৃতির শোভার মধ্যে রয়েছে লছমনঝুলার মতো কাছিবাঁধা সাঁকো,—তারই নীচে সরযূর গর্ভে রয়েছে অতিকায় 'মার্কণ্ডেয় শীলা'—যেখানে তপস্যার আসনে ব'সে ঋষি মার্কণ্ডেয় রচনা করেছিলেন 'দুর্গাসপ্তসতী' পুরাণ। লোকপ্রবাদ এই, সরযূনদীর এই সঙ্গমস্থলে 'দক্ষ হিমবান' তাঁর কন্যা দুর্গার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ দিয়েছিলেন। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে বাগেশ্বরে ভুটিয়াদের বিরাট মেলা বসে। তিব্বত থেকে বিপুলপরিমাণ পণ্য-সম্ভার এখানে এসে পৌঁছয়।

বাগেশ্বরের পরেই ওঠে 'পাতাল-ভুবনেশ্বর' এবং 'যজ্ঞেশ্বরের' কথা। 'যজ্ঞেশ্বর' আলমোড়া থেকে আঠারো মাইল দূরে, এবং এটিও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে আছেন অনেক তপস্বী। মৃত্যুঞ্জয়, নবগ্রহ, মার্তণ্ড ইত্যাদির মন্দির এখানকার প্রধান আকর্ষণ, এবং শিবরাত্রি ও বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে। একদা মুসলমানরা এই জনপদটিকে আক্রমণ করে, তা'তে অনেক মূর্তি ধ্বংস হয়। 'পাতাল-ভুবনেশ্বর' এখান থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল পার্বত্য পথ। কয়েকটি প্রাচীন মন্দির ভিন্ন সেখানে আছে একটি মস্ত গুহা, তা'র মধ্যে নানা দেবমূর্তি খোদিত। অন্ধকার গুহার ভিতরকার কঠিন ঠাণ্ডায় অদ্ভুত রকমের প্রাচীন পাথর ও ধাতবের গন্ধ। তারই মধ্যে দেওয়ালে-দেওয়ালে মহাভারতের কয়েকটি কাহিনীও উৎকীর্ণ।

বৈজনাথ থেকে কর্ণপ্রয়াগের দিকে যাবার যে পথটির কথা বলছিলুম, সেটি ক্রমশ দুস্তর গিরিমালার ভিতর দিয়ে উঠেছে। মাইল দশেকের পর 'গোয়াল্‌দম'

নামক একটি পার্বত্য জনপদ পাওয়া যায়। 'গোয়ালদমের' উত্তরপ্রান্তে সম্ভবত মূল পিন্দার গঙ্গার ধারা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিয়ে পুনরায় উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই পথটি ধীরে ধীরে চ'লে গেছে নদী পার হয়ে। পূর্বদিক থেকে পিন্দার গঙ্গারই অপর একটি প্রশস্ত উপনদী এসেও এখানে মিলেছে। উত্তুঙ্গ এবং প্রায় দুঃসাধ্য শৈলশ্রেণীর ভিতর দিয়ে এই দুর্গম পথ চলে গেছে চড়াইয়ের পর চড়াই উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিশূল পর্বতের তুষার হিমবাহের কোলে। এই অঞ্চল বৈজনাথ থেকে প্রায় প'য়তাল্লিশ মাইল উত্তরে। ত্রিশূলের দক্ষিণে হোলো পিন্দার গঙ্গা ও হিমবাহ এবং উত্তরে ঋষিগঙ্গা,—যে-গঙ্গা গিয়ে মিলেছে যোশীমঠের নীচে ধবলীগঙ্গা ও বিষ্ণুগঙ্গায়। ভারতের সীমানার অন্তর্গত হিমালয়ের যে কয়টি উচ্চতম চূড়াকে আমরা জানি, তাদের মধ্যে তিনটিকে পাই এখানে কাছাকাছি। প্রথমটি ত্রিশূল,—উচ্চতা ২৩,৫০০ ফুট; দ্বিতীয়টি নন্দাদেবী,—২৫,৬৪৫ ফুট; এবং তৃতীয়টি হোলো দ্রোণগিরি,—২৩,১৮৪ ফুট। কাশ্মীরের নাঙ্গা ও কারাকোরামকে (কৃষ্ণগিরি) বাদ দিলে বর্তমান ভারতীয় হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর হোলো, নন্দাদেবীর চূড়া।

সম্প্রতি ত্রিশূল পর্বতের হিমবাহের প্রান্তবর্তী 'রূপকুণ্ড' নামক একটি তুষার সরোবরকে নিয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট নাড়াচাড়া করছেন। 'রূপগঙ্গার' তীরবর্তী এই তুষারাচ্ছন্ন রূপকুণ্ডের আশেপাশে বহুসংখ্যক নর-কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ (Skeletal remains) সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কঙ্কালগুলি বছরের মধ্যে দশমাসেরও বেশী বরফের নীচে সমাধিস্থ থাকে; কেবল ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তুষারবিগলনকালে তা'রা দৃশ্যমান হয়। এরা কতকাল আগেকার মানুষ কেউ জানে না, কবে এদের মৃত্যু ঘটেছে তা'ও অজ্ঞাত। অনেকের ধারণা, এরা পরাজিত সৈন্যসামন্তের দল,—পলায়মান অবস্থায় এদের উপরে অতিকায় হিমবাহের আক্রমণ ঘটে। আবার অনেকে বলে, এরা ছিল তীর্থযাত্রী। ত্রিশূল পর্বতের পাদদেশে 'হোমকুনি' তথা 'ত্রিশূলী' নামক অঞ্চলে গিয়ে এই তীর্থযাত্রীর দল নন্দাদেবী তথা গৌরী-দেবীর পূজা দিতে চলেছিল, এমন সময় তা'রা তুষারঝঞ্ঝা ও বর্ষণের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বৈজনাথ থেকে ত্রিশূল পর্বতের দিকে আজও প্রতি বৎসর একদল তীর্থযাত্রী নন্দাদেবীর মূর্তিসহ শোভাযাত্রা নিয়ে যায় 'ত্রিশূলী'তীর্থে। এদের নাম 'নন্দাজাত।' রূপকুণ্ড হ্রদের নিকটবর্তী রূপগঙ্গার তুষারবিগলিত ধারায় অবগাহন করা এদের অপর লক্ষ্য। এরা কখনও সেখানে পৌঁছয়,—পৌঁছয় অতি কম, কেননা তুষারবর্ষণের সংকেত পেলেই অভিযানে বিরত হয়। বিগত ত্রিশ বছর আগে একটি যাত্রীদল সাফল্যলাভ করেছিল। তারপর আবার একটা প্রচেষ্টা হয় ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে—কিন্তু তা'রা সমর্থ হয়নি। এই 'ত্রিশূলী' তীর্থের অন্তর্গত 'রূপকুণ্ডের' ধারে শুধু যে ওই কঙ্কালগুলি প'ড়ে আছে তাই নয়, ওদের নিয়ে নানাবিধ প্রবাদ, জনশ্রুতি এবং লোকসংগীতও নীচেকার অঞ্চলে প্রচলিত। ওরা

যে তীর্থযাত্রী ছিল এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের মনে কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেণ্টের নৃতত্ত্ববিভাগের পরিচালক ডাঃ এন দত্তমজুমদার মহাশয় সদলবলে দ্বিতীয়বার 'রূপকুণ্ড' এলাকায় গিয়ে কতকগুলি চর্মাবৃত কঙ্কাল সংগ্রহ ক'রে কলিকাতায় এনেছেন। এগুলি নাকি দুশো বছরের পুরণো, এবং তুষার আবরণের জন্য আজও নষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু তিনি সর্বপ্রকার সংবাদ গবেষণা করে এইটি সিদ্ধান্ত করেন যে রূপকুণ্ডের নরকঙ্কালগুলি 'ত্রিশূলী' তীর্থেরই অভিযাত্রী ছিল। দুই শতাব্দী পূর্বে এই তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে ছিল সালঙ্কারা বহু নারী ও শিশু, কয়েকজন মেষপালক ও কয়েকটি জন্তু। তাদের সঙ্গে তীর্থযাত্রীর পক্ষে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি ও লাঠি ইত্যাদিও ছিল। এ সম্বন্ধে সম্প্রতি তিনি অন্যান্য তথ্যাদিও প্রকাশ করেছেন। এই তদন্ত এবং গবেষণার ব্যাপারে ভারতীয় নৃতত্ত্ববিভাগের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই অন্যান্য ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করবেন শোনা যাচ্ছে। কৈলাস পর্বতের মধ্যে যেমন তুষারাবৃত সরোবর 'গৌরীকুণ্ড' দেখা যায়, এখানেও ঠিক তেমনি। রূপকুণ্ডও এক প্রকার জ'মে থাকে বছরের অধিকাংশ কাল। তবে গৌরীকুণ্ডের উচ্চতা ১৮,৫০০ ফুট, রূপকুণ্ড ওর চেয়ে প্রায় দেড় হাজার ফুট কম। বৈজনাথ থেকে 'গোয়ালদম' হয়ে 'রূপকুণ্ড' পৌঁছতে পায়ে হাঁটা পথে তিন-চার দিন লাগে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল উঁচু পথ। সম্প্রতি একটি সংবাদে শুনছি, এলাহাবাদের একটি অভিযাত্রীদল রূপকুণ্ডের কঙ্কালাকীর্ণ স্থলে পৌঁছে 'ব্রহ্মকমল' প্রমুখ শতাধিক বর্ণের দুষ্প্রাপ্য ফুল ওখান থেকে সংগ্রহ করেছেন।

'কৌসানীর' নীচে এসে আমরা দাঁড়ালুম। পথ চ'লে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। চারিদিকে নিঃঝুম পার্বত্য প্রকৃতি। সামনেই একটি ছোট পোষ্ট আপিস, তা'র পাশে ছোট ছোট চালাঘরে দুটি দোকান। একটিতে চা পাওয়া যায়। তাদেরই পিছন দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে উপর দিকে। দোকানের সামনেই একটি চশমাপরা শীর্ণকায় পথ-প্রদর্শককে পাওয়া গেল।

শশাঙ্ক এবং আমি চললুম চড়াইপথ ধ'রে। চড়াই সামান্য, হয়ত মোট শ' তিনেক ফুট উঁচু হবে। চিড়গাছের জটলার ভিতর দিয়ে দীর্ঘপথ চূড়ার দিকে উঠেছে। উপর দিকে উঠে গিয়ে আমরা যে বিপুল ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবো, নীচের দিকে দাঁড়িয়ে আমরা ঠিক অতটা আন্দাজ করতে পারিনি। নীচের দিকে যে সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যে ছমছমে ভাবটি ছিল, উপর দিকে উঠে ধীরে ধীরে আকাশ যেন তা'র সমস্ত অর্গল খুলে সামনে দাঁড়ালো। সেই আকাশপথ কুমায়ুনের গিরিশৃঙ্গচূড়ায় গিয়ে না দাঁড়ালে ঠিক বুঝতে পারা যাবে না। অবশেষে আমরা একটি মালভূমিতে এসে পৌঁছলুম, এবং সেই সমগ্র মালভূমিটি হোলো একটি বৃহৎ সুসজ্জিত এবং আধুনিক ডাকবাংলারই প্রাঙ্গণ। মানুষের

সমাগম কোথাও দেখছিনে। নীচে থেকে উপরে ওঠবার আগে ছিন্নজীর্ণ পোষাক-পরা যে কৃশকায় লোকটি আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল, তার চোখে মোটা চশমা,—এবং এত মোটা যে, চোখ দুটো খুব ছোট দেখায়। চেহারা উপবাসে আর অভাবে শীর্ণ এবং অকালবার্ধক্যে একটু আনত। কথা বলে কম, এবং অনেকটা যেন আত্মগত। লোকটি পথ দেখিয়ে যখন আমাদের ডাকবাংলার সিঁড়ির উপরে তুললো, তখন জানলুম সে এখানকার খানসামা তথা চৌকিদার। লোকটি যেমনই শান্ত, তেমনই নিরীহ।

কিন্তু অনেক বড় বিস্ময় আমাদের জন্য সঞ্চিত ছিল, যখন আমরা উত্তর দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। বস্তুত, সমুদ্রে সাঁতার দিলে সমুদ্রের শোভা উপলব্ধি করা যায় না। হিমবাহ দেখেছি, তুষারনদী অতিক্রম করেছি, তুষারলোকের মধ্যে রাত্রিবাসও করতে হয়েছে বা'র বা'র,—কিন্তু তখন তা'র শোভা-সৌন্দর্য উপলব্ধি করা অপেক্ষা আত্মরক্ষা করার দিকেই ঝোঁক থাকে অনেক বেশী। কতকটা দূরে দাঁড়িয়ে পরম রমণীয় চিত্রপট না দেখলে প্রকৃত রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না। গগনচুম্বী ত্রিশূলশৃঙ্গ যে আমাদের আলিঙ্গনের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে, নীচে থাকতে আমরা বুঝতে পারিনি। কিয়ৎক্ষণের জন্য দুজনেই আমরা হতচেতন ও বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমরা যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। খানসামা আমাদের মানসিক অবস্থা অনুধাবন ক'রে তখনকার মতো চ'লে গেল।

আনন্দে আর উল্লাসে শশাঙ্কর দুটো চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

ডাকবাংলার ভিতরে ঢুকে দেখি কলকাতার শ্রেষ্ঠ 'বোর্ডিং হাউসকেও' হার মানায়। বড় বড় আলমারি, বড় বড় ড্রেসিং টেবল্, অনেকগুলি খাট পালঙ্ক, অসংখ্য ফায়ার প্লেস, মস্ত বড় ডিনার টেবল্, ভালো ভালো কুশন্ চেয়ার, মাথার উপর টানা পাখা, সুসজ্জিত বাথরুম, বহুমূল্য কার্পেট দিয়ে প্রত্যেক হল্-এর মেঝে মোড়া। যেখানে যেটি দরকার। জানলা দরজা আসবাব—প্রত্যেকটি যেন ঝলমল করছে। আমরা দুজনে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। এটি গোলাকার পাকা বারান্দা এবং আমাদের বিশ্বাস, এই একটি বারান্দায় ব'সে বাকি জীবন অতি আনন্দে কাটানো চলে। কখনও দুঃখ পেয়েছি, কেউ ব্যথা দিয়েছে, কারও কথার আঘাতে কখনও বুকের মধ্যে ঘা লেগেছে, কারও নিষ্ঠুর বঞ্চনায় জীবনকে কখনও শূন্য মনে হয়েছে,—এই বারান্দা থেকে উদার হিমালয়ের দিকে চেয়ে একটি পলকের মধ্যে মানুষের বিরুদ্ধে সমস্ত নালিশ যেন মুছে নিয়ে গেল। নীচের পৃথিবী নীচেই প'ড়ে থাক্, এই স্বর্গলোক থেকে বিদায় নেবার আর ইচ্ছা রইলো না।

খানসামা এসে চা দিয়ে আহারাদির ব্যবস্থা পাকা ক'রে গেল।

চূড়ার উপরে বারান্দায় ব'সে আমাদের সময় কেটে চললো। ঠিক এই বারান্দায় এবং এই ইজিচেয়ারে ব'সে পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব এগারো দিন অতিবাহিত করেছিলেন ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে,—তিনি মহাত্মা গান্ধী।

এই বারান্দাটিতে ব'সে-ব'সে অতি যত্নে তিনি তাঁর 'অনাসক্তি যোগ' গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। বোধ হয় অনাসক্ত ভাবনার এমন একটি নিভৃত ক্ষেত্র হিমালয়ে আর কোথাও নেই, অন্তত এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ঈশ্বরকে যারা খুঁজে-খুঁজে হায়রাণ হয়, এখানকার সন্ধান বোধ হয় তা'রা আজও পায়নি। যদি তাঁকে ডাকতেই হয়, তবে এখান থেকে ডাকামাত্রই তাঁর কানে উঠবে! সামনেই ঠিক বারো মাইল শূন্যপথে গেলে ত্রিশূলের শুভ্র চূড়া। পশ্চিম দিকে কেদার ও বদরিনাথ, গৌরী আর হস্তী, পূর্বে নন্দাদেবী, দ্রোণগিরি আর নন্দকোট। দেবতারা দল বেঁধে এক একটি সিংহাসনে ব'সে রয়েছেন। সমগ্র হিমালয় ভ্রমণকালে এত স্বাচ্ছন্দ্য, এমন নিবিড় আনন্দ ও সীমাহীন অখন্ড স্তব্ধতা আর কোনওদিন কোথাও পাইনি।

খানসামা এসে সামনে দাঁড়ালো। মালভূমির প্রান্তেই ওর বাসস্থান। ওর কে আছে আর কে নেই—প্রশ্ন করিনি। লোকটাকে এবার দেখলুম চোখ তুলে। বয়স কত ঠাহর করা যায় না। প'য়তাল্লিশ থেকে প'য়ষট্টি কিছু একটা হবে। গায়ের কোট আর পাজামা ছিন্নভিন্ন। চেহারায় কোনও চাঞ্চল্য নেই, কিছুমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই। মোটা চশমার ভিতর থেকে ছোট ছোট ধারালো চোখ দেখলে সমীহ হয়। অথচ চাহনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, কপালে গভীর চিন্তার রেখা, এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। গান্ধীজির সম্বন্ধে প্রশ্ন করলুম, মুখে চোখে একটি চাপা গৌরব ফুটলো, কিন্তু তা'র সংযম দেখে আমরা অবাক। গান্ধীজি এসেছিলেন, ওর বাবা তখন বেঁচে। কিন্তু ও থাকতো গান্ধীজির তদারকে। বারান্দায় গান্ধীজির আসন পেতে দিত, বিছানা করতো, দুধ আনতো নীচের থেকে, স্নানের জলের ব্যবস্থা করতো, বই-কাগজ গুছিয়ে রাখতো, এবং রাত্রে পাহারায় থাকতো। ওর বয়স তখন কুড়িবাইশ। ওর কাঁধে হাত রেখে গান্ধীজি বেড়িয়েছেন অনেকবার। লোকটা ধীরে ধীরে কথা বলছে, কিংবা কাঁদছে বলা কঠিন। ওর ওই আনম্র চেহারার মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে একটি দার্শনিক আত্মগোপন ক'রে, আমরা মন দিয়ে তাকে স্পর্শ করতে পারছি। লোকটা চেয়ে ছিল 'ত্রিশূলের' দিকে। কৈলাসের হরপার্বতীর কথা তুলতেই সে ঈষৎ উৎসাহ পেলো। তীর্থযাত্রীদের প্রতি তা'র কী গভীর দরদ! দেখিয়ে দিল কেদারনাথ আর বদরিনাথ আর নন্দাদেবী। তারপর মৃদুকণ্ঠে নিজের ভাষায় বলতে লাগলো, মানুষ নিজের দুঃখ আর অভাব নিজেই সৃষ্টি করে, বেদনা পায়, বিবাদ বাধায়, আবার অনুশোচনায় নিজেই কাঁদতে বসে। মানুষের জন্য মানুষ আত্মোৎসর্গ করছে, আবার মানুষই মানুষের দুর্গতি টেনে আনছে। গান্ধীজির পায়ের কাছে নৈবেদ্য দিয়ে মানুষ তাঁকে বললে, তুমি মহাত্মা, তুমিই দেশের পিতা! সেই মানুষই আবার মহাত্মাজীকে হত্যা ক'রে সবাই মিলে কাঁদতে বসলো!

চুপ ক'রে লোকটার শান্ত আলাপ শুনছিলুম। ভাবছিলুম লোকটার বয়স

হাজার-হাজার বছরেরও বেশী। সভ্যতার ছেলেখেলা যতদিন ধ'রে চলেছে, লোকটা যেন তা'র চেয়েও বৃদ্ধ। যখন চ'লে গেল, আমরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

কৌসানীর চূড়া এবং স্বামী আনন্দের কথা শুনেছিলুম শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আলমোড়ায়। স্বামীজি থাকেন এখানে স্থায়ীভাবে তাঁর 'গঙ্গাকুটীরে।' খানিকটা অরণ্যপথ অতিক্রম ক'রে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। তাঁর দেখা পেলুম অতি সহজে। বয়স বোধ করি সত্তর হয়নি। ধবধবে চেহারা। তিনি বোম্বাইয়ের অধিবাসী, এবং প্রকৃত নাম হোলো 'অমৃতলাল শেঠ।' বাণিজ্য জগতে তাঁর প্রচুর খ্যাতি। স্বামী আনন্দ গান্ধীজির একজন বিশেষ গুণমুগ্ধ অনুরাগী, এবং গান্ধীজির অপমৃত্যু-কাল অবধি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে গান্ধীজির সঙ্গে তিনি ছিলেন। কিন্তু স্বামীজি রক্তের চাপের রোগী এবং গান্ধীজির পরামর্শেই তিনি এখানে রোগ-মুক্ত হবার জন্য আসেন। গান্ধীজির মৃত্যুসংবাদে তাঁর শরীরের অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তিনি শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। অতঃপর তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং গান্ধীদর্শনের সুযোগ্য ভাষ্যকার মাশরুওয়ালার মৃত্যুসংবাদ যেদিন তাঁর কানে এলো, সেইদিন থেকে স্বামী আনন্দ এই কৌসানীতে তাঁর চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছেন। হিমালয়ের এই পরমাশ্চর্য শোভা ছেড়ে তিনি আর কোথাও যেতে চান না। তিনি তাঁর বৈষয়িক জীবন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। অধ্যাত্ম আদর্শের দিক থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করেন। এখানে তিনি দুধ ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য স্পর্শ করেন না। তাঁর বাকি জীবনের একমাত্র কামনা হোলো, শান্তি সাধনা। পড়াশুনোয় তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন।

অনেক গল্প তিনি করলেন আমাদের সঙ্গে তাঁর বারান্দায় ওই ত্রিশূলের চূড়ার সামনে ব'সে। বোম্বাই থেকে তাঁর কয়েকজন আত্মীয় মহিলা ও যুবক তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, সেজন্য কিছু সোরগোল সেদিন ছিল। আমাদের জন্য চা-বিস্কুট ইত্যাদি এলো। বললেন, এসব কিন্তু এ তল্লাটে পাওয়া যায় না, ওরা এসব সঙ্গে এনেছে—ওই ছেলেমেয়েরা। আমার এখানে কিচ্ছু নেই। কিছু সঙ্গে আনিনি, কিছু সঙ্গেও রাখবো না যাবার আগে।

স্বামীজি আসবার আগে আমাদের হাতে হিমালয়ের কয়েকখানি ছবি উপহার দিলেন। এমন সুশিক্ষিত, ভদ্র, আদর্শবাদী এবং অমায়িক সজ্জন সহসা কোথাও চোখে পড়ে না। মনে মনে বহুবার প্রণাম জানিয়েছিলুম।

আসবার সময় তিনি বললেন, ত্রিশূলের ওপরে মেঘ করেছে, সেজন্য মন খারাপ ক'রো না,—ও মেঘ থাকবে না, ভোর রাত্রের আগেই স'রে যাবে।

সেদিন ছিল রাসপূর্ণিমা। দেওদারের অরণ্যের উপরে দাউ দাউ ক'রে

জ্বলছে নীল আকাশে বড় বড় তারা। কয়েক টুকরো মেঘ অলকাপুরীর দিকে ভেসে ভেসে চলেছে। চন্দ্র জ্বলছে। জ্যোৎস্নায় ফিন্ ফুটছে তুষারলোকে। সেই আনন্দলোকে পথ চিনে চিনে আমরা ডাকবাংলায় ফিরে এলুম। সেই রাত্রি ছিল অতি শীতল। আমাদের বিবাগী মনের ভাবনা জ্যোৎস্নায় দিশাহারা হয়ে হিমালয়ের চূড়ায়-চূড়ায় কেঁদে বেড়াতে লাগলো। ঘুম এলো না পোড়া চোখে। মেঘ বোধ হয় আর কাটলো না এবার। আমাদের নিরাশ চক্ষে অবসাদ এলো।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলুম বিছানার মধ্যে। রাত যখন প্রায় দুটো বাজে, হঠাৎ শশাঙ্ক বারান্দা থেকে চীৎকার ক'রে ডাকলো। ধড়মড়িয়ে উঠে ছুটে এলুম বারান্দায়। কেন, কি হয়েছে? কোনও বিপদ?

সহসা দুজনে চুপ। মেঘের আবরণ স'রে গেছে! দেবাদিদেব ত্রিশূলী চোখ মেলেছেন মহাশূন্যের বিপুল জ্যোৎস্নালোকে। পলকের মধ্যে দেখে নিলুম, যা কখনও দেখিনি কোনওদিন!

উভয়ে আমরা স্তব্ধ, হতবাক। আনন্দের নিবিড় যন্ত্রণায় শুধু থরথর ক'রে কাঁপছিলুম। স্বামী আনন্দের শুভ কামনায় যাত্রা আমাদের সার্থক হয়েছে।

পরদিন বিদায় নেবার আগে খানসামা এসে দাঁড়ালো। আমরা তা'র হাতে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে পাওনা ইত্যাদি চুকিয়ে দিলুম। পাওনা পেলেই তা'র চলবে। বকশিস চায় না, দাবি জানায় না। কিন্তু যখন নিতান্তই তা'র সুখ্যাতিতে আমরা একটু উচ্ছ্বসিত হলুম, তখন সে একটি খাতা বা'র ক'রে বললে, এখানে আপনাদের কেমন লাগলো, একটু লিখে রেখে যান্।

সেটি হোলো ডাকবাংলার 'লগবুক'। লিখতে লিখতে একবার প্রশ্ন করলুম, তোমার নাম কি, ভাই?

লোকটি সবিনয়ে বললে, হবিব আহমেদ।

তা'র প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা বিদায় নিলুম।

॥ ৯ ॥

শূন্যলোকে বিমানযোগে চলেছি কোচবিহারের দিকে।

আকাশপথে প্লেন্ থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম দিগ্বলয়প্রসারিত হিমালয়ের অন্তহীন শুভ্র কেশরজাল। সংখ্যাতীত শ্বেতচূড়ার উপরে পড়েছে তরুণ সূর্যরশ্মি, গলিত গৈরিক স্বর্ণপ্রবাহ নামছে দেবাদিদেবের কপাল বেয়ে। ডিসেম্বর-শেষের একটি প্রভাত। তখনও ঘুম জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গে। পৃথিবী আমাদের অনেক নীচে, রাত্রির শেষ প্রহর তখনও তার বিশাল ছায়া মেলে রয়েছে। মহাব্যোমের অনন্ত শূন্য থেকে শুধু চেয়েছিলুম শুভ্র-নীল-রক্তিম হিমালয়ের পরম বিস্ময়ের দিকে। ভেসে যাচ্ছিলুম আকাশপথে। নীচে অনন্ত নিদ্রা, পৃথিবীর পাখী তখনও ঢুলছে!

কোচবিহার বিমানঘাঁটি থেকে তুষারমৌলী 'সিংহচুলাকে' দেখা যায়। বেলা বেড়েছে। রৌদ্রে ঝলমল করছে তুষারের স্থির তরঙ্গ। কেউ ওটাকে বলে, 'চেন্‌চুলা', কেউ বা বলে, 'সিন্‌চুলা'। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ওই সিন্‌চুলার নীচে দাঁড়িয়ে তদানীন্তন বৃটিশ ভারত গভর্নমেণ্ট ভূটানের সঙ্গে সন্ধি করেছিল। ইংরেজ কেবল যে রাজত্ব জয় করেছিল তাই নয়, রাজ্যের আশেপাশে বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বতকেও তা'রা বিশ্বাস করেনি। কে জানে কোথা দিয়ে কখন্ বাঘের থাবা বেরিয়ে আসে। সেই কারণে নিস্পৃহ প্রতিবেশীর শক্তির পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য তা'রা তা'র গায়ে খোঁচা দিয়ে দেখতো, তা'র দৌড় কতদূর। নেপাল, তিব্বত, সিকিম, ভূটান, গাড়োয়াল, আফগানিস্তান,—সর্বত্র ওই একই কথা। সুবিধা ঘটলে রাজ্য কেড়ে নিত, আর নয়ত একপ্রকার অপমানজনক সন্ধিচুক্তি চাপিয়ে দিত তাদের ঘাড়ে।

ভূটানের দিকে যাচ্ছিলুম।—

সেই সিন্‌চুলা চুক্তি, তারপর থেকে ভূটানের খবর আর তেমন পাওয়া যায়নি। পূর্বোত্তর ভারতের সীমানায় আঠারো হাজার বর্গমাইল ব্যাপী এই পার্বত্য ভূভাগ আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে অন্ধকারাচ্ছন্ন রয়েছে—এটি কৌতুকের বিষয় বৈকি। চাকার গাড়ী আজও ভূটানের কোনও অঞ্চলে ঘুরছে না, এটিও বিস্ময়। ভারতের সঙ্গে এতকালের মধ্যে তা'র কোনও প্রকার যোগাযোগও নেই, এর জন্য উদ্বেগও কিছু দেখা যায় না। শোনা যায় মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র আজও সেখানে অব্যাহত। রাজা সেখানে সর্বাধিনায়ক। মন্ত্রী নেই, বিচারালয় নেই, রাজনীতিক দল নেই, শাসক সম্প্রদায় নামক কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নেই। শুধু আছেন







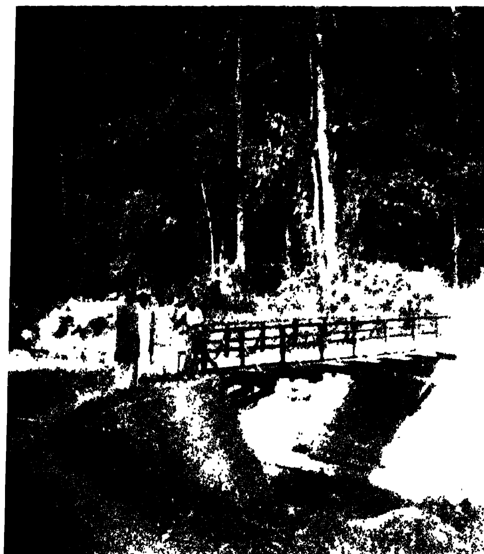






















রাজা, আছেন জনকয়েক রাজারই প্রতিনিধি,—আর আছে প্রজাসাধারণ। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে ভূটানরাজ মহামান্য 'জিগমো ওয়ানচুক দোরজী' ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন জানিয়েছেন কয়েকটি বিষয়ে সাহায্যের জন্য। তাদের মধ্যে প্রধান হোলো শিক্ষা, যোগাযোগপথ এবং ঔষধপত্রাদি। রাজা মহাশয় ভূটানে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করতে চান্। এতকাল অবধি ভূটানের সঙ্গে তিব্বতের আত্মীয়তা চ'লে এসেছে অব্যাহত ভাবে। উভয়ে একধর্মী। উভয়েই সমগোত্রীয়,—যেমন সিকিম। উভয়ের প্রাণের ভাষার সঙ্গে উভয়ে পরিচিত। ফলে, তিব্বত এবং ভূটানের মধ্যে এতকাল ধ'রে যে একটি অন্তরঙ্গ রাজনীতিক, অর্থনৈতিক, এবং লোক-ব্যবহারিক সম্পর্ক চ'লে এসেছে, সেটি দুই রাষ্ট্রের প্রধান কর্ণধার দুইজনের মধ্যেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ, তার একজন হলেন দলাই লামা এবং অন্যজন হলেন ভূটানরাজ। ভাষায়, জীবনযাত্রায়, সমাজচিন্তায় ভারতের সঙ্গে ভূটান-তিব্বত-সিকিমের মিল হয়নি মধ্যযুগে, এর ওপর দুস্তর পার্বত্য ভূভাগ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। সেইজন্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রনীতিক ভারতের নিকট ওরা আজও একপ্রকার অপরিচিত রয়ে গেছে। সিকিমের মতো তিব্বতের সঙ্গে ভূটানের সম্পর্ক হোলো বৈবাহিক। আচার ব্যবহার, ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-প্রকৃতি,—এদের একটু আধটু ব্যতিক্রম ছাড়া,—তিব্বত, ভূটান এবং সিকিম প্রায় একাকার। কিন্তু আধুনিক জগতের সঙ্গে সিকিম যতটুকু ভয়ে-ভয়ে মিশেছে, ভূটান তা'ও করেনি। ভূটান অনুসরণ ক'রে এসেছে তিব্বতকে। রাস্তাঘাট কোথাও বানায়নি, পাছে বাইরের লোক গিয়ে ঢোকে। কা'রো সঙ্গে সে লেনদেনের চুক্তি করেনি, কারো সঙ্গে তা'র বন্ধুত্ব হয়নি, পাছে সামাজিক মেলামেশা ঘটে এবং বাইরে থেকে ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি গিয়ে ভূটানে বাসা বাঁধে। রুচি, প্রকৃতি এবং বিদ্যাবুদ্ধির স্তর মেলে ব'লেই তিব্বতের সঙ্গে তা'র যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ভারতবর্ষ থেকে অত্যুগ্র আলোকরশ্মিকণা যদি কখনও ঠিক্‌রে গিয়েছে ভূটানে, তবে রাজার চোখে ধাঁধাঁ লেগেছে, তিনি সযত্নে সকল দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

কিন্তু সম্প্রতি ভূটানরাজ 'জিগমা দোরজি' মহাশয় তাঁর প্রাসাদভবনের উত্তর-মুখী বাতায়ন থেকে উত্তরের হাওয়ায় কেমন যেন বিষাক্ত গন্ধ পাচ্ছিলেন। হাওয়া উঠেছে চীন থেকে তিব্বতে, এবং তিব্বতের 'সান-পো' উপত্যকা পেরিয়ে সেই হাওয়া আসছে ভূটানের উত্তুঙ্গ এবং ভয়ভীষণ বন্য পাহাড়ের আশে পাশে। তিব্বত থেকে ছোট বড় নানা পাথুরে নদী নেমে আসছে ভূটানের শিরাউপশিরায়, কিন্তু বর্তমান তিব্বতের নদীর জলকেও সম্ভবত ভূটানরাজ বিশ্বাস করতে পারছেন না। কি জানি ওই সব নদীর জলেও হয়ত বা হিমালয়োত্তর রাজনীতির বিষাক্ত বীজাণু ভূটানের রক্তে প্রবেশ করতে পারে। একারণে মহামান্য ভূটানরাজ বরাবরই উৎকর্ণ ও সতর্ক জীবন যাপন করছিলেন। এবার সম্প্রতি একথা তাঁকে ভাবতে হচ্ছিল, তিব্বতের সঙ্গে তিনি তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করবেন কিনা।

কিন্তু সম্পর্কটা রয়ে গেছে তিনশো বছরেরও বেশী, এবং খুব সম্ভব এমন একটি যুগ থেকে যেটি মধ্যযুগীয় ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া কঠিন। এমন একটি কাল ছিল প্রাক্-পাঠান তথা বৌদ্ধ-হিন্দু আমলে,—বিশ্বাস করা যাক্ এক হাজার বছরেরও অনেক আগে—যখন রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আঞ্চলিক সীমানা নিয়ে অতটা কেউ মাথা ঘামায়নি, এবং যে যুগে ভারত-গান্ধার-তিব্বত-নেপাল-সিকিম-ভূটান-ব্রহ্মাদি ছিল একটি অখণ্ড এবং অবিভক্তিবাদী রাজগোষ্ঠী—যারা আপন আপন রাজতন্ত্রকে একটি কেন্দ্রীয় চেতনায় মিলিয়েছিল,—সেটি হোলো ভারত এবং বহির্ভারতীয় অধ্যাত্মধর্মের চেতনা। ঠিক জানা নেই, এই চেতনার যোগ-সূত্র বোধ হয় হারাতে থাকে অষ্টম শতাব্দীর শেষ থেকে। ভূটানের ইতিহাসও এই সব কারণে অনেকটা ধূম্রাচ্ছন্ন। জানা যায় না বিশেষ কিছু। যেসব ভূটানী মাঝে মাঝে দল বেঁধে কলকাতায় পড়াশুনো করতে আসে, তাদের অধিকাংশই দেশছাড়া। নিজেদের দেশের ইতিহাস নিয়ে তাদের অত মাথাব্যথা নেই। তারা সিকিমে, পূর্ব নেপালে, দার্জিলিঙে ঔপনিবেশিক হিসাবে মানুষ হয়েছে, এবং ইংরেজ মিশনারীরা তাদেরকে বহু সময়ে খৃষ্টানও করেছে, খরচও যুগিয়েছে। কলকাতার মিশনারী স্কুল-কলেজগুলি ভূটানীদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

বিমানঘাঁটি থেকে আমাদের জীপ গাড়ী ছেড়েছিল উত্তরদিকের মধুর রৌদ্রপথে। পৌষ মাসের মাঝামাঝি, মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক পাওয়া যাচ্ছিল। দক্ষিণ হিমালয়ের তরাইয়ের দিকে আমাদের পথ, এই পথ আলীপুর দুয়ারের উত্তরপ্রান্তে পার্বত্য অরণ্য এবং মানবচিহ্নহীন গিরিজটলাময় নদীর সীমানায় শেষ হয়েছে।

বাঁদিকে পশ্চিম দুয়ারের উত্তর প্রান্ত। ওখানকার পথ উঠে গিয়েছে দুই শাখায়। একটি সিকিমে, অন্যটি কালিম্পঙে। যদি শিলিগুড়ি দিয়ে যাওয়া যায় তবে কালিম্পঙ-সিকিম একই পথ। পশ্চিম দুয়ারের ভিতর দিয়ে দুটি শাখাপথ অবশেষে মিলেছে একত্রে—যেখান 'নাথুলা' গিরিসঙ্কট,—যেটি ভারত তথা সিকিম-তিব্বতের সংযোগস্থল, এবং 'চুম্বি' উপত্যকার দক্ষিণপ্রান্ত। এটি অতি প্রাচীন ক্যারাভান্ পথ,—তিব্বতের ভিতর দিয়ে নানাশাখায় বহুদূর-দূরান্তরে চ'লে গেছে। 'ফারিজং' থেকে 'চমলহরির' বিশাল চূড়ার তলা দিয়ে, 'বাম'হ্রদ এবং 'কালা'হ্রদের মধ্যলোক ছাড়িয়ে 'গুরু' থেকে 'ত্রাংপো',—তারপর 'গিয়ানৎসি' থেকে 'নাগারৎসির' পূর্বপথে—যেখানে 'যামদ্রোকের' বিশাল জলাশয় নীলকাচের মতো স্থির হয়ে রয়েছে ষোলহাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে। সেই যামদ্রোকের পশ্চিম সীমানা বেয়ে ক্যারাভানপথ ব্রহ্মপুত্র তথা 'সানপো'-র দক্ষিণ তীরে পেঁাছেছে, তারপর নদী পার হয়ে 'কাইচু' নামক আরেকটি নদীর তীরে-তীরে উত্তরে লাসানগরীর পথ। এই পথে বৃটিশ-ভারত গভর্নমেণ্ট ফ্রান্সিস

ইয়ংহাসব্যাণ্ডের নেতৃত্বে ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বত আক্রমণ করেন, তারপর উভয়ের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্বরচনায় এসব কাহিনী আলোচনা ক'রে এসেছি।

আমরা ডানদিকে হিমালয়ের পূর্বদুয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। এ অঞ্চল ভূটানের ঠিক দক্ষিণে। উত্তর ভূটানের সংবাদ কেউ জানে না। কিন্তু সেই অঞ্চলের গিরিশৃঙ্গমালার ভিতর দিয়ে ভূটান থেকে নানা পার্বত্যপথ তিব্বতের মধ্যে চ'লে গেছে। এই পথগুলিই ভূটান-তিব্বতের যোগাযোগ রক্ষা ক'রে এসেছে। এইগুলি প্রধানত ভূটানী চাউল এবং তিব্বতী লবণের বাণিজ্যপথ। কিন্তু এই 'নুন-ভাতের' সম্পর্ক ছাড়াও উভয়ের মধ্যে আরেকটি সম্পর্ক আছে যেটি কিছু বিস্ময়জনক। কমবেশী তিনশো বছর আগে জনৈক প্রসিদ্ধ ভূটানী লামা কৈলাসের পথে তীর্থযাত্রা করেন। ভূটান থেকে কৈলাস-মানসসরোবর অল্পবিস্তর এক হাজার মাইলের ব্যবধান বৈকি। সেদিনও চাকার গাড়ী ছিল না তিব্বতে, এবং আজও নেই। সেই লামা তাঁর তপস্যার স্থান খুঁজে পান্ কৈলাস-চূড়ার নিকটবর্তী অঞ্চল 'তারচেন' নামক পল্লীতে। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, এবং পারিপার্শ্বিক নানা অঞ্চলে তাঁর ক্রমশ প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠে। তিনি সেখানে কয়েকটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। কালক্রমে কৈলাস এবং মানস সরোবর অঞ্চলে ওই 'তারচেন্‌কে' কেন্দ্র ক'রে অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ, গুম্ফা, পল্লী এবং গ্রাম, তথা পশ্চিম তিব্বতের কয়েকটি অঞ্চল ভূটানরাজের অধীনে আসে। ওই স্থানগুলিকে সম্মিলিতভাবে এখন 'ক্ষুদ্র ভূটান' বলা হয়। ভূটানরাজের একটি অট্টালিকা রয়েছে এখন 'তারচেনে', এবং জনৈক 'ভিক্ষু' ভূটানী শাসনকর্তা বর্তমানে 'ক্ষুদ্র-ভূটানের' সর্বপ্রকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

পশ্চিম এবং পূর্ব দুয়ারের সীমানারেখার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে। সমতল প্রান্তর পথ। প্রান্তরের পূর্বদিকে রেলপথ চলেছে কোচবিহার থেকে 'রাজাভাতখাওয়ার' ওদিকে। পশ্চিমে মাদারিহাটের পথ। মাদারিহাট পশ্চিম দুয়ারের অন্তর্গত। মাদারিহাটের পূর্বপ্রান্তে নেমে এসেছে 'আমো-চু' নদী,—এ নদী নেমেছে 'চুম্বি'-উপত্যকা থেকে।

পথ অনেক দূর। বোধ করি তিরিশ মাইলের কাছাকাছি। দূরে দূরে একটি আধটি চাষীগ্রাম চোখে পড়ে। ধানকাটা হয়ে গেছে, শূন্য প্রান্তর প'ড়ে রয়েছে। ভালো লাগছে এই জনশূন্যতা। মানুষ দেখছিনে ব'লেই আনন্দ। কেননা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চলে আমরা বাস করি। মানুষের ঢেউ এসে আমাদের উপর আছাড় খায় কথায়-কথায়; মানুষের বন্যা আমাদের সমাজ-জীবনের দুই তট ভেঙে দিচ্ছে প্রায় প্রতিদিন, পরিপ্লাবিত করতে বসেছে চারিপাশ। নিত্য দুই হাতে প্রাণপণে ঠেলে দিচ্ছি মানুষের সেই ভীড়, জনতার সেই চাপ। মানুষের গন্ধে কণ্ঠরোধ হচ্ছে আমাদের, মানুষের ধাক্কায় আহত-প্রতিহত হচ্ছি, ছিটকে যাচ্ছি, হুমড়ি খেয়ে পড়ছি। আমাদের ঘরদোর, আনাচ-

কানাচ, নালা-নর্দমা-আঁস্তাকুড়, বন-বাগান-মাঠ-ঘাট-ক্ষেতখামার,—মানুষের চাপে সব ভ'রে গেল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসছে মানুষের, ধাক্কার পর ধাক্কা,—কোনোমতে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই আবার দিচ্ছে মানুষের ধাক্কা। বাঁচবার পথ নেই, পালাবার স্থান নেই, নিশ্বাস নেবার বায়ু নেই,—মানুষের উৎকট দুর্গন্ধের দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে আমরা অন্তিমশয়ান যক্ষ্মারোগীর মতো আনন্দোজ্জ্বল মুক্তির মুহূর্ত গুণছি। আমরা বাঙ্গালী।

ভালো লাগছিল উদার শূন্য প্রান্তরের স্নিগ্ধ হাওয়া। গাড়ী ছুটে চলেছে। ক্রমে এসে পৌঁছলুম পথের শেষ দিকে। এই অঞ্চলের কয়েক মাইল প্রচুর ধূলিময়। কিন্তু নতুন দেশের আকর্ষণ এমন যে, ধূলিমালিন্যের দিকে দৃষ্টি থাকে না। সেই ধূলিময় গ্রামের পথ পেরিয়ে একসময় মোটর এসে দাঁড়ালো কালজানি নদীর মৃন্ময় তটে। খেয়া নৌকায় আমাদেরকে গাড়ীসমেত পার হতে হবে। রেলপথের একটি সাঁকো আছে, কিন্তু সেটি কিছু দূরে।

ছমছমে কেমন একটি আবছায়া নদীর এপারে-ওপারে। জঙ্গল জটলায় কোথাও কোথাও আচ্ছন্ন। ফলনের প্রাচুর্যে চারিদিক পরিপূর্ণ, কিন্তু খুব নিরিবিলি। নদীরা নেমেছে প্রথম পাহাড়ের জটাজটিলতা ছেড়ে সমতলে। সেজন্য শীতের দিনেও প্রবাহের প্রখরতা কম নয়। আলীপুর হোলো তরাই অঞ্চল, এবং মৃৎপ্রধান। আলীপুর দুয়ারে এসে পৌঁছলুম।

নদী পার হয়ে বৃক্ষচ্ছায়াময় গ্রামের পথ। এটি শহরের সীমানা। চালাঘরের নীচে-নীচে দোকান, এপাশে ওপাশে গৃহস্থপল্লী। পাকা ইমারত চোখে পড়ছে না কোথাও। করোগেটের চালা, কাঠের খুঁটি, ছেঁচাবাঁশের দেওয়াল,—কিন্তু দেখতে সুশ্রী। মাচানের উপর সব্জি, অথবা একটু ফুলবাগান,—প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই দেখছি। জীবন বড় নিরিবিলি,—সভ্যতার বিড়ম্বনা থেকে অনেকটাই যেন বিচ্ছিন্ন। আপন মনে একা থাকে আলীপুর—অরণ্য আর নদীকে কোলে নিয়ে। শিয়রে ব'সে রয়েছে অন্ধকার ভূটান,—বিরাট হিমালয়ের প্রাকার-ঘেরা।

বাবুপাড়ায় সুধীর বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নির্দিষ্ট ছিল। সেখানে অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটে গেল একে একে। এখানে একটি সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে এসেছি বটে, কিন্তু অরণ্য ও পর্বত অভিযানের কথায় আশে পাশে সাড়া পাওয়া গেল প্রচুর। ভ্রমণ এবং অভিযানের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে কিছুকাল আগে অন্যত্র কিছু আলোচনা করেছি।

আলীপুর হোলো জলপাইগুড়ির মহকুমা, এবং সমগ্র জলপাইগুড়ি, বিশেষ ক'রে আলীপুর,—চেয়ে থাকে ভূটানের দিকে ভীত নয়নে। যেমন অন্ধকার থেকে হঠাৎ লাফিয়ে এসে নরখাদক জন্তু আক্রমণ করে, তেমনি অতর্কিতভাবে

উত্তুঙ্গ ভূটানের নদীরা ছুটে আসে আলীপুরের উপর,—তারপর সেই বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় যা কিছু সব। ভূটানের পাহাড়ে কালো মেঘ ঘনিয়ে এলে আলীপুরের গৃহস্থদের হৃৎকম্প হয়। ঘরকন্না, মাঠ-ময়দান, গরু-মহিষ, ধান-চাল,—ভেসে যায় সেই বন্যার তাড়নায়। পাকাঘর কেউ বাঁধে না,—বাঁশ আর খুঁটির সাহায্যে মাচান তুলে তা'র ওপর সবাই নির্মাণ করে বেড়াবাঁধা ঘরদোর। বন্যার কালে গৃহস্থদের বাসস্থানের তলা দিয়ে কেবল যে জলস্রোত যায় তাই নয়, জন্তু-জানোয়ার এবং বড় বড় সরীসৃপও হাবুডুবু খেয়ে চ'লে যায়। অনেক গৃহস্থের অনেকবার ঘর ভেঙেছে, ঘরকন্না ভেসে গেছে, এ পাড়া থেকে ওপাড়ায় লোক পালিয়েছে, লণ্ডভণ্ড হয়েছে গৃহস্থালী। সংসারযাত্রার এই অনিশ্চয়তার উত্তরে ব'সে রয়েছে ওই পর্বতরাজ্য,—সে নিস্পৃহ, তা'র চক্ষু নিমীলিত,—দক্ষিণের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের দিকে তা'র ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই।

ভূটানের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে সিকিম, উত্তরে তিব্বত। এই অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভূটান কখনও এ কামনা করেনি, বাইরের লোকের সঙ্গে সে মিশবে। বাইরের আলো পড়েনি ভূটানে, বিদ্যুৎ নিয়ে যায়নি, কল-কারখানা বসায়নি, এক ফোঁটা এলোপ্যাথী ওষুধও খায়নি। বিজ্ঞান ওদের দরজায় কখনও মাথা গলায়নি, এজন্য দুঃখও পায়নি। কারণ, তিব্বতের মতোই, ওরা সভ্যতাকে সন্দেহ ক'রে এসেছে চিরকাল। ভূত-প্রেত-পিশাচকে ওরা শ্বেতপতাকা তুলে পাহাড়ী রাজ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে,—যেমন দেখেছি নেপাল আর সিকিমের পাহাড়ে-পাহাড়ে, যেমন কুলু আর উত্তর কুমায়ুনে, যেমন কিন্নরে-লাডাখে,—যদিও তাদের অনেকে সভ্যতার স্পর্শকে ভয় পায়নি। তা'রা গ্রহণ আর বর্জন দুই করেছে। কিন্তু ভূটানে ভিন্ন কথা। প্রশস্ত প্রবেশপথ এখানে কোথাও নেই। পথ আছে, কিন্তু সে-পথ হোলো বন্য হস্তীর, সেই পথে প'ড়ে থাকে পাহাড়ী ময়াল শিকারের অন্বেষণে, ভয়াল ভাল্লুক আর ক্ষুধার্ত চিতারা সেই পথে ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়ায়। সেই পথে ভূটানে অভিযান করেছে অনেকে, অনেকে পৌঁছয়নি, অনেকেই ফেরেনি।

এতকাল পরে মন ফিরেছে ভূটানের। ওদের চোখ পড়েছে নীচের দিকে—যেখানে ভারতবর্ষ। ওরা রাজি হয়েছে ছেলেদেরকে ভারতে পাঠাবে শিক্ষার জন্য, এবং ভারতের সঙ্গে যোগরক্ষার ব্যাপারে ভারতকে দিয়েই দুই একটি রাজপথ বানিয়ে নেবে। কিছুকাল আগে ভূটানরাজ এসেছিলেন দিল্লীতে ভারতের আমন্ত্রণে,—হয়ত তাঁর মনের সন্দেহ কতকটা ঘুচেছে।

যতদূর দেখা যাচ্ছে 'নাগরাকাটা' থেকে ভূটানের মধ্যে কয়েক মাইল অগ্রসর হওয়া যায়: এবং বিশেষ বাধাও দেয় না কেউ। কে যেন বলছিল, 'রাঙগামাটি' নামক একটি জনপদ ভূটানের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ রেখেছে। ওখানে এসে ওরা 'নুন' কিনে নিয়ে যায়, আর বোধ হয় অতি-আবশ্যকীয় কিছু কিছু সামগ্রী। দেওয়ানগিরি হোলো ভূটানের দক্ষিণ-পূর্বের সীমান্ত শহর,—

উপত্যকায় অবস্থিত। এতকাল ধ'রে এই ক্ষুদ্র শহর ছিল ভারতের এলাকায়,—মাত্র সাত বছর আগে এই দেওয়ানগিরির বত্রিশ বর্গমাইল এলাকা ভারত গভর্নমেণ্ট ভূটানকে ফেরৎ দেন। ভূটান ভারতের সংগে কখনও শত্রুতা করবে না, এজন্য নেহরু গভর্নমেণ্ট ওদেরকে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা ক'রে দিচ্ছেন। ওরা এখন ওদের পররাষ্ট্রনীতি স্থির করবে ভারতের পরামর্শে,—এই হোলো সর্ত। ওরা অস্ত্র আমদানি করবে ভারতের মাধ্যমে, এবং অস্ত্রাদি বাইরে চালান করতে পারবে না। ভূটান থাকবে ভারতের 'রক্ষা-ব্যবস্থাদির' মধ্যে,—ওর গায়ে কেউ না হাত দেয়। রাজনীতিক নিস্পৃহতা রক্ষার মূল্য পেয়েছে ভূটান।

কিন্তু দেওয়ানগিরি থেকে ভূটানের রাজধানী 'পুনাখা' অনেকদূর। এ গাড়োয়াল নয় যে, পথে-পথে তীর্থমন্দির; কুলু অথবা কাংড়া নয় যে, মানালি পর্যন্ত মোটরপথ গিয়েছে। নেপাল নয় যে, 'নামচে-বাজার' আর 'থিয়াংবোচে' পর্যন্ত যাত্রীদল পাওয়া যাবে,—এ হোলো অন্ধকার জলা-পার্বত্য ভূমি। নীচের তলাকার উপত্যকায় জন্তু আর মানুষের নিত্য সংগ্রাম বেধে উঠছে কথায় কথায়। খাবার নিয়ে টানাটানি করছে বাঘে আর মানুষে। গাছ-পালা ক্ষেত-খামার আক্রমণ করছে হাতীর দল,—বিনা নোটিশে তা'রা হানা দিচ্ছে বস্তিতে-বস্তিতে। বর্শা, বল্লম, টাঙ্গি আর কুক্রি নিয়ে বন্য ভূটানী উন্মত্ত হয়ে খুনে বাঘের পিছনে ছুটছে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল বড় ভয়ংকর।

তাম্রলপুর থেকে এগিয়ে দেওয়ানগিরি পৌঁছতে প্রায় ষাট মাইল পড়ে। মাঝপথে পাহাড়ী নদী পার হতে হয়। দেওয়ানগিরি থেকে 'তাসিগং' একশো মাইল উপত্যকা পথ,—তারপর উঠে গেছে দুস্তর হিমালয় ভূটানের উত্তরদিকে। ওদের শহরে-জনপদে, বস্তি-পল্লীতে গিয়ে পৌঁছলে সহসা বুঝতে পারা যায় না, ওরা বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু। ওদের একদিকে বাঙলা, অন্যদিকে আসাম। আসামের একটা অংশ বৈষ্ণব, অন্যটা শাক্ত। ভূটান বৌদ্ধ, কিন্তু সে নিয়েছে বাঙলার শাক্তনীতি। চণ্ডী, কালী, তারা,—এরা ওদের পূজ্য। পশুবলি ওদের ধর্মাঙ্গ। সকল পাহাড়ীজাতির মতো ওরা সাধারণত খর্বকায় এবং বলিষ্ঠ। ওদের প্রকৃতিগত সরলতা হিংস্রতায় রূপান্তরিত হ'তে বিলম্ব ঘটে না।

তাসিগং থেকে পশ্চিম উপত্যকাপথে বহু নদ-নদী ও দুর্গম পথ পেরিয়ে প্রায় তিনশো মাইল অতিক্রম করলে 'কৃষ্ণগিরির' দক্ষিণে এসে পৌঁছনো যায়। কিন্তু এই পথে নানাবিধ জানোয়ারের এবং হিংস্র কুকুরের অবাধ রাজত্ব। মাঝ-পথে 'খাঙকার' ও 'মিলি' গিরিসংকট অতিক্রম ক'রে আসতে হয়। খাঙকারে এসে মিলিত হয়েছে দুটি বৃহৎ নদী,—দুটি নদীর মূল উৎস হোলো তিব্বতে। সিন্ধুনদ যেমন দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র কাশ্মীরকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, 'অরুণ' নদ যেমন গৌরীশৃঙ্গ থেকে সোজা কুড়ি হাজার ফুট নেমে পৃথিবীর গভীরতম খদ সৃষ্টি করেছে, অথবা—মনে প'ড়ে গেল বন্য শতদ্রুকে,—সে যেমন মানসসরোবর থেকে বেরিয়ে সমগ্র পাঞ্জাব আর বাহবালপুরকে কেটে

অবশেষে গিয়ে মিলেছে সিন্ধুনদে, তেমনি এই দুটি নদী। এরা এত দীর্ঘ নয়, কিন্তু দুঃসাহসিকা। এদের সঙ্গে যোগ রয়েছে তিব্বতী ব্রহ্মপুত্রের—যার তিব্বতী নাম হোলো সাংপো। এরা কোথাও কোথাও বিশহাজার ফুট উঁচু পাহাড় দ্বিখণ্ডিত করেছে, পেরিয়ে এসেছে দুর্গম দুস্তর গিরিমালা,—তারপর এসেছে দক্ষিণ ভূটানের তাসিগঙ উপত্যকায়। সেখান থেকে সাজগোছ খুলে নিজের নাম নিয়েছে, 'ডাঙমে'। ওদিকে আবার কৃষ্ণপর্বতের গা ঘেঁষে ছুটে এসেছে 'টঙসা' উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই দুই নদীর সঙ্গমক্ষেত্র থেকে নতুন নামে একটি বিস্তৃত ধারার জন্ম হোলো—তার নাম মানস। প্রতি বর্ষায় এই মানসের প্রবল বন্যাস্রোত আসামের গোয়ালপাড়ায় এসে নানা ধারায় ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়।

আমরা নদী প্রান্তর আর অরণ্যলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছি দিন তিনেক। দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার ভূটান। তা'র মধ্যে প্রবেশপথ পাইনে। মাঝে মাঝে বন্যায় ভেসে ছুটে নেমে আসে ওখান থেকে গ্রাম, গাছ-পালা-পাথর গড়িয়ে আসে বজ্ররবে, পাহাড়ের চাংড়া ভেঙে এসে ছারখার ক'রে বিপ্লব বাধিয়ে দেয়, জলের স্রোতের মধ্যে মানুষে-জানোয়ারে আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম বেধে ওঠে। কিন্তু ছায়াবৃত ভূটান। জানবার যো নেই, ওখানে মানুষের সংখ্যা কত, বোঝবার যো নেই ওদের সংসারযাত্রার সত্য পরিচয়। অরণ্যে, তুষারে, জানোয়ারে, আকাশস্পর্শী পর্বতচূড়ায়,—ওরা চিরদিন রয়ে গেল অজানা রহস্যের ছায়ার পাশে। শত শত বর্ণের পতঙ্গ-প্রজাপতির দল ওরা নীচের দিকে পাঠিয়ে দিল, ওরা ছড়িয়ে রাখলো হাজার হাজার বর্ণের বন্যলতা, অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ্ ওরা লুকিয়ে রাখলো গুহায়-গহ্বরে, পাথরে-কন্দরে, এবং ওরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি টুক্‌রোকে বেঁধে রেখে দিল ওদের অরণ্যে আর পর্বতে। বিদ্যুতের আলো ওরা জ্বাললো না, পাছে তা'র অত্যুগ্রতায় আরণ্যক ভূটান আপন স্বরূপকে দেখতে পায়। ওরা চাকার গাড়ী নিয়ে গেল না স্বদেশে, পাছে স্বজাতি তা'র জীবনে দ্রুতগতি লাভ করে। ভারতের যুগ-যুগান্তের উত্থান-পতন, প্রতি শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় বিপ্লবঝঞ্ঝা, সভ্যতা ও শিক্ষা,—এরা নীচের তলায় প'ড়ে রইলো,—ভ্রূক্ষেপ নেই ভূটানের। রাজার ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে রাজনীতি নেই, তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কা'রা যেন এর মধ্যে কবে 'ভূটান-কন্‌গ্রেস' বানাতে গিয়েছিল, রাজা মহাশয় তাদের টুঁটি টিপে দিয়েছেন। কিন্তু 'ভূটান কন্‌গ্রেস' অত সহজে রাজাকে ছাড়েনি। তা'রা শস্যের অংশ দিয়ে রাজস্ব পরিশোধ করতে আর প্রস্তুত নয়, নগদ টাকায় তা'রা রাজস্ব দিতে চায়। তা'রা বলছে, মন্ত্রিসভা যদি না করো, তবে প্রতিনিধিসভা বানাও,—তুমি থাকো অভিভাবক হয়ে,—মেনে নিচ্ছি তোমাকে। তা'রা বলছে, রাত্রির

অন্ধকার নামলে কেউ আপত্তি জানায় না, কিন্তু চারিদিকে যখন আলো জ্বলে উঠছে, তখন আমাদের ঘরের অন্ধকার আমরা বরদাস্ত করবো না। আলো চাই, পথঘাট চাই, ঔষধপত্র চাই, শিক্ষাসভ্যতা চাই। ভূটানের 'হা' নামক অঞ্চলে এই নিয়ে হাহাকার ওঠে।

মহারাজা অত সহজে এসব কথায় কান দিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি একটি কারণ ঘটেছে। বছর দেড়েক আগে তিব্বতে ভূটানী চাউল রপ্তানীর বাণিজ্য-যোগ যেমন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তেমনি তিব্বত থেকে ভূটানে লবণ এসেও আর পৌঁছয় না। এই লবণ-দুর্ভিক্ষই মহারাজাকে সচেতন ক'রে তুলেছে। খাদ্য-জগতে সর্বাপেক্ষা 'মিষ্ট' সামগ্রী হোলো লবণ। চিনি অথবা গুড় যত মিষ্টই হোক, লবণ তা'র চেয়েও 'মিষ্ট'। কেননা লবণ ভিন্ন মানুষের প্রাত্যহিক জীবন অচল। অতএব লবণভিক্ষার জন্য মহারাজা ভারতের দরজায় নেমে হাত পাতেন। কিন্তু পথঘাট না থাকার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট প্লেন থেকে লবণের বস্তা ভূটানে ফেলতে বাধ্য হন্।

মোট নয়জন প্রশাসক আছেন ভূটানে—তাঁদের নাম পেন্‌লপ। তাঁরা মহারাজার অধীনে এক একটি অঞ্চলের অধিনায়ক,—যেমন এককালে ভারত-সম্রাটের অধীনে থাকতেন 'ভাইসরয়।' এই নয়জন পেন্‌লপ ও তাঁদের কর্মসচিব—যাঁরা অধিকাংশই রাজপরিবারভুক্ত এবং মহারাজার অনুগত,—এঁদের সাহায্যেই মহারাজা তাঁর আঠারো হাজার বর্গমাইলব্যাপী পার্বত্য ভূভাগের শাসনকার্য চালান্।

এখানেও ভূটান-কন্‌গ্রেস মহারাজাকে চেপে ধরেছে। কায়েমী স্বার্থের ব্যবস্থা বদলাতেই হবে। আইন-কানুন রাজার ইচ্ছানুবর্তী হ'লে চলবে না, 'লিখিত' আইন চাই। আইন-আদালত চাই, বিচারশালা ও বিচারপতি চাই। শাসনব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী না হয় নাই রইলো, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ না হ'লে চলবে না। রেখে দাও তোমার ওই তাঁবেদার 'পেন্‌লপ', স্বেচ্ছাতন্ত্রকে আর আমরা স্বীকার করিনে। এবার চাই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, চাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

ভূটান-কন্‌গ্রেসের অনেকগুলো দাবি মহারাজা স্বীকার করেছেন, এবং শীঘ্রই ভূটানের রাষ্ট্রক্ষেত্রে কয়েকটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার কথা চলছে। এবার তিব্বতকে ছেড়ে মহারাজা ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত হয়েছেন। জনসাধারণ প্রথম মাথা তুলেছে ভূটানে।

উত্তর ভূটান পর্বতমালায় বেষ্টিত,—যেমন দুরারোহ, তেমন জনশূন্যপ্রায়। পশ্চিম ভূটানের চেহারা প্রায় একই প্রকার। দুঃসাধ্য পাহাড়, নদী এবং অতল-গহ্বর খদের দ্বারা সিকিমের সঙ্গে তা'র প্রাকৃতিক ব্যবধান। উত্তর সিকিমের

উত্তুঙ্গ পাউহুনরী পর্বতের থেকে নেমে এসেছে 'আমোচু' নদী সোজা দক্ষিণে সিকিম পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ভূটানের মধ্যে। এই নদীর ধারাপথে সিকিমে আর ভূটানে দুই ভূভাগ একত্রে জড়িত। দুয়ের মধ্যে সীমানানির্দেশ কিছু নেই,—আছে শুধু পর্বতের পর পর্বত, এবং পাঁচ থেকে আট হাজার ফুট উচ্চ মালভূমি। আমোচু নদী দক্ষিণ পথে মাদারিহাট হয়ে কালজানির দিকে চ'লে গেছে। অপর দুটি প্রধান নদী হোলো রায়ডাক এবং মোচু। ঠিক মনে পড়ছে না 'রায়ডাক' নদীর ভিন্ন নাম 'কালচিনি' কিনা। এই রায়ডাক নদী নেমে এসেছে জয়ন্তী অরণ্যের উত্তর প্রান্তে—যে অঞ্চলের নাম হয়েছে 'ভূটানঘাট।'

চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলুম ওই ভূটানঘাটে রায়ডাক নদীর তটে। ওপারে ভূটান পাহাড়, নীচে নদীর নীল ধারা বাঁদিক থেকে ডানদিকে চ'লে গেছে অনেক দূর। সেই কোথায় যেন গুহালোকে পাওয়া যায় 'ফাঁসখাওয়া মহাকাল',—সেখানে আছে আশ্রম,—পথ গিয়েছে কালচিনি নদীর উপর দিয়ে। বাঁশের পুল বেঁধে তবে সেই অন্ধ গুহাশ্রমে প্রবেশ করা যায়। আছে তা'র আশপাশে আরণ্যক ভূটানী বস্তি। আর ওই দেখে নিয়ে গেলুম কালচিনির পুলের ওপারে ভূটানের অরণ্য, দিনের বেলাতেও ভয়ের বাসা,—ও অঞ্চলে নাকি রাজ-বোড়ারা হাতীর শুঁড় জড়িয়ে ধ'রে ফণা বিস্তার করে।

সামনে বন্য নদী পাথরে-পাথরে আকীর্ণ, ঘন বিশাল অরণ্য চতুর্দিকে। দিনমানেও এই নদীতটে একা আসতে অনেকে সাহস পায় না। চারিদিক রুদ্ধশ্বাস, গভীর নিস্তব্ধ। একটু আগে হাতী গেছে এই পথে, 'নাদ' ফেলে গেছে,—তা'র থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছে। নদীর ওপারে ভূটান পাহাড়ে উঠে গেছে হাতীর পথ। পাহাড় থেকে ওরা যখন-তখন লুট করতে আসে শস্য-ভাণ্ডার। দরকার হ'লে ওরা গ্রাম লুট করে, বন-বাগানকে তচনচ করে, এবং বাধা দিতে গেলে মানুষকে পদদলিত ক'রে চ'লে যায়।

পলাশবাড়ী থেকে শামুকতলার পুল, আর বাবুপাড়া থেকে 'মাঝেরদাবড়ি'—এদের মধ্যে ঘুরছিলুম। আছে মহকুমার আদালত আর আপিসপাড়া, আছে এখানে ওখানে পল্লী আর লোকযাত্রা,—কিন্তু শহর-নগর একে বলে না,—সব মিলিয়ে এ যেন কতকটা আধুনিক গ্রাম। কিন্তু গ্রামের বাইরে সন্ধ্যার পর থেকে সংশয়াচ্ছন্ন। নরখাদক বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে দেখা দেয়। কেননা বাঘ আসে কথায় কথায়। চারিদিকে নদী আর অরণ্য, পাহাড় আর জলাভূমি,—মাঝখানে ছোট্ট আলীপুর দুয়ার। কিছুদূর এগিয়ে গেলে দমনপুর, তারপর তরাইয়ের অরণ্যলোক আরম্ভ। হিমালয় প্রায় সর্বত্র তা'র উদার মহিমাকে প্রথম প্রকাশ করে ধ্যানগম্ভীর অরণ্যসম্পদে। দমনপুর থেকে চললো পথ 'বক্সাদুয়ারের' দিকে, আর বাঁ দিকে উত্তর-পশ্চিমে রেলপথ এবং বনপথ চ'লে

গেল রাজাভাতখাওয়ার ওদিকে! রাজাভাতখাওয়া! থমকে গেলুম বটে। ঠিক মনে পড়ছে না গল্পটা। সমগ্র আলীপুর দুয়ার ছিল নাকি একদা ভূটানের অধীনে। একদিন এলেন এখানে কোচবিহারের মহারাজা ব্যাঘ্রশিকারের অভিযানে। বোধ করি তাঁর এই প্রবেশ ছিল বে-আইনী। অন্য ভাষ্য হোলো এই, আলীপুর দুয়ারের উপর উভয়পক্ষেরই নাকি দাবি ছিল। সে যাই হোক, ভূটান রুখে দাঁড়ালো কোচবিহারের বিপক্ষে। সন্দেহ নেই, রাজরক্ত আর রাজনীতি বড় ভয়ঙ্কর,—এবং এর চেহারা দেখে বেড়িয়েছি রাজস্থানে। ফলে, যুদ্ধ বেধে উঠলো, এবং যথাকালে সন্ধিও হোলো। আলীপুর দুয়ার এলো কোচবিহারের অধীনে। বোঝাপড়াটা নাকি উভয়পক্ষেরই আনন্দের কারণ হয়েছিল। কিন্তু এই আনন্দকে স্মরণীয় ক'রে রাখা দরকার। সুতরাং ভূটান আর কোচবিহার স্থির করলেন, ভোজনের আসর বসিয়ে এই বন্ধুত্বকে পাকা করতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। দুজনে একাসনে বসে অন্নগ্রহণ করলেন যেখানে, সেই অঞ্চলের নাম রাখা হোলো, 'রাজাভাতখাওয়া!' এই নামেই স্থানীয় রেলষ্টেশনটি পরিচিত রয়েছে।

অরণ্যসমাকীর্ণ পথে আমাদের মোটর দ্রুত চলেছে অনেক দূর। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মাইল চল্লিশেক পথ। সঙ্গে আছেন শ্রীযুক্ত দে-সরকার,—আলীপুর দুয়ারের সর্বপরিচিত মাষ্টার মশাই। প্রবীণ বয়সে তাঁর পর্বতারোহণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেক তরুণকে হার মানায়। তিনি পাহাড় আর নদী আর দুর্গমের গল্পে মেতে উঠেছিলেন। 'সঙ্কোশ'নদীর উপত্যকা-পথ ধ'রে অরণ্য জলাভূমি আর পাহাড়তলী পেরিয়ে সোজা উত্তরে চলে গেছে দুঃসাহসীর পথ। বনময় জলাময় ভূভাগ, দুই ধারে হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গদল,—হাতীর দল নেমে আসে শীতকালে, বাইসন তাড়া করে ভূটানীকে, হরিণ আর বনশূকরের পাল এধার থেকে ওধারে ছুটে যায়, বন্য কুকুর খরগোসকে খুঁজে বা'র করে, হায়না এগিয়ে এসে জন্তুর কঙ্কাল শুঁকে চ'লে যায়,—ওদেরই ভিতর দিয়ে অভিযান-পথ 'চীরঙ' পর্যন্ত গিয়ে পেঁছিয়। 'চীরঙ' হোলো ভূটানী জনপদ,—সেখানকার মানুষ দারিদ্র্যে আর ক্ষয়রোগে শুকিয়ে মরে,—জল আর জন্তুর সঙ্গে লড়াই চলে তাদের অহরহ। 'চীরঙ' থেকে 'সঙ্কোশ' নদীর নাম হয়েছে মো-চু,—যেমন ব্রহ্মপুত্রের নাম 'সান্‌পো।' এই 'মো-চুর' পূর্বদিকে গগনচুম্বী কৃষ্ণপর্বতের অগণ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারিত হয়েছে দূরদূরান্তরে। এই নদীর তীরে-তীরে পথ চ'লে গেছে 'ওয়াংদু' জনপদ পেরিয়ে সোজা উত্তরে 'পুনাখা' শহরে। নামটি পুণাখা অথবা 'পুণ্যাক্ষ'—ঠিক জানিনে। মন্দির, গুম্ফা, বাজার, রাজভবন—সবই আছে। দারুময় মঙ্গোলীয় স্থাপত্যেরও অভাব নেই। পুণাখা থেকে একটি অশ্বপথ ফারোজঙ হয়ে চ'লে গেছে কালিম্পঙের দিকে। ভারতের সঙ্গে ভূটানের এটি অন্যতম সুদূরবর্তী যোগসূত্র।

গহন ভীষণ অরণ্যানীর শোভা দেখে চলেছি। দুই ধারে কেমন যেন অপ্রাকৃত অনৈসর্গিকের ইন্দ্রজাল বিস্তারিত। অরণ্যের নীচে দিয়ে এখানে ওখানে রহস্যপথ চ'লে গেছে। ওদের প্রত্যেকটি যেন সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্নের মতো। শীতের দিনে বিশাল শালপ্রাংশু আর শেগুনের পাতা ঝরেছে অনেক। ক্বচিৎ এক-আধজন আরণ্যক কাঠুরিয়ার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ছায়াচ্ছন্ন পথে হঠাৎ বেরিয়ে আসে কৃষ্ণকায় মাটির সন্তান,—চেহারায় জংলী, অর্ধনগ্ন,—হাতে একটা হাতিয়ার। তার পিছনে আরও এক-আধজন। ওরা এ অঞ্চলে একা চলে না। মনে প'ড়ে যাচ্ছে শুক্‌না আর আমলেকগঞ্জের অরণ্য, মনে পড়ছে দেওদার পর্বতের নীচে দ্রোণভূমি, সোমনাথের পথে গিরনারের সিংহ-বন। দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম বক্সাপাহাড়ের নীচে 'সাঁতরাবাড়ীর' পুলিশ ফাঁড়িতে।

আশে পাশে দুচার ঘর বস্তি নিয়ে ছোট্ট একটি পল্লী। শুনলুম গতকাল এখানে বাঘ এসে একটি নরহত্যা ক'রে গেছে। লাস পাওয়া যায়নি, ফসলের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে বাঘ পালিয়েছে। এ অঞ্চলে এসব গা-সওয়া। জনৈক সশস্ত্র পাহারাদার আমাদের ব'লে দিল, পাহাড় এখানে নিরাপদ নয়। আপনারা পাহাড়ে যাচ্ছেন বটে তবে বেলা চারটের মধ্যে ফিরবার চেষ্টা পাবেন।

তা'র প্রস্তাব মেনে নিয়ে আমরা অগ্রসর হলুম। পায়ে পায়ে আমাদের উৎসাহ, মনে-মনে উদ্দীপনা। এ অঞ্চল এই সেদিন অবধি ছিল ভূটানে,—প্রায় বছর তিরিশেক আগে ইংরেজরাজ এই অঞ্চলের মাইল পাঁচেক পাহাড়ী অঞ্চল জুড়ে একটি দুর্ভেদ্য কারাগার তৈরী করে। এই কারাগারের নাম দেওয়া হয় 'বক্সাদুর্গ।' চতুর্দিকে হিমালয়ের চূড়া, একদিকে শুধু দেখা যায় দূর-দূরান্তর। এই পথে রয়েছে বিপ্লবী বাঙলার রক্তের ইতিহাস এখানে ওখানে ছড়িয়ে। স্বাধীনতার ইতিহাসে যারা স্মরণীয়, এবং বরণীয়,—এইখানে ব'সে-ব'সে তা'রা নৈরাশ্যের দিন গুণেছে। প্রেন্‌টিস, পোর্টার, জ্যাকসন্‌, এণ্ডারসন, হার্বার্ট, লীটন্‌, রেডিং, উইলিংডন, লিনলিথগো ইত্যাদি—এদের অমানুষিক আচরণ আজও এই পাহাড়ে রক্তের অক্ষরে লেখা। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় লর্ড রেডিংয়ের আমলে এই কুখ্যাত বন্দীশালা খোলা হয়, এবং তাঁরই আদেশক্রমে বাঙলার শত শত শ্রেষ্ঠ কর্মবীরকে গোপনে এখানে এনে রাখা হয়। লোক-লোচনের অন্তরালে মধ্যরাত্রে অথবা অরণ্যের ছায়াপথ ধ'রে বন্ধ গাড়ীর মধ্যে বন্দীঅবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এবং লাঞ্ছনায় আর প্রহারে জর্জরিত ক'রে এই পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে তাদেরকে বাধ্য করা হোতো। না জানতো দেশবাসী, না জানতো বন্দীরা নিজে,—এই অঞ্চলের নাম ও পরিচয়। বহুদিন অবধি ইংরেজ এই সংবাদ জনসাধারণের কানে তুলতে দেয়নি এবং তাদের যথেচ্ছ বর্বরতা যখন বরদাস্ত করতে না পেরে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই বন্দীরা মাথা তুলতে বাধ্য হয়,—তখন, যতদূর মনে পড়ে, ওদের পিছনে সশস্ত্র গুর্খাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়, এবং তা'র ফলে কয়েকজন বন্দীর মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ

বাঙগালী যে নেয়নি তা নয়, কিন্তু তা'র পরিমাণ বড় অল্প। অকল্যাণ, অন্যায় এবং অনাচারকে সংহার করার জন্য আমাদের দেশে গীতাধর্ম প্রচলিত। অসুরকে নিধন করার জন্য হাত যদি না কাঁপে, দয়া-মায়া-কৃপা-মোহ যদি অন্তরকে আচ্ছন্ন না করে, ফলাফল সম্বন্ধে হৃদয় যদি নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ থাকে,—তবে সার্থক সেই অসুরসংহার! বাঙগালীর অনেক বীর সন্তান সেদিন অনেক ক্ষেত্রে এই গীতাভাষ্যকে জীবনের ব্রত ক'রে তুলেছিল। রোগে উপবাসে প্রহারে উৎপীড়নে আশাভঙ্গে সেদিন বক্সাদুর্গের নির্জন প্রকোষ্ঠে অনেকের অপমৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তাদেরই পুণ্যরক্তে কলম ডুবিয়ে লেখা হয়েছিল আজকের স্বাধীনতার কাহিনী!

আন্দাজ করতে পারি তিন মাইলের বেশী চড়াই পথ। প্রথম দিকের মাইলখানেক পথ কতকটা দুস্তর পাকদণ্ডি,—অনেকটা দম লাগে। একটি মস্ত ঝরণা নেমে এসেছে মাঝপথে,—পাহাড় বনময় এবং জনচিহ্নহীন। বুঝতে পারা যায় এখান থেকে কোথাও পালাবার পথ ছিল না সেদিন। সমতলের কোনও কোলাহল এখানে পৌঁছয় না, সভ্যজগৎ থেকে অনেক দূর হোলো এই পাহাড়ের সীমানা। দেশ ও জাতির সংস্পর্শ থেকে বিপ্লববাদীদলকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে অজানালোকে নির্বাসিত ক'রে রাখার মতো এমন আদর্শ জায়গা আর কোথাও নেই।

প্রায় দেড়ঘণ্টা লেগে গেল বক্সা ডাকঘরে এসে পৌঁছতে। ছায়াচ্ছন্ন পার্বত্য ভূমি; দূর পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অতি দরিদ্র কয়েক ঘর ভূটানীর বাস। একটি বাঙগালী পোষ্ট মাষ্টার আছেন ডাকঘরে, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তাঁর পরিবার জর্জরিত। নির্জন বনতল ছমছম করছে চারিদিকে। ভূটান পাহাড় অবরোধ ক'রে রয়েছে এই ক্ষুদ্র বস্তি অঞ্চলকে। আমরা চড়াই পথে আরও অনেকটা উঠে চললুম। শ্রমিক মেয়ে-পুরুষ চলেছে কাঠ বোঝাই নিয়ে। কান পেতে শুনলে বুঝতে পারা যায়, বাঙগলা আর হিন্দির অপভ্রংশ নিয়ে তাদের ভাষা। শুনতে পাওয়া গেল এখানে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ,—পেটের পীড়া অত্যধিক। খাদ্যসামগ্রী আনতে হয় বহুদূর নীচের থেকে।

দুর্গের সীমায় এসে উঠলুম। সারিবন্ধ একতলা অনেকগুলি ঘর দেখা যাচ্ছে একটি মালভূমিতে। আজও তেমনি রয়েছে কাঁটাতারের বেড়া, তেমনি সুরক্ষিত প্রবেশপথ, তেমনি নানাবিধ বাসব্যবস্থা। মাঝখানে দুতিনটি কাঠের গম্বুজ, ওখানে সদাসতর্ক পাহারা থাকতো। আমরা ভিতরে যাবার আগে কিছুদূর এগিয়ে ফরেষ্ট অফিসারদের বাঙগলায় এসে উঠলুম। এঁরা প্রায় সকলেই বাঙগালী। এঁদেরই একজনের নিকট আমাদের জন্য পূর্বব্যবস্থামতো ভুরিভোজনের আয়োজন ছিল। পথের বাঁক ঘুরলে প্রথমেই নজরে পড়ে একটি মস্ত বারান্দাওয়ালা খয়েরি রংয়ের সরকারি ভবন। বুঝতে পারা যায়, সরকারি তদন্তকালে ও`` ছিল বড় কর্মচারীদের বাসস্থান। এখন সমস্তই জনশূন্য।

ও অঞ্চলে বন্দীশালা, এ অঞ্চলে লাইব্রেরী, স্কুল, কর্মচারীদের কোয়ার্টার, খেলাধুলার জায়গা,—এবং যেখানে যেটুকু অত্যাবশ্যকীয় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন। একটি সরু পথ মাঝখান দিয়ে ভূটানের বিশাল পাহাড়ে উঠে গেছে।

এপারে এসে প্রবেশ করলুম বন্দীশালায়। মাঝখানে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কাঁটাতারের বেড়া চতুর্দিকে, বাধার পর বাধা। কোনও দিন কল্পনা করিনি, এখানে পৌঁছতে পারবো। বক্সা মানে ছিল ভয়, বিভীষিকা, দেশপ্রেম, বিপ্লব, উৎপীড়ন, নির্বাসন,—মনের বিচিত্র চেহারা ছিল এই পাহাড়টিকে ঘিরে। ঘুরে ঘুরে দেখছিলুম সর্বত্র। নির্জন স্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠ কা'কে বলে, তা'র ভিতরে ঢুকে লৌহকপাট বন্ধ ক'রে দেখলুম। আজ সে-মন নেই, সে-বেদনা-বোধ নেই, সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ছায়ারা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে ধকধক ক'রে জ্বলে না সেদিনের সেই আগুন আর ঘৃণা,—রাত্রির পর রাত্রি দাঁতের উপরে দাঁত ঘষা, একটি ইংরেজকে গুলীবিদ্ধ ক'রে মারলে সেই সংবাদ শুনে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানো, অন্তরে অন্তরে সেদিনের বীর-পূজা,—প্রাণের সেই উত্তাপ জাতির মন থেকে আজ জুড়িয়ে গেছে।

ঘুরে বেড়ালুম আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ। বোধ হয় কিছু খুঁজছিলুম। শুক্‌নো রক্তের একটি ফোঁটা, হৃৎপিণ্ডের এতটুকু অবশেষ, জরো-জরো যন্ত্রণার এক ঝলক আর্তকণ্ঠ, দধীচিদলের একটুকরো বজ্রাস্থি, কোনও কাতর নয়নের শেষ চাহনি! কিন্তু কিছু নেই,—ইতিহাসের নতুন পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠায় আজ এসে দাঁড়িয়েছি। স্বাধীন ভারতে আজ সেই তা'রা গল্পের মতো। সমগ্র পাহাড়শীর্ষের মালভূমিটি আজ বড় বড় অজগর সাপ এবং সরীসৃপের অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

জীবহিংসা মহাপাপ একথা জানি বৈকি। ভালোবাসার দ্বারা পৃথিবী-বিজয়ের ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা সবাই জানে। ইংরেজের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ আজকে আর কোনোমতেই খুঁজে পাওয়া যায় না,—তা'রা চলে গেছে ইংরেজের সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু অপমানে উৎপীড়নে অরাজকতায় সেদিনের শাসকসম্প্রদায় বাঙ্গালীর মনোজগতে যে দারুণ বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, ইংরেজের সেই হিংস্রতাকে হিংসার দ্বারাই বাঙ্গালী যোগ্য মূল্য দিতে বাধ্য হয়েছে। লোহাকে কাটতে গিয়ে লোহার অস্ত্র ছাড়া উপায় ছিল না।

এবার পঁচিশ বছর আগের ইতিহাসে ক্ষণকালের জন্য ফিরে যেতে চাই।

ইংরেজ শাসকগণের প্রচণ্ড নিগ্রহের কালে বাঙ্গালীজাতি সেই সময় আপন স্বভাবধর্ম অনুযায়ী একটি আত্মিক আনন্দের অবারিত মুক্তির পথ খুঁজে ফিরছিল। রাজনীতিক জীবনে যে-অবরুদ্ধ গ্লানি, নৈরাশ্য এবং অবমাননা তা'কে শাসকগণের বিরুদ্ধে তিক্তমতি ক'রে তুলেছিল, সেই রাহুচ্ছায়াকে অপসারিত করার জন্য বাঙ্গালী চেয়েছিল একটি যুগজয়ী সাংস্কৃতিক ও চিৎপ্রাকর্ষিক অভিব্যক্তি—যেটি সর্বব্যাপী আনন্দ ও মুক্তিবোধের সাড়া তুলতে

পারে। তৎকালে এই আনন্দ, আশ্বাস ও মুক্তির একমাত্র প্রতীক্ ছিলেন জাতির সর্বোত্তম ভাবনায়ক ও অভিভাবক মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে তখন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। সেটি প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি থেকে মুক্ত হলেও অন্তরে-অন্তরে রাজনীতিক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সে যাই হোক, এই আনন্দের হাটে এসে দাঁড়ালো সবাই,—সকল দল, সকল মত, সকল পথ, এবং দেশের সকল মনীষী ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়। তাঁরা একটি 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সংস্থা গঠন করলেন, এবং তা'র অন্যতম কর্মসচিবস্বরূপ মনোনীত করলেন শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়কে। হোম মহাশয়ের অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা, উদ্দীপনা এবং সংগঠনশক্তি সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে উৎসাহ সঞ্চার করতে সেদিন সমর্থ হয়, সেটি কেবল যে স্মরণীয় তাই নয়, সেটি ঐতিহাসিক ঘটনাও বটে। ফলে, দেশব্যাপী রবীন্দ্র-অনুরাগীগণের সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কলিকাতা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বোধ করি পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্যাবধি কোনও কবি তাঁর জীবনকালে রবীন্দ্রনাথের মতো এমন জাতিবর্ণনির্বিশেষে এই প্রকার বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেননি। মহাকবির তখন সত্তর বৎসর বয়স। বস্তুত, সেদিন পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ ও সর্ববরেণ্য মনীষীগণও এই উপলক্ষ্যে ভারতকবির উদ্দেশ্যে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন। তাঁদের সকলের বাণী বহন ক'রে একখানি 'সুবর্ণগ্রন্থ' স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শত সহস্র—স্বদেশী ও বিদেশী—সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা নিবেদন করেছিল মহাকবির পদপ্রান্তে। বাঙলার ঘোরতর দুর্দিনে সেদিন 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' অনুষ্ঠান কেমন যেন স্বস্তি ও মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ দিয়েছিল। এই সময় বক্সাদুর্গের রাজবন্দীরাও চুপ ক'রে থাকতে পারেননি। তাঁ'রা কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের দাবি ও উপরোধ জানালেন, মহাকবিকে তাঁ'রাও অভিনন্দন জানাতে চান্। কারণ মহাকবির অমোঘ স্বদেশীমন্ত্রে তাঁদের জীবন দীক্ষিত। কর্তৃপক্ষ তাঁদের দাবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। সুদূর ভূটানের হিমালয়চূড়া থেকে একদল পিঞ্জরাবন্ধ রক্তাক্ত পাখীর আর্তকণ্ঠ অভিনন্দনের ভাষায় এসে পৌঁছলো মহাকবির চরণোপান্তে! সেই আর্তকণ্ঠের ডাকে সেদিন মহাকবির হৃৎপিণ্ডে লেগেছিল দোলা। অপমানিত এবং যন্ত্রণাদগ্ধ মানবাত্মার বেদনায় তাঁর দুই চক্ষে নেমে এলো অশ্রু। তিনিও তখন ছিলেন হিমালয়ের আর এক চূড়ায়,—দার্জিলিংয়ে। হিমালয়ের সেই শীর্ষস্থলে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ মহাকবির বজ্রকণ্ঠ যে-অভয়বাণী সেদিন উচ্চারণ করেছিল, সেই বাণীবাহিনী কবিতাটি সমগ্র বাঙলা ও ভারতের দিকবিদিক প্লাবিত ক'রে ছুটে গেল পৃথিবীর মর্মলোকে। বাঙালীর আর্তপ্রাণ সেদিন তাঁর ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল :

প্রত্যভিনন্দন

বক্সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্দ্ধ স্রোতে
বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি' অঙ্কুর আকাশে দিল আনি'
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্ত্য নরের রাজধানী॥

"অমৃতের পুত্র মোরা" কাহারা শুনালো বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জ্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দু:খেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

১৯ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দার্জ্জিলিং

সেদিনের শাসক ইংরেজরা কাব্যরসিক অথবা সাহিত্য-বিচারক ছিল না। সেইজন্য এই কবিতাটি বারম্বার গোপনে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়েও তা'রা এর প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু প্রত্যেক বাঙালী সেদিন এই কবিতার প্রত্যেকটি শব্দের রাজনীতিক মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিল। তামস-প্রকৃতি ইংরেজের বিরুদ্ধে অমৃতের সন্তান বিপ্লববাদীগণের উদ্দেশ্যে মহাকবি তাঁর এই কালোত্তীর্ণ কবিতায় আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন!—যাই

হোক, এই কবিতাটির মধ্যে বিপ্লববাদীগণের প্রতি মহাকবির আন্তরিক অনুরাগের গন্ধ পেয়ে তৎকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এটি বক্সাদুর্গের বন্দীগণের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে রাজি হননি। কবিতাটি যথাসময়ে অমল হোম মহাশয়ের হাতে ফিরে আসে, এবং 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এক নিরীহ জাতি বাস করে ভূটান পাহাড়ের গহনলোকে। ওদের নাম 'টোটো' জাতি। আপাতত এই 'টোটো বস্তিটির' দুস্তর অঞ্চল আলীপুর দুয়ারের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র জাতির লোকসংখ্যা অল্পবিস্তর সাড়ে তিনশো থেকে চার শো'র বেশী নয়। এরা একদা পাহাড়পর্বতে কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পেয়ে প্রবাদমতো টোটো ক'রে ঘুরে বেড়াতো বলেই এদের নাম 'টোটো', —অর্থাৎ আশ্রয়চ্যুত ভবঘুরে। এরা চিরকাল মার খেয়েছে পাহাড়ে-পাহাড়ে নেপালী আর ভূটানীদের হাতে। পাথরে পাথরে মাথা ঠুকে বেড়িয়েছে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে। দারিদ্র্যে কুষ্ঠব্যাধিতে অন্নাভাবে অনেকে বিকলাঙ্গ। ওদের ভাষা ওদের নিজস্ব,—না ভূটানী, না নেপালী, না বা সিকিমী। ওরা প্রায় এবার সবংশে ধ্বংস হয়ে এলো, আর দেরি নেই! হয়ত বা ওদেরকে বাঁচাবার জন্য এক আধজন মানবপ্রেমিক ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়,—কিন্তু সে মার খেয়ে ফিরে আসে। পাহাড়ী নেপালী আর ভূটিয়া ওদের ভাগ থেকে জমী আর অন্ন কেড়ে নেয়, ভেঙে দিয়ে যায় ওদের ঘরকন্না। কিছুদিন আগে একটি বাঙালী যুবক এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গিয়েছিল 'টোটো' বস্তিতে, কিন্তু বাগে পেয়ে নির্মমভাবে বিরোধীপক্ষ তাকে হত্যা করে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে আলীপুর দুয়ারের কর্তৃপক্ষ টোটোদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন, —তা'রা যেন দ্রুততর গতিতে নিশ্চিহ্ন না হয়। 'টোটো'দের জাতিপরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

'টোটো' পাহাড়ের বস্তি জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যেই পড়ে, কিন্তু তবু এটি ভূটানী অঞ্চল। সমস্ত প্রকৃতি হোলো ভূটানী। এখানে খরস্রোতা 'আমো-চু'-র নাম হয়েছে 'তরসা।' এরই কোনও এক তটে 'টোটো' পাহাড়,—মানবসমাজের বাইরে। জলা জঙ্গল পাহাড়—এ ছাড়া আর কিছু নেই। এর বাইরে জগৎ আছে, টোটোরা জানে না। সভ্যসমাজের লোকেরা অনেকে হাতীর পিঠে চ'ড়ে টোটোবস্তির চেহারা দেখে আসে। ওই মানহারা মানবগোষ্ঠীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে সভ্য মানুষের মাথা হেঁট হয় বৈকি।

খুঁটির সাহায্যে মাচান বানিয়ে তা'র ওপর ওরা চালাঘর তৈরি করে। যেমন আলীপুরে, যেমন শিলিগুড়ি আর আসামে। জলের ভয়, জন্তুর ভয়, সরীসৃপের ভয়। ওরা ডাকলেও আসবে না সভ্য জগতে, ওরা মিলতে চাইবে না কারো সঙ্গে,—পাছে ওদের ধর্মবোধ আপন স্বাতন্ত্র্যকে হারায়, এই আশঙ্কা। ওরা

ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক, অতিশয় আত্মবাদী, জাতি-অভিমানী, স্বকীয়তার অনুরাগী,—সম্ভবত এই সব কারণে ওরা মার খেয়ে আসছে যুগে যুগে। ওই বস্তিতেই ওদের এক একটি পাড়া,—তার কর্তা হোলো এক একজন মোড়ল। মোড়লরাই ওদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওদের দেবতা আছে, পালপার্বণ আছে, নাচ গান বিবাহ আছে, সমাজব্যবস্থাও আছে। ওদের প্রধান জীবিকা হোলো পরের জন্য খাটা। এ ছাড়া ক্ষেতখামার আছে কিছু কিছু। ওইতে ওরা শাকসব্জি বানায়, অল্পস্বল্প লাঙগল চষে। এমনি করেই দিন যায়। সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ওদেরকে বাঁচাবার জন্য নানাবিধ সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে শুনতে পাওয়া যায়। ঔষধ পথ্য পানীয় এবং আশ্রয়—এদের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, মানুষ ক'রে তোলার সাংস্কৃতিক দায়িত্বও পালন করা চাই।

দেবাদিদেব হিমালয় তাঁর সহস্র জটা বিস্তার ক'রে চোখ বুজে রইলেন ভূটানের হিমালয়ে। রইলো চমলহরি আর কৃষ্ণপর্বতের গগনভেদী রৌপ্যচূড়া, রইলো 'মনিউল, কাংটো আর মাগোর' দুরতিক্রম্য গিরিসংকট, রইলো পুণাখা থেকে সুদূর দুর্গমলোকে ক্যারাভান পথ,—যে-পথ গেছে তিব্বতের অজানা অনামা বালুপাথরের প্রান্তরে,—কিন্তু তাঁর পায়ের নীচে রয়ে গেল সহস্র সর্বনাশা নদীর ধারা, অনধ্যুষিত অপরিচিত বিশাল জলাজঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ,—যেখানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, হায়না, অজগর, শূকর, হরিণ, শম্ভর, সরীসৃপ, ইত্যাদির অবাধ স্বচ্ছন্দ রাজরাজত্ব। তিনি নিমীলিতনেত্র যোগাসীন, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই কল্পে কল্পান্তে। চরাচরব্যাপী পশুদল রইলো তাঁর আসনের নীচে,—প্রসন্নবদন পশুপতি রইলেন ধ্যানগম্ভীর!—

॥ ১০ ॥

কোশীর সাঁকো আরেকবার পার হচ্ছিলুম। পাহাড়ের প্রাকার-চক্রান্ত ভেদ ক'রে সাঁকোর তলা দিয়ে কোথা থেকে যেন আলো এসে পড়েছে। পাহাড়ের শিরদাঁড়ার এটা পশ্চিম পার, আমরা যাবো পূর্বপারে। নদী পেরিয়ে গাড়ী চললো আবার চড়াইপথে।

যাচ্ছিলুম আলমোড়া শহরের দিকে। শশাঙ্কবাবু সঙ্গেই আছেন।

আটমাইল চড়াইপথ আর বাকি। কিন্তু এবার একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। পাহাড় জরীপ ক'রে একদা যারা মোটরপথ বা'র করেছিল তাদের উদ্দেশে ধন্যবাদও জানাই, ক্ষুরে-ক্ষুরে নমস্কারও করি। মনে কৌতুক ছিল বটে, কিন্তু ভয় আর অপঘাতের দুর্ভাবনা সর্বশরীরকে আড়ষ্ট ক'রে রেখেছিল ঘণ্টা কয়েক। যকৃতে মোচড় লেগেছে বার বার, কাঠ হয়েছে মেরুদণ্ড, বিপ্লব বেধেছে অন্ত্রেতন্ত্রে কতবার। আর হৃদ্‌যন্ত্র,—থাক্‌, হৃদয়ের কথা আর নাই তুললুম। পাহাড়ের প্রত্যেক 'বেণ্ডে' মৃত্যুর ভয় পেয়ে আমার অন্তর্যামী বাঁধন কেটে পালাবার চেষ্টায় ছিল। শশাঙ্কবাবুর সুবিধা এই, ভয়-ভাবনা তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করে না। গাড়ীর জানলা দিয়ে ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া পেলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়তে জানেন।

'গাগর' গিরিশ্রেণী ছেড়ে 'কূর্মাচলে' এসে ঢুকেছি। এটি আলমোড়ার অপর নাম। কুমায়ুন নামটি এসেছে কূর্মাচল থেকে, লোকে বলে। নাম কেন বদলায় বার বার, জানিনে। কিন্তু বদলায়। দেশের নাম, নগর ও পাহাড়ের নাম, আঞ্চলিক নাম,—সবই বদলায়। হস্তিনাপুর থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, তারপর দিল্লী। লক্ষণাবতী হোলো লক্ষ্ণৌ। পাটলীপুত্র পাটনা। কাশী, 'জীত্বরী', বারাণসী, বেনারস, বানারস,—এখন আবার নাকি ফিরেছে 'বারাণসীতে'। পিটার্সবাগ, পেট্রোগ্রাড, লেনিনগ্রাড। সিন্ধু, হিন্দু, ইন্দো, ইন্দা, ইণ্ডিয়া,—অথচ 'ভারত' সকলের আগে। পাহাড়ের নামও বদলেছে যখন খুশি। গৌরীশিখর হয়েছে এভারেস্ট। কৃষ্ণগিরি হোলো কারাকোরম। কালদণ্ড হোলো লান্সডাউন। আরও আছে অনেক। কূর্মাচলকে কেউ আবার বলে 'কূর্মাঞ্চল'। কিন্তু নদীর নাম কথায়-কথায় বদলেছে এখনও শুনিনি। ওটা স্থানু নয়, ধারাবাহিক—তাই হয়ত টিঁকে আছে। গঙ্গা হোলো গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর,—এই দুহাজার মাইলে হাত দিতে হয়ত কেউ ভরসা পায়নি। অনেকের নিজের নামটি বদলাবার সখ আছে, কিন্তু বাপের নামটি বদলাতে ভয় পায়। প্রথমত সম্পত্তি আর পরিচয় নিয়ে টানাটানি, দ্বিতীয়ত জননীর প্রতি অবিচার।

এলোমেলো কথা নিয়ে চ'লে এসেছি অনেকটা পথ। গাড়ী হাঁসফাঁস করতে

















করতে ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। মধ্যাহ্নকাল সমাগত, দক্ষিণ পাহাড়ের প্রায় শিখরে হেমন্তের সূর্য। এবার দূরের থেকে দেখা যাচ্ছে আলমোড়া। কিন্তু শহর তখন অনেক উঁচুতে। আমাদের সামনে সুদীর্ঘপথের রেখা উত্তরে প্রসারিত। উত্তর দিয়ে ঘুরে আমরা যাবো পূর্বে।

মধ্যাহ্ন প্রখর, শীতের হাওয়া এখনও ওঠেনি আলমোড়ায়। আমরা উঠে এলাম আলমোড়া শহরের প্রধান রাজপথে—এটির নাম 'গান্ধীমার্গ'। শহর মস্ত বড়। নৈনীতালকে ছেড়ে দিলে আলমোড়ার মতো বড় শহর কুমায়ুনে আর নেই। কাঠগোদাম ষ্টেশন থেকে আলমোড়ার দূরত্ব হোলো পঁচাশী মাইল মোটরপথে,—বরং কিছু বেশী। কিন্তু রামগড়ের পথ দিয়ে এলে পথ অর্ধেক কমে যায়। তবে সে-পথটি পায়ে হাঁটা, কিংবা ঘোড়া অথবা ডাণ্ডি।

'আনন্দময়ী' ধর্মশালা ছাড়িয়ে আমরা এসে উঠলুম 'রয়াল' হোটেলে। প্রথমেই যেটি চোখে পড়ে সেটি হোলো জলাভাব। জল আলমোড়ায় বড় কম—অবশ্য, আমি শহরের কথা বলছি,—জেলার কথা নয়। যেটি কালীগংগা, ধবলী-গংগা, কোশী, গোমতী ইত্যাদির দেশ, সেখানকার সর্বপ্রধান শহরে জলের অভাব বৈজ্ঞানিক যুগে এটি মন মানতে চায় না। সম্ভবত এর প্রধান কারণ, শহরের সংগে উচ্চতর কোনও বড় পর্বতের ভূসংযোগ কম। জলের ব্যবস্থা করতে হয় নীচের থেকে। প্রসংগক্রমে বলে রাখি, যে সমস্ত উঁচু পাহাড়ে ঝরণা নেই, কিংবা যে সকল শিখরলোকে জলের সংস্থান কম, তার ত্রিসীমানায় যায় না কেউ—সে সব পাহাড় ভীতিজনক। সেই কারণে সাধুসন্ন্যাসী হোক আর পার্বত্য অধিবাসীই হোক,—সবাই খোঁজে সুউচ্চ পাহাড়ের কোল। যেখানে ঝর্ণারা নামে, সেখানে গুহাগহ্বরের আশপাশ একটু বনময়,—যেখানে নির্মল জলের ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার, ঝর্ণামাত্রই নিরাপদ নয়। অনেক প্রকার বন্য এবং উদ্ভিজ্জ লতার ধোয়াট নামে অনেক ঝর্ণায়, অনেক প্রকার ধাতব মিশ্রিত থেকে যায়। বিশেষ ক'রে পাহাড়ের উপর দিকে যদি জনবসতি থাকে, তবে সেই পাহাড়ের নীচেকার ঝরণাগুলি অত্যন্ত দূষিত জল নিয়ে নামে। উদরের পীড়া হোলো পাহাড়ের মারাত্মক পীড়া। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকেও পাহাড়ে ভিড়ে ভিড়ে পেটের ব্যামোয় মরতে দেখেছি। সাধু সন্ন্যাসীদের কথা আলাদা। যানবাহনের প্রবল ভীড়ের মধ্যেও কলিকাতার স্বল্পবেতনভোগী হতভাগ্য কেরানীরা যেমন সহসা গাড়ীচাপা পড়ে না, সেইরূপ অর্ধাহারী অর্ধনগ্ন সাধু-সন্ন্যাসীরাও ঝরণার জলের হাত থেকে বাঁচে।

বেশ আছি 'রয়াল হোটেলে।' একটু বড়মানুষী, একটু বিলাস,—একটু বা ছড়ি ঘুরিয়ে পাহাড়ের 'রীজের' ওপর দিয়ে অনেক দূর চ'লে যাওয়া,—দিন কেটে যাচ্ছে ভালোই। শহর বড় আকর্ষণ নয়,—কেননা কলকাতার চৌরংগী দেখা আছে, বহুবাজার ষ্ট্রীটও চিনি। এটি জেলার প্রধান কর্মকেন্দ্র, সুতরাং কোর্ট-কাছারি থেকে আরম্ভ ক'রে গোরাছাউনী ও বাজার-হাট সবই আছে।

আবহাওয়ার দিক থেকে নৈনীতাল অপেক্ষা এখানে ঠাণ্ডা বোধ হয় একটু কম। নৈনীতালে এরই মধ্যে কনকনানি এসে গেছে, কিন্তু আলমোড়ায় এখনও হাওয়া ওঠেনি। অনেক মন্দির এবং অনেক দেবস্থানে মঙ্গোলীয় স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে। পশ্চিম তিব্বতের পথ এখান থেকে সর্বাপেক্ষা সহজ। তিব্বতের সঙ্গে আলমোড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সর্বত্র বিদ্যমান।

আলমোড়ার একান্তে রয়েছে প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজাদের একটি পুরাতন দুর্গ। মন্দির অনেকগুলি। তাদের মধ্যে নন্দাদেবী, ত্রিপুরাসুন্দরী, পাতালদেবী, কাসারদেবী, বদ্রীশ্বর—এগুলি প্রধান। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন শহর থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি অতি রমণীয় এবং নিরিবিলি পাহাড়ের কোলে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কোনো কোনো সময়ে অভ্যাগতরা বাসস্থান পেয়ে যান্।

নানাপথ এখান থেকে নানাদিকে চ'লে গেছে। কিছুদূরে কাসারদেবী পাহাড়ের কোলে জনৈক আমেরিকান সাধু একটি পাইনের বনে তাঁর একটি আশ্রম বানিয়ে রয়েছেন। আরো রয়েছেন কয়েকজন পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ও সংসারত্যাগী ব্যক্তি, এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে তাঁরা অধ্যাত্ম-সাধনা করেন। আলমোড়ায় যে বন্য প্রকৃতির একটি প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, সেটি নৈনীতালে ঠিক তেমনটি নেই। আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে যে স্থূল উপকরণ-বাহুল্য দেখা যায়, তা'র থেকে স'রে যেতে চাইছে সৌন্দর্যপিপাসু মন,—যে-মন দার্শনিক। সম্ভোগের প্রচুর উপকরণ দেখে ভয় পেয়েছে অনেক চিন্তাশীল মন, পাছে তাদের তলায় চাপা পড়ে মানুষের মহৎ বৃত্তি, পাছে সুখভোগের বিপুল বস্তুসম্ভার তাদের পরমার্থ পিপাসা ও তত্ত্বজ্ঞানের পথে বিঘ্ন ঘটায়। আলমোড়া থেকে প্রায় কুড়ি বাইশ মাইল দূরে পাহাড় প্রকৃতির একটি অতি মনোরম নিভৃত কোণে আরও কয়েকজন পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিত ও সাধক অপর একটি আশ্রম বানিয়েছেন। আশ্রমটির নাম হোলো 'উত্তর বৃন্দাবন।' এখানে আছে শ্রীকৃষ্ণের একটি মন্দির। চিতোরের রাণাকুম্ভের পত্নী মহীয়সী মীরাবাঈ যে ধরনের সাধন-ভজনের পথে আপন জীবনকে সার্থক ক'রে তুলেছিলেন, এখানকার সজ্জন সাধুগণ অনেকটা যেন সেই প্রকার আপন জীবন ও সত্তাকে বিলীন ক'রে রেখেছেন। এ'দের মধ্যে একজন সাধক তাঁর পাণ্ডিত্য, রসবোধ এবং অধ্যাত্ম তপস্যার জন্য বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। তাঁর নাম কৃষ্ণপ্রেম, ওরফে রোনাল্ড নিক্সন্; আরেকজন আছেন, 'আনন্দপ্রিয়', ওরফে মেজর আলেকজান্দার। 'উত্তর বৃন্দাবনে' আরও অনেকেই আছেন তাঁদের সঙ্গে। বিস্ময়ের কথা এই, যে-কাশ্মীরকে কথায়-কথায় ভারতের 'ভূস্বর্গ' বলা হয়,—সেখানে সাধুসন্তসন্ন্যাসীর আশ্রমসংখ্যা খুবই কম। হিমাচল প্রদেশে, পাঞ্জাবে, পেপসুতে,—অর্থাৎ হিমালয়ের দুস্তর উত্তর অঞ্চলে ঠিক সাধুর আশ্রম, তপোবন, কুটীর প্রভৃতি বলতে যা বোঝায় তা'র সংখ্যা খুব গণ্য নয়। সংসারত্যাগী, বৈরাগী, গৃহবিমুখ, সন্ন্যাসী—এরা সবাই আপন আপন আবাসস্থল নির্বাচন

করেছেন প্রধানত কুমায়ুনে। আবার কুমায়ুনের মধ্যে নৈনীতালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁদের কম। তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালে আর কুর্মাচল আলমোড়ায়। হয়ত এ দুটি অঞ্চল 'গাঙ্গেয়', সে কারণেও হ'তে পারে। এ দুটি অঞ্চলে এসে পেঁছিলে চিন্তা ও ভাবনার পথ সহজেই যেন অধ্যাত্মগতি লাভ করে। সভ্যতার থেকে দূরে, সকল প্রকার লোককোলাহলের বাইরে, বাস্তব প্রয়োজনের অতিক্রান্ত যে-জীবন আপন সৌরবিশ্ব রচনার একটি স্বাচ্ছন্দ্য পায়, গাড়োয়াল এবং আলমোড়ার পাহাড়ে ও গিরিনদীতটে তা'র সন্ধান মেলে।

কুমায়ুনের দুই সীমানায় দুটি প্রধান নদী। পশ্চিমে শতদ্রু, পূর্বে কালীগঙ্গা। দুইয়ের মধ্যে দুশো মাইলের ব্যবধান। এই দুশো মাইলব্যাপী সমগ্র উত্তরলোক কমবেশী পনেরো থেকে ষোল হাজার ফুট উচ্চ পর্বত প্রাকারের দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাকারের ওপারে হোলো পশ্চিম তিব্বত। পশ্চিম তিব্বতের একটা বড় অংশ একশো পনেরো বছর আগে ভারতীয় কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেটি হোলো লাডাখ পর্বতমালা এবং তার পারিপার্শ্বিক অঞ্চল। সেখান থেকে দক্ষিণে নেমে শতদ্রু পার হয়ে আবার ভারত-তিব্বত সীমানা সোজা এসেছে দক্ষিণে। এখানে তিব্বতে প্রবেশকালে প্রথম যে গিরিসংকট পাওয়া যায় তা'র নাম হোলো 'শিপ্‌কি।' শিপ্‌কি বুশাহর রাজ্যের শেষ সীমানা। শিপ্‌কির পর থেকে সুদীর্ঘ দুশো মাইল অতি দুর্গম পর্বতমালার দেশ। কিন্তু মানুষের অধ্যবসায় এই দুঃসাধ্য এবং ভয়ভীষণ প্রাণিশূন্যপ্রায় গিরিশৃঙ্গদলের ভিতরে-ভিতরে আরও অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম একে একে আবিষ্কার করেছে। তা'রা হোলো 'ঠাগা, মানা, নিতি, শল্‌শল্‌, আন্তধুরা, দরমা, লাম্পিয়া,'—এবং অবশেষে হোলো লিপুলেক। লিপুলেকের পাশেই কালীগঙ্গার উৎপত্তিস্থল। ভারতের সীমানা আপাতত ওখানেই শেষ, অর্থাৎ কালীগঙ্গার পূর্বপারে হোলো নেপাল, কিন্তু কালীগঙ্গার ধারাটি ভারতসীমানারই অন্তর্ভুক্ত।

লিপুলেক থেকে টনকপুর—উত্তর থেকে দক্ষিণ—কমবেশী প্রায় দুশো মাইল হাঁটা পথ। এই দুশো মাইল দীর্ঘ হোলো কালীগঙ্গার ধারা। সম্প্রতি টনকপুর থেকে পিথোরাগড় অবধি মোটরপথ গেছে, এবং পিথোরাগড় থেকে আশকোট পর্যন্ত মোটরপথ নিয়ে যাবার কথা এই সেদিনও চলছিল। যদি পথটি সম্পূর্ণ হয়ে যায় তবে কৈলাস-মানসের তীর্থযাত্রীর পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। কেননা আলমোড়া থেকে 'আশকোট' অবধি সত্তর মাইল পায়ে হাঁটা পথ ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণে টনকপুর থেকে 'আশকোট' পর্যন্ত নব্বই মাইল পথ তা'রা মোটরযানে অতিক্রম করতে পারবে। হয়ত শীঘ্র এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে, আলমোড়া শহরকে ছেড়ে দিয়ে 'আশকোট' হবে কৈলাস-মানস যাত্রার প্রধান প্রারম্ভ-কেন্দ্র।

কৈলাস এবং মানস সরোবর তীর্থযাত্রার আলোচনাটা, বলা বাহুল্য,

আলমোড়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভারতবর্ষের যে কোনও অঞ্চল থেকেই কৈলাসের পথে যাওয়া চলে—এমন কি কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, সিকিম, দার্জিলিং, ও আসাম থেকেও যাওয়া সম্ভব। এই সকল অঞ্চল দিয়ে কৈলাস ও তিব্বতে যাবার জন্য ক্যারাভান পথ আজও চালু আছে। অভিযাত্রিকের যাবার পথ চিরদিনই অবারিত। কিন্তু সেই অতিমানবিক কষ্টস্বীকারের ধৈর্য এবং অসীম অধ্যবসায় গৃহগতপ্রাণ বাঙালী চরিত্রে কম। যদি কেউ কাশ্মীর থেকে কৈলাস-মানসে যায় তাকে ছয়শো মাইলেরও বেশী অতিক্রম করতে হবে। পথ হোলো শ্রীনগর থেকে 'লে' (লাডাখ), এবং সেখান থেকে দক্ষিণে 'তাসিগঙ', গারটক, 'তীর্থাপুরী' ও কৈলাস। পাঞ্জাব দিয়ে গেলে শিমলা, নারকান্দা, চিনি, শিপ্‌কি ও গারটকের পথ। এই সব দুস্তর অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ক্যারাভানের সঙ্গে সঙ্গে অভিযান করলে কেউ বাধা দিচ্ছে না! পথ ডাকছে, কিন্তু সাড়া দিচ্ছে কে? সেই দুরন্ত যৌবনের আত্মবিদারণ সকলের জীবনে ঘটে না। আখড়ায় গিয়ে কুস্তি শিখলে মাংসপেশী ফোলে, ডন-বৈঠক-মুগুর ভাঁজলে সুন্দর দেহ তৈরী হয়,—কিন্তু ওকে কি দুর্জয় সৎসাহস বাড়ে? দুঃখ-দুর্যোগ-ভয়—এদের জয় করার মতো উদ্দীপনা ওতে আসে কি? ব্যায়ামের দ্বারা ধৈর্য ও অধ্যবসায় পাওয়া যায় কি?

'নিতি' গিরিসংকট হোলো গাড়োয়ালের উত্তরে। 'হোতি-নিতি', 'গুন্‌লা-নিতি' এবং 'দামজান-নিতি।' যোশীমঠ থেকে অগ্রসর হ'লে এই তিনটি পথে তিব্বতে প্রবেশ করা যায় এবং এক একটিতে দেড়শো থেকে দুশো মাইল পর্যন্ত গেলে কৈলাস-মানস। আহার, আশ্রয় এবং ঘোড়া—এ তিনটেই নিয়মিত মেলে না বটে, কিন্তু তবু অনেকে যায়। হিমালয়ের টান হোলো অপ্রতিরোধ্য টান। যে ব্যক্তি শোনে, সে ঘরে থাকে না। যে-ব্যক্তি একবার যায়, সে ওখানকার ওই দুঃখে, দুর্গমে, দুর্যোগে গিয়েই আনন্দ পায়,—ঘরে তা'র সুখ নেই। ওই ছিন্নভিন্ন পোষাকপরা ধূলিমলিন পার্বত্যসন্তানদের দরিদ্র ঘরের কাঠের আগুনের আভায় ব'সে তা'রা আনন্দ পায়। ওই দুরারোহ গিরিমালার আশেপাশে, গুহা-গহ্বরে, গিরিনদীর তটে-তটে, এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে—তা'রা ঘুরে বেড়ায়। আনন্দের অসহ যন্ত্রণা, সুখের নিবিড় অশ্রুসজলতা, বেদনার বিচিত্র আনন্দ,—এরা তা'কে ফিরতে দেয় না, স্থাণু থাকতে বলে না,—আঁচলের তলায় ফিরে যাবার পথ দেখায় না। কত কঠিন মন গ'লে গেছে হিমালয়ের পাথরে-পাথরে মাথা ঠুকে, কত দস্যুরত্নাকর মহামুনি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছে,—কেউ তা'র খোঁজ রাখে না। জীবনের পণ্য হারিয়ে গেছে কত মানুষের, কত বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে, কত ঈশ্বর কতবার পথের ধূলোয় আসন নিয়েছে,—কেউ কি তা'র খবর জানে? মেঘলোকে উধাও হয়েছে, তুষারদেশে হারিয়ে গেছে, কেঁদে-কেঁদে নিরুদ্দেশ পাহাড়ে মিলিয়েছে,—তা'দের সংখ্যাও ত' কম নয়! দার্শনিক তা'র জ্ঞানকে ঘষেছে হিমালয়ের কষ্টিপাথরে, কত নারীতপস্বিনী

তাদের কঠিন জপের মন্ত্র পাঠিয়েছে ওই রণোন্মত্তা পার্বতীনদীর সফেন ধূম্র-জটার স্তবকে স্তবকে,—হিসাব রেখেছে কি কেউ?

কৈলাস-মানস কঠিনসাধ্য,—কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পথ আলমোড়া। আলমোড়ার নীচে দিয়ে গেছে দুএকটি পথ,—কোনটি সরযূ, কোনটি বা গোমতীর তীরে তীরে,—কিন্তু বিশেষ একটি অঞ্চলে গিয়ে তাদেরকে মিলতেই হয়েছে। প্রধান এবং সুবিধাজনক পথ হোলো আলমোড়া থেকে থাল, আশকোট, জওলজিবি, ধরচুলা, খেলা, মাল্পা, গারবিয়াঙ, লিপুলেক ও তাকলাকোট। কিন্তু মাঝখানে একটি শাখাপথ 'খেলা' অঞ্চল থেকে ধবলীগঙ্গার তীরে তীরে চ'লে গেছে 'পঞ্চোলী' ওরফে 'পঞ্চচুলীর' উত্তুঙ্গ শিখরলোকের পূর্বপ্রান্ত ঘেঁষে সোজা উত্তরে 'দরমা' গিরিসঙ্কট পেরিয়ে। এই পথে পাওয়া যায় পশ্চিম তিব্বতের একটি প্রধান বাণিজ্য শহর। নাম, 'গিয়ানিমা মণ্ডি'। এই কেন্দ্র থেকে কৈলাসের দূরত্ব বোধ হয় প্রায় সত্তর মাইল, এবং মানস-সরোবরের দূরত্ব খুব সম্ভব পঞ্চাশ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু এ পথটি ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক,—তীর্থযাত্রীর পক্ষে দূর হয় একটু বেশী।

আলমোড়া থেকে কুড়ি মাইল দূরে সরযূ নদী পার হয়ে চ'লে গেছে 'থাল'-এর পথ। মাঝখানে পেরিয়ে যেতে হয় 'ভেরিনাগ'। 'ভেরিনাগ' থেকে হিমালয়ের কয়েকটি তুষারচূড়া দেখে মন মুগ্ধ হয়ে যায়। নন্দাদেবী, নন্দকোট, ত্রিশূল ও পঞ্চচুলীর শোভা এখানে হিমালয়ের চিররহস্যকে কথায়-কথায় প্রকাশ করতে থাকে। এর পরে আশকোট, জওলজিবি ও ধরচুলার পথ। নদী, ঝরণা, উপত্যকা, অরণ্য, মন্দির এবং বিভিন্ন দেবস্থান—সমস্ত মিলিয়ে ধীরে ধীরে তীর্থযাত্রীকে কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন করতে থাকে। এ হোলো ডাকিনী মায়ার টান। স্নেহমমতার টান, সংসারের প্রতি আসক্তি, বিষয়-বৈভবের প্রতি আকর্ষণ, সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার স্মৃতি, সমস্তই যেন লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে, গত-কালের কথা গত জীবনের মতো বিলীন হয়ে যায় যেন জন্মান্তরে। তুমি নিজে যাচ্ছ না, কোনও শক্তি তোমার নেই,—কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি তোমাকে ঠেলছে পিছন থেকে, এবং অন্য শক্তি টানছে তোমাকে সামনের দিকে। হিঁচড়ে-হিঁচড়ে টানছে! ক্ষতবিক্ষত হচ্ছ, কিন্তু নিজে তুমি দায়ী নয়। দুর্গম পার হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু নিজের শক্তিতে নয়। মৃত্যু লেলিয়ে দিচ্ছে কেউ, মুখ দিয়ে রক্ত আর ফেনা তুলে দিচ্ছে, শরীরকে শীর্ণতর করছে। দুঃসহ দুঃখ, ভয়, বাধা—এরা পথরোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে, দুঃস্বপ্ন আর চিত্তগ্লানিতে ঘুলিয়ে উঠছে তোমার প্রতি পদক্ষেপ। পাহাড়ী সাপ দিচ্ছে ছেড়ে কোথাও কোথাও তোমার পায়ের তলায়, ঘোড়া কিংবা ঝব্বু থেকে ফেলে দিচ্ছে তোমার অসতর্কক্ষণে, অন্ন আর আশ্রয় কেড়ে নিচ্ছে কোথাও কোথাও। বিরাট খদের মৃত্যুগহ্বরের নীচে তোমার

সাংঘাতিক অবলুপ্তির জন্য ডাকছে তোমাকে পিশাচীর করাল দৃষ্টি,—কিন্তু তবু তুমি সমস্ত অস্বীকার ক'রে এগিয়ে যাচ্ছ। তুমি নয়, অন্য কেউ। যে ব্যক্তি গারবিয়াং-কালাপানির দিকে এগোচ্ছে, যে-ব্যক্তি গৌরীগঙ্গা আর কালীগঙ্গার ধারে ধারে চলেছে,—সে তুমি নয়, তোমার থেকেই বেরিয়ে এসেছে আরেকজন,—তা'কে তুমি চিনবে না! সে দুঃখের আগুনে জ্বলে-পুড়ে এবার খাঁটি হয়েছে, সে প্রকাশ করেছে তা'র দুঃখদীর্ণ প্রাণের একাগ্রতা, প্রমাণ করেছে তা'র প্রবল আন্তরিকতা। দৈত্য-দানব প্রেতিনী-পিশাচীর ভয়ে আপন যজ্ঞ সে পণ্ড করেনি, প্রবল প্রাণ এবং অটল বিশ্বাসকে শত দুর্যোগেও সে হারায়নি। আতঙ্কের ভিতর থেকে সে বীর্যলাভ করেছে, মৃত্যুভয়ের চক্রান্ত থেকে লাভ করেছে সে অভয়মন্ত্র। একথা সে প্রমাণ করার চেষ্টা পেয়েছে যে, দুর্গম তীর্থপথে যাত্রা করাই হোলো আত্মশুচিতা সম্পাদনের প্রধান পথ। তুমি তাকে চিনবে না! তা'র জন্য দ্বার খোলা হচ্ছে অলকায়, ডাক দিচ্ছে তা'কে 'স্বর্ণভূমি'। সে এবার উঠে এসেছে মৃত্যুর থেকে জীবনে, জীবন থেকে চলেছে মহাজীবনে। কিন্তু সেখানেও হবে তা'র শেষ পরীক্ষা। তুষাররাজ্যে প্রবেশ ক'রে লক্ষ লক্ষ বৈদুর্যমণির জ্বলজ্বালায় তা'র চোখের মণি হয়ত অসতর্ক মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হবে। কিন্তু তারপরে তা'র দৃষ্টিতে আসবে প্রশান্তি। দর্শন করবে সেই দিব্য দীপ্যমান বিভা, যার ফলে পলকের মধ্যে তা'র যোগসমাধিলাভ ঘটবে, সমগ্র জীবন যার দর্শনমাত্র শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করবে।

কৈলাস ও মানসসরোবর যাত্রাই হোলো তীর্থযাত্রার পরম সার্থকতা!

'চিতাই' রোড ধ'রে ফিরে আসছিলুম। 'নারায়ণ তেওয়ারি দেওয়াল' পেরিয়ে গণেশ মন্দির ছাড়িয়ে চলেছি। ভরা শুক্লপক্ষে মায়ারহস্য ফুটেছে পাহাড়ে এবং পূর্বপাহাড়তলীর উপত্যকায়। ডানদিকে সরকারী এক একটি কর্মকেন্দ্র। আরেকটু এগিয়ে এলে সরকারী জেল। জেলের ভিতরে কয়েদীদের জীবনযাত্রা জানার উপায় নেই বটে, কিন্তু এমন নিভৃত অঞ্চলে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে জেলখানা দেখলে কয়েদীদের প্রতি একটু ঈর্ষা হয় বৈকি। দার্জিলিঙের কথা মনে পড়ছে। লুইস জুবিলীর বারান্দায় দাঁড়ালে নীচের দিকে জেল্; চম্পাবতীর সেই ময়দানের ধারে দাঁড়ালে ইরাবতীর কোলে সেই জেল্! প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিশেষ ক'রে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি জেলখানা দেখে খুবই আনন্দ পাওয়া যায়।

পথ নির্জন চন্দ্রালোকিত। কতকটা পরিশ্রমসাধ্যও ছিল। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে বনবাগান ঘুরে শশাঙ্কর সঙ্গে ফিরছিলুম। শহরে এসে পৌঁছতে আর বাকি নেই। এমন সময় দূরের থেকে দুটি লোককে কাছে আসতে দেখা গেল। একজন কথা বলছে গলগলিয়ে, আরেকজন অসীম

ধৈর্যসহকারে শুনছে। কাছাকাছি এসে পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় বাক্যবাগীশ লোকটি সহসা থামলো, এবং আমাদের দিকে ফিরে বিনা ভূমিকায় পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করলো, আপনারা বাঙগালী নিশ্চয়?

ঈষৎ বিস্মিত হলুম। ভদ্রলোকটি সুশ্রী এবং সৌম্যদর্শন। তাঁর পোষাকটি ঘোড়সওয়ারের মতো। পরণে 'ব্রীচেস।' নীচের দিকে বুট, এবং হাতে একটি ছড়ি। পল্টনের লোক মনে করেছিলুম। প্রশ্নের জবাবে বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভদ্রলোক বললেন, আমি বলদেও যোশী। বহুদিন বাঙগলায় ছিলুম। ভারতের মধ্যে আমার সকলের বেশী প্রিয় বাঙগলা দেশ।

প্রশ্ন করলুম, আপনি কি পাটের কারবার করেন?

হাসিমুখে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, একেবারেই না।

সবিনয়ে জানালুম, যাঁরা পাট, কাপড়, বনস্পতি কিংবা সরষের তেল এসব নিয়ে কারবার করেন—বাঙগলা তাঁদের কাছে খুবই প্রিয়।

এ আপনার ভুল ধারণা!—যোশী কলরব ক'রে উঠলেন, তারাই সব চেয়ে বেশি হেনস্তা করে বাঙগলাকে। তারাই বাঙগলাকে নির্বোধ বানিয়ে লাখো লাখো টাকা নিয়ে যায়। দেখুন, এ নিয়ে অনেক কথা উঠবে, আমি বেশী বাড়াতে চাইনে। কিন্তু আমার কাছে বাঙগালী নমস্য। বাঙগালীর পায়ের কাছে ব'সে একদিন আমি পলিটিক্স-এ দীক্ষা নিই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আমার পরম গুরু। গান্ধীজির পরে তিনিই বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ভদ্রলোক তাঁর সুদীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের কাহিনী আরম্ভ করলেন। একটা সময়ে তিনি নাকি সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। সেটি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ,—'বেঙগল ভলাণ্টিয়ার্সের' জন্মকাল। বিরাট শোভাযাত্রাসহ আবেদন নিয়ে যাচ্ছেন সুভাষচন্দ্র সেবারকার কলকাতার কংগ্রেসমণ্ডপে। সুভাষ-চন্দ্রকে সমর্থন করছেন জওয়াহরলাল। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জওয়াহরলালের পিতা পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু। সুভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেস সভাপতির শোভাযাত্রার 'জেনারল অফিসার কমাণ্ডিং ইন্ চীফ।' অশ্বারোহী সুভাষ, সৈনিকের পোষাকে সুভাষ,—এবং সেই পোষাকের সম্মান তিনি রেখেছিলেন পরে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে। যাই হোক, আমি সেই 'বেঙগল ভলাণ্টিয়ার্সের' প্রধান অফিসার ছিলুম!—মিঃ যোশী সোচ্ছ্বাসে গল্পটা বলতে লাগলেন।

ঘণ্টাখানেক ধ'রে তিনি আমাদের কারোকে কথা বলতে দিলেন না এবং এমন চমৎকার ক'রে তাঁর গল্প বলতে লাগলেন যে, আমি আর শশাঙ্ক যেমন অভিভূত, তেমনই মুগ্ধ। চাঁদের আলোয় ভদ্রলোকের বয়সটি ঠাহর হচ্ছে না, মাথায় ছিল সৈনিকের টুপি।—কিন্তু তাঁর সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান চেহারার মধ্যে একজন বিশেষ বিক্রমশীল যোদ্ধা যে আজও রয়েছে, এতে ভুল নেই। তাঁর কথায় আমাদের প্রতি এমন স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছিল যে, আমরা

তন্ময় হয়ে ঘণ্টাখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। আজ আমাদের সারাদিনের পরিভ্রমণটি যে সার্থক হয়েছে,—শশাঙ্ক একথাও স্বীকার ক'রে নিল।

নমস্কার, প্রতি নমস্কার এবং বিদায় সম্ভাষণের হিড়িকে আরও মিনিট দশেক লেগে গেল। দেড় বছরের আনাগোনার ফলে যে প্রকার প্রণয়কাহিনী গ'ড়ে ওঠে, দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মধ্যে সেই অন্তরঙ্গতা জন্মে' গেল। উভয় পক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলুম, প্রতি সপ্তাহে উভয়ের মধ্যে অন্তত একখানা চিঠি বিনিময় যদি না হয়, তবে পরস্পরের জীবন ব্যর্থ মনে হবে।

পুরুষে-পুরুষে অথবা মেয়েতে-মেয়েতে যখন প্রণয় হয়, তখন সে-বস্তু বোধ করি বড়ই গভীর, উপরতলায় তা'র কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না। কিন্তু পরবর্তী চার বছরের মধ্যে চিঠিপত্র ত' দূরের কথা, কেউ কা'রো খোঁজ-খবরও রাখিনি! চাঁদের আলোয় ভদ্রলোককে দেখেছিলুম, দিনের আলোয় তাঁকে আজ দেখলে চিনতেও পারবো না, এই আমার ধারণা।

এর মধ্যে আবার দিন তিনেক থেকে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে, তাঁর নাম নীলাম্বর পন্থ। তিনি এককালে কলকাতায় ছিলেন, সামান্য কাজকারবারও ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হোলো এই, বাঙলার গ্রামের দুঃখদুর্দশার সঙ্গে তিনি খানিকটা পরিচিত। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষকালে তিনি নিজের খরচে একটি 'খাদ্যবিতরণ কেন্দ্র' খুলেছিলেন শহরতলীতে। এখন তিনি থাকেন এখানে একটি পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে তিনি কয়েকটি গরু পালন করেন, এবং দুধ ভিন্ন আর কিছুই খান না। বৈচিত্র্য হিসাবে একটু আধটু ছানা, একটু আধটু মালাই। তিনি অবিবাহিত। বয়স তাঁর প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। জাতিতে ব্রাহ্মণ। ভদ্রলোক প্রত্যেকদিনই শহরে আসেন বেড়াতে। এখানকার 'গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের' তিনি একজন সভ্য। অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক, এবং হাসিখুশী। এখানে আমাদের কোনও অসুবিধে হ'লে তাঁর ওখানে যে কোনও সময় গিয়ে আতিথ্য নিতে পারি, একথা তিনি বারম্বার জানিয়েছেন। তীর্থ এবং মন্দিরের গল্প তাঁর খুবই প্রিয়। তিনি মৃত্যুর আগে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁর সামান্য যা কিছু আছে দিয়ে যেতে চান্—একথা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ভদ্রলোক বাঙলা বলতে পারেন।

দূরের থেকে তাঁকে দেখে আমরা নমস্কার ক'রে বললুম, বহু ভাগ্যে আবার দেখা মিললো!

পন্থজী বললেন, মিলতেই হবে। সমস্ত আলমোড়ায় পাবেন দুটি প্রধান সম্প্রদায়—রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র। এক হোলো যোশী, অন্য হোলো পন্থ। পন্থ আর যোশী শুনলেই জানবেন, ওদের বাড়ী আলমোড়া। ওরা হোলো পাহাড়ী।

আমরা বললুম, একজন যোশীর সংগেও আমাদের খুব আলাপ হয়েছে। খুব চটপটে আর বাকপটু। মিলিটারী পোশাকে থাকেন। একদিন রাজনীতিতে ছিলেন। আমরা খুব রস পেয়েছিলুম।

পন্থজীর প্রসন্ন মুখখানি সহসা গম্ভীর হয়ে এলো। বললেন, কবে আলাপ হয়েছে?

কাল রাত্রে!

তিনি বললেন, বলদেও যোশীর কথা বলছেন ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি চেনেন? কেমন লোক? কী ধারণা আপনার?

পন্থজী এ নিয়ে কথা বাড়াতে চান না। শুধু বললেন, আমার বয়স হয়েছে। আর কদিনই বা। অপরের নিন্দে করার আগে নিজের জীবনেই ত' দেখছি কত ত্রুটি, কত ভুল। শুধু এইটুকুই বলি, বলদেও আপনাদের ওপর চোখ রেখেছে তা'র নিজেরই প্রয়োজনে। মানুষের বাহ্য পালিশ দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।

তাঁর সাংকেতিক ভাষা শুনে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হলুম। সেদিন যাবার আগে পন্থজী ব'লে গেলেন, দেশে ফিরে যাবার জন্য যদি আপনাদের টাকাকড়ির দরকার হয়,—মনে হচ্ছে দরকার হবেই,—তাহ'লে আমাকে বলবেন! এখানে বেড়াতে এসেছেন, জুয়া-টুয়া খেলার ফাঁদে যেন পা দেবেন না!

পন্থজী চ'লে গেলেন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাই বেড়ে গেল। তবে পরবর্তী যে কয়দিন আমরা আলমোড়ায় ছিলুম, বলদেও যোশীকে আর দেখিনি।

ভারাক্রান্ত মনে আমরা ফিরে এলুম আমাদের সেই পরিচিত চায়ের দোকানটিতে। আজও দেখছি আসর জমিয়ে বসেছেন সেই বৃদ্ধ হরিশচন্দ্র মহাশয়। তাঁর কৌতুক কাহিনী শোনার জন্য দোকানে এবং দোকানের বাইরে পর্যন্ত লোক জমে গেছে। তাঁর কীর্তিকলাপ হোলো আন্তর্জাতিক ধরনের। লোকজন হেসেই অস্থির। বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তিনি সৈনিক হয়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংরেজদের সংগে ঘুরে বেড়ান্। বাইশটি ভাষা তিনি শিখেছেন। তাঁর মুখে চীনা, জাপানী, জর্মান, মৈথিলী এবং চাটগেঁয়ে আলাপ শুনে আমরা সবাই আমোদ পাচ্ছিলুম। দুর্বোধ্য স্কচ্ এবং ফরাসী শুনে হেসে সবাই লুটোপুটি। পার্বত্য 'অহোম্' ভাষায় তিনি পারদর্শী। মিশরীয় আরবী এবং মুরজাতির ভাষায় তিনি আশ্চর্য দক্ষ। তাঁর মুখে তামিল এবং তেলেগু শুনে আমাদের চায়ের আসর জমে উঠলো। তিনি এখন সরকারী পেনসন্ পান্। অত্যন্ত সাধু এবং ঈশ্বরভীরু ব্যক্তি। তিনি আলমোড়ারই স্থায়ী বাসিন্দা।

একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালীর নাম আমরা প্রায়ই শুনছিলুম কথায়-কথায়। এখানে একটি পাহাড় তাঁর নিজস্ব। সেখানে তাঁর মস্ত বড় ক্ষেতখামার এবং গবেষণাগার। অনেক ছাত্র এবং শিক্ষক সেখানে মোতায়েন থাকেন। সেখানে নানা-যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং তা'র জন্য মস্ত আফিস। ফুলে ফলে ফসলে

ফলনে সেই পাহাড়টি একেবারে পরিপূর্ণ। সেই পাহাড়ে বাগান যত বড়, অট্টালিকা নাকি তারই অনুরূপ। ভদ্রলোকের নাম বশীশ্বর সেন।

সাহস ক'রে একদিন সকালে তাঁর সেই পাহাড়ের ফটক পেরিয়ে শশাঙ্কর পিছনে পিছনে গেলুম। কুকুরের ভয়, দারোয়ানের ভয়, এবং তা'র চেয়েও ভয় বেশী যাঁদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। কেন? কী দরকার ছিল এখানে আসার? যদি অনামুখো হয়? যদি সাহেবী মেজাজ দেখিয়ে 'দে'তো' আলাপ করে? আমরাই বা চড়াও হ'তে যাই কেন গায়ে প'ড়ে? থাক্, ফিরে চলো, শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক বললে, আরে এসোই না! মানুষ ত'!

মানুষ! কিন্তু বনমানুষ যদি হয়?

ক্রমশ দেখা গেল পথ অবারিত। কুকুর অথবা দারোয়ানের দেখা মিলছে না। কোটপ্যান্টপরা মালী কাজ করছে ফুলবাগানে। হাসিমুখে এগিয়ে এলো দুটি যুবক। দু'একটি কর্মচারীর প্রসন্ন মুখ। আমাদের সংবাদ গেল ভিতরে। এক মিনিটের মধ্যেই এসে দাঁড়ালেন একজন বর্ষীয়সী মেম-সাহেব। সস্নেহ দৃষ্টিতে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি বাগানেই আমাদের বসবার জন্য দুখানি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তাঁর পরিচয় পরে আমরা পেলুম। তিনি সুপ্রসিদ্ধা আমেরিকান লেখিকা 'শ্রীমতী গার্ট্রুড্ ইমারসন্ সেন'। তাঁর অতি বিখ্যাত গ্রন্থ 'Voiceless India'-র নাম আমাদের জানা ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের চমৎকার ভূমিকা লিখেছিলেন। মিসেস সেন একজন বিশিষ্ট আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের ভগ্নীও বটে।

মিনিট দুই পরেই এলেন বশীশ্বর সেন মহাশয়। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ,—বয়স ষাট বছরের কম নয়। তিনি এসেই একেবারে উদার স্নেহে আমাদের দুজনকে আলিঙ্গন।—কী খবর? কি ভাগ্যি আমাদের! বসুন, বসুন,—অনেককাল পরে নতুন মানুষ দেখে আনন্দ পেলুম। আপনাদের কোনও কষ্ট হয়নি ত'? কোথায় এসে উঠেছেন? এসব কাজের কথা নয়। আমার এখানে আহারাদি করতে হবে। লোকে আমাকে বলে, 'বটানিষ্ট্', আসলে আমি চাষাভুষো। কিন্তু খবরদার, পালিয়ো না যেন ভাই,—পাহাড়ীলোকের খপ্পরে প'ড়ে গেছো। চুপ ক'রে ব'সে এখানে চা-বিস্কুট চালাও, তারপর আমার ঘরের ভাত-চচ্চড়ি! যদি অনুমতি করো তবে মাল্‌পো খাওয়াবো! রাত্রে মাংস-পোলাও! ওরে ওই, চুপ ক'রে আছিস কেন রে! দুটো প্রাণের কথা বল্‌রে ভাই! হাঁপিয়ে উঠেছি যে!

আমরাও হাঁপিয়ে উঠেছি। অনেকটা যেন বন্যাস্রোতে ভেসে গেছি। মনে প'ড়ে গেল বহু বছর আগেকার কথা। তরুণ বয়সে একবার এলাহাবাদে কুম্ভ-মেলায় যাচ্ছিলুম। বোম্বাই মেল-এ থার্ড ক্লাসে একটি লোক আমাকে ডেকে অনেক ভীড়ের মধ্যে জায়গা দিল। বললে, বসুন গুছিয়ে, একটা রাত্রের ত' মামলা!

বর্ধমানে পেঁাছে লোকটা বললে, এসো ভাই, খাবার খেয়ে নিই!

পরদিন সকালে মোগলসরাইতে পেঁাছে সে বললে, মাইরি, আমার পয়সায় কিন্তু তোকে চা খাওয়াবো! আপত্তি শুনবো না।

তারপর এলাহাবাদে পেঁাছেই সে এমন দু'একটি মধুর ঘরোয়া সম্ভাষণ করতে আরম্ভ করলো যে, আমি যেন দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলুম। এমন মানুষ কালে-ভদ্রে জোটে বৈকি।

বশীশ্বর সেন মহাশয় কখন্ যে নিঃশব্দে আমাদের পরম প্রিয় 'বশীদা' হয়ে পড়েছেন, আমরা নিজেরাও জানতে পারিনি। তাঁর এই 'আপনি' থেকে 'তুমি', এবং 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ পরিণত হ'তে ঠিক কয় মিনিট লেগেছিল, এখন আর মনে পড়ে না।

সব কাজ ফেলে স্বামী-স্ত্রী এসে গল্পে মেতে উঠলেন। একটি সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলো। বশীদা'র বহুকালের অনুরোধক্রমে মহাকবি প্রথম আলমোড়ায় আসেন তাঁর মৃত্যুর বছর চারেক আগে। তাঁর প্রথম পদার্পণের কাহিনীটুকু উপভোগ্য বৈকি। মহাকবি একবেলা রাগ ক'রে বশীদা'র সঙ্গে কথা বলেননি। যখন বললেন তখন প্রথম ভাষণ হোলো এই প্রকার,—তোমার সঙ্গে আমার কি কোনও শত্রুতা ছিল, বশী?

কবির গম্ভীর মুখচ্ছবি দেখে বশীদা' ভয়ে আড়ষ্ট! আমরা প্রশ্ন করলুম, তারপর?

শোন্ ভাই কী কাণ্ড!—বশীদা আরম্ভ করলেন, কবির রাগ দেখে ভয়-ভাবনার আর কূল পাইনে, কী অপরাধ করলুম রে বাবা! কিন্তু তারপর আমার ভ্যাবাচাকা চেহারা দেখে কবি আবার বললেন, এখন বুঝতে পারছি বিদেশ-বিভূঁয়ে এনে আমাকে জব্দ করাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল!

নাও ঠ্যালা! ঠ্যালার নাম বাবাজি! কাঁদবো, কি পায়ে ধরবো, কি ডিগবাজি খাবো,—ভেবে ঠিক পাচ্ছিলুম না। কিন্তু কবি খুব রসিক ছিলেন ত? আমার কাঁচুমাচু চেহারাটায় উনি বেশ রস পাচ্ছিলেন। এবার বললেন, পাহাড় ঠেলে আমাকে এনেছো, কিন্তু পাহাড়ের 'বেণ্ড্'গুলো সমান ক'রে কেটে রাখতে পারোনি!

তখ—ন ব্যাপারটা বুঝলুম রে, ভাই। এখানকার 'বেণ্ড্'গুলো কী সাংঘাতিক দেখে এলি ত'! আহা, বুড়ো মানুষ, নার্ভের ওপর ষ্ট্রেন্ হয়েছিল খুব! আমি ত' আজও ভয়ে কাঠ হই! তোদেরও ভয় হচ্ছিল ত'?

আর বলবেন না!

কবির গল্প শুনতে শুনতে মিসেস ইমারসন্ সেন এতক্ষণ খুব হাসছিলেন। এবার তাঁর পরম যত্নরক্ষিত একখানি বেতের আরাম চেয়ার বা'র ক'রে আনলেন। বললেন, এই চেয়ারখানি আমাদের এখানে মহাকবির আসন ছিল।

আমরা অতঃপর ঘুরে ঘুরে দেখলুম, বশীদা'র বৈজ্ঞানিক সব্জীর ক্ষেত।

একটি পেঁয়াজ ওজনে পাঁচপো, একটি বেগুন আড়াই সের। এই অনুপাতে অন্যান্য সব্জি। আমরা দেখেশুনে অবাক। এসব নাকি গবেষণালব্ধ উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানসম্মত 'ক্রস্-ব্রীডিং'। বশীদা ছিলেন আচার্য জগদীশ বসুর প্রিয় ছাত্র। গুরুর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি কায়মনোবাক্যে দুইজন ব্যক্তির শতায়ু কামনা করেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, ভারতীয় উদ্ভিদ্বিজ্ঞানে বশীদাই প্রথম 'ফলনবীজস্বত্ব' নিয়ে আণুবীক্ষণিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া (micro-manipulation) আরম্ভ করেন।

কবিকে ঘরে এনে আমি বলেছিলুম,—বশীদা আবার আরম্ভ করলেন,—মশাই, আমি লেখাপড়া তেমন শিখিনি, আপনার ওই সব কাব্য-টাব্য আমার মাথায় ঢোকে না! কিন্তু একশো বচ্ছর অন্তত আপনাকে বাঁচতে হবে, নৈলে শুনবো না! কবি বললেন, তোর এমন অহেতুক দাবি কেন রে, বশী?—বললুম, ঠাকুর সামনে আছে তাই ত' কাজকর্মে জোর পাই! চোখের সামনে থেকে স'রে গেলে সবই ত' অন্ধকার!—আহা, কী রূপ, কী চোখ, কী বিরাট পুরুষ! চারদিকে নেংটি ইঁদুরের দল, তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল পশুরাজ সিংহ! সত্যি নয়, ভাই?

বশীদার মুগ্ধ হৃদয় আর চক্ষুর দিকে আমরাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলুম।

পুনরায় তিনি বললেন, আহা, আমাদের গর্বের ধন, অন্ধের নড়ি, শিবরাত্রির শল্তে! মুনিঋষিকে দেখিনি, কিন্তু রবিঠাকুরকে দেখার পর মুনিঋষিকে আর না দেখলেও চলবে। কি বলিস, ভাই?

রবীন্দ্রনাথ কেমন তা পৃথিবীবাসী জানে, কিন্তু বশীদা যে কেমন—একথা একান্ত ক'রে জেনে গেলুম শশাঙ্ক আর আমি। আর সেই জানার সাক্ষী রয়ে গেল দিগন্তের কোলে ওই তুষারচূড়ারা,—গৌরীপর্বত আর নন্দাদেবী, ত্রিশূল আর পঞ্চুলী। ওরা আজকে আমাদের এই আনন্দের নিত্য সাক্ষী হয়ে রইলো।

যাবার আগে আমরা মিসেস সেনের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। বশীদা যাবার সময় ডেকে বললেন, ওরে, ওই পাগ্লা, সন্ধ্যেবেলা ঠিক আসবি, এখানে না খেলে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে!

আমরা হাসিমুখে বিদায় নিচ্ছিলুম। তিনি পুনরায় বললেন, আর এক পাগ্লা আসছে আজ বিকেলে। ছেলেটা বে'থা করেনি, কিন্তু খাঁটি সোনা! ওই যে আমাদের উমাপ্রসাদ রে! হিমালয়ের পোকা! ছেলেটাকে দেখলে আমার বুকের ছাতি ফুলে ওঠে!

বলতে বলতে চ'লে গেলেন বশীদা। আমরাও তখনকার মতো বিদায় নিলুম। আমাদেরও বুক ফুলে উঠেছিল শ্রদ্ধায়।

নিজেদেরকে ধিক্কার দিচ্ছি শতবার। সেদিন কেন অন্যমনস্ক ছিলুম, কেনই বা উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ের একটি পথ আমাদেরকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেল,—ওই যেদিকে একদা নর্তকশ্রেষ্ঠ উদয়শঙ্কর তাঁর নাচের শিক্ষালয়টি গড়েছিলেন একটি মালভূমিতে—এবং কেন আমরা মতিচ্ছন্নের মতো দুর্বার মোহের টানে বনময় পাহাড়ের আশেপাশে আত্মসন্ধানীর মতো ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়ালুম, আজ আর সেসব কথা মনে নেই। কিন্তু বশীদা'র ওখানে সেদিনকার সান্ধ্য-ভোজে না যাওয়ার জন্য অনুশোচনার আর শেষ ছিল না। হয়ত আমাদের মনে একথা হয়ে থাকবে, স্বভাববৈষ্ণব বশীদার প্রাণখোলা আমন্ত্রণ এক জিনিস, এবং ওই প্রবীণা আমেরিকান মহিলা মিসেস গার্ট্রুড্ ইমারসন,—ওঁকে মেহন্নত ক'রে সমস্তটা আয়োজন করতে হবে, সে অন্য বস্তু। কিন্তু আমাদের এই অমার্জনীয় উদারবুদ্ধির পিছনে যে-সূক্ষ্ম আড়ষ্টতা বোধ ছিল,—যেটির দিকে আমাদের মনশ্চক্ষু সেদিন পড়েনি,—সেটির সম্বন্ধে বহুকাল আগে এক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য ক'রে গেছেন, "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" একটু ঘুরিয়ে কথাটা এই ভাবে বললে কেমন লাগে?—সহজ হওয়া যায় না মোটেই সহজে।

এর জন্য আমাদের শাস্তি তোলা ছিল, সেই কথাই বলি। সেদিন আমরা গিয়েছিলুম হাঁটতে হাঁটতে সেই পাহাড়ের একটু নীচে—যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের ফুলবাগানভরা নিরিবিলি আশ্রমটি পাহাড়ের গায়ে গেঁথে উঠেছে। সেখানে ছিলেন সদ্য পাশ্চাত্যদেশপ্রত্যাগত শচীন মহারাজ এবং পূর্ণ মহারাজ। তাঁদের মধুর আতিথেয়তায় অসীম আনন্দ পেয়ে সবেমাত্র হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় আমাদের দরজায় ধাক্কা পড়লো। দরজা খুলতেই নিত্যপ্রসন্নবদন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেসে উঠলেন। এই অকৃত্রিম হিমালয়প্রেমিক সম্বন্ধে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা বরাবর অটুট থেকে গেছে, আমার বিশ্বাস একথা তিনি জানেন না। মধ্য হিমালয়ের একটি বিশেষ ভূভাগে তাঁর প্রায়শ আনাগোনার কথা আমার ভ্রমণকালে অনেক সময়ে শুনতে পাই। কুমায়ুন পর্বতমালা তাঁর বিশেষ প্রিয়, এবং তিনি এই অঞ্চলকে তন্ন তন্ন ক'রে দেখার চেষ্টা পেয়েছেন। তাঁর কৈলাস ভ্রমণের গল্প তাঁর মুখ থেকে শুনে অনেকেই আনন্দ পান্। তাঁর মতো হিমালয়োৎসাহী বাঙালীর মধ্যে সংখ্যায় কম।

ধমক দিয়ে উমাপ্রসাদ বললেন, শিগগির বেরিয়ে আসুন বাইরে, আপনার শমন এসে দাঁড়িয়ে। খাবার নেমন্তন্ন ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন, করেছেন কি? মানুষ চেনেননি?

বাইরে এসে দেখি মোটর থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সহাস্যমুখে মিসেস ইমারসন সেন। হাস্যমুখ হ'লে কি হবে, ভিতরে আগ্নেয়গিরি! কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দুজনে দাঁড়ালুম অনেকটা যেন নির্লজ্জের মতো। সন্তোষজনক কোনও কৈফিয়ৎ হাতে ছিল না, এমন কি হাতের কাছে এমন কোনও মিথ্যা গল্পও নেই

যে, তৎক্ষণাৎ ফে'দে বসবো। নানা গঞ্জনার মধ্যে মহিলা একসময় বললেন, আমিই ব'কে মরছি, কিন্তু কই, তোমাদের মুখে চোখে অনুশোচনার ভাব ত' দেখছিনে? বেশ, তাহ'লে এক কাজ করো, আমার শিঙাড়া আর মাল্‌পোর দামটি দিয়ে দাও, খুশী হয়ে চ'লে যাই!

উমাপ্রসাদ খুব হাসলেন। বললেন, বটে, আপনি মাল্‌পো বানিয়েছিলেন, তার প্রমাণ কিন্তু ওঁদের হাতে নেই। সুতরাং আর একবার খাইয়ে সেটা প্রমাণ করুন?

মিসেস ইমারসন হাসতে হাসতে কি যেন বললেন, ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় উমাপ্রসাদের দিকে চেয়ে যেন ব'লে উঠলেন, "Oh, you birds of the same feather!"

কথা রইলো, আজ সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে গিয়ে জলযোগ না করলে মহা অনর্থ কাণ্ড ঘটবে। মহিলা যাবার সময় আবার হুম্‌কি দিয়ে গেলেন, এবং আমরা সেই হুম্‌কির মধ্যে জননীর মধুর তিরস্কারের আস্বাদ পেলুম। মোটর চ'লে গেল।

উমাপ্রসাদকে বহুদিন পরে পেয়ে আমরা আনন্দে মশগুল হয়ে গেলুম।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি তিনজনে। ওক্‌, আখরোট আর শিশমের ছায়াপথে পাহাড়ী শেগুনের ফাঁকে ফাঁকে আসন্ন সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে জ্যোৎস্নাময়ী। নীচের দিকে রেলওয়ে আউট-এজেন্সির পাড়া, উপরদিকে বসবাসপল্লী—উভয় অঞ্চলই এখন শান্ত। ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই বশীদার সঙ্গে দেখা। উমাপ্রসাদকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন, ধ'রে এনেছিস দেখছি। ছোঁড়াদুটোর কান ধ'রে তুর্কিনাচন নাচিয়ে দে ত'? শিঙাড়া-মাল্‌পো ফেলে পাহাড়ে পাহাড়ে কাব্য করতে ছুটেছিলি, পাষণ্ড?

তাঁর তিরস্কারে সবাই হেসে লুটোপুটি। বশীদা বললেন, নে, এখানে ব'সে গল্পগুজব কর, আমি চট্‌ ক'রে একবার 'গোপালের ব্যাগার' দিয়ে আসি।

গোপালের ব্যাগার!—শশাঙ্ক প্রশ্ন করলো, সে আবার কি, বশীদা?

তবে শোন্‌—বশীদা থমকে গেলেন,—আমি ভাই বাঁক্‌ড়ো জেলার লোক। গোপাল নামে আমাদের দেশে এক রাজা ছিল। তিনি বললেন, আমার রাজ্যে সবাই হবে বোষ্টম, হরিনাম জপ ছাড়া আর কিছু চলবে না! তারপর রাজা আর তাঁর গুপ্তচরেরা বেরিয়ে খবর নিতো, সবাই হরিনাম জপ করছে কিনা। কিন্তু ধ'রে বেঁধে কি প্রেম হয়? অথচ গুপ্তচরের গতিবিধির খবর পেয়ে এখানে ওখানে সবাই হঠাৎ চোখ বুজে মালা ঠকঠক করতো! আর যারা কেজো লোক, তা'রা কাজ ফেলে ছুটতো ঘরের দিকে। ব'লতো, যাই, 'গোপালের ব্যাগার' দিয়ে আসি! আমারও ভাই তাই। তোরা ব'স, একবারটি মালা ঠকঠক ক'রে আসি।

সেই সন্ধ্যারাতটি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। শচীন মহারাজ, পূর্ণ মহারাজ,

প্রমুখ আরও দুজন সাধু এলেন। একটি ঘরের ভিতর দিয়ে আরেকটি ঘরে এসে আমরা বসলুম। এঘরটি চারদিকেই প্রায় বন্ধ,—শীত পড়েছে বাইরে,—ভিতরে মধুর উত্তাপ জড়ানো। মেঝের উপর মাদুর ও কার্পেট পাতা, ভিতরটি পাশ্চাত্যরুচিতে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। পাশের ছোট্ট ঘরে স্বামীস্ত্রীর উপাসনা-গৃহ, তাঁরা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের পূজারী। ওর মধ্যে ঢুকেই বশীদাকে 'গোপালের ব্যাগার' দিতে হয়। গোল হয়ে বসেছেন সবাই চেয়ারগুলিতে। চারজন গৈরিকবাসা সুপণ্ডিত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, আর এধারে বশীদা, উমাপ্রসাদ, মিসেস গার্ট্রুড্ ইমারসন্ সেন, এবং শশাঙ্ক। মাঝে মাঝে তাজা খাবার আসছে। আলো জ্বলছে ভিতরে। বাইরে নিবিড় হয়েছে জ্যোৎস্না। অনুভব করলুম পাহাড়ে-পাহাড়ে আলমোড়া স্তব্ধ হয়ে গেছে, এবং বহুদূর দিগ্বলয়ের কোলে ত্রিশূলী আর নন্দাদেবীর তুষার চূড়াসনের উপর অনন্ত সৌরবিশ্বের মহামন্দিরে আরতির ঘণ্টাও হয়ত শেষ হয়ে গেছে। সেখান থেকে চোখ ফিরে এলো সন্ন্যাসীদের উপর। তাঁদের একজনের নির্বাক দৃষ্টির উপরে যেন অনন্ত গভীরতার একটি আশ্চর্য ছায়া পড়েছিল।

উমাপ্রসাদ তাঁর সর্বশেষ হিমালয় ভ্রমণকালের দুটি অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। মিসেস ইমারসন্ সতর্ক ক'রে দিলেন, যুক্তি ছাড়া কোনও কাহিনীর বাস্তবতা স্বীকার করবো না। তোমার চিন্তায়, কথনে, নিশ্বাসে, কণ্ঠে ও বর্ণনায় অলৌকিকতার প্রতি প্রশ্রয় দেবে না কিন্তু।

মিসেস সেনের প্রখর বৈজ্ঞানিক মন উমাপ্রসাদের কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে চুলচেরা বিচার করতে লাগলো।—

"উত্তরকাশীর সেই কৃষ্ণাশ্রম্ সাধু। বয়স একশো বছরেরও অনেক বেশী। চেহারা তাম্রবর্ণ, কিন্তু জ্যোতির্ময়। নিশ্চল, যোগাসীন—চক্ষু নিষ্পলক। সন্দেহ হয় বুঝি বা পাথরের মূর্তি। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাঁর সঙ্গে থাকেন এক ব্রহ্মচারী। চেহারাটি রুক্ষ্ম, কিন্তু সুশ্রী। বয়স বাইশ অথবা বিয়াল্লিশ জানা যায়নি। কিন্তু একথা জানা গেল, সে মেয়ে,—বার দুই স্বামীপরিত্যক্তা। মৌনী-সাধুকে ছেড়ে ঘরসংসারে তা'র মন বসেনি কোনদিন। ওই সাধু তাকে সংস্কৃত শিখিয়েছে পাথরের উপর জলের অক্ষর লিখে-লিখে। সাধু শুধু চেয়ে থাকে গঙ্গার দিকে, মেয়েটি দেখাশোনা করে।"

ইমারসন্ প্রশ্ন করলেন, অন্ধ মোহ?

উমাপ্রসাদ জবাব দিলেন, জানিনে। ঘটনা শুধু এই।

চুপ ক'রে গেলুম আমরা সকলে। দ্বিতীয় গল্পটা বদরিকাশ্রমের। উমাপ্রসাদ বললেন, আমার এক বন্ধু ধ'রে নিয়ে গেলেন আমাকে তপ্তকুণ্ডের ওদিকে। এখানে এক সাধু আছেন তাঁকে কেউ না খাওয়ালে তিনি কিছু খান্ না। তপ্তকুণ্ডের কোলেই ছোট্ট একটি ঘরে তিনি থাকেন। আমি গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখি বয়সে তরুণ সম্পূর্ণ এক উলঙ্গ সাধু,—বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের

মধ্যে। অনেকটা যেন যুবক পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের মতো চেহারা। একটুখানি দাড়ি আছে মুখে। হিন্দি এবং ইংরেজিতে আলাপ করেন, কিন্তু আমার ধারণা তিনি বাঙালী। তাঁর সেই নগ্নকান্তি যৌবনশ্রী দেখে যে কেউ চমকে উঠবে। পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, তিনি পণ্ডিত এবং সুশিক্ষিত। ইংরেজি বলেন চমৎকার।

হঠাৎ মিসেস ইমারসন্ প্রশ্ন ক'রে বসলেন, উলঙ্গ কেন? কাপড় জোটে না? নাকি effect নেবার চেষ্টা করে?

উমাপ্রসাদ বললেন, জানিনে, প্রশ্নও করিনি। দেখলুম, তাঁর আশ্রমটির খাঁজে-খাঁজে নানাবিধ কাগজপত্র, চিঠি, লেখাপড়ার সরঞ্জাম। তাঁকে নানা প্রশ্ন করলুম। তিনি জানেন, বিলেতের সর্বশেষ খবর; তিনি জানেন, দু'বছর পরে কোন্ ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর পর যা ঘটবে, তা তিনি জানেন। তাঁর কথা অনেকগুলো সত্য হয়েছে, আমি মিলিয়ে দেখেছি। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে দেখলুম, দিল্লীর উচ্চতম শাসনকর্তা এবং বড় বড় কন্‌গ্রেস নেতাদের সাম্প্রতিক চিঠিপত্র। চীন, জাপান, ইউরোপ—এসব জায়গা থেকে তাঁর কাছে চিঠিপত্র এসেছে মাত্র আগের দিনে। অন্তরঙ্গ আলাপ হোলো।

মুখ তুললেন শ্রীমতী ইমারসন্।—হিমালয়ের কোনও ছদ্মবেশী গুপ্তচর? Trans-Himalayan guard? কিন্তু কাপড় পরে না কেন? খায় না কি জন্য? ব্যাগ-বাক্স কিছু আছে দেখলে? কিছু পুঁজিপাটা?

কিচ্ছু নেই! সম্পূর্ণ নিঃস্ব।—উমাপ্রসাদ বললেন, খোঁজ করলুম সেদিন অনেক; কিছুই জানতে পারিনি!

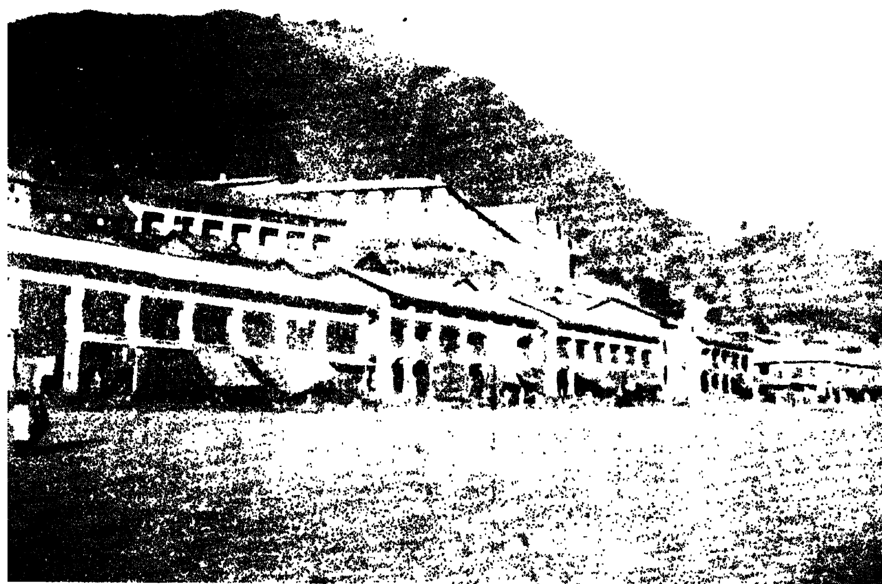
শীতকালে নেমে আসে?

শুনিনি সেকথা। তবে শীতকালে তুষারপাতের মধ্যে সে গভর্নমেণ্টের আইন অমান্য ক'রেও থাকতে চায়!—ব্যাস, সেদিন ওই পর্যন্তই আমার জানা!

আলোটা জ্বলছিল। উদ্বিগ্ন প্রশ্ন সকলের মুখে চোখে ফুটে উঠেছে। জ্যোৎস্নাহসিত হিমালয়ের অনন্ত গগনে সেই প্রশ্ন তারায় তারায় ঘুরে বেড়ালো নিরন্তর।











॥ ১১ ॥

দিল্লী মেল অনেকক্ষণ লেট্। সেপ্টেম্বর হ'লেও শরতের আভাস এখনও তেমন পাচ্ছিনে। মেঘ রয়েছে উত্তর প্রদেশে। কানপুরে আকাশ ডাকলো, টুণ্ডুলায় বৃষ্টি নামলো। আলীগড়ে রীতিমতো বর্ষা। গাজিয়াবাদে মুষলধারা। মনে করেছিলুম আরেক পেয়ালা চা চলবে,—কিন্তু বৃষ্টিতে গা ঢাকা দিয়েছে রেষ্টুরেণ্ট কার-এর 'বয়',—জলের ঝাপটায় 'মেটেভাঁড়ের' চা-ওলাও পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শাহদারায় গাড়ী থামতে দেখা গেল আকাশ একটু ধরেছে! বড় নির্জন শাহদারা। যমুনার এ প্রান্তে ব'সে সে যেন করুণ নয়নে চেয়ে থাকে 'লাল কেল্লার' দিকে। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

ধীরে ধীরে শাহদারা থেকে গাড়ী ছেড়ে যমুনা পেরিয়ে লালকেল্লার প্রাকারের ওপর দিয়ে দিল্লীমেল ঢুকলো এসে রাজধানীর প্লাটফরমে। দিল্লীমেলের আভিজাত্য ভিন্ন রকমের। বৃষ্টি এবার থেমেছে। আবার সেই দিল্লী।

দরজা ধ'রে দাঁড়িয়েছিলুম। সহসা প্লাটফরম থেকে উচ্চকণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ ক'রে হাঁক দিলেন শ্রীমতী মায়া! গাড়ী থামার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলেন শ্রীমতী ও তাঁর তরুণ স্বামী। তাঁদের পিছনে আরেকজন পাঞ্জাবী বন্ধু। মিঃ গুপ্তর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। কথা বলার আর কোনও অবসর ছিল না, মুহূর্তের মধ্যে মিঃ গুপ্তর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলুম। স্পর্শমাত্র মনে হোলো, আলাপ এবং আত্মীয়তা যেন আমাদের বহুকালের। স্বাস্থ্যবান, সুশ্রী, শ্যামবর্ণ যুবক। এমন সজ্জন এবং ভদ্র যুবক সচরাচর চোখে পড়ে না। পায়ে হাত দিতে গেলেন স্বামীস্ত্রী,—হাত ধ'রে তুলে নিলুম। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি মধুরভাষণে আলাপ করলেন।

অপরিচিত ছিলেন বটে মিঃ গুপ্ত, কিন্তু সেই ব্যবধান কাটিয়ে গত এক বছরে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে কয়েকখানি। চিঠির মতো মানুষটিও সুন্দর। শ্রীমতী মায়ার দিকে ফিরে বললুম, মেয়েদের সৌভাগ্যে কখনও ঈর্ষাবোধ করিনি, কিন্তু আপনার স্বামীভাগ্য দেখে বড় হিংসে হচ্ছে!

তবে যে বড় তামাসা করেছিলেন?

হাস্যমুখর এবং মধুর হয়ে উঠলো দিল্লী ষ্টেশন। মিঃ গুপ্ত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাইরে, টেনে তুললেন মোটরে।

শ্রীমতী মায়া গত এক বছরের মধ্যে গিয়েছিলেন কলকাতায়, এবং আমার বাসস্থানেও অনুগ্রহ ক'রে পদার্পণ করেছিলেন,—দেখাশুনো হয়েছে বার কয়েক, এবং অনেকটা যেন পারিবারিক আত্মীয়তাও ঘটেছে। আজ তাঁর স্বামী কেশব হলেন আমার কাছে নতুন।

দিল্লী ষ্টেশন থেকে তাঁদের বাসস্থান অনেকটা দূরে। সবাই জানে আরাবল্লীর জটলা এবং শিরাউপশিরা দিল্লীকে বহুক্ষেত্রে অসমতল ক'রে রেখেছে। আমাদের গাড়ী এদিক ওদিক ঘুরে আরাবল্লীর পাথুরে বনজঙ্গলের ডাঙ্গা পেরিয়ে 'রাজেন্দ্রনগর' আর 'প্যাটেলনগর' ছাড়িয়ে সেই রাত্রে এসে ঢুকলো 'পুষা ইনষ্টিটিউটের' বৃহৎ বন-বাগানে। তা'র সুদূর পূর্বপ্রান্তে ফটকটি খোলা পাওয়া গেল, এবং সেই ফটক পেরিয়ে একটি অতি নির্জন ও নিষ্প্রদীপ অঞ্চলের প্রান্তরে গাড়ী প্রবেশ করলো। এটি আরাবল্লীর একটি মনোরম উপত্যকা, নাম ইন্দ্রপুরী, ষ্টেশন থেকে আন্দাজ মাইল দশেক। অন্ধকার রাত্রে কোথাও কিছু দেখা গেল না, বিদ্যুৎ এখানে আজও এসে পৌঁছয়নি,—তাদেরই ভিতর দিয়ে কোনও একটি ছোট্ট বাগানবাড়ীর ফটকে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। কেশব আমাকে নামিয়ে নিয়ে এলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ করামাত্র অনুভব করা গেল, আতিথেয়তার সমস্ত ব্যবস্থাদি গুছিয়ে রেখে তাঁরা ষ্টেশন থেকে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন।

আবহাওয়াটি এতই উল্লাসপ্রধান যে, সে-বর্ণনা বাহুল্য। বুঝতে পারা গেল, শ্রীমতী মায়া আমার অসংখ্য কাহিনী স্বামীকে আগে থাকতে ব'লে রেখেছেন। শ্রীনগরের বন্যায় তাঁর ঘরকন্না ভেঙ্গে যাওয়ার গল্প, জম্মুর হোটেলের বর্ণনা, হিমাচল প্রদেশের অভিযান, কাংড়া আর কুলুর কাহিনী, ক্ষীরভবানী আর পহলগাঁওয়ের ইতিবৃত্ত,—এবং পরিশেষে আমার বিব্রত ও বিরক্তিভাব, মেজাজ-মর্জির ঈষৎ রুক্ষতা,—কোনোটাই বাদ যায়নি। পাঞ্জাবী বন্ধুটি বিদায় নেবার পর রাত দুটো পর্যন্ত হারিকেন লণ্ঠনজ্বালা ঘরে আমাদের গল্পের আসর মুখর হয়ে রইলো। শ্রীমতী মায়া বোধ করি এবার আমাকে বাগে পেয়েছিলেন। তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমার হাতের রান্না যে তেমন ভালো হয়নি, এটি তিনি স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন এবং আমিও ব'লে বসলুম, আমার স্বভাব-প্রকৃতির অপবাদ বরং সইবে, কিন্তু আমার রান্নার নিন্দা একেবারেই অসহ্য!

ঘরময় হাসির তুফান উঠলো।

স্ত্রীর সর্বপ্রকার কাজকর্মে এবং আতিথেয়তার আয়োজনে কেশবের সর্বাঙ্গীন সাহায্যদানের চেষ্টা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। এমন আনন্দময় দাম্পত্য জীবনের স্বচ্ছন্দ ও সুখী চেহারা দেখতে আমার বাকি ছিল। স্বামীস্ত্রীর জীবনে এমন শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের সম্পর্ক আধুনিক কালে যখন তখন চোখে পড়ে না। মায়াদেবীর গল্প বর্ণে বর্ণে সত্য।

পরদিন ছিল রবিবার। কেশবকে সারাক্ষণ পাওয়া গেল। খানিকক্ষণ তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো গেল পাহাড়ের আশেপাশে। এই পাহাড় পেরিয়ে তাঁকে সাইকেলে যেতে হয় 'পালম্ বিমানঘাঁটিতে',—সেটি তাঁর চাকরিস্থল। তিনি

হলেন সার্জেণ্ট, এবং জনৈক গ্রাউন্ড ইঞ্জিনীয়র। এখান থেকে বাজার-হাট বেশ খানিকটা দূর। মাঝে মাঝে শ্রীমতী মায়া সাইকেল চ'ড়ে ঘুরে আসেন প্যাটেল নগর থেকে। আগ্রায় থাকতে মায়া ঘোড়ায় চ'ড়ে খুব বেড়াতেন। মেয়েমহলে এখানে তিনি নাচ শেখান, এবং 'গীটার-বাজনায়' তিনি পারদর্শিনী। হারমোনিয়ম ছোঁন না, কিন্তু 'তম্বুরা' তাঁর প্রিয়। কেশব বললেন, পুজোর সময় আপনি এখানে থাকলে ওঁর নাচ দেখতে পাবেন। বেশ নাম-ডাক আছে।

হাসিমুখে বললুম, ভ্রমণকালে তাঁর এই সব গুণপনার আভাসমাত্র পাইনি। দুঃখের কথা বৈকি। আমাকে উনি ঠকিয়েছেন!

আমার মন্তব্যে সরস পরিহাস বোধ ক'রে কেশব খুব হাসতে লাগলেন। তিনি ধ'রে বসলেন, এবার পুজোয় আপনাকে দিল্লীতে কাটিয়ে যেতে হবে।

অপরাহ্ণের দিকে খানদুই সাইকেল-রিক্সা যোগাড় ক'রে আনলেন কেশব, এবং আমরা পালম-এর এয়ার-অফিসার্স ক্লাবের উদ্দেশে রওনা হলুম। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মাইল দুই হবে। প্রসারিত বন-বাগান এবং সরকারি কোয়ার্টারগুলি একে একে পেরিয়ে গিয়ে আমরা অবশেষে এসে উঠলুম ক্লাবের বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে ঘণ্টাতিনেক ব'সে গান বাজনা এবং 'পথের দাবী' নাটকের মহড়া দেখা গেল। আগামী পুজোয় এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। কিন্তু এই 'পথের দাবী' নাটকে শ্রীমতী মায়া 'সুমিত্রার' ভূমিকায় আগাগোড়া যেমন চমৎকার অভিনয় করলেন,—আমি সেটি দেখে হতচকিত। মেয়েদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা সুশ্রী এবং দীর্ঘাঙ্গী। 'সুমিত্রার' ভূমিকায় তাঁর চেহারার লাবণ্য কাজ করেছে অনেকখানি। বাস্তবিকই, আমি যেন তাঁকে এই প্রথম আবিষ্কার করলুম। একত্র ভ্রমণ করেছি এতদিন, কিন্তু কোনওদিনই তাঁর সঠিক পরিচয় পাইনি। নিজকে কখনও তিনি প্রকাশ করেননি যে, তিনি শিল্প ও ললিতকলার অনুরাগিণী,—তাঁর এই সংযমের কথা স্মরণ ক'রে আমি অভিভূতের মতো চেয়েছিলুম। কেশব আমার পাশে ব'সে তন্ময় হয়েছিলেন কতক্ষণ।

এ যাত্রা ভ্রমণের তালিকা ছিল কিছু দীর্ঘ। হিমালয়ের চাম্বা উপত্যকা থেকে ফিরে পশ্চিম রাজস্থানে পাকিস্তানের সীমানা অবধি যাবো। সেখান থেকে যাবো সৌরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে, এবং অতঃপর বোম্বাই ও পঞ্চবটী হয়ে ফিরবো। মোটামুটি সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল হিসাব করা আছে। হাতে দুমাস সময়। চিতোর উদয়পুর যাবার চেষ্টাও রয়েছে। সুতরাং মনে কিছু তাড়া ছিল। আগামীকাল আমাকে রওনা হ'তে হবে।

পরদিন সকাল থেকে দিল্লীর কয়েকটি কাজ সারতে প্রায় গেল সারাদিন। 'ইন্দ্রপুরীতে' ফিরে এলুম অপরাহ্ণে। কেশব উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। রাত সাড়ে আটটায় কাশ্মীর মেল আমাকে ধরতে হবে, তারজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা স্বামীস্ত্রী ক'রে রেখেছিলেন। কিন্তু একটি 'নাটকীয় পরিস্থিতি' আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল, এবং সেটির জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলুম না।

কেশব বললেন, আপনি বলছিলেন যে, পাঁচ মিনিটে আপনি আপনার সকল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির ক'রে নিতে পারেন। কথাটা কি সত্যি?

হেসে বললুম, বোধ হয় পাঁচ মিনিটও লাগে না!

কেশব বললেন, সবিনয়ে জানাই, আপনি বোধ হয় খবর রাখেন না, সংসারে আরও দু'একজন আছে—তা'রাও এটি পারে।

শুনে খুশী হলুম।

আমাদের চায়ের আসর বসেছিল। অনুভব করা গেল, পিছনে শ্রীমতী মায়া দাঁড়িয়ে হাসি টিপে স্বামীকে কি যেন ইশারা করছিলেন। আমাদের আলাপ চলছিল ছদ্মগাম্ভীর্যের সঙ্গে, এর পাশে হাসি পুঞ্জিত রয়েছে। কেশব বললেন, যদি অভয় দেন্ তাহ'লে একটি অনুরোধ করি।

এবার হেসে ফেললুম,—ভূমিকাটা একটু দীর্ঘ মনে হচ্ছে!

আপনাকে আর একবার আমরা জব্দ করতে চাই। মায়া যাবেন আপনার সঙ্গে।

মুখ তুললুম,—মানে? ঘর সংসারে মন নেই?

কেশব বললেন, আপনার অসুবিধে যাতে না হয় সেদিকে উনি দেখবেন। হিমালয় ওঁর ভালো লেগেছে। আপনার সঙ্গে যাওয়াটাই ত' গৌরব!

থামুন দেখি?—প্রতিবাদ ক'রে উঠলুম,—আপনার ঘরকন্না, রান্নাবান্না—এসব দেখবে কে?

কোনও অসুবিধে হবে না, আপনি বিশ্বাস করুন। আমাদের ক্যান্‌টীন্ দেখেননি,—সেখানে খাওয়া খুব ভালো।—কেশব আশ্বাস দিয়ে বললেন, রাত্রে পাশের বাড়ীতে খাবো। ওঁরা আমার বিশেষ বন্ধু!

তেড়ে উঠলেন শ্রীমতী মায়া,—আপনাকে কষ্ট না দিলেই ত' হোলো! এবার আমিই সব দেখাশোনা করবো, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। ভয় নেই, আর কিছু আপনার কাছে খেতে চাইবো না। নিজের মোটঘাট নিজেই বইবো। যদি দরকার হয়, একখানা কম্বল শুধু আপনার কাছে ভাড়া ক'রে নেবো!

কেশব বললেন, আপনার জন্যই ওঁর হিমালয় বেড়ানো সম্ভব হোলো।

বুঝতে পারা গেল আগে থেকেই স্বামী স্ত্রী এ সম্বন্ধে পরামর্শ ক'রে রেখেছেন এবং সেইমতো প্রস্তুতও হয়েছেন। সুতরাং ভালো ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন ক'রে নেবার আগেই দেখতে পেলুম সেই পাঞ্জাবী বন্ধুটির সাহায্যে 'প্যাটেল নগর' থেকে একখানা ট্যাক্সি আনা হোলো, এবং তাঁদের সিদ্ধান্তের ঘণ্টা দুইয়েকের মধ্যেই আমরা চারজনে মিলে গাড়ীতে উঠে দিল্লী ষ্টেশনের দিকে রওনা হলুম। হয়ত একেই বলে, ঘটনাস্রোতে ভেসে যাওয়া। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে দশ মাইল পথ গাড়ীর মধ্যে ব'সে রইলুম। অবশেষে টিকিট কিনে গাড়ীতে দুজনকে বসিয়ে দিয়ে গাড়ী ছাড়বার সময় জোর ক'রে

পায়ের ধুলো নিয়ে কেশব হাসিমুখে বিদায় নিলেন। কথা রইলো, পুজোর ঠিক আগে ফিরবো।

গাড়ী ছাড়লো। প্রবল ভীড় ইণ্টার ক্লাসে। নতুন ধরনের আজকাল-কার বাক্স-আকৃতি গাড়ীগুলির মধ্যে যেন দম আট্‌কায়। সেই ভয়ানক ঠাসাঠাসির মধ্যে কোনও মতে হাত দেড়েক স্থান পাওয়া গেল একমাত্র এই কারণে যে, জনৈক সুশ্রী তরুণী আছেন সঙ্গে! আরও জনতিনেক মহিলাযাত্রী ছিলেন ওই বাক্সের মধ্যে, তাঁরা একবার তাকালেন মায়ার প্রতি,—কিন্তু এক ইঞ্চিপরিমাণ ন'ড়েও তাঁরা বসতে রাজি হলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ঘুমের মধ্যে আমার নাকের কাছাকাছি পা ছড়িয়ে ছিলেন।

ভীড়ের চাপে কষ্টের রাত্রি একসময় শেষ হোলো। সকালে যখন পাঠান-কোটে এসে পৌঁছলুম, মনে হোলো কঠিন কারাগারের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলুম। খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিলুম কিছুক্ষণ।

সেই অতি পরিচিত পাঠানকোট। সকল দৃশ্য থেকে যেন চেনা জিনিসের ইশারা পাচ্ছি। প্রাচীন বন্ধুরা চারিদিক থেকে যেন দুজনকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশ্ন করছে, ভালো আছো ত? এই নিয়ে এক বছরে ছয়বার ঘুরলুম পাঠানকোটে।

সেই পরিচিত হোটেলে এসে ঢুকলুম। হোটেলের সেই ছোকরা চেনামুখ দেখে হেসে নমস্কার জানালো। সেই ভিতর দিকের ছমছমে ঘরটিতে সেই ময়লা টেবিল—যার পাশেই হোলো হাত ধোবার কল। ছেলেটা টোষ্ট্‌ আর চা আনলো। টোষ্টে মাখন লাগিয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

মায়াদেবী বললেন, বড্ড জব্দ হয়েছেন, না?

কোন্‌টা শুনলে খুশী হন্‌?

তিনি খুব হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, সত্যি বলছি, ভ্রমণের কষ্ট লোকে ভুলে যায়, আনন্দটাই মনে থাকে। আজ অদ্ভুত লাগছে, যেন গেল বছরের ভ্রমণের সূত্রটাই ধ'রে আছি,—মাঝখানের এক বছরটা হারিয়ে গেছে।

বললুম, এবার কিন্তু আপনার গুপ্তসাহেব আমাকে অবাক করেছেন।

স্বামীর উল্লেখমাত্র মায়াদেবী উচ্ছ্বসিত হলেন। বললেন, উনি ভাবেননি আপনি রাজি হবেন। ওঁর আনন্দ বলবার নয়। এই এক বছর ধ'রে উনি আমার কাছে আপনার গল্প শুনেছেন। কিন্তু আমার ভয় ছিল, আপনি রাজি না হ'লে উনি হয়ত একটু আঘাত পেতেন।

এবার প্রতিবাদ জানালুম,—কিন্তু স্ত্রীর মনে হিমালয়ের নেশা ধরলে তাঁর ঘরকন্না সামলাবে কে?

মায়াদেবী হেসে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, ভ্রমণে যে এত আনন্দ আগে জানতুম না।

মোটর বাসে গিয়ে উঠলুম, বেলা তখন প্রায় আটটা। এখান থেকে তিনটি পথ গেছে তিনদিকে। প্রথমটি জম্মু হয়ে সোজা শ্রীনগর, দ্বিতীয়টি ধরমশালা, কাংড়া ও মণ্ডিরাজ্যের দিকে, তৃতীয়টি 'চাম্বা' উপত্যকার পথে। কাশ্মীর হোলো উত্তর-পশ্চিমে, চাম্বা উত্তর-পূর্বে এবং কাংড়া হোলো পূর্ব-দক্ষিণে। 'চাক্কি' থেকে আমাদের পথ ঘুরলো উত্তরে। আমরা ধবলাধার গিরিশ্রেণীর উপত্যকার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার দক্ষিণপ্রান্তীয় উপত্যকায় প্রবেশ করবো। পঞ্চনদীর মধ্যে আমরা দক্ষিণবর্তী শতদ্রু ও বিপাশা দেখেছি বহুদূর পর্যন্ত, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার উৎসঅঞ্চল প্রায় ঘুরে এসেছি,— এবার আমরা চললুম ইরাবতীর পথ ধ'রে। গিরিশ্রেণীর ভিতরে-ভিতরে ইরাবতী নদী কোন্ পথ দিয়ে এসেছে আমাদের কিছুই জানা নেই। কিন্তু এইটুকু জানি, কুলু উপত্যকায় জন্ম নিয়েছে বিপাশা, লাহুল উপত্যকায় জন্মলাভ করেছে চন্দ্রভাগা তথা চন্দ্রা, এবং 'চাম্বা' উপত্যকার কোনও একস্থল থেকে বেরিয়েছে ইরাবতী।

'চাক্কীর' ঘাঁটি-পাহারা ছেড়ে আমাদের মোটর বাস চলেছে 'ভাটোয়া' হয়ে 'দুনেরা' গেট-এর দিকে। এটি নাতিউচ্চ উপত্যকাপথ। পার্বত্য, কিন্তু প্রায় সমতল। সমুদ্রসমতা থেকে এ অঞ্চল কমবেশী দুহাজার ফুট উঁচু, কিন্তু বোঝবার জো নেই। এখানে পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ উভয়ে মিশ্রিত। একজন আরেকজনের ঘাড়ের ওপর কোথায় ঝুঁকে পড়েছে, ঠিক হদিশ মেলা ভার। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করছি। হিমালয়ের স্বভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে ধীরে-ধীরে, কিন্তু উচ্চতা এসে পৌঁছয়নি। পাহাড়ের কোল এসেছে, এসেছে তা'র গায়ে-গায়ে অজস্র ফলন। গ্রামের সরোবরে কোথাও শ্বেত, কোথাও রক্তকমল ভেসে উঠেছে। দেখতে দেখতে গাড়ী এসে পৌঁছলো 'দুনেরা' বস্তিতে। এবার থেকে পথ একতরফা। ঘাঁটি-পাহারা এখানে গেট্ খোলে,—ওপক্ষের গাড়ী এসে পৌঁছলে এপক্ষের গাড়ীকে যাবার অনুমতি দেয়। এটি হিমাচল প্রদেশের সঠিক সীমানা কিনা বলতে পারিনে।

কথা ছিল, শ্রীমতী মায়া এ যাত্রায় ভ্রমণটি পরিচালনা করবেন। সুতরাং আমি অক্রিয়, তিনি সক্রিয়। তিনি চায়ের হুকুম করলেন, এবং তিনিই জল-যোগাদি আনালেন। পুরুষের প্রাধান্যের যুগ বোধ করি এবার শেষ হয়ে এলো, এবার নারীসমাজ। মেয়ে-পুলিশ, মেয়ে-উকীল, মেয়ে-হাকিম। ঝাঁসীর-রানী-ব্রিগেড্ দেখেছি নেতাজীর কৃপায়, নেহরুর কৃপায় দেখেছি মেয়ে-রাজদূত, গান্ধীজির কৃপায় দেখেছি মেয়ে-রাজ্যপাল, বিধান রায়ের কৃপায় মেয়ে-মন্ত্রী। এটি মহিলা যুগ। শ্রীমতী মায়া তদ্বির-তদারক করছিলেন। বলাবাহুল্য, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর লাভ হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে এসে পৌঁছলুম প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পেরিয়ে 'বানীক্ষেতে'। বানীক্ষেত,—'রানীক্ষেত' নয়। এর মধ্যে থেমেছে অনেকবার, পেরিয়েছে অনেক চড়াই উৎরাই। হিমালয় অনেকবার তার রাজমহিমা প্রকাশ করেছে, কোথাও কোথাও খরস্রোতা গিরিনদী ত্বরিৎ গতিতে সামনে দিয়ে ঘুরে অভিসারিকার মতো ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে আত্মগোপন করেছে। আমরা এতক্ষণে ইরাবতীর সীমানা পেলুম।

'বানীক্ষেতে' নামলুম। এখান থেকে ভিন্ন গাড়ী যাবে 'চাম্বায়'। আমাদের গাড়ীটি চ'লে গেল নিকটবর্তী 'ডালহাউসী' পাহাড়ের চূড়ার দিকে। হাতে সময় অনেকক্ষণ। সুতরাং হাতের কাছেই এক ফার্লং এগিয়ে বাজারের ধারে 'জয়হিন্দ' হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করা গেল।

বানীক্ষেত থেকে বাঁ-হাতি 'চাম্বা'র পথ। ইংরেজ আমলে সাহেবসুবোদের আনাগোনা কম ছিল ব'লেই 'চাম্বা' উপত্যকার পথটি ভালো হ'তে পারেনি। 'ডালহাউসী'র পথটি কিন্তু কলকাতার চৌরঙ্গী অপেক্ষা কম সুন্দর নয়, তবে অপ্রশস্ত। গাড়ী ছাড়লো,—তখন প্রায় বেলা পৌনে দুটো। এবার আমরা ইরাবতীর পথ ধরলুম। 'চাম্বার' পাহাড়ের কোলে তখন মেঘ নেমে আসছে। এখান থেকে আন্দাজ তিরিশ বত্রিশ মাইল পথ। শ্রীমতী মায়া এবার গুছিয়ে বসলেন।

প্রায় মাইলখানেক পর্যন্ত এগিয়ে সহসা অনুভব করলুম, সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন আমাদের সামনে থেকে মুছে গেছে, এবং উন্মত্তা ইরাবতীর পাশে পাশে হিমালয় যেন এবার তা'র প্রকৃত অন্তঃপুরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে। শব্দজগৎ স্তব্ধ। একমাত্র শব্দ হোলো ইরাবতীর প্রমত্ত গর্জন, এবং অন্য আওয়াজ মোটরের। সকালের জগৎ অপরাহ্ণে যেন নিশ্চিহ্ন। এই পথ দিয়ে আমরা কোনও কালে কোথাও জনপদ আবিষ্কার করতে পারবো এমন মনে হচ্ছে না। বর্ষার আক্রমণে পথ ভেঙেগ গেছে পদে পদে, পাহাড় থেকে বড় বড় 'ঝোরা' নেমেছে, ধস নেমে পথ ভেঙেগ নীচের দিকে অতিকায় পাথর গড়িয়ে গেছে। অতি সংকীর্ণ পথ। কোথাও ছায়া ছমছম করছে, কোথাও আতঙ্কজনক বাঁক। গাড়ীর পিছনের চাকা এক-এক সময় সংকট পেরিয়ে যাচ্ছে। একটি মুহূর্তের জন্যও নিরাপদ বোধ করছিনে। জন দশ বারো যাত্রী আমরা, কিন্তু সকলের মুখ শুকনো, এবং উদ্বিগ্ন। শীতকালে এ পথ এমন দুঃসাধ্য নয়। শুনলুম দুতিনটি লোক সম্প্রতি পাহাড়ের ধস প'ড়ে এখানে মারা গেছে। গত তিনদিন আগেও গাড়ী চলাচল এদিকে বন্ধ ছিল। মনে পড়ছে তিস্তা-বাজার থেকে সিকিমসীমান্ত রংগীত নদীর পথ। বনময়, বন্য, জনহীন, প্রস্তরপরিকীর্ণ সংকীর্ণ পথের সেই ভাঙগন। যাত্রী সম্পূর্ণ নিরুপায়, সামনে ও পিছনে পার্বত্যপথের রেখাটি যোগচ্ছিন্ন। তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদো। কান্না শুনে জন্তু যদি বা আসে, একটি মানুষেরও দেখা পাবে না। দু'চারদিন পরে হয়ত

আসবে পি-ডব্লু-ডির লোক তদন্তে—দেখবে তোমার নাজেহাল। তারপর খবর যাবে যথাস্থানে। পাহাড়ের পথ যদি খদ থেকে অনেক উঁচু হয়, এবং সামনে-পিছনে ধস নামে,—তবে শিবের অসাধ্য! ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দার্জিলিং ও সিকিমে এই ঘটনা ঘটে গেছে। দুবছর লেগেছিল নিরাপদ করতে।

আজ এখানে সেই চেহারা দেখে যাচ্ছি। ফাটল দেখা দিয়েছে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে, জল ঢুকেছে ভিতরে-ভিতরে। পাথরের ওজন কতক্ষণ টেনে রাখতে পারবে কে জানে, কতখানি ধস নামতে পারে তাও জানা নেই। ড্রাইভার মাঝে-মাঝে গাড়ী থামাচ্ছে, ডানপাশের পাহাড় এক একবার পর্যবেক্ষণ করছে, তারপর ষ্টার্ট দিচ্ছে গাড়ীতে। কে জানে, সতর্ক থাকা ভালো। একটি ধস নেমে আসার অর্থ,—মোটরবাস ও যাত্রীর দল ইরাবতীর মধ্যে সমাধিস্থ! তা'র চেয়ে বড় কথা,—ছেঁচে-কুটে অপঘাত মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যু এড়িয়ে আমাদের গাড়ী পালাচ্ছে পদে-পদে। ফিরে দেখি, মুখে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মায়াদেবী হেঁট হয়ে পড়েছেন। পাহাড়ের ঘূর্ণী লেগেছে তাঁর। তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, গাড়ী কেমন ক'রে পড়ছে গর্তের মধ্যে, কেমন কাৎ হচ্ছে, কেমন ভাবে আবার উঠছে। অপঘাত যদি ঘটে, তবে আনন্দের কথা এই—শ্রীমান্ কেশবের শোক-তাপ দেখার জন্য আমাকেও বেঁচে থাকতে হবে না। ভয়ে ভয়ে কেবল এই কথাই ভাবছিলুম, এ যাত্রায় মায়াদেবীর আসা উচিত হয়নি। পথঘাটের চেহারা আগে জানলে ভালো হোতো।

পাথরে-পাথরে মাথা ঠুকছে ইরাবতী, রণোন্মত্তা ভৈরবী যেন অসহ্য যন্ত্রণায় অবরোধ ভেঙেগ ছুটেছে। ধবলাধার ছেড়ে পীরপাঞ্জালের প্রান্তগিরিলোকে প্রবেশ করছি। চম্পাবতীর সংবাদ আনছে ওপারের পাহাড়ী পাখীরা। দেওদারের অরণ্যে মাঝে মাঝে দলছাড়া পাইন উঠেছে আপন সৌন্দর্যমহিমা নিয়ে।

ঘণ্টা তিনেক পরে এক স্থলে এসে সহসা গাড়ী থমকে দাঁড়ালো,—এর পর গাড়ী আর যাবে না। তখনও মাইল চার পাঁচ বাকি। এ অঞ্চল পাহাড়তলী, সুতরাং এরই মধ্যে দিনান্ত এসেছে ছমছমিয়ে। সামনেই ইরাবতীর ধারে বসেছে পুলিশ চৌকি। অদূরে একটি বড় পাহাড়ের বিরাট এক ধস নেমে এসেছে,—পথ বন্ধ। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে নেমে এলুম মালপত্র নিয়ে। দেখা গেল, আমরা ছাড়া অনেকেরই নিকট এ সংবাদটি বিদিত, অতএব তা'রা একে একে যে যার পথে পা বাড়ালো। আমরা পড়লুম একা। শূন্য মোটরবাস প'ড়ে রইলো এক পাশে, ড্রাইভার গা ঢাকা দিল।

এটি নাকি বস্তি, নাম 'প্রেল্।' কিন্তু ওই পুলিশ চৌকির একটি সশস্ত্র লোক এবং একটি ঘোড়া,—এ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখছিনে কোথাও। হঠাৎ এসে দাঁড়ালো দুটি কিশোর পাহাড়ী বালক পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে। তা'রা মাল বইতে পারবে জানালো। কিন্তু তাদের শীর্ণ চেহারা দেখে একেবারেই উৎসাহ পেলুম না। এদিকে সন্ধ্যা আসন্ন।

কেমন যেন একটু বিব্রতই বোধ ক'রে এবার ফিরে তাকালুম মায়াদেবীর দিকে। আর কিছু নয়, একজন ভদ্রমহিলার নিরাপত্তার প্রশ্ন! তাঁর স্বামী পাঠিয়েছেন গৌরবের সংগে,—আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্ব—কোনো পর্যায়েই ইনি পড়েন না, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ সম্মানে রাখার স্বাভাবিক দায়িত্ব আছে বৈকি। সুতরাং আসন্ন অন্ধকারের চেহারা দেখে একটু যেন ভয়ই পেলুম। বিরক্তিপূর্ণ অনুশোচনাও বোধ করলুম।

আমি আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।—এই ব'লে তিনি একদিকে একা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই আমি বাধা দিলুম,— না, একা যাওয়া হবে না আপনার। আপনি বরং দাঁড়ান্, আমি দেখি।

তিনিও মুখ তুলে তাকালেন। সে-মুখে হাসি। শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনি আমাকে একা ছাড়তে চান্ না, কিন্তু গুপ্তসাহেব আমাকে একা ছেড়ে দিয়েছেন! কেন জানেন? তিনি চেনেন আমাকে!

পুলিশ চৌকির ওই সশস্ত্র লোকটিকে ডেকে নিয়ে মায়াদেবী এগিয়ে গেলেন, এবং দূর পাহাড়িপথের বাঁকে অদৃশ্য হলেন।

পাঁচ মিনিট গেল! দশ মিনিট কাট্‌লো! পনেরো মিনিট হ'তে চললো! ঝিঁ-ঝিঁ পোকারা ডেকে উঠলো সন্ধ্যায়। চৌকির ঘোড়াটা একবার সাড়া দিল। পঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। বন্য পাখী পাহাড়ের ফাটলে কোথায় যেন ডানা ঝাপটিয়ে উঠলো। তিরিশ মি...হ্যাঁ, দূর থেকে এবার আসছে যেন দুটি ঘোড়া এদিকে। একটির উপরে নারীর আয়তন! আরেকটির উপরে সশস্ত্র সেই পুলিশ। দম আট্‌কে ছিল এতক্ষণ, এবার ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেললুম।

কাছে এসে লোকটি নামলো। পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালো দুটি ঘোড়াওয়ালা। পাশের ঘোড়াটির উপরে একদিকে দুই পা ঝুলিয়ে সহাস্যে ব'সে রয়েছেন মায়াদেবী। পুলিশের ওই লোকটির সাহায্যে বস্তি থেকে তিনি ওই ঘোড়া দুটি ও তাদের রক্ষীকে ধ'রে এনেছেন।

বিছানার পুঁটলী খুলে দুখানা কম্বল বা'র ক'রে দুটি ঘোড়ার পিঠে পাতা হোলো। আরেকখানি গরম চাদর মায়াদেবী চেয়ে নিলেন। এবারে ভাগাভাগি ক'রে সেই দুটি বালক ও অশ্বরক্ষী মিলে মালপত্রগুলি পিঠে তুলে নিল। পুলিশের লোকটিকে কিছু বকশিস্ দেওয়া হোলো। মায়াদেবী এবার হঠাৎ জিম্‌নাষ্টিক দেখিয়ে নিজেই টপ্ [illegible] উঠলেন ঘোড়ার পিঠে, তারপর চাদরখানা দিয়ে সামনের দিকে ঢেকে [illegible] অশ্বরক্ষী একবার আমার দিকে তাকালো, তারপর তা'র 'চাম্বিয়ালী' ভাষায় বললে, মেমসাহেব ঘোড়ায় চড়াটা জানেন ভালো।

ঘোড়া দুটি না পাওয়া গেলে হয়ত হোঁচট খেয়ে-খেয়ে রাত্রে একসময়

'চাম্বা'য় পেঁছিতুম, কিন্তু খোয়ারের শেষ থাকতো না। মধ্যপথে একটি গিরি-নদীর জলে খালি পায়ে নামতে হোতো, অন্ধকার পথে সরীসৃপের ভয় থাকতো,—এবং পরিশেষে মালপত্রের কোনও ব্যবস্থাই করা যেতো না। পথ এখন খুবই অন্ধকার। নদীর গর্জন শুনছি, কিন্তু দেখতে কিছু পাচ্ছিনে। ঝোপজঙ্গল এবং একটি পাহাড়ী বস্তির গা ঘেঁষে আমাদের ঘোড়া দুটি এগোচ্ছিল। কোথাও কিছু স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছে না। আলোর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

পাঁচ মাইল অত নয়, তা'র চেয়ে কম। সামনের দিকে একটি মস্ত পাহাড়ের অবরোধ ছিল, তাই অমন অন্ধকার জনশূন্যতা ছিল। আমরা পশ্চিম পথে মাইল দুই ঘুরে বনভূমির একটা অংশ পার হয়ে আসতেই দেখা গেল, দূরের পাহাড়ে রাত্রির আলো ঝিকমিক করছে। আর মাইল দুই। অশ্বরক্ষীরা সতর্কভাবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ছেলে দুটিও যাচ্ছে সাধ্যমতো মালপত্র পিঠে নিয়ে। মায়াদেবীর ঘোড়া সামনে এগিয়ে চলেছে। ঘোড়ার সঙ্গে তিনিও দুলছেন।

ক্রমে আমরা এসে পেঁছিলুম ইরাবতীর পুলের কাছে। এটি লছমন-ঝুলারই মতো কাছিটানা সাঁকো। কিন্তু আশেপাশে সব অন্ধকারে একাকার। লোকজন এবার দেখা যাচ্ছে। দোকানপত্র দেখছি। পুলের নীচে দিয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে নদী ব'য়ে চলেছে। পুল পার হয়ে ডানহাতি শহরের চড়াইপথ। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় অতি মৃদু ইলেকট্রিকের আলো জ্বালা হয়েছে। কিন্তু সেই আলো শ্রীনগরের রাত্রির আলোর মতোই মৃদু। ইলেকট্রিকের আলোর কথা আমার স্মরণ নেই,—আমাদেরকে তেলের আলো জ্বালাতে হয়েছিল।

চড়াইপথে ধীরে ধীরে পাকদণ্ডী পেরিয়ে আমরা উঠে এলুম শহরে। শহর-প্রবেশের ঠিক মুখে একটি বিশাল প্রাচীন তোরণদ্বার, কিন্তু তোরণটির বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে 'গান্ধী-তোরণ।' তোরণ পার হলেই ডানদিকে প্রশস্ত এক ময়দান, এটি নাকি পোলোখেলার মাঠ। শহরের বাজার আরম্ভ হয়েছে ঠিক তোরণের পর থেকে।

কিন্তু হঠাৎ রাত্রিকালে শহরের মধ্যে একজন অশ্বারোহীর সঙ্গে আরেকজন সুন্দরী অশ্বারোহিণী এসে প্রবেশ করবেন, এবং তিনি নিতান্ত অবলা লজ্জা-জড়িতা নন [illegible]
সঞ্চার করো [illegible]
জনতার আ [illegible] এবং [illegible] যখন জানলো—আ[illegible]রা [illegible]
করতে এসে [illegible] উপত্যকায়, তখ[illegible]
মধ্যে অনেকে [illegible]র জন্য [illegible] বাস [illegible] দেখিয়ে দেবার উৎসাহে [illegible]
এলো।

বাসস্থা[illegible] এবং সেটি ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিমে [illegible] একটি নিরিবিলি মস্ত বাগানের মধ্যে। বাগানের ঠিক নীচে ইরাবতীর খদ,

গভীরতলে নদী বয়ে চলেছে। এই বাগানে অজস্র পুষ্পলতা, সূর্যমুখী, গোলাপ এবং ডালিয়া থরে থরে প্রস্ফুটিত। মাঝে মাঝে রয়েছে ওক্, আর পাইন, মাঝে মাঝে এক আধটা চীড়। নানাবিধবর্ণ অসংখ্য ফুল ও পুষ্পলতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দুই পাশে, কিন্তু এদের নাম মনে রাখতে পারলুম না কোনও কালে। যাই হোক, উদ্যানের এই শোভা আজও থেকে গেছে বোধ করি একটি কারণে। মাস দেড়েক আগে পণ্ডিত নেহরু এসেছিলেন চম্পাবতীতে,—ফলে, সর্বালঙ্কারভূষিতা হয়েছে চম্পাবতী! বন্য কৌমার্যের গায়ে জড়ানো হয়েছে মণিরত্নখচিত আভরণসজ্জা।

বাগানে এসে যখন আমরা ঢুকেছি, দেখি রাত্রি সাড়ে সাতটা। দুইধারে বিশাল পর্বত বেষ্টন ক'রে রয়েছে,—সেই কারণে এই উপত্যকায় রাত্রি ঘনিয়েছে একটু অকালে। বারান্দার উপরে টিপটিপ করছে একটি আলো, তা'র বাইরে সমস্তই আবছা। সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে একটি প্রকাণ্ড তির্যক ছায়া বাগানে নেমে এসেছে দেখে কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। দেখি, দ্বিতীয়ার অতি শীর্ণ বঙ্কিমচন্দ্র—রমণীর নখাগ্রের মতো—দূর পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হবার আগে তা'র শেষ সঙ্কেতটুকু রেখে যাচ্ছে। আকাশ ঝলমল করছে জ্যোতিষ্কে আর তারকায়।

অশ্বরক্ষীরা জিনিসপত্র নামালো। খানসামা এসে দাঁড়ালো সামনে। একটি অতি সুশ্রী ও সুপুরুষ যুবা,—ভদ্র এবং লাজুক। আমরা যা কিছু প্রস্তাব করি, তাইতেই সে নতমুখে সম্মত হয় এবং সেটি প্রতিপালন করে। করে বটে, কিন্তু দেরি করে—এই যা অসুবিধা। দু'জন অশ্বরক্ষী এবং দুটি বালককে তাদের পারিশ্রমিক ও বকশিস দিয়ে বিদায় করা হোলো। মায়াদেবী ছেলে-দুটিকে কিছু খাদ্যও দিলেন।

ঠিক মনে নেই, খানসামার নামটি বোধ করি মহেন্দর। সে এসে দরজা খুলে আলো জেবলে দিল। পাশের ঘরটিতে এসেছেন একজন সৌম্যদর্শন 'এগ্রিকালচারাল ইনস্‌পেক্টর।' তাঁকে ডেকে আমরা আলাপ করলুম। আমাদের এ ঘরটি বেশ বড় এবং সুসজ্জিত। এধারে ওধারে প্রচুর আসবাবপত্র সাজানো। ঘরের দেওয়ালে একটি প্রকাণ্ড বাঘের ছবি,—স্বল্প আলোয় তা'র জ্বলজ্বলে চেহারাটা দেখলে ভয় করে। দূরের থেকে একজন শিকারী তা'র দিকে বন্দুক তুলেছে।

মহেন্দর পাঁচ মিনিটের চা পনেরো মিনিটে আনলো, তারপর স্নানের ঘরে গরম জলের ব্যবস্থা করতে লা[illegible]ং ক'রে ঘণ্টাখানেক। সব কাজেই তা'র দেরি। একটি ঘটি আনতে লেগে[illegible] বসলেন। [illegible]নট। মায়াদেবী তাকে নৈশভোজনের ব্যবস্থা করতে বললেন [illegible] রাত বারোটার আগে সেই খাদ্য আমাদের মুখে উঠবে কিনা গভীর সন্দেহ।

দিনের আলোয় নতুন দেশে পেঁছিলে সমস্তটা আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া যায়।

আলোয় [illegible]াওয়ায় তা'র প্রকাশের সঙ্গে একটি আত্মীয়তা ঘটে। আমরা রাত্রের দিকে এসেছি ব'লেই সমস্তটা সন্দেহে ভরা। কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, সেজন্য অবিশ্বাস্যকেও বিশ্বাস করতে হচ্ছে। ঘরের অথবা বারান্দার আলোটুকুতে যেটুকু প্রকাশিত, তা'র বাইরে এ জগৎটি হোলো ভৌতিক। সেই কারণে একজন কয়েক পা এগিয়ে গেলেই আরেকজন তা'র সাড়া নিচ্ছি। ইচ্ছা ক'রেই অনাবশ্যক কথা বলছি, কেননা ওইটুকু সোরগোলের মধ্যেই সাহস। রাত আন্দাজ সাড়ে নটার সময় ইন্‌স্‌পেক্টর ভদ্রলোক তাঁ'র ঘরের দরজা বন্ধ করার আগে অনুগ্রহ ক'রে বললেন, যদি কোনও দরকার হয় আমাকে ডাকবেন। আপনারা অবশ্য এ অঞ্চলে নতুন লোক, তবে এখানে ভয়ের কিছু নেই। আমি পাশেই রইলুম।

মায়াদেবী দ্রূকুঞ্চন ক'রে সহাস্যে বললেন, ভয় নেই ব'লে লোকটা যেন আরও ভয় পাইয়ে দিল! কই, আপনার মহেন্দরকে একবার হাঁক দিন্ দেখি!

বাইরে এসে হাঁক দিলুম, কিন্তু চমকে উঠলুম নিজের হাঁকে। সামনে কখন্ যেন সেই শীর্ণ চন্দ্রের ছায়া কৃষ্ণকায় ময়দানবের বক্ষপট থেকে মিলিয়ে গেছে। শুধু চরাচরব্যাপী রয়েছে নিঃঝুম অন্ধকার। বারান্দার আলোটা আর জ্বলছে না। চেতনার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠে এলো আরেকটি লোক,—মহেন্দর নয়। লোকটি বয়স্ক, রেষ্ট হাউসের পাচক। তাকে বললুম, আমরা স্নান সেরে ব'সে আছি, বুঝেছ? খাবার-দাবার কই? মহেন্দর কোথা?

বাজার গিয়া।

বাজারে গেছে এতক্ষণে? মানে? জিনিসপত্র কিনতে?

জি হাঁ।

এর পর আর কিছু বলবার রইলো না। সঙ্গে আমাদের আর কোনও খাদ্য নেই। মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন। তিনি ঘরে গেলেন, আমি বারান্দার ধারে ব'সে অপেক্ষা ক'রে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরেই এলো অবশ্য মহেন্দর। ঠাহর ক'রে দেখলুম, কি-কি যেন তা'ব সঙ্গে। রাগে গসগস করছিলুম। ছোকরা নিজের মনেই লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ভিতর দিকে কোথায় যেন গিয়ে ঢুকলো।

[illegible] এবার সে খাবার আনলো [illegible] ঘরে [illegible] বছর পাঁচি[illegible] ঝল[illegible] অত্যন্ত ক্রুদ্ধ [illegible] দু[illegible]র [illegible] ক'রে প্রশ্ন [illegible] কি মেয়ে

মায়াদেবী হেসেই অস্থির। হাসিমুখে তিনি প্রশ্ন করলেন, এ ক্ষণ কি ...ছিলে? আমরা যে ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করছিলুম!

মহেন্দর সবিনয় জানালো, সে 'নিমক' আর মাখন আনতে গিয়েছিল ...জারে, তবে পথে একটুখানি তাস খেলতে ব'সে গিয়েছিল!

তা'র এবম্বিধ সরল স্বীকারোক্তি শুনে আমরা অভিভূত হলুম। কিন্তু একথা সত্য, তার ওষ্ঠাধরের এ প্রকার ...লবর্ণ পুরুষ মানুষের মুখে আর কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। আহারাদির পর যথারীতি সে এসে তেমনি বিনীত ভাবটি বজায় রেখে থালাবাসনগুলি নিয়ে চ'লে গেল।

রাত্রে শীত পড়েছিল। কিন্তু দিল্লী থেকে বেরিয়ে এই প্রথম আবিষ্কার করলুম, বিছানার কোনও পুঁটলী মায়াদেবীর সঙ্গে নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় ওটার কথা তাঁর মনেই পড়েনি। তাঁর এই শিল্পী-জনোচিত জীবনবৈরাগ্য নিয়ে পরিহাস করতেই তিনি বললেন, বিশ্বাস করুন, আমার ঠাণ্ডাও লাগে না, অসুখও করে না। শীতের রাত্রেও এক একদিন নাচের আসর থেকে ফিরে গলগল ক'রে ঘাম পড়েছে, গায়ে ঢাকা না দিয়েই ঘুমিয়েছি।

'চাম্বা' উপত্যকার প্রকৃত নাম 'চম্পাবতী।' দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক কাহিনীটির সত্য-মিথ্যা কখনও নিরূপণ করার চেষ্টা পাইনি, কিন্তু তারই অনুরূপ একটি কাহিনী এককালে এই উপত্যকায় ঘটেছিল। চম্পাবতী ছিলেন রাজদুহিতা, সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। কোনও এক ভিনদেশী সৌম্যদর্শন তরুণের সঙ্গে তিনি প্রণয়াসক্ত হন্, এবং সম্ভবত গোপনেই তাকে বিবাহ করেন। রাজকন্যার এবম্প্রকার বিবাহ এবং জীবনযাত্রা পিতার পক্ষে আনন্দদায়ক হয়নি এবং যখন সেই তরুণের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে,—চম্পাবতীও সেই চিতার আগুনে ঝাঁপ দেন্। এখানকার প্রধান একটি মন্দিরের নাম 'চম্পাবতী'—ভিতরে যাঁর মূর্তি রয়েছে তিনি হলেন মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা।

পরদিন আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। দূর হিমালয়ের অন্তরালে,—জনতার সর্বপ্রকার কলরব-কোলাহলের বাইরে চম্পাবতী যেন তপস্বিনী। চারিদিকে বিরাট হিমালয়ের অন্তহীন একটির পর একটি উত্তুঙ্গ স্তর,—পৃথিবী এখানে অচল ... সম্পূর্ণ ... হোরাইজন্' গল্পটি মনে পড়ে, হিমালয়ের আকাশপথে একটি উ... মান যখন 'লাসা'নগরী আবিষ্কার করে। চম্পানগরীও তেমনি হিমালয়ের গহনলোকে যেন একটি নিরুদ্দেশ হারানো শহর।

চম্পাবতীর এই পার্বত্য পরিবেষ্টনের একদিকে জম্মু ও কাশ্মীর, অন্যদিকে লাহুল জাস্কার ও লাডাখ,—এই দুইয়ের মধ্যলোকে দুর্গম ও গগনস্পর্শী

পীরপাঞ্জালের নীচে দিয়ে চ'লে গেছে চন্দ্রভাগার প্রবাহ। এপারে চম্পাবতী, ওপারে লাহ্নল। সমগ্র পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা এই অঞ্চলে কুড়ি থেকে বাইশ হাজার ফুট। চম্পাবতী, লাহ্নল ও কুলু উপত্যকাই হোলো পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থল—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিপাশা। লাহ্নলের দক্ষিণে কুলু। চম্পাবতীর দক্ষিণে ধবলাধার অতিক্রম করলেই কাংড়া উপত্যকায় পৌঁছনো যায়। গত বছর এমন দিনে আমরা কাংড়া ও কুলু ভ্রমণ করছিলুম।

চম্পাবতীর পার্বত্য উপত্যকার আয়তন হোলো ৩,২১৬ বর্গমাইল, এবং জনসংখ্যা সওয়া লক্ষর কিছু বেশী। চম্পা শহরে মাত্র ৬,০০০ নরনারীর বসবাস এবং চাষবাস পশুপালনাদি তাদের উপজীবিকা। এই উপত্যকা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত, এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতে এব উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র উপত্যকাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে বিরাট এক একটি গিরিশৃংগ,—হাতীধর, ধবলাধর, পাংগীশ্রেণী, মণিমহেশ, দাগানিধর, ছত্রধর এবং জাস্কার। চম্পার অধিবাসীগণের মূল পরিচয় হোলো, তা'রা রাজপুত এবং রাঠোরবংশীয়। চম্পাবতীতে এরা 'রাঠ' নামে পরিচিত। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, তাতার, পাঠান এবং মোগলযুগে রাজস্থানের একটা বড় অংশ যখন টুকরো-টুকরো হয়ে হিমালয়ের নানা পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আঞ্চলিক আদিবাসীদের সংগে হাত মিলিয়ে আপন আপন শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন কবতে থাকে,—এই 'রাঠ' সম্প্রদায় তখন হয়ে ওঠে তাদেরই একটি ভগ্নাংশ। নেপালে, কাংড়ায়, মণ্ডিতে, বিলাসপুরে, কুলুতে এবং আরও অনেক অঞ্চলে রাজস্থানী রাজপুতরা [illegible] হিন্দু, যাদের [illegible] রাজপুত, [illegible] মধ্যে অনেকটা [illegible] গেছে বৈকি [illegible] অনুভব করে [illegible] অপেক্ষা বা [illegible] ওখানে সুপ্রত্যক্ষ। বাঙলায় [illegible] শীতলাদেবীব পু [illegible] ও কঠোর মূর্তিতে [illegible] সংগে সাপ [illegible] ড়িয়ে সাপে [illegible] অথবা 'দেওন [illegible] অথবা 'নাগা'- [illegible] মাত্র। সাপে [illegible] 'রাতির' নামক [illegible] নিজস্ব যেটি [illegible] নাম 'চাম্বিয়াল [illegible] হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জা [illegible] একই ভাষা ঘু [illegible] অনেক দেশে, মাঝে মাঝে কেব [illegible] আঞ্চলিক আও [illegible]

চম্পাবতীর [illegible] ছিল অভিজাত। তা'রা ছিল প্রবল শক্তিব পূজারী [illegible] কন্দীয় প্রভুদের [illegible] বশ্যতা স্বীকার

করেনি। এরা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতের থেকে এরা নিজেদেরকে কখনও পৃথক মনে করেনি। ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে এরা বৃহতের সঙ্গে আত্মিক যোগ কখনও হারায়নি। ইউরোপের খৃষ্টান রাজনীতিতে আমরা যে অসভ্যতা দেখে আসছি একশো বছর কাল থেকে, এদেশে সেই প্রকার রাজনীতি অনেক কম। হিমালয়ে তা'র চেয়েও কম। পররাজ্যের প্রতি লোভ ও জুলুম, পরের ঘরে অশান্তি বাধাবার ফন্দি, পরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ও হুমকি, পরের উপরে প্রভুত্বের চেষ্টা,—এই রাজনীতি ভারতীয় ঐতিহ্যের ধাতে সয়নি। বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চেয়ে পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় একমাত্র দেশ ভারতবর্ষ যেখানে দুই প্রকার মহাসম্মেলন আহ্বান ক'রে মানুষের সঙ্গে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মিলনের চিরকালীন চেষ্টা করা হয়েছে। তা'র মধ্যে একটি হোলো ধর্ম মহাসম্মেলন এবং অন্যটি হোলো 'মহাকুম্ভের মেলা'। ভারতের প্রায় সর্বত্র আজও সেই সম্মেলন এবং শত-সহস্র বাৎসরিক 'মেলা' তা'র শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এইসব সম্মেলন এবং 'মেলা'র না আছে বিজ্ঞাপন, না বা প্রচারকার্য,—হয়ত পঞ্জিকার এক কোণে ছোট্ট একটি উল্লেখ আছে, এবং সেইটিই যথেষ্ট। শতে, সহস্রে, লক্ষে—ছুটে আসবে নরনারী দেশ-দেশান্তর থেকে। তখন দেখি একটি মাত্র তীর্থপথে ভারতের সকল জাত এবং শ্রেণী একাকার হয়ে থাকে।

চম্পাবতীর প্রাচীন রাজধানী হোলো, ভ্রামর। কেউ বলে, ব্রহ্মহর। চম্পানগরী থেকে ইরাবতীর তীরে তীরে পূর্বপথে অগ্রসর হ'লে আন্দাজ পঞ্চাশ মাইল দূরে 'ভ্রমর।' এই নগরীর বন্য পার্বত্য শোভা অতি মনোরম। এখানে 'বর্মা' বংশ ছিল বহুকাল। আদিত্য বর্মা, লক্ষ্মী বর্মা, শাহিলা, সোম, উদয়, গণেশ, প্রতাপ সিং, বলভদ্র, পৃথ্বী সিং, ছত্র সিং, শ্রী সিং, গোপাল সিং, শান সিং, ভুরি সিং ইত্যাদি বহু নরপতির শাসনকাল ছিল। চম্পানগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে, তাও বহুকাল। এই উপত্যকার দুইদিকে, অর্থাৎ ধবলাধার ও পীরপাঞ্জালের মধ্যস্থলে বহু দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থস্থান আজও এখানকার শিবশক্তি উপাসনার গৌরব বহন ক'রে চলেছে। তাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর, শিখর, লছমণ, শক্তি, চামুণ্ডা, ভগবতী, বংশীগোপাল ইত্যাদি প্রধান। চম্পাবতীর সর্বপ্রধান যে ক'টি উৎসব, তাদের মধ্যে পহেলা বৈশাখের নববর্ষ উৎসব একটি। এ ছাড়া পহেলা ভাদ্রে একটি উৎসব হয়, সেটির নাম 'পত্ররু' সংক্রান্তি,—সেটির সঙ্গে বোধ করি বর্ষার সাফল্য ও সার্থকতার যোগ আছে। তারপর হোলো 'মণিমহেশের' বিরাট উৎসব ও মহাসম্মেলন। এটির নাম 'মাশরু'। এই মেলাটি শিব-পার্বতীর নামে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকটা 'কুলুর' দশহরা উৎসবের মতো। 'মণিমহেশে'র এই মেলায় সমগ্র চম্পাবতীর নর্তকীরা এসে জড়ো হয় এবং তাদের আলুথালু ও জীবনমরণ মাতানো নাচ দেখার জন্য বহু দূর দেশ থেকেও পর্যটকরা আসে। সেই নাচের নাড়া খেয়ে কমলকোরক

রক্তপদ্মে পরিণত হয়। জ্যোৎস্নারজনীতে পাহাড়ে পাহাড়ে নৃত্যসভা ব'সে যায়।

'খাজিয়ার' তথা 'খাজার' এখান থেকে প্রায় আট মাইল চড়াই পথ, সেখানকার পাইনবন এবং সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে কাশ্মীরের গুলমার্গ মনে পড়ে। অতি নিরিবিলি এবং নিভৃত নিকুঞ্জলোক। নিকটেই একটি প্রাচীন দেবস্থান,—নাম 'খাজিনাগ।' সেখানকার জনবিরল ডাকবাংলার বারান্দায় ব'সে অনেক পথের অনেক পথহারানো পাখী তাদের প্রাণের প্রলাপ গুঞ্জন ক'রে চ'লে যায়।

দিন দুই ঘুরে-ঘুরে আমরা বেশ পরিশ্রান্ত। গত বছর মায়াদেবী ছিলেন গম্ভীর, এবারে হুজুগে মেতেছেন। কলরব তুলছেন পথে-ঘাটে। নাচ দেখছেন, গান শুনছেন, ফটো জোগাড় করছেন। টিলাপাহাড়ের ওপর চম্পাবতীর রাজপ্রাসাদ,—তা'র মধ্যে রয়েছে চিড়িয়াখানা,—সেখানে নানা পশুপক্ষীর মেলা। মায়াদেবী ঘুরছেন প্রাসাদপ্রাঙ্গণে আর অন্তঃপুরের আশে-পাশে। সংকীর্ণ পথ পেরিয়ে মস্ত দেউড়ীর ভিতর দিয়ে ঢুকছেন লছমীনারায়ণের মন্দিরে। এদিকে গণেশের মন্দির, ওধারে চামুণ্ডা, তারপর ভগবতী। কোথাও পূজো দিচ্ছেন, কোথাও বা মেয়েদেরকে জড়ো করছেন। ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি হাটতলার পাশ দিয়ে দোকানপাতি ছাড়িয়ে ছোট ময়দানের সামনে 'ভূরি সিং' যাদুঘরে,—যেখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র এবং তৎসংলগ্ন ঐতিহাসিক সামগ্রী সুরক্ষিত।

আমরা বড় শহুরে মানুষ,—এখানকার কোনোটাই আমাদের কাছে নতুন নয়। এখানে সব রকমের প্রতিষ্ঠান প্রায় পাশাপাশি,—আধঘণ্টার মধ্যে দেখা শেষ হয়ে যায়। প্রাসাদে আর কোনও বিস্ময় নেই,—বিস্ময় আছে মানুষের বৈশিষ্ট্যে এবং সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য পরিচয়ে। ঠিক তথ্য সংগ্রহ নয়। কিন্তু দেখতে চাচ্ছি সেই বস্তু, যা দেখিনি কোনওদিন। জীবনের নিবিড় পরিচয়টুকু জানতে চাচ্ছি, যেটি রয়েছে পাহাড় পর্বতে জড়িয়ে, যেটি রয়েছে আদি অধিবাসীদের ঘরকন্নার মধ্যে ছড়িয়ে। যাদুঘর, হাসপাতাল, পৌরভবন, প্রসূতিসদন,—এসব দেখার জন্য আসিনি, এসেছি চম্পাবতীর প্রাণের ইতিহাস পাঠ ক'রে যেতে,—যেটি তা'র শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

চম্পাবতীর সামন্ত নরপতি ছিলেন এই সেদিন অবধি; এখন ভারত গভর্নমেণ্টের নিয়োজিত ডেপুটি কমিশনার ব'সে রয়েছেন শাসনকার্য নিয়ে। তাঁরই সৌজন্য ও সহায়তায় আমরা জানবার ও বুঝবার সুবিধা পেলুম অনেক। চম্পাবতীর পায়ে ছিল শৃঙ্খল,—আজ শৃঙ্খলের পরিবর্তে নূপুর। ইরাবতীর তীরে-তীরে সেই নূপুর 'ঝুমুর-ঝুমুর মধুর' হয়ে বেজে চলেছে। চম্পাবতী

গ চোখ মেলেছে। কাজ তুলে নিয়েছে অনেক। কুটীর-শিল্পের নানাবিধ মাস নিয়ে সে নতুন জীবন আরম্ভ করেছে। ডেপুটি কমিশনার মহাশয় পাবতীর সমস্ত পরিচয় আমাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। অনেক ক্ষেত্রে দলিল-পত্রও তিনি বা'র ক'রে দেখতে দিলেন।

'হরিরায়ের' মন্দিরের পাশ কাটিয়ে ময়দান পেরিয়ে আমরা রেষ্ট হাউসের সেই নন্দনকাননে এসে ঢুকলুম রাত্রের দিকে। সেই এগ্রিকাল্‌চারাল্‌ ইন্‌স্‌পেক্টর ভদ্রলোক চ'লে গিয়েছেন। অন্ধকারে থমথম করছে দুখানা শূন্য হলঘর। মহেন্দর তাদের মহলে আছে কিনা কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাগানের গায়ে বিশাল পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে একটি আবছা পথ উঠে কোন্‌দিকে যেন হারিয়ে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে একবার হাঁক দিলুম মহেন্দরকে, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। আজকে আর আলোও জ্বলেনি বারান্দায়।

আন্দাজে-আন্দাজে এগিয়ে ঘরের চাবি খুললুম, কিন্তু হারিকেন লণ্ঠনটি খুঁজে বের করার জন্য চার-পাঁচটি দেশালাইর কাঠি জ্বালাতে হোলো। হঠাৎ এতক্ষণ পরে মনে প'ড়ে গেল, কেরোসিনের অভাবে গত রাত্রে আলোটা কখন্‌ এক সময় নিভে গিয়েছিল। লণ্ঠনটা তেমনি শূন্য অবস্থায়েই রয়ে গেছে। মোমবাতি কেনার কথা মনেই পড়েনি।

মায়াদেবী বোধ করি আমার মুখের চেহারাটা অনুমান করেছিলেন। বললেন, মহেন্দর আসবে ঠিক সময়, ভাববেন না। শুনুন, বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে আপনি যেন রাগারাগি করবেন না! আর ত' আজকের রাত্তিরটা!

পরদিন প্রভাতেই আমাদের যাত্রা। কাল রাত্রের তিরস্কার মহেন্দর ভোলেনি। আজ প্রত্যূষে চা ও কিঞ্চিৎ প্রাতরাশের ব্যবস্থা ক'রে দিল। নির্দিষ্ট সময়ে ঘোড়াওয়ালারা দুটি ভদ্রগোছের ঘোড়া এনে বারান্দার নীচে হাজির করলো। সকাল তখন সাতটা। রাঙা রৌদ্র স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। নীচের উপত্যকায় তখনও প্রভাত এসে পৌঁছয়নি। মধুর ঠাণ্ডায় চম্পাবতীর চোখে তখনও সুখের তন্দ্রা জড়ানো। মহেন্দরের পাওনা এবং বকশিস মিটিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

ঘোড়াওয়ালারাই আমাদের মালপত্র সঙ্গে নিল। মায়াদেবীর একটি সুটকেস এবং ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা উৎরাই পথে ইরাবতীর তীরে নেমে সাঁকো পার হয়ে ঘোড়ায় উঠলুম।

পাখীর কণ্ঠে প্রভাতী বন্দনা চলছিল। বনময় বস্তি ও পাহাড়তলীর ধারে ধারে আমাদের ঘোড়া দুটি চললো। আবার আমাদের যেতে হবে সেই 'প্রেল্‌'নামক পুলিশ চৌকী পর্যন্ত, সেখানে মোটরবাস পাবার কথা। গিরি-নদীটি পার হয়ে দূর পথে অগ্রসর হলুম। সূর্যকিরণ নেমেছে তখন ইরাবতীতে।

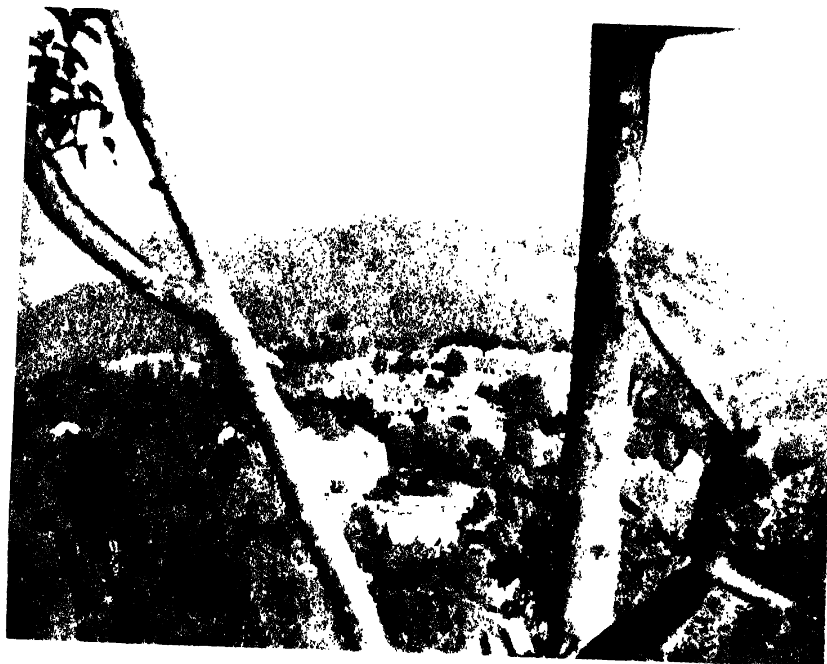
॥ ১২ ॥

ধবলাধারের প্রান্তভাগেই নামছি। নীচে নেমে আবার ঘুরে যাবো পশ্চিমে। সেই একই ইরাবতীর ধারাপথে ফিরে যাচ্ছি,—প্রেল্ থেকে 'বানীক্ষেত',—রানীক্ষেত নয়। সেই পাহাড়ের তলায় তলায় ভাঙন, আর ধস নামা। সেই সংকট আর অপমৃত্যুর ভয়,—সেই পাশে পাশে বন্য আর পার্বত্য ছায়াচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে লীলায়িত ইরাবতী পাথরে-পাথরে আছাড় খেয়ে ছুটেছে। কালো-কালো অতিকায় পাথর পড়ে রয়েছে নদীতে এক একটি মহিষাসুরের মতো,—মহিষমর্দিনী ইরাবতী রণোন্মত্তা হয়ে তাদেরকে দলন ক'রে চলেছে।

ভয় আর পাচ্ছিনে। ভয়েতেও অভ্যস্ত। ড্রাইভারের হাতে যদি ষ্টিয়ারিং ঠিক থাকে, তবে আমাদের মৃত্যু ঘটানো শিবেরও অসাধ্য। সুতরাং আর ভয় পেতে চাইনে, ওটা হোলো মনের একটি বিশেষ অংশের পংগুতা। মৃত্যু কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে মৃত্যুভয় কমে যায়। হাসপাতালের ডাক্তার মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত। মানুষ মরছে, সহকারীদের সংগে তিনি চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছেন। শ্মশানের মুর্দাফরাস চিতার আগুনে বিড়ি ধরায়। যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে মড়া সাজিয়ে নীচের দিকে সিঁড়ি বানিয়ে সৈন্যরা মাথা তুলে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে। সবই এক সময় অভ্যাস হয়ে যায়। সাধুসন্ন্যাসী যখন নদী-পাহাড়ের ধারে কোথাও ম'রে প'ড়ে থাকে, তখন আরেক সাধু সেই পথ দিয়ে যাবার সময় অবশ্য মৃতের ঠ্যাং ধ'রে নদীতে ফেলে দিয়ে যায়,—কিন্তু মৃতের শেষ সম্পত্তির সেই হয় উত্তরাধিকারী। হয়ত সে খুঁজে পায় একটি ছোট্ট কল্‌কে, এক খাবল কাঁচা তামাক, কিংবা এক টুকরো গাঁজার জট, আর নয়ত বা এক বড়ি অহিফেন-সদৃশ চরস,—ব্যস। ওইখানে বসেই কল্‌কেটি সেজে আগুন দিয়ে দম্‌ভোর টানে দুই টান। চোখ রাঙা ক'রে ওই পরলোকগত উলংগ অদ্বৈতবাদীর দিকে একবার তাকিয়ে বলে যায়,—ইয়া, বোম্ শিউয়াশংকর! মৃত্যুভয় ও শোকের সংস্কার তাকে স্পর্শ করে না।

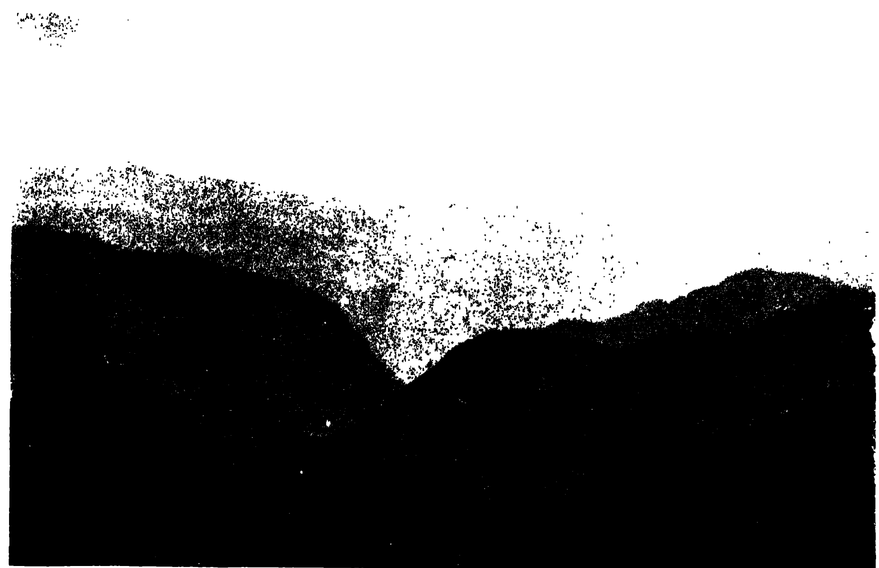
সবই অভ্যাস। মন আমাদের নিত্যই জীর্ণ হ'তে থাকে কয়েকটি সংস্কারে। ভয় তা'র মধ্যে প্রধান,—কেননা পিতামাতার অশিক্ষাদানের ফলে শৈশব থেকে ভয় চেপে বসে সন্তানের মনে। ভূতপ্রেতের ভয়, চোর-ডাকাতের ভয়, সেপাই-সান্ত্রীর ভয়, অপঘাত সম্ভাবনার ভয়,—আরও নানাপ্রকারের ভয়। তা'র সংগে জোটে ব্যাধি ও বেদনাবোধ, সুখদুঃখবোধ, শোক-তাপবোধ, জরা-বিকার-হিংসা-ঘৃণা-লোভ-কামবোধ ইত্যাদি এরাও পেয়ে বসে ওই সংগে। ফলে, মানুষ হয়ে ওঠে বিভিন্ন বৃত্তির একটা সংমিশ্রণ। এদের থেকে মুক্তিই হোলো প্রকৃত মুক্তি। এইটিই মানুষের চিরকালীন ক্ষুধা। সংসার পিছন থেকে টানছে এদেরই চক্রান্তে













টেনে ফেলবার, ওদিকে বেদান্তবাদ টানছে অসীম আদি অন্তহারা মুক্তিচৈতন্যের দিকে। দুইদিকের দুই টান,—মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ। এই দোটানার মধ্যে প'ড়ে মানুষ গুরু খোঁজে, সাধুসন্তর কাছে ধর্ণা দেয়, তীর্থপথে ছোটে, মন্দির বানায়, কীর্তনের আসরে গিয়ে বসে, কিংবা পিঁপড়ের গর্তে চিনি দেয়। সব পেয়েও আনন্দ নেই, এই হোলো সুখী মানুষের দুঃখ; সব ছেড়েও আনন্দ পাওয়া যায়, এই হোলো জ্ঞানী মানুষের ভাষ্য। সেই কারণে সুখী মানুষরা যখন আনন্দলাভের অসীম ক্ষুধায় দুঃখ বরণ করে, সংসারী লোকরা তখন চমকে ওঠে। শাক্যসিংহের পলায়ন দেখে ভারতবর্ষ একদা তেতে উঠেছিল। নিরাসক্ত, স্বচ্ছ এবং নির্বিকার আনন্দই একমাত্র বস্তু,—যেটি আপন অন্তর্যামীকে ঘিরে মধুর স্বর্গ রচনা করে।

ছাব্বিশ মাইল পথ। ওই পথটিতে পড়েছিল অমর্ত্যলোকের ছায়া। যা কিছু দেখি,—বস্তুমাত্রই অভিজ্ঞতা। জীবনের পরম আস্বাদ হোলো অভিজ্ঞতায়। অনেক বই পড়েছে অনেকে, অনেক পন্ডিত অনেক শাস্ত্র পাঠ করেছে। কিন্তু পৃথিবীকে সে পাঠ করেনি, জীবনের পৃষ্ঠা ওলটায়নি। শাস্ত্র দেয় ভাষ্য আর ব্যাখ্যা, কিন্তু অভিজ্ঞতা দান করে না। অভিজ্ঞতাই জীবন। তার বৈচিত্র্যে অপরিসীম কৌতুক, তারই সংঘাতে আশ্চর্য নাটকীয়তা। গতি আছে ব'লেই গ্রহণ করতে পাচ্ছি, দেখছি ব'লেই অভিজ্ঞতালাভ করছি। বুদ্ধিতে পাই, চেতনায় পাই, জ্ঞানে পাই, দুঃখ ও আনন্দে পাই, দুর্যোগে-বেদনায়-ভালোবাসায় সর্বপ্রকারে পাই। পান্ডিত্যের মধ্যে এই পাওয়া নেই,—সেইজন্য পান্ডিত্য হোলো শূন্য, জ্ঞান হোলো সমৃদ্ধ। জ্ঞানের জন্ম অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানের প্রকাশ জীবন-সাধনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রিলাভের কালে স্নাতকরা যখন আশীর্বাদ লাভ করে, তখন প্রথম কথাটাই হোলো—বাইরে এসে দাঁড়াও জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, ওইখানেই তোমাদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রথম আরম্ভ। তোমরা গতিলাভ করো, অভিজ্ঞতা অর্জন করো,—সেই হবে তোমাদের জ্ঞানের প্রথম সোপান।—স্নাতকরা সেই মন্ত্র কানে নিয়ে নবজীবন রচনার কাজে এগোয়।

সভ্য জগতের চেতনার মধ্যে যখন এসে পৌঁছলুম, তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শেষের ছাব্বিশ মাইল পথ একপ্রকার প্রাণিশূন্য ছিল। পাহাড়ী উপত্যকার বহুদূর নীচের দিকে এক আধটি স্লেট-পাথরের ছাদওয়ালা ঘর দেখতে পেয়েছিলুম, কোথাও কোথাও এক আধ টুকরো আকস্মিক ফসলের ক্ষেত,—নৈলে সবটাই আদি প্রকৃতির বন্যতায় আর পাথরের জটলায় একাকার। নীচে দিয়ে উঠে গেছে পাহাড়, দিগন্তকে অবরোধ ক'রে রেখেছে চারিদিক থেকে। বিস্ময়ের সীমা নেই।

মায়া[illegible]র বললেন, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! বেপোট্ জায়গায় না গেলে [illegible]র হিমালয় দেখা হয় না?

হাসলুম। বললুম, মেজাজটি আপনার ভালো নেই। কারণটাও বুঝেছি। আসুন, সেই আমাদের 'জয়হিন্দ্' হোটেল!

তিনিও তাড়না করতে ছাড়লেন না।—বটে? ক্ষিধের জ্বালায় আপনিও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন ঘণ্টা চারেক। মনে নেই?

বানীক্ষেত বাজারের সেই হোটেলওয়ালা আমাদের চিনে রেখেছে। ফর্সা পাৎলা চেহারা, সামনে উনুন জ্বালিয়ে সে খাবার বানাচ্ছিল। ভিতরে কয়েকখানি ময়লা বেঞ্চি ও হাতল-ভাঙ্গা চেয়ার। ঘরের দুই ধারে খান দুই চারপাই, তা'র থেকে ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। এক কোণে একটি জলের 'টাঙ্ক।' তারই উপরে কয়েকটি পিতল-দস্তায় বানানো গেলাস। ভাত-রুটি-তরকারি এখানে মিলবে। দোকানের সামনে সুন্দর ও মসৃণ রাজপথ,—পাঠানকোটের দিক থেকে এসে ডালহাউসীর দিকে গেছে। হিমাচলের কোলে আবার মেঘ নেমেছে।

হোটেলের ভিতরে ঢুকলুম। খাদ্যাদির সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অনেককাল পরে একটি নতুন ধরনের গন্ধ পাচ্ছি, সেটি হোলো খাঁটি ঘিয়ের। আজ বোঝা গেল, শাস্ত্রবাক্য কত সত্য,—অর্থাৎ ঘ্রাণের দ্বারা আমরা অর্ধভোজন ক'রে থাকি। দোকানে হিন্দু এবং মুসলমানী দু রকমেরই আহার্য থরে থরে সাজানো, ঘৃত এবং মসলা সহযোগে তা'রা বর্ণাঢ্য। প্রশ্ন করলুম, কোন্‌টা খাবেন, বলুন? হিন্দু, না মুসলমান?

মায়াদেবী আজ ফোয়ারার মতো অনর্গল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ওদিকে চেয়ে বললেন, উভয়ের মিলনেই ত' আনন্দ!

হোটেলওয়ালার আনুকূল্য ছিল প্রচুর। চিবিয়ে, চুষে, চেটে এবং গিলে অবশেষে যে প্রকার কায়িক অবস্থা দাঁড়ালো, তা'তে আর যাই হোক—ভ্রমণ করা চলে না। কেউ যদি তখন বল্‌তো, থাক্ তোমার ডালহাউসী, চলো প্লেনে চড়িয়ে তোমাকে সেই কলকাতার বাড়ীর ছাদে নামিয়ে দিয়ে আসি, বোধ হয় রাজি হয়ে যেতুম।

আহারাদির পর উদ্গার উঠলো। মায়াদেবী বললেন, জয়হিন্দ্!

কথাটা শুনে হোটেলওয়ালাটি হাসলো বটে, কিন্তু আমার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, একটি দিনের গল্প। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট। কলিকাতার পথে পথে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা। চারিদিকে যানবাহন আর কলরব। সেদিন মদের দোকান বন্ধ ছিল কিনা জানিনে। কিন্তু পথের ধারে সেই বিপুল জনতার একান্তে বসেছিল একটি লোক এক বোতল মদ হাতে নিয়ে। কানে তা'র জবাফুল গোঁজা। সেই জনতার দিকে তাকিয়ে লোকটা নিজের মনেই আনন্দ ক'রে বলছিল, অনেক দুঃখে স্বাধীনতা পেলুম, বাবা!-জয় হিন্দ্!—এই ব'লে মদের বোতলটি ধ'রে সে ঢালতে লাগলো গলার মধ্যে!

হোটেলওয়ালার কাছে শুনলুম, এখানে কোথায় যেন পান পাওয়া যায়। ভাবলুম, পান কিনে এনে মায়াদেবীকে চমক লাগাবো। পান আনবার জন্য বেরিয়ে

পড়লুম। খুঁজে খুঁজে এক সময় দোকানও পাওয়া গেল। কিন্তু সেই পান নিয়ে ফিরে এসে দেখি, দড়ি ছেঁড়া সেই খাটিয়াখানায় শুয়ে মায়াদেবী অগাধে নিদ্রা যাচ্ছেন। অত্যন্ত ময়লা একটি তুলোবারকরা লেপ তলায় পাতা, এবং তিনি গায়ে তুলে নিয়েছেন সব চেয়ে নোংরা একখানা ছিন্নভিন্ন কম্বল। এটি হোটেলওয়ালারই সংসারযাত্রা, এবং এইটুকুরই মধ্যে,—কিন্তু হোটেলওয়ালাও মায়াদেবীর নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে একটু অবাক।

স্বামী-স্ত্রী মিলে ভেবেচিন্তেই এই দুরবস্থা ঘটিয়েছেন, সুতরাং আমার ভাববার আর কিছু রইলো না। থমকে একবার দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ছত্র স্মরণ ক'রে সান্ত্বনা পেতে হোলো,—"সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।"

একটু পরেই ডালহাউসীর গাড়ী এসে পড়লো। কিন্তু মায়াদেবীকে ডেকে তোলবার কোনও উৎসাহই পেলুম না। ডাকলে বোধ হয় একটু অবিচারই হোতো। সুতরাং মিনিট পাঁচেক নিয়মমতো দাঁড়িয়ে গাড়ী চলে গেল উত্তর-পশ্চিম পথে। আমি সেই জিনিসপত্র আগলে পথের ধারেই একখানা পাথর আশ্রয় ক'রে ব'সে রইলুম।

আন্দাজ মিনিট পনেরো পরেই আচমকা মায়াদেবী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। গাড়ীর সময়টি তাঁর জানা ছিল। কিন্তু গাড়ী যে চ'লে গেছে এটি তাঁকে জানাতে হোলো। তিনি মহা লজ্জিত, কিন্তু মনোভাবটি চেপে রেখে তারস্বরে বললেন, আপনি এমন মুখচোরা   ত' জানতুম না? ডাকলেন না কেন?

বললুম, আপনার এই 'নেপোলীয়নী' ঘুম জানা থাকলে ঠিকই ডাকতুম। তবে আরেকখানা গাড়ী আছে চারটের সময়। দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বেশ করেছেন ঘুমিয়ে। ওটা হোলো 'ভাত-ঘুম।'

মায়াদেবী উঠে এলেন। সময় হাতে ছিল দুঘণ্টারও বেশী। তিনি বললেন, মালপত্র এখানে থাক্, চলুন ঘুরে আসি।

ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম হোলো 'বানীক্ষেত।' মোটর চলাচলের পথটিই হোলো তা'র নাভিকেন্দ্র। তিন ফার্লংয়ের মধ্যেই তা'র ব্যবসায় বেসাতি। এর বাইরে হোলো দুদিকের পাহাড়তলী এবং চাষীবস্তি,—বেড়াবার মতো জায়গা তা'র কোথাও নেই। কেউ কম্বল বুনছে, কোথাও দর্জির ঘর, ফল বিক্রি করছে কেউ, কোনও মেয়ে কাঠের বোঝা নিয়ে চলছে, কোথাও বা বৃদ্ধা রৌদ্রে ব'সে তা'র নাৎনীকে দিয়ে মাথার উকুন বাছিয়ে নিচ্ছে। পথের ধারে গান গাইতে বসেছে এক অন্ধ বোরেগী, আরেক জায়গায় পাথরের টুকরো আর জন্তুর হাড় দিয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছে একটি লোক। ঘুরে বেড়ালুম খানিকক্ষণ ওদেরই পাড়ায় পাড়ায়। চাষী মেয়ে আগাছার বাণ্ডিল তুলে আনছে গিরিনদীর পাথর জটলার ফাঁকে ফাঁকে,—এগুলি গরু মহিষের খাদ্য। এটি তরাই অঞ্চল, সুতরাং ফলন অনেক বেশী। পাহাড়তলীর পাশে পাশে চ'লে গিয়েছে বনজঙ্গলের পথ ইরাবতীর পারে পারে।

পল্টনের লোকেরা মাঝে মাঝে এদিকে আসে শিকারের সঙ্গী খুঁজতে। সাপ উঠে আসে এদিকে বড় বড়। ওই যতটুকু ঘুরে এলুম ততটুকুই পরিচয়, ততটুকুই সত্য। তার বাইরে সবই রয়ে গেল, সবটুকুই অজানা। আমরা যাত্রী, আমাদের কৌতূহল ক্ষণকালের,—সেকথা ওরাও জানে, আমরাও বুঝি। অভব্য কৌতূহল প্রকাশ করতে গিয়ে আমরাই ছোট হই, ওরা অবাক হয়ে থাকে। ওরা চিরকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে শক্ত ভিত্তির ওপর, আমাদের মতো নোঙগর ছেঁড়া অগণিত যাত্রী ওদের চোখের ওপর দিয়ে অবিশ্রান্ত ভেসে চলেছে। কেউ ওদের প্রাণের পরিচয় নেয় না, ওরাও সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু এই পরিচয়ের অভাব এবং অনুৎসাহ থেকে ভুল বুঝাবুঝির জন্ম ঘটে। একপক্ষের অনিচ্ছা এবং অন্যপক্ষের ঔদাসীন্য—এর থেকেই অবশেষে দেখা দেয় রাজনীতিক কচকচি। সামাজিক জীবনে না মিললে রাজনীতিক সম্পর্ক মধুর হয় না, এটি ছেলেমানুষেও বোঝে। উড়িষ্যার সঙ্গে বাঙগলার সামাজিক জীবন চিরকাল অচ্ছেদ্য ব'লেই রাজনীতিক জীবনে উভয়ের মধ্যে কখনও বিবাদ বাধেনি। উভয়ের মন জানাজানি বহুকালের।

যথাকালে গাড়ী এলো, এবং যখন ছাড়লো তখন বেলা সাড়ে চারটে। চার পাঁচ মাইল মাত্র পথ। কিন্তু তখন পাহাড়ে মেঘে রৌদ্রে আকাশে অরণ্যে—শরৎকালের লুকোচুরি আরম্ভ হয়ে গেছে। একদিকে বিষণ্ণ মুখ, অন্যদিকে হাস্যোজ্জ্বল। একটু পশ্চিমে, একটু উত্তরে আরম্ভ হোলো চড়াইপথ। পথ মসৃণ এবং সুন্দর,—রাজপুর থেকে মুসৌরীর পথের মতো। কোথাও ক্ষমা নেই, নিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই,—কেবল চড়াই। গাড়ীর গতি মন্থর, কিন্তু শব্দ কানফাটা। চার মাইলে প্রায় চার হাজার ফুট চড়াই, সোজা কথা নয়। ওই যে সেবার উঠলুম বিহারের পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরে—জৈন ধর্মশালাটার পাশ দিয়ে চড়াই আরম্ভ হয়েছিল। সেও চার হাজার ফুট উঁচু, কিন্তু ছ' মাইলে পথটা ছড়ানো,—এবং মাঝখানে পাওয়া গিয়েছিল কতকটা উপত্যকা। এখানে কিচ্ছু নেই, শুধু চড়াই। এ পথে ফিরবার সময় পেট্রল্ খরচ নেই। ষ্টিয়ারিং ধরে রইলো, ব্রেক্ টিপে রইলো, গাড়ী নেমে এলো গড়গড়িয়ে। সব পাহাড়ের ড্রাইভাররাই এই সুযোগ নেয়।

দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছি। উঠছি উঁচুতে। দক্ষিণে পাঞ্জাবের বিরাট সমতল অনেকটা যেন কুহেলী-ঢাকা। ধবলাধার শ্রেণীর উপরে উঠে পীর পাঞ্জাল দেখতে পাচ্ছি। জম্মু থেকে কাশ্মীরের পাহাড় উঠে গেছে পশ্চিম থেকে উত্তরে,—একটির পর একটি হরিৎবর্ণ দানব পাশাপাশি শুয়ে যেন বিশ্রাম নিচ্ছে, ওরা যেন দেবতাত্মা হিমালয়ের মন্ত্রে বশীভূত। এটি হিমাচল প্রদেশ,—সমতল অঞ্চলের ধার ধারে না। এদিকে এমন বহু সহস্র নরনারী আছে যারা রেলপথ দূরের কথা, চাকার গাড়ী কখনও দেখেনি। তা'রা হিমালয়ের সন্তান, পৃথিবী তাদের থেকে বাইরে প'ড়ে থাকে। সংবাদপত্র কেমন, তারা জানে না, সাহেবসুবো দেখেনি এ জীবনে,—এবং সারা বছরে একবার যদি

কখনও কোনও পাহাড়ের শীর্ষলোকের ধার দিয়ে একটি এরোপ্লেনকে চকিতে পার হয়ে যেতে দেখে, তবে তা'রা পাহাড় পেরিয়ে ঘরের দিকে পালায় আতঙ্কে। চল্‌তি যুগের ইতিহাসই ওরা পৌরাণিক কাহিনীর মতো শোনে।

সহসা সচেতন হলুম। আমাদের গাড়ীতে যাত্রীর সংখ্যা মোট দশ-বারোজন। কিন্তু অধিকাংশেরই লেগেছে ঘূর্ণী,—পাহাড়ের পথে যেমন হয়। মায়াদেবীর মাথা এরই মধ্যে হেঁট হয়েছে, তাঁর আর সাড়াশব্দ নেই। অন্যান্য আরোহীদের মধ্যে স্ত্রীলোক আছে জনতিনেক। একজন দশাসই ভদ্রলোক শিবনেত্রে একেবারে অসাড়। কেউ কেউ জানলা দিয়ে যথাসম্ভব মুখ বাড়িয়ে গলা চিরে,— ও-য়া-ক্,— না, থাক্ দেখবো না! ওর ছোঁয়াচটা যেন নিজের মধ্যেও কিলবিলিয়ে ওঠে। দেখতে পাচ্ছি গাড়ী না থামলে মায়াদেবীর আর সুস্থ হবার আশা নেই।

গাড়ী ঘুরে-ঘুরে ক্রমেই উঠছে উপর দিকে। ভুজঙ্গভূষণের দেহ জড়িয়ে সাপ যেমন ক্রমশ তাঁর জটার শীর্ষে ওঠে। ঠান্ডায় এবার সবাই জড়োসড়ো হচ্ছে। মেঘ নেমে যাচ্ছে ইরাবতীর দিকে; পাইনের বনে মেঘ ঢুকছে। মেঘ ঢুকছে আমাদের গাড়ীতে। ড্রাইভার ঝাপসা মেঘে গাড়ী চালাচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া ঝলক দিয়ে যাচ্ছে। নীচেকার রৌদ্রক্লান্ত জীবন ভুলে গেলুম। জামার বোতাম বন্ধ করতে হোলো এতক্ষণে। পাহাড়ে-পাহাড়ে শরতের কুসুম সমারোহ পথের দুধারে এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। একটি আধটি বস্তির দেখা পাচ্ছি।

পল্টনের পাড়ার ধারে এসে একবারটি গাড়ী দাঁড়ালো। আমরা শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। অসংখ্য মিলিটারী ব্যারাক, এবং তাদের আনুষঙ্গিক উপকরণ চোখে পড়ছে। অফিসারদের আনাগোনা দেখছি। এটি বোধ করি পাঞ্জাব রেজি-মেণ্টের কেন্দ্র। পাঠানকোট থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে।

গাড়ী সেখান থেকে আবার ছাড়লো এবং আঁকাবাঁকা সুন্দর পথ ধ'রে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দেখতে দেখতে শহরে এসে পৌঁছলুম। মোটর ষ্ট্যাণ্ডের পাড়ায় কিছু কিছু লোকজন দেখছি বটে, কিন্তু চারিদিকেই জনবিরল। এমন কোলাহলবিহীন স্তব্ধতা কোনও পাহাড়ী বড় শহরে দেখিনি। একটু যেন বিস্ময়বোধ করলুম।

নানা হোটেলের দালাল এসে দাঁড়ালো, কিন্তু ওদের মধ্যে আমরা 'গ্রাণ্ড-ভিউ-হোটেলটি' পছন্দ করলুম। নির্বাচনে তখনকার মতো ভুল ঘটলো, সেটি পরে টের পেলুম। কিন্তু মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে বিশ্রাম নেবার বিশেষ দরকার ছিল। প্রায় বারো থেকে তেরো ঘণ্টা হোলো, আমরা পথে-পথে ঘুরছিলুম।

ডাকঘরের গা দিয়ে একটি পায়ে হাঁটা ঢালুপথ উঠে এলো মস্ত এক হোটেল-প্রাসাদের প্রাঙ্গণে। কিন্তু এটি এত নিভৃত অঞ্চল যে, একটু যেন আড়ষ্ট হলুম। একটি গুজরাটি পরিবার নীচের তলায় এসে ভালো দুটি ঘর আগেই নিয়েছেন। সুতরাং উপরতলায় গিয়ে একটি বড় ঘর নিতে হোলো। মস্ত বড় বারান্দা,— কিন্তু এপাশে ওপাশে কোথাও মানুষ নেই। চতুর্দিকে এত বিলাসসজ্জা এবং

অপ্রয়োজনীয় ঝকঝকে আসবাবপত্র যে, চোখ ঠিক্‌রে যায়। এই হোটেল থেকে হিমালয়ের দৃশ্য সর্বাপেক্ষা সুন্দর,—ওরা বললে। কিন্তু মাথাপিছু দৈনিক পনেরো টাকা লাগবে,—এ যেন একটু বেশী। হোটেলে যাত্রীসংখ্যা যত, তা'র চেয়ে খানসামার সংখ্যা অধিক। ভিতরে লাউঞ্জের আসবাবপত্র দেখে আমরা হতচকিত। এ হোটেলে আজকাল সাধারণ উচ্চ মধ্যবিত্ত ভারতীয়রা আসে, এবং তা'র জন্য রেট্ কমিয়ে পনেরো টাকা করতে হয়েছে,—এজন্য কর্তৃপক্ষের মনে চাপা দুঃখ রয়েছে। সাহেবসুবোরা টাকা দিতে জানতো; তা'রা এদেশ ছেড়ে চ'লে গিয়েছে,—সেজন্য অনেকেই বিমর্ষ।

ঘরখানা মস্ত। ভালো ভালো গদিআঁটা কৌচ, দেওয়ালের নীচে ফায়ার প্লেস, পরিপাটি শয্যা ব্যবস্থা, ঘরের সংলগ্ন স্নানের ঘর, মেঝের উপরে কার্পেট, মখমলের বড় বড় পর্দা, একাধিক ইলেকট্রিক আলো,—অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরামের উপকরণ প্রচুর। এদিক ওদিক ঘুরে দেখে এলুম, আমাদের ঘরটিই শ্রেষ্ঠ মনে হোলো। কিন্তু এই বিরাট এবং সুদীর্ঘ দোতলাটিতে লাউঞ্জের দরজাটি সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের এ মহল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। অজানা এবং অপরিচিত পাহাড়ের প্রান্তে যদি কোনও অভাবনীয় বিপত্তি ঘটে, বহু ডাকাডাকি সত্ত্বেও কেউ ছুটে এসে দাঁড়াবে, এমন মনে হচ্ছে না। হোটেল-নির্বাচনে ভুল ঘটেছে, এই ধারণা আমাকে পেয়ে বসে-ছিল। উৎসাহের অভাব বোধ করছিলুম।

ঠাণ্ডাকে রোধ করার জন্য চারিদিক থেকে বন্ধ। সমস্ত বারান্দায় কাঠের দেওয়াল এবং কাঁচের জানলা। সমস্ত মেঝে কাঠের, সিঁড়িও কাঠের। পাহাড়ী শহরে কাঠ ছাড়া উপায় নেই। কাঠের বাড়ী হোলো সর্বত্র। কাঁচ না থাকলে জানলা হয় না। কাঠের মেঝে থাকার জন্য বহুদূর থেকে পায়ের শব্দ এবং কাঁপন অনুভব করা যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে ভালো বাড়ী মানেই ভালো এবং মোটা কাঠের বাড়ী। আরাম এবং মধুর উত্তাপ সৃষ্টির জন্যই এই কাঠের কাজ।

সন্ধ্যার চা এবং জলযোগাদির পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মায়াদেবী চাঙ্গা হলেন। আমার ধারণা ছিল বিপরীত। ভাবছিলুম রাত্রির মতো তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। কিন্তু হোটেলের ভিতরে গিয়ে নৈশভোজনের ফরমাস দিয়ে এসে দেখি, তিনি বাহির হবার জন্য প্রস্তুত। বললেন, চলুন, বেরিয়ে পড়ি। আমি সত্যিই বলি, চাম্বার চেয়ে ডালহাউসী আমার বেশি ভালো লাগছে।

বললুম, বড্ড বেশি সাহেবী নয় কি? একটু যেন উগ্র আধুনিক?

তিনি রাগ করলেন,—এ যুগের অন্নজল খেয়ে বাঁচবো, অথচ একশো বছরের পেছনে চেয়ে থাকবো,—এ কেমন কথা? এবার বুঝতে পারছি আপনার গাম্ভীর্যের আসল কারণ। চলুন, পথে বেরিয়ে কথা হবে। আমার সন্দেহই ঠিক, আপনি একটু সেকেলে!

ঈষৎ দিনের আলো তখনও রাঙ্গা হয়ে রয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমে। কিন্তু সেই

সূর্যাস্তকাল যে কত সুন্দর, পথে বেরিয়ে বুঝতে পারা গেল। 'সীডার' ও পাইনের বিশাল অরণ্য পাহাড়ের সীমানা ধ'রে দূরে দূরান্তে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে দিনান্তের রক্তবরণ দিগন্ত সর্বত্র রক্তিম আভা প্রসারিত করেছে। বাঁ-হাতি সুন্দর পথ উঠে গেছে অন্ধকার পাহাড়ের জঙ্গল জটলার ভিতর দিয়ে। এত নিরিবিলি যে, এখন পর্যন্ত একটি মানুষেরও দেখা পাচ্ছিনে। আমরা আস্তে আস্তে চড়াই পথে উঠে যাচ্ছি। 'সীডার' বৃক্ষের পাতায় বায়ু সঞ্চালনে মর্মর শব্দ হচ্ছে, মুখ তুলে দেখি পশ্চিম দিগন্ত সম্পূর্ণ অন্ধকার হবার আগেই প্রথম শুক্লপক্ষের শীর্ণ চন্দ্র আকাশপথে এসে হাজির হয়েছে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ প্রায়ই লতাগুল্মজড়িত এবং শৈবালাচ্ছন্ন। পথের বাঁকে বাঁকে আলো জ্বলেছে। বড় বড় পাখীর ডানা ঝাপটের আওয়াজ পাচ্ছিলুম। কিন্তু তাদের সেই পক্ষ-সঞ্চালনের ফলে গাছের থেকে যে গন্ধের ঝলক এসে নাকে লাগবে, এটি ভাবিনি। ফুল নয়, গাছের গন্ধ। ফুলের মতো গন্ধ নয়, কিন্তু এমন একটি নিবিড় তন্দ্রাজড়ানো অপরিচিত গন্ধ, যেটি সমতলবাসীরা কখনও পায় না। হ'তে পারে 'সীডারের' গন্ধ, কিন্তু এইটি ছড়ানো রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সর্বত্র। মৃগনাভির উগ্র গন্ধের ঝলক দুচারবার পেয়েছি; রাজস্থানে গিয়ে জেনেছি আসল চুয়ার গন্ধ কেমন; প্রাচীন বট যেখানে জরাজীর্ণ মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে বাইরে এসেছে—সেই মন্দিরের ভিতরকার বন্য সোঁদা গন্ধও জানি;—ছোটবেলায় যেদিন বড়দাদার বিয়ে হোলো, তাদের ফুলশয্যার পরের দিন বাসিফুলের মাড়ানো গন্ধের কথাও মনে আছে; এমন কি দিদির শ্বশুরবাড়ীর সেই শ্যাওলাধরা প্রাচীন পুকুরঘাটের বাঁধানো ইমারতের ফাটলে যে-গন্ধটা পেতুম বোবা পুকুরের কোলে,—তাও ভুলিনি। কিন্তু এ গন্ধের সঙ্গে তাদের কা'রো মিল নেই। এ পাওয়া যায় কেবলমাত্র হিমালয়ে এলে। কুমায়ুনের উত্তর পাহাড়-পথে, নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে, উত্তর সিকিমের লা-চেন অঞ্চলে, কাশ্মীরে,—এবং ওই যেটি আজ পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত,—মারী, নাথিয়া-গলি অথবা হাভেলিয়ানের পরম রমণীয় পার্বত্য অঞ্চলে। আমার ধারণা, বিনিদ্র রোগীকে ঘুম পাড়াবার মতো এমন গন্ধ আর নেই। আমার ক্লান্তির মধ্যে তন্দ্রার বিহ্বলতা ছিল।

অন্ধকার হয়েছে, কিন্তু ঠিক যাচ্ছি কোন্ দিকে ঠাহর হচ্ছে না। এখানে ওখানে আড়ালে আবডালে বাগানবাড়ী এক একটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আলো জ্বালা দেখে মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণও পাচ্ছি,—কিন্তু সমস্তটাই নিস্তব্ধ। পথটি কোথায় গিয়ে এবং কতদূরে উঠে শেষ হয়েছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মায়াদেবীর ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। তাঁর চলনের উৎসাহে সমস্ত দিনমানের ক্লান্তির কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি এখানে পা দিয়েই যেন তাঁর কাশ্মীরকে খুঁজে পেয়েছেন। স্পষ্টই বলেছেন, চাম্বা অর্থাৎ চম্পা নগরী তাঁর ভালো লাগেনি। বন্য ও দুঃসাধ্য পর্বতপ্রাকারের মধ্যে বন্দিনী 'চম্পাবতী' তাঁর

প্রিয় হ'তে পারেনি। ডালহাউসীর এই আধুনিক সুসভ্য সাজসজ্জা তাঁর ভালো লেগেছে। আমার মনে সান্ত্বনা ছিল এই, ডালহাউসী চম্পাবতীরই অন্তর্গত। নামে মাত্র পাঞ্জাবের অধীন।

আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মায়াদেবী। এবার থমকে দাঁড়িয়ে ধমক দিলেন,—তখনকার কথাটা কিন্তু ভুলিনি।

আমিও দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ, আপনার মধ্যে সেই পুরনো পৈতেধারী ব্রাহ্মণটি ঠিকই বেঁচে আছে।

থাকলে ক্ষতি কি?

আপনার গাম্ভীর্যের কারণও ওইখানে।

এবার খুব হেসে উঠলুম সকৌতুকে। ধনুর্বাণ তুলে তিনি সোজা আক্রমণ করেছেন। পুনরায় বললেন, গুপ্তসাহেবের মুখে যেদিন থেকে আপনি শুনেছেন, আমি নাচ-বাজনা-অভিনয় এসব জানি—সেদিন থেকেই আপনার মুখ ভার। বুঝতে পারি, আপনি এসব পছন্দ করেন না!

প্রাদেশিক ভাষায় একে বলে, 'বেধড়ক' আক্রমণ। হাসিমুখে শুধু বললুম, সাংঘাতিক অভিযোগ বটে। আপনার স্বামী এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর সঙ্গে ঠিক আপনার ঝগড়া হোতো!

কেন?

আমার ওপর এই আক্রমণ তিনি সইতেন না!

মায়াদেবী আবার কিছুদূর এগিয়ে চললেন। দু'দিকের ঘন বৃক্ষচ্ছায়ার অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। বহু দূরের আলোর একটু আভা পড়েছে গাছের শীর্ষে। উপর দিকে তাকিয়ে মায়াদেবী এবার নিজেই থামলেন,—না, আর নয়—চলুন ফিরি! আচ্ছা, বলুন ত', আপনি কি সত্যিই মেয়েদের নাচ-গান পছন্দ করেন না?

উৎরাই পথ ধরলুম এবার। পরিশ্রম হয়েছে প্রচুর। তাঁর কথা শুনে কিন্তু হাসতেই হোলো,—পছন্দ করি—একথা শুনলে কি আপনি ধেই ধেই ক'রে নাচতে আরম্ভ করবেন?

উচ্চ হাস্যে পথ মুখরিত হোলো। অতঃপর নীচের পথ ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে যখন 'ডালহাউসী ক্লাবের' পাশ কাটিয়ে হোটেলে এসে উঠলুম, তখন বেশ রাত হয়েছে। গুজরাটীরা দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

সন্ধ্যার পর থেকে শীত পড়েছে প্রচুর।

উত্তরে বহুদূরে চম্পাবতী উপত্যকার ললাটলোকে দেখা যাচ্ছে তুষারশুভ্র 'পাঙ্গী পর্বতমালা।' সমুদ্রসমতা থেকে 'পাঙ্গীর' উচ্চতা প্রায় ২৩,০০০ হাজার ফুট,—চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন। তা'র নীচে থেকে দক্ষিণ পার্বত্যলোকের নাম

'চম্পাবতী উপত্যকা।' ডালহাউসী এই উপত্যকারই মধ্যে পড়ে। আগে চম্পাবতী ছিল একটি সামন্ত রাজ্য, এখন ডেপুটি কমিশনারের অধীন। এটি এখন হিমাচল প্রদেশের একটি জেলামাত্র। যেমন মাণ্ডি, বিলাসপুর, শিরমুর ইত্যাদি।

বারান্দায় এক ফালি মধুর রৌদ্র এসে পড়েছে। সন্দেহ ছিল, দিনমানে হয়ত মানুষের কলরব-কোলাহল শুনতে পাওয়া যাবে। সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়নি। শূন্য ডালহাউসী চারিদিকে যেন খাঁ খাঁ করছে। সমস্ত দিন ধ'রে চেয়ে থাকা 'পাঙগীর' দিকে, সমস্ত দিন পাখীর ডাক শোনা,—সমস্ত দিনরাত্রি নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করা। যদি কিছু বৈচিত্র্য থাকে তবে সে বাইরের পথে পথে। প্রাতরাশ সেরে আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

ওক্ আর পাইনের বন আলোছায়ার ঝিলিমিলিতে ঝলমল করছে। পথ তেমনি নিরিবিলি, তেমনি বনময়। তিনদিকে পাহাড়, একদিকে খদ। আমাদের বসবাসের অঞ্চল হোলো 'বাক্রোটা' পাহাড়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চার-পাঁচটি পাহাড় পরস্পর সংলগ্ন, এবং তাদেরকেই কেন্দ্র ক'রে ডালহাউসী গ'ড়ে উঠেছে। 'চম্পা' উপত্যকার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু হোলো নিকটবর্তী এই ডালহাউসী, এবং এখান থেকে নেমে অরণ্যপথ ধ'রে আন্দাজ কুড়ি মাইল গেলে 'চম্পানগর।' কিন্তু এর চারিপাশের অরণ্য অত্যন্ত গহন গভীর,—হিংস্র জানোয়ারদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। ওদিকে অসুরনাশিনী চামুণ্ডা দশপ্রহরণ ধারণ ক'রে আছেন, এদিকে পাশব রাজ্যের পশুপতিনাথ তাঁর বিরাট পশুশালা সৃষ্টি ক'রে রেখে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ব'সে রয়েছেন। সমগ্র চম্পাবতী অরণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

আমরা 'নিম্ন-বাক্রোটা' থেকে উঠতে উঠতে 'শীর্ষ-বাক্রোটার' দিকে চললুম। অন্য পাহাড়গুলির নাম হোলো 'ভান্জোর, পট্রাইন, তেহরা, কাঠলাগ' ইত্যাদি। রানীক্ষেত, মুসৌরী, নৈনীতাল সম্বন্ধে সাধারণত যে ধারণা হয়, এখানেও তাই। হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেকটি সুন্দর শহর ইংরেজের গ্রীষ্মাবাসের কল্পনায় তৈরী। কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব—এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে ইংরাজ দেখতে পেয়েছিল 'চাম্বা' উপত্যকা। এই উপত্যকার সামন্তরাজের হাত থেকে একশো বছর আগে পূর্বোক্ত পাহাড়গুলি আদায় করে নেন্ কর্নেল চার্লস্ নেপিয়ার। তখন ছিলেন বড়লাট লর্ড ডালহাউসী,—সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক আগে। তখনও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল চলছে। তারপর নগর নির্মাণ করতে তিন বছর লাগে। আমরা এখানে দৈবাৎ এসে পড়েছি ঠিক একশো বছর পূরণের কালে। সম্প্রতি কিছুদিন আগে 'ডালহাউসী' প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসবকালে পণ্ডিত নেহরু এখানে এসেছিলেন। তাঁর আগমন-সমারোহের ধাক্কা এখনও এখানকার অধিবাসীরা কাটিয়ে ওঠেনি। বাজারে এখনও উত্তাপ রয়েছে।

চড়াই ভাঙগতে ভাঙগতে উঠছি উপর দিকে। গাছপালার ফাঁকে, পাহাড়ের কোলে, ঝোপজঙ্গলের আড়ালে,—এক একটি বাংলো রয়েছে লুকিয়ে। কিন্তু

প্রত্যেকটিতে মানুষের সংখ্যা কম। কোনও বাংলো একেবারে শূন্য, কোনটি মালী অথবা রক্ষীর তত্ত্বাবধানে, কোনটিতে বা বাইরের দু'একটি লোক। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব হচ্ছে, পাঁচশোখানা বাংলোর মধ্যে চারশোখানারও বেশী শূন্য প'ড়ে রয়েছে। এই ডালহাউসী মানুষের সোরগোলে গমগম করেছে দশ বছর আগে,—ভারত যখন স্বাধীন হয়নি। স্থানীয় 'বালুন' গোরা ছাউনীতে ছিল ইংরেজ সামরিক অফিসারদের প্রবল কর্মতৎপরতা; পাহাড়ে-পাহাড়ে সাহেব-সুবোদের বাংলো,—তাদেরই ছেলেমেয়েদের ইস্কুল পাঠশালা; মিশনারীদের কন্‌ভেণ্ট্ আর গির্জার প্রার্থনা-সমারোহ। এই একমাত্র পাহাড়ী শহর যেখানে নোংরা বস্তি চোখে পড়ে না, দারিদ্র্য যেখানে সর্বাপেক্ষা কম, যেখানে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিচ্ছন্নতা। প্রত্যেকটি বাংলোয় সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত পরিবারের বসবাস ছিল, এটি দৃষ্টিমাত্রই ধারণা হয়। স্কটল্যান্ড দেখিনি, দক্ষিণ কানাডাও দেখিনি,—কিন্তু তাদের ছবির সঙ্গে ডালহাউসী হুবহু মিলে যায়। বনে, কাননে, উদ্যানে, গিরিনির্ঝরে, ওক্-পাইনের বীথিকায়, ছায়ানিবিড় নিভৃত নিকুঞ্জলোকে—ডালহাউসী শহর মুসৌরীকে পদে পদে হার মানায়।

'বাক্‌রোটা' পাহাড়ের শীর্ষে উঠে এলুম। দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে। ঘন রৌদ্র, কিন্তু স্নিগ্ধ হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এখান থেকে পথ নানাশাখায় গেছে নানা দিকে। এ অঞ্চলটি দার্জিলিংয়ের 'অবসারভেটরীর' পাড়ার মতো চারিদিকে প্রসারিত,—অনেকটা যেন মালভূমি। খাদ্যসামগ্রীর বাজার একটু নীচের দিকে। উপরদিকের ম্যাল্-এর বাজারটি কলকাতার চৌরঙ্গীর অপভ্রংশ। কাজকারবার বড় ছিল, কিন্তু এখন লোকজন অতি কম। মায়াদেবীর ভালো লেগেছে এই জনবিরলতা। তিনি ডালহাউসীর গুণগানে মুখর হয়ে উঠেছেন। চারিদিকের পাখীসমাজে বোধ করি এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়েছে যে, ডালহাউসী বোধ করি এমনি জনবিরল থেকে যাবে চিরদিন! তা'রা গাছে-গাছে আদিবাসীর মতো দল পাকিয়ে সম্ভবত তারস্বরে এই কথাটাই ঘোষণা করছে,—তোমরা সভ্যতা আর সংস্কৃতির ধ্বজাধারী হ'তে পারো, কিন্তু তোমরা পরদেশী,—তোমরা এসেছ বাইরের থেকে। বস্তুত, কোনও পাহাড়ে এত বিচিত্রবর্ণের পাখী-সমাবেশ দেখিনি।

'পাঙ্গীর' বিশাল শুভ্র পর্বতশ্রেণী দেখছি উত্তরে। চোখ চিক্‌রে যায়—এত শাদা। প্রত্যেকটি চূড়া পাশাপাশি সাজানো,—প্রত্যেকটি ঝলমল করছে রৌদ্রে। উত্তর পর্বতের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে চন্দ্রভাগা, ডালহাউসীর ঠিক নীচে দিয়ে গেছে ইরাবতী, এবং দূর দক্ষিণ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সমতল ভূভাগে বেরিয়ে এসেছে বন্য বিপাশা। বিপাশা থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে গেলেই মানস সরোবরের সন্তান মহানদ শতদ্রু। চূড়ায় দাঁড়িয়ে কাছেই দেখা যাচ্ছে জম্মুর গিরিশ্রেণী,—পীর পাঞ্জালের দক্ষিণ প্রান্ত। 'উধমপুর' ও 'চিনেনি' অঞ্চলে চন্দ্রভাগার একপারে ধবলাধার, অন্যপারে পীর পাঞ্জাল,—এবং এটি কেবল-

মাত্র ডালহাউসী থেকেই সুপ্রত্যক্ষ। দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যে সেতু রচনা করেছে চম্পাবতী।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ডালহাউসীর চতুর্দিক হোলো 'চাম্বা ভ্যালীর' দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু লর্ড ডালহাউসী এই শহরকে সংযুক্ত ক'রে গেছেন পাঞ্জাবের সঙ্গে। ডালহাউসী পৌঁছতে গেলে চাম্বাই অতিক্রম করতে হয়, এবং চাম্বার সঙ্গে সমতল ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্ক ডালহাউসীর দ্বারাই হওয়া সম্ভব। পাঞ্জাবের সঙ্গে ডালহাউসী শহরের এই অসংগত সম্পর্ককে আজও লালন করছেন ভারত গভর্নমেণ্ট সম্ভবত এই কারণে যে, সমগ্র ডালহাউসী শহর এবং 'বালুন' গোরা ছাউনীটি নির্মিত হয়েছিল 'চাম্বার' সামন্ত নরপতির টাকায় নয়,—ভারত গভর্নমেণ্টেরই অর্থে। বিতর্কটা আজও চলেছে। কিন্তু হিমাচল প্রদেশ গভর্নমেণ্ট বোধ করি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে বিব্রত করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। ফলে, পাঞ্জাব এবং হিমাচলের রাজ্যসীমানা অদ্যাবধি অনেকটা জটিল হয়ে রয়েছে।

নানাকথা নিয়ে আমরা ঘুরতে ঘুরতে এসেছি অনেকদূর। কয়েকটি ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে ডালহাউসীর সঙ্গে--সেগুলি স্মরণ ক'রে আমাদের মনে ছিল রোমাঞ্চ কৌতুক। বহুকাল পূর্বে—সেও প্রায় চুরাশী বছর পেরিয়ে গেল—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছিলেন তাঁর কিশোরপুত্র রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। এখানে তাঁর একটি সাধনার স্থল ছিল। সকালের দিকের শীতে রবীন্দ্রনাথ এখানে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন,—সেটি অতিমানবিক ধৈর্য ব'লে আজও মনে করি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এসেছিলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু,—সেটি লর্ড রেডিংয়ের স্বেচ্ছাচারের কাল,—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের বছর,—সেই সময় মোতিলালের সঙ্গে ছিলেন পুত্র জওয়াহরলাল—ভাবী ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধার। এখানে তাঁরা অনেকদিন কাটিয়েছিলেন।

থমকে এসে দাঁড়ালুম দুইটি পথের একটি সংযোগস্থলে। একজন বৃদ্ধ ঘোড়াওয়ালা সেখান থেকে নির্দেশ ক'রে দেখিয়ে দিল, অদূরে ডাঃ ধরমবীরের বাড়ী। এই বাগানবাড়ীতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ভাবী নেতাজী সদ্য-কারামুক্ত সুভাষচন্দ্র অসুস্থ দেহে ধরমবীর এবং তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীর আতিথ্য নিয়ে বাস করেছিলেন অনেকদিন। ওই বাড়ীটির সঙ্গে আমার নিজের মনের সামান্য যোগ ছিল এই, ওখান থেকে সুভাষচন্দ্র সেদিন খানদুই স্মরণীয় পত্র আমাকে লিখেছিলেন! কিন্তু এখানে আমার সহসা থমকে দাঁড়াবার হেতু বারম্বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও মায়াদেবীকে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারা গেল না।

সেই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পর ডালহাউসীর জীবনের উপর দিয়ে গেল আরও কয়েক বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোলো, ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন হয়ে এলো। পূর্ব পাঞ্জাব রয়ে যাচ্ছে ভারতের মধ্যে। অতঃপর কাশ্মীর ঘোষণা করলো

ভারতের অন্তর্ভুক্তি। ক্রমে সাম্প্রদায়িক সর্বনাশের আগুন জ্বলে উঠলো পাঞ্জাবে। ইংরেজ চ'লে গেল দেশ ছেড়ে। কিন্তু এই ডালহাউসীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি ছিল সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মুসলমান পরিবারগণের দখলে। পাহাড়ের এই চূড়ায় চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ অবস্থায় তাঁরা বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর উপর আবার উপজাতীয়দের দ্বারা কাশ্মীর আক্রান্ত হোলো ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। ফলে, স্থানীয় মুসলমান এবং হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে 'চাম্বার' এই অঞ্চল ছেড়ে দিগ্বিদিকে চ'লে যেতে লাগলো।—মুসলমানরা গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে শিয়ালকোট অভিমুখে। সমস্ত চলাচল ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, বাজার হাট এবং গভর্নমেণ্ট পরিচালিত নানা জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও শাসনযন্ত্র—সমস্তই ভেঙে পড়লো। ডালহাউসীর সেই থেকে দুরবস্থা আরম্ভ। অসংখ্য ভূসম্পত্তি অনাদরে প'ড়ে রয়েছে,—কিন্তু ভোগ করার মানুষও নেই, এবং ভোগের অধিকারও বিশেষ কেউ পায়নি।

বিশ্রাম নিয়ে এক সময় মায়াদেবী গাত্রোত্থান করলেন। বললেন, চলুন।

মন টিঁকছে না কোথাও, এত জনবিরল। হোটেলের ওই প্রকাণ্ড অট্টালিকার সর্বত্র যেন সকরুণ শূন্যতা জড়ানো। অরণ্যে, প্রান্তরে, মরুভূমে, দুস্তর পর্বতের কোথাও,—কেউ মানুষের কলরব আশা করে না। কিন্তু একটি জনকোলাহল-মুখরিত নগর এবং তা'র শত শত অট্টালিকা যদি সহসা জনপ্রাণিশূন্য হয়ে যায়, তবে তা'র আনাচে কানাচে ঘুরতেও ভয় করে। পরিত্যক্ত ডালহাউসী, কিন্তু অনাদৃত নয়। সাজানো পুষ্পোদ্যান সর্বত্র রয়েছে পরিচ্ছন্ন, প্রায় প্রতি বাংলোর ভিতরে প্রচুর আসবাবপত্র, বিলাসের পর্যাপ্ত উপকরণ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের নিখুঁৎ আয়োজন,—শুধু মানুষ নেই! যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তিনভাগের একভাগ মূল্যে এক একটি সম্পত্তি কিনতে পারে, তা'র জন্য একটি প্রতিষ্ঠানও কাজ করছে,—কিন্তু কেনবার লোক কম। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি পার্বত্য শহরের এই দুর্গতি ও অভিশপ্ত জীবন দেখে আমাদের দিন কাটছে।

যিনি সঙ্গে রয়েছেন তাঁর মনোভাবটি কিন্তু বিপরীত। তিনি একপ্রকার আনন্দ পাচ্ছেন এই জনশূন্যতায়। পাখীর কলরব তাঁর শুনতে শুনতে লেগে যায় ঘণ্টাখানেক। শূন্য বাংলোর আশেপাশে গিয়ে তার ইতিহাসটি ঠাওরাতে লেগে যায় বহুক্ষণ। বনজঙ্গলের ছমছমে পথ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় অনেকদূর। তাঁর আনন্দ ভিন্ন রকমের।

'কালাপাহাড়' এখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল বনপথ। অনেকে বলে, 'কালাটপ।' এখন শরৎকাল, ছায়ালোকের বাঁকে বাঁকে এখনও গিরিনির্ঝরের নির্মল সুশীতল জল ঝরঝরিয়ে নামছে নীচেকার খদে। ছোট ছোট বস্তির গায়ে গায়ে সামান্য

ফসলের খামার পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে দেখা যায়। এই অঞ্চল থেকে পাইনবনের আরম্ভ। এই পথ চ'লে গেছে আরও অনেক দূর—'দইনকুণ্ড' ছাড়িয়ে। এখানকার অধিবাসীরা অতি সুশ্রী রাজপুত এবং ধর্মভীরু। এরা সকলেই 'চাম্বা' উপত্যকার লোক বলেই নিজেদেরকে জানে; ডালহাউসী অথবা পাঞ্জাবকে তা'রা স্বীকার করে না। 'দইনকুণ্ডে' কতকটা সমতল পাওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে হিমালয়ের দুর্লভ দৃশ্য অবারিত ভাবে চোখে পড়ে। ঠাণ্ডা প্রচুর। কিন্তু 'পাঙগী' পর্বতশ্রেণীর আশ্চর্য শোভা সমস্ত পরিশ্রমকে সার্থক ক'রে তোলে। মায়াদেবী অত্যন্ত ভক্ত হয়ে উঠেছেন ডালহাউসীর, সুতরাং তিনি সবিস্তারে জানালেন, ঘোড়ায় চ'ড়ে সমস্ত দিন ঘুরলেও তাঁর ক্লান্তি আসবে না।

'খাজিয়ারের' সুন্দর শোভা এখান থেকে দেখা যায়। সীডার আর পাইনের ঘন অরণ্যবেষ্টিত 'খাজিয়ার'-এর দূর্বাদলশ্যাম মালভূমি অনেকটা নীচে। মাঝখানে একটি মস্ত সরোবর, এবং সেই সরোবরে একটি ভাসমান ক্ষুদ্র দ্বীপ। চারিদিকের ঢালু মালভূমির জল ধীরে ধীরে 'খাজিয়ার'কে পূর্ণ ক'রে তোলে। পাইনসমাকীর্ণ পাহাড়ের ঠিক নীচে একটি ডাকবাংলো। খাজিয়ারে এসে দাঁড়ালে চম্পানগরীর দূরত্ব আর থাকে মাত্র নয় মাইল। 'দইনকুণ্ডের' উচ্চ ভূখণ্ডে দাঁড়ালে দূর পর্বতের তলায় তলায় পাঞ্জাবের পূর্বোক্ত চারিটি নদীর ধারা চোখের উপরে ঝলমল করে রৌদ্রকিরণে। ভূস্বর্গ দেখেছি অনেকবার, অনেকবার মর্ত্যের সঙ্গে নন্দনলোকের সেতু রচনা করেছি। কিন্তু সেদিনকার কুসুমিত কাননের বন্য প্রকৃতি হতবিস্ময় এনেছিল চোখে। ফিরবার পথে সেদিন মায়াদেবী বললেন, অনেক পাহাড়ে ঘুরলুম আপনার সঙ্গে ওবছরে আর এবছরে,—কিন্তু ডালহাউসী ভালো লেগেছে সব চেয়ে বেশি। একে ছেড়ে গিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত মন বসবে না ঘরকন্নায়।

সেদিন রাত্রে হোটেলের সেই সুবিস্তৃত ডিনার হল্-এর টেবিলে ব'সে তিনি একটি হাসির কথা তুলতেও ছাড়লেন না। কথা উঠেছিল হিমালয় ভ্রমণ নিয়ে। বিগত ত্রিশ-বত্রিশ বছরের হিমালয় ভ্রমণের প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব লিখতে বসেছি 'দেশ' পত্রিকায়, এবং ভ্রমণের শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি এতদিনে এই 'চাম্বা' উপত্যকায়,—এই সব আলোচনার কালে তিনি একসময়ে বললেন, আমার অহঙ্কার কিন্তু আর বোধ হয় রইলো না। কাশ্মীর থেকে আপনার সঙ্গে বেরিয়ে ভেবেছিলুম, লেখক মানুষটি কেমন তাই দেখবো,—আমরা স্বামীস্ত্রী কখনও লেখক দেখিনি। কিন্তু আপনাকে দেখবার সময়ই পেলুম না। হিমালয়ের আড়াল প'ড়ে গেল। এক বছর এমনি ক'রেই আপনি আমাকে ঠকালেন!

প্রকাণ্ড হলের মধ্যে উচ্চ হাসির আওয়াজ কিছুক্ষণ ধ'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু আহারাদির পরেও ওই বিতর্কটা সেদিন দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত চললো, এবং তাঁর সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে আমি জর্জরিত হ'তে লাগলুম।

'বাক্‌রোটার' উপরে দাঁড়িয়ে স্যের্যর আলোয় দেখেছিলুম, উত্তর পীর-পাঞ্জালের পর্বতশ্রেণী, এবং আকাশ ঘনবর্ষার মেঘে মলিন। কিন্তু তা'র ফলাফল পরে ভোগ করতে হবে, সেকথা ভাবিনি।

সেদিন মধ্যাহ্নের পর আমরা ডালহাউসী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। পাখীডাকা পাহাড়ের বনলোক প'ড়ে রইলো পিছনে, আমরা গোরাছাউনী পেরিয়ে মধুর স্নিগ্ধতার দেশ ছাড়িয়ে নেমে চললুম সেই পুরনো পথ দিয়ে। বিদায় সম্ভাষণ জানালো চম্পাবতীর কুসুমবল্লরীর দল। সেই জয়হিন্দ্‌ হোটেল, সেই ডানদিকে চম্পানগরীর সঙ্কটসঙ্কুল গিরিসঙ্কট হাতছানি দিল। অপরাহ্ণের দিকে 'ডুনেরা'য় এসে পাওয়া গেল প্রচুর জনসমারোহ,—যেন ভিন্ন গ্রহলোকের অপরিচিত প্রাণী-সমাজে এসে পেণছলুম। কিছু চিনতে পারছিনে। জীবনের একটা ছোট টুকরো নিরুদ্দেশ পাহাড়ের মধ্যে মিলিয়ে রইলো।

ঘাঁটি পাহারার অবরোধ ছাড়িয়ে আরও প্রায় কুড়ি মাইল পেরিয়ে 'চাক্কি' ঘাঁটিতে এসে একবার গাড়ী থামলো। এখান থেকে অন্য একটি পথ গেছে কাংড়ার দিকে—যেটি আমাদের দুজনেরই অতি পরিচিত। কাংড়া, জ্বালামুখী, বৈজনাথ, মণ্ডি, কুলু—সমস্তই জানা পথ। ওপথে গত বছরের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দুইজনেরই মনে।

পাঠানকোটে এসে গাড়ী যখন থামলো, বেলা তখনও পাঁচটা বাজেনি। দিল্লীর গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীর-দিল্লী মেল। ঠাণ্ডা থেকে নেমে এসে গরমে কষ্ট পাচ্ছিলুম।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জানা গেল, প্রবল বৃষ্টি নেমেছে কাশ্মীরে, এবং গত তিনদিন অবধি কাশ্মীর-পাঠানকোটের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আজ প্রথম সেই পথ দিয়ে যাত্রী নেমে এসেছে। ষ্টেশন এবং তা'র পারিপার্শ্বিক অঞ্চল লোকে লোকারণ্য,—রেল কর্তৃপক্ষ দিশাহারা। আমরা বিপন্নভাবে ছুটোছুটি আরম্ভ ক'রে দিলুম। হিমালয় ভ্রমণের আনন্দ মাথায় উঠে গেল। এ গাড়ী না ধরতে পারলে কোনমতেই চলবে না।

ট্রেনে ইতিমধ্যেই তিলধারণের ঠাঁই নেই। সবাই যাচ্ছে দিল্লী, আর নয়ত লুধিয়ানা জলন্ধর, অথবা ওই কাছাকাছি। ফার্ষ্ট ক্লাস অথবা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কোনোমতেই পাওয়া গেল না। প্রত্যেকটি 'বোগী' পরিপূর্ণ,—এবং তালাচাবি লাগানো। আগে থেকে আমরা ব্যবস্থা করিনি, সেই আমাদের মস্ত ত্রুটি। কাশ্মীর থেকে নেমেছে জলের বদলে মানুষের বন্যাস্রোত। আমাদের অবস্থাটা একেবারে নিরুপায়। গাড়ীর পাদানে পর্যন্ত মানুষ ঝুলছে।

আমার এক বন্ধু বলেন, যৌবনকাল হোলো জীবনের রাজবেশ! কথাটার প্রমাণ আজ প্রথম পাওয়া গেল। মেয়েদের গাড়ী থেকে দুটি পাঞ্জাবী মহিলা মায়াদেবীকে ইশারায় ডাকলেন,—তাঁদের গাড়ীতে একজন মাত্র মহিলার মাথা গোঁজবার মতো জায়গা মিলতে পারে। এতেই আমরা কৃতার্থ,—কেননা আগে

থেকে মিঃ গুপ্তকে জানানো আছে, আগামীকাল প্রভাতে তিনি দিল্লী ষ্টেশনে এসে দাঁড়াবেন স্ত্রীর প্রতীক্ষায়। স্ত্রীকে যদি দেখতে না পান্ তাহ'লে হয়ত তিনি ভাববেন, মায়াদেবী নাচ-গান ফেলে তপস্বিনী হয়ে গেছেন হিমালয়ে! সুতরাং সর্বাগ্রে দেবীকে গাড়ীতে তুলতে হোলো বহু সংগ্রামের পর। আমার কপালে ওই পাদানি! ঝুলতে ঝুলতেই যেতে হবে সারারাত!

ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম সমস্ত প্লাটফরমে মরিয়ার মতো। কোনো পাদানিতেও পা রাখার জায়গা নেই। একজন শিখ ভদ্রলোকের পায়ের ভিতর দিয়ে পা গলাবার চেষ্টা করলুম,—তিনি ল্যাং দিয়েই আমার পা সরিয়ে দিলেন। ঠ্যাং ভাঙেনি এই রক্ষে!

আশ্চর্য, বিপদের সমস্ত আয়োজন ঘনিয়ে আসা সত্ত্বেও আমার বিপদ সচরাচর ঘটে না। কয়েকমাস আগে কলকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয় বলেছিলেন, আপনার হার্টের ব্যামো! পাহাড়ে আর কখনও যাবেন না, গেলে নির্ঘাত মৃত্যু!—কিন্তু পাহাড়ে না গেলে যে হার্টের ব্যামো বাড়ে,—এটি তাঁকে বলা হয়নি! যাই হোক, হঠাৎ চোখে পড়লো প্লাটফরমে আমাদের এক পুরনো বন্ধু দাঁড়িয়ে। তিনি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুপ্ত, একজন বিশিষ্ট কৃতী সাংবাদিক। সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি গিয়েছিলেন শ্রীনগরে সপরিবারে। তিনি দিল্লীর 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' স্পেশাল অফিসার। ফিরে যাচ্ছেন দিল্লীতে। দেখেই তিনি প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

—কোন্ গাড়ীতে উঠেছেন?

হেসে বললুম, চেষ্টা আছে ওঠবার, তবে এখনও উঠতে পারিনি।

বেশ ত, আসুন না আমার গাড়ীতে,—আমার জন্য সম্পূর্ণ কামরা রিসার্ভ করা আছে!—অশ্বিনীবাবু তাঁর সহৃদয় প্রস্তাব জানালেন।

তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সঙ্গে তিনচারটি তাঁদের পুত্র-কন্যা। তাঁদের সেদিনকার উদার ও স্নেহশীল আচরণ সত্যই স্মরণীয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে আমি সেই সন্ধ্যায় যেন হাতে স্বর্গ,—না থাক্, নির্বিঘ্নে আগে টিকেট-চেকারের চোখে ধুলো দিয়ে ট্রেন ছাড়ুক, তারপর ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঈশ্বরকে সুবিধামতো ধন্যবাদ দেওয়া যাবে!

মায়াদেবী ও তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে কথা উঠলো। জানা গেল, ওঁরা অশ্বিনীবাবুর যেন কি প্রকার কুটুম্ব হন্।

গাড়ী ছেড়ে দিল যথাসময়ে। মায়াদেবী জানতেও পারলেন না, আমি পরম স্বাচ্ছন্দ্যে গদির উপরে পা ছড়িয়ে শুয়ে বাঁচলুম। রাখে কেষ্ট মারে কে!

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় গাড়ী এসে পেঁছিলো দিল্লীতে। একটু মুখ ফেরাতেই দেখা গেল, হাসামুখে শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র স্ত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

প্রবল জনতার ভিতর থেকে দুজনে নামলুম দুই কামরা থেকে। এর পর অধিক বাহুল্য। শ্রীমান্ আমাকে সহাস্যে জড়িয়ে ধরলেন।

ওদিকে আমাকে তাঁদের পাহাড়গঞ্জের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছেন প্রিয়দর্শন তরুণ বন্ধু শ্রীমান্ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য।

অশ্বিনীবাবুর বদান্যতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ তোলা রইলো।









॥ ১৩ ॥

গাড়োয়ালের ভিতর দিয়ে আবার অগ্রসর হচ্ছিলুম। হেমন্তের হাওয়া নেমেছে তরাইয়ের বনে বনে। কোটদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করেছি। সেই আত্ম-তাড়না আবার ছুটিয়ে এনেছে এদিকে। সেই নতুনের টান, বিচিত্রের সেই ঘরছাড়ানো আকর্ষণ। আমি আসিনি, আমাকে এনেছে কেউ। আমি যাচ্ছিনে, যাচ্ছে অন্য কেউ আমার পায়ে পায়ে। সেই দেখছে, সেই দেখাচ্ছে, জানাচ্ছে সেই,—আমার অস্তিত্ব তারই চেতনায়। আমি আছি চর্মচক্ষু মেলে,—দেখছে সে।

কোটদ্বারের পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছিলুম।—

হিমালয় পরিক্রমা শেষ হয়ে এলো বৈকি। ডায়েরীও প্রায় শূন্য হ'তে চলেছে। এই ঝুলি সম্পূর্ণ শূন্য ক'রে যেতে চাই এই যাত্রায়। কিন্তু দক্ষিণ গাড়োয়ালের হৃষিকেশে না পেঁছিতে পারলে সর্বস্বান্ত হবার পরম আনন্দ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এই পরিক্রমা শেষ হোক হৃষিকেশে। তেত্রিশ বছরের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে শূন্য ঝুলিটি ফেলে দিয়ে যাবো নীলধারায়। ওইটি আমার শেষকৃত্য।

*

* *

'কালদণ্ড' পর্বতের চূড়ায় উঠেছি। আধুনিক মানচিত্রে 'কালদণ্ড'র উল্লেখ নেই কোথাও, তা'র স্থলে বসানো হয়েছে 'লান্সডাউন।' কোটদ্বার থেকে লান্সডাউন পঁচিশ মাইল পার্বত্য ও উপত্যকাপথ। গাড়ী যায়।

সুদূর সমতল ভারত দক্ষিণে, এবং উত্তরে তুষার গিরিশ্রেণীর কয়েকটি পরিচিত শিখর,—এই দুই দৃশ্যের সন্ধিস্থল হোলো 'কালদণ্ড' পর্বত। এদিকে চোখ ফেরাও, ওদিকে মুখ ঘোরাও—দেখে নাও বিরাটের আনন্দস্বরূপ! মহাকালের অতন্দ্র প্রহরী।

তবু স্বীকার করবো, কোনও আমন্ত্রণ নেই লান্সডাউনে। কেউ ডাকে না,—এসে পড়লে কেউ জায়গা দিতেও নারাজ। সেইজন্য লান্সডাউন থাকে অনেকটা যেন লোকলোচনের বাইরে। সন্দেহ নেই, এককালে কর্তৃপক্ষও এটি চেয়েছিল। এটি 'গায়োড়াল রেজিমেণ্টের' প্রধান কেন্দ্র। এই রেজিমেণ্টের সঙ্গে বাইরের অন্যান্য পার্বত্য অধিবাসী অথবা সমতলবাসীর যোগাযোগ না থাকে—এই ছিল উদ্দেশ্য। ভারতীয় সেনাবাহিনী ইংরেজ আমলে ভারতীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

ছোট্ট এই শহরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের চূড়ায়; বুঝতে পারা যায় এই

অসমতল মালভূমিটি প্রস্তুত করতে এককালে সময় লেগেছিল। সরু সরু পথ এখানে ওখানে পাহাড়ী বস্তির গা ঘেঁষে নীচের দিকে নেমে গেছে। ক্ষুদ্র এক পাহাড়ী শহরের দোকান বাজার যতটুকু হওয়া সম্ভব—এখানেও তাই। অভাব এবং দারিদ্র্য চারিদিকেই প্রকট। ওদেরই আনাচে কানাচে আবশ্যিক এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার নিয়ে ব'সে গেছে মাড়োয়ারির দোকান,—দরিদ্র এবং স্বল্পবিত্ত পল্লীবাসীর মাঝখানেই নাকি খুচরা ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটে কিছু দ্রুতগতিতে।

মালভূমিটি প্রশস্ত, কিন্তু এর বাইরে সমতল বলতে আর বিশেষ কিছু নেই। এর পাশেই গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট-এর সুবিস্তৃত গোরাছাউনী। লান্সডাউনের ওটাই সকলের বড় পরিচয়। কাঁটাতারের বেড়া-দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে, ভিতরে ভিতরে পাকা বাংলো অসংখ্য,—ওদেরই মধ্যে কুচকাওয়াজের ময়দান, অস্ত্রশালা আর দপ্তর। বোধ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে একমাত্র গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট,—যার সৈন্যদল পাহাড়পর্বতের বাইরে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বসবাস করতে চায় না। নেপালী গুর্খারাও বরং উত্তাপ সইতে শিখেছে, কিন্তু গরমের দেশের কথা উঠলে গাড়োয়ালীরা আতঙ্কিত হয়। এই রেজিমেণ্ট-এর চিরস্থায়ী বসবাস এবং হিসাব নিকাশের দপ্তর হোলো এই লান্সডাউন,—এবং হিমালয়ের ভিতরে ভিতরে বহু অঞ্চলে এরা পাহারা দেয়। কঠিন পরিশ্রম, কঠোর জীবন-যাত্রা, অনন্যসাধারণ নির্ভরযোগ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতা—ইত্যাদি গুণাবলী এদেরকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। মনে প'ড়ে গেল একটি ঘটনার কথা। বোধ হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ। সেটি আইন অমান্যের যুগ, এবং গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত পাঠান খোদা-ই-খিৎমদগারগণের সীমান্তব্যাপী আন্দোলন। বোধ করি পেশাওয়ার রেল স্টেশনের নিকট দাঁড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতি গাড়োয়ালী সেনাদলের উপর হুকুম দিলেন, শোভাযাত্রাকারী নিরস্ত্র এবং অহিংস পাঠানদের উপর গুলী চালাও! সম্ভবত সেই প্রথম গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট বেঁকে বসলো, কারণ অহিংস ও নিরস্ত্র পাঠানদেরকে তা'রা হত্যা করতে প্রস্তুত নয়!

সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের উৎপীড়িত হৃদয় চাপাকণ্ঠে এই গাড়োয়ালী রেজিমেণ্টকে আশীর্বাদ করেছিল। কিন্তু এই 'অবাধ্যতার' জন্য সেই বিশেষ গাড়োয়ালী সেনাদলটি পরবর্তী সতেরো বৎসরকাল অবধি নিঃশব্দে ইংরাজের হাতের শাস্তি বহন করেছে, তা'র কঠোরতা আমাদের অনেকেরই অগোচরে ছিল।

আগেই বলেছি লান্সডাউনের প্রাচীন নাম 'কালদণ্ড' পর্বত, এবং এই 'কালদণ্ডের' ঠিক নীচেই ছিল দুটি প্রাচীন তীর্থমন্দির—কুমারী শাকম্ভরী ও কালেশ্বর মহাদেব,—যার উল্লেখ পাওয়া যায় কেদারখণ্ডে। এককালে অরণ্যে আকীর্ণ ছিল পাহাড়ের নীচের দিক,—জন্তুজানোয়ার বছরের অধিকাংশকাল এখানে অবাধে রাজ্যপাট চালাতো। তখন বছরের বিশেষ-বিশেষ পর্বে

গাড়োয়ালীরা এসে পাহাড়ের তলায় এই দুটি মন্দিরে কেবল পূজা দিয়ে যেতো। এমনি ক'রে গেছে বহুকাল। কেউ বলে পাঁচশো বছর, কেউ বা বলে আরও বেশী। আধুনিক কালে এসে দেখি, ঠাণ্ডা পাহাড়ের নিরিবিলি অঞ্চল খুঁজতে বেরিয়েছে ইংরেজ। ডালহাউসী, মুসৌরী, নৈনীতাল, শিমলা, রানীক্ষেত— এরা একে একে গ'ড়ে উঠেছে দুটি শ্রেণীর জন্য। একটি হোলো শাসক ইংরেজ, অন্যটি রক্ষক ইংরেজ। শাসক হোলো বড়লাট, রক্ষক হোলো জঙ্গীলাট। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'কালদণ্ড' নামটি অপসারিত ক'রে তা'র স্থলে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লান্সডাউনের নামে এই পর্বতচূড়াটির উপরে গাড়োয়াল রেজিমেণ্টকে বসিয়ে ক্ষুদ্র একটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। লান্সডাউন থেকে পঁচিশ মাইল পথ নীচে নেমে গেলে কোটদ্বারের ক্ষুদ্র রেলষ্টেশন। ইদানীং এই কোটদ্বার থেকে বদরিনাথ যাবার জন্য মোটরবাস চলাচল করছে। এ গাড়ী কর্ণপ্রয়াগ ও চামোলী হয়ে পিপলকুঠি পর্যন্ত যাচ্ছে, সেখান থেকে বদরিনাথ আর মাত্র বাকি থাকে আটত্রিশ মাইল। হিমালয়ের বহু দুঃসাধ্য পথ প্রতিনিয়তই সুগম ও সহজসাধ্য হচ্ছে।

কালেশ্বর মহাদেবের নিভৃত বনময় মন্দিরটির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। বনে বনে পাখীর কুজনগুঞ্জন ছাড়া আর কোনও প্রকার কলরব নেই। সামনে রয়েছে বলীবর্দ মূর্তি; একটি ঘণ্টা দুল্‌ছে—ওটার মৃদু গম্ভীর রবে গাড়োয়ালীরা মাঝে মাঝে এসে কালেশ্বরের যোগতন্দ্রা ভাঙগাবার চেষ্টা পায়। এখানে ওখানে ছায়ানিরিবিলি দুতিনটি পাকা ঘর, একটি অঙগন,—এর বাইরে পাহাড়ের তলায়-তলায় চ'লে গেল বনপথ। এদের নিয়েই থাকেন পূজারী,— তিনি অতি ভদ্র একটি আত্মভোলা মানুষ। মন্দিরটির কোনও চাকচিক্য নেই ব'লেই সহজে শ্রদ্ধা আসে। হয়ত এর বয়স বছর ষাট সত্তরের বেশী নয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, কেদারখণ্ডে উল্লিখিত ঠিক এই স্থলেই পঞ্চাশ বছর আগে ওই কালেশ্বরের লিঙগমূর্তি খুঁজে পাওয়া যায় বনের মধ্যে,—সেই লিঙগই পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সত্য মিথ্যার সমস্ত দায়িত্ব রয়ে গেল স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে,—যাদের শ্রদ্ধায়, সেবায়, পূজায়, ভালোবাসায় কালেশ্বর জাগ্রত। দেবতার অস্তিত্ব হোলো বিশ্বাসে,—বাইরে কিছু নেই।

বিদায় নিচ্ছিলুম শাকম্ভরী মন্দিরের কাছে—লান্সডাউন বাজারের নীচের দিকে মন্দির। পাশ দিয়ে চ'লে গেছে পাহাড়ী বস্তির পথ। কোথাও কোথাও সপরিবারে থাকে কয়েকজন গাড়োয়ালী সৈনিক,—যারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায়। রেজিমেণ্ট আছে ব'লেই শহর আছে, প্রাণধারণের সংস্থান আছে। সৈন্যদলের মধ্যে গাড়োয়ালী গুর্খার সংখ্যাও কম নয়। কালক্রমে গাড়োয়ালীর মধ্যে নানা শ্রেণী মিশে গেছে।

যূথভ্রষ্ট লান্সডাউনের শিখরলোক—চারিদিকে এর অন্তহীন অবকাশ। হঠাৎ চূড়াটি যেন দাঁড়িয়ে উঠেছে হাজার ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট

উচ্চতার উপরে,—যেন দলছাড়া। ফলে, দক্ষিণে দেখা যায় অনন্ত অরণ্যসমাকীর্ণ তরাই, এবং উত্তরে তুষারমৌলী হিমালয়। যে-দৃশ্যটি রানীক্ষেত এবং কৌসানী থেকেও পুরোপুরি দেখা যায় না,—এখানে তা'রা অধিকতর প্রত্যক্ষ। সেটি হোলো কেদারনাথ এবং বদরিনাথের পাশাপাশি দুটি শ্বেতচূড়া। ওরা হোলো গাড়োয়ালের আদি দেবতা,—ওরা নিত্যপূজ্য।

কালদণ্ডের কাছে বিদায় নিয়ে পাকদণ্ডী পথে ঘুরে ঘুরে নামছিলুম। সুন্দর ও মসৃণ প্রশস্ত পথ চারিদিকের দিগ্বলয়কে যেন চোখের সামনে ঘোরাচ্ছে। এমন নির্জন বনময় পথও যেমন সহসা চোখে পড়ে না, তেমনি এই অল্পসংখ্যক মাইলের মধ্যে এমন চড়াইও সচরাচর দেখা যায় না। এর বাইরে দেখা যাচ্ছে লান্সডাউনে দ্রষ্টব্য আর কিছু নেই,—কিছু রাখাও হয়নি। কেউ যেন লান্স-ডাউনের আকর্ষণ খুঁজে না পায়, এই ছিল লক্ষ্য। সেই কারণে যদিও একটি সামান্য ও শৃঙ্খলাহীন ক্ষুদ্র হোটেল আবিষ্কার করা যায়, ভদ্র বাসস্থান কোনও মতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইরের লোকের অভ্যর্থনা এখানে কোথাও নেই।

অবকাশ সংকীর্ণ হয়ে এলো, ঘুরে-ঘুরে তলিয়ে নেমে যাচ্ছি, চীড়বনের ভিতর দিয়ে নেমে যাচ্ছি 'দুগাড্ডার' দিকে। একদিকে পার্বত্য অরণ্য, অন্যদিকে বিস্তৃত অতিকায় পাহাড় তা'র অতিপ্রাকৃত মহিমা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ছায়াছমছমে পথ ঝিল্লিমুখরিত। পথের পাশে পাশে গভীর খদ, নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে 'খো' নদী। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যেন ঘুম জড়িয়ে রয়েছে গুহায় গহ্বরে পাথরে,—সেই ঘুম হাজার হাজার বছরের। চারিদিকের আকণ্ঠ স্তব্ধতার মধ্যে কোথাও যেন লুকিয়ে রয়েছে অমৃতের পরম আস্বাদ,—সেটি খুঁজে পাবার জন্য উৎসুক অধীর মন যেন ছোঁক ছোঁক করে। এবারের মতো বিদায় নিয়ে যাচ্ছি হিমালয়ের কাছে।

'উমরাওখান' নামক একটি ঘাঁটি পাহারা পার হলুম, এ পথ দিয়ে যাবার সময় একবার সেলাম ঠুকে 'ষোল আনা' প্রবেশমূল্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এটি পাহাড়ী ছোট্ট বস্তি, চতুর্দিকে অরণ্য। গাড়ী কিছুক্ষণ থামে ব'লেই এখানে একটি চায়ের দোকান পাওয়া যায়। পাশে পাশে 'খো' নদী ব'য়ে চলেছে। তা'র ধারা কখনও বাঁ দিকে, কখনও বা দক্ষিণে। এখান থেকে 'দুগাড্ডা' পৌঁছবার মাইল দুই আগে একটি শাখাপথ চ'লে গেছে বদরিনাথের দিকে, এটি বহুদূর অবধি পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কর্ণপ্রয়াগে গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে।

'দুগাড্ডায়' এসে পৌঁছলুম। 'খো' নদীর উপরেই একটি জনবহুল ছোট প্রাচীন শহর। এই শহরের দুদিকে খদ ব'লেই হয়ত এর নাম দুগাড্ডা। যেটি বাজার অঞ্চল সেটির নাম 'গান্ধী চৌক।' বস্তি, নালা, ঘিঞ্জি এবং দারিদ্র্য,—সমস্ত মিলিয়ে যেন হতশ্রী। এটি উপত্যকা, এবং চাষবাস আছে। অদূরের পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে একটি শ্বেতবর্ণ শিবমন্দির, এবং 'খো' নদীর ধারে একটি মসজিদ। 'দুগাড্ডা' থেকে একটি পথ বেঁকে চ'লে গেছে গাড়োয়ালের

প্রধান কেন্দ্র 'পৌড়ী'র দিকে। 'পৌড়ী' এখান থেকে চল্লিশ মাইল, এবং কোট-দ্বার দক্ষিণে দশ মাইল মাত্র। 'খো' নদীর ধার দিয়ে-দিয়েই আমাদের মোটরবাস কোটদ্বার শহরের দুমাইল দূরে এসে পৌঁছলো। এই পথটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অশোক মার্গ', এবং আমরা যে প্রশস্ত রাজপথটি ধ'রে 'গান্ধীভবন' নামক হোটেলে এসে পৌঁছলুম, সেটির নাম 'রবীন্দ্র মার্গ।' বস্তুত, গত পনেরো বছরের মধ্যে চারজন ব্যক্তির নামে ভারতের সংখ্যাতীত শহরে এবং হিমালয়ের নানা অঞ্চলে অনেকগুলি রাজপথ উৎসর্গ করা হয়েছে,—তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র এবং পন্ডিত নেহরু।

অরণ্যের সীমানায় হোলো কোটদ্বার। ছোট্ট রেলষ্টেশন—তা'ও যেন অনেকটা বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শহরটি যেন মোটরবাসেরই একটি প্রধান আড্ডা। বদরিনাথের যাত্রীর কলরবে ইদানীং এই শহর গ্রীষ্মকালে মুখরিত থাকে। অধিকাংশ যাত্রী পায়ে হাঁটা তীর্থ পরিক্রমা এখন ত্যাগ করেছে, তা'রা গাড়ীতে যায় 'চামোলী' ছাড়িয়ে। ফলে, মধ্যপথে যে সকল যাত্রীশালা ও 'চটি' ছিল, যাত্রীদের মুখ চেয়ে সুদূর পাহাড়ী অঞ্চলে যারা অন্নসংস্থান করতো, তা'রা কপালে হাত দিয়ে বসেছে। মাঝপথের গ্রাম, বস্তি, মন্দির, চটি—এদের দুর্গতি বেড়ে উঠছে যেমন দিন-দিন, তেমনি যাত্রীদের পক্ষে এখন পথের দুঃখকষ্ট ও পরিশ্রমও কমছে। তীর্থপথ অপেক্ষা তীর্থক্ষেত্রই এখন তীর্থযাত্রীদের প্রধান লক্ষ্য।

অরণ্যের সীমানা দিয়ে কোটদ্বার থেকে একটি পাকা রাস্তা চ'লে গেছে হরিদ্বারের দিকে। পঁয়ত্রিশ মাইল পথ, এবং এপথে মোটর বাস চলে। কিন্তু অসুবিধা এই, বর্ষার ভাঙনে এ পথটি অগম্য হয়ে ওঠে, সেই কারণে নবেম্বরের মাঝামাঝির আগে এটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এটি অরণ্যপথ, এবং পাহাড়ের তলায়-তলায় এটি এঁকে-বেঁকে গঙ্গার মূলধারার দিকে চ'লে গেছে। পথে ছোট বড় অনেকগুলি গিরিনদী পার হয়ে যেতে হয়।

॥ ১৪ ॥

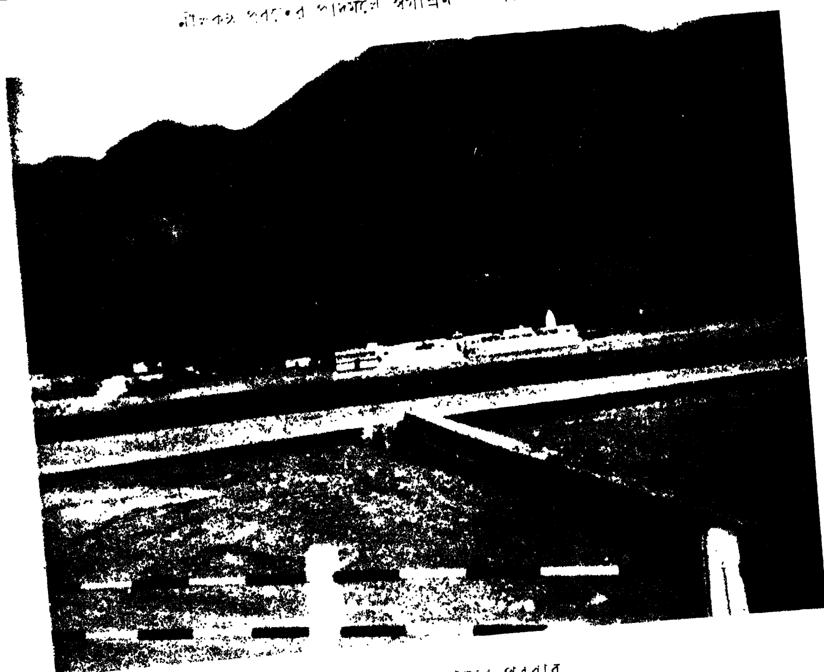
হিমালয় শত পাকে বেঁধে রেখেছিল বহুকাল। সেই বাঁধন কাটতেও লেগে গেল অনেকদিন। ক্লান্ত দুই পা এবার বিশ্রাম চাইছে সেইখানে, যেখানে তেত্রিশ বছর আগে একদা যাত্রা সুরু হয়েছিল। অতএব আবার সেদিন হরিদ্বার ছাড়িয়ে এসে পেঁছলুম হৃষিকেশে। এই হৃষিকেশেরই উত্তর প্রান্তের বিশুষ্ক চন্দ্রভাগার নুড়ি তুলে একদা কপালে ঘষে' মনে-মনে স্থির করেছিলুম, হিমালয় পরিক্রমা এখান থেকেই সুরু হোক। কিন্তু ঠিক এইখানে এসে সেই পরিক্রমার পরিসমাপ্তি ঘটবে, তরুণ বয়সে এ কথাটা সেদিন মনে হয়নি। জীবনের অপরাহ্ণকাল ঘনিয়ে এসেছে, বেলা আর বাকি নেই, চূড়ায় চূড়ায় রাঙারৌদ্র দেখা যাচ্ছে। সুদূর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বিহঙ্গের ডানায় এসেছে ক্লান্তি। সৌরবিশ্বব্যোমের অনন্ত নিদ্রা তা'র সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। এবার বিদায় নেবো।

ঝোলাঝুলি নিয়ে দাঁড়ালুম পথে। কর্কশ পাথর-কাঁকরের রুক্ষরৌদ্রপথ, কিন্তু এর টান হোলো জীবনজোড়া। কতবার এসেছি এখানে, সংখ্যা গণনা করিনি। যতবার গান গেয়েছি, সব শেষে সমে এসে ঠেকেছি এই হৃষিকেশে। দুঃখে অপমানে আঘাতে নরকযন্ত্রণায় কতবার অভিশপ্ত পৃথিবীকে ফেলে পালিয়ে এসেছি এখানে,—সহসা পরম বিস্ময় যেন তা'র রহস্য তোরণদ্বার খুলে ভিতরে ডেকে নিয়েছে। ঝোলাঝুলিকেও মনে হয়েছে বাধা, ফেলে চ'লে গেছি বার বার,—কিন্তু একবারও হারায়নি, এই দুঃখ। এখানে আজ দেখতে দেখতে পাকাবাড়ী উঠে গেল অনেকগুলি, আধুনিকের অনেক ছাঁচ এসে পেঁছে গেল, সেতু বাঁধা হোলো চন্দ্রভাগায়, রাস্তা পাকা হোলো নানাস্থলে, দোকানপাট আর বাজার ব'সে গেল যেখানে সেখানে, রেলপথ এসে পেঁছলো 'রাড়েওয়ালা' থেকে, মোটরবাস হাঁসফাঁস ক'রে ছুটে এলো নানাদিক থেকে। এখানেও কালের চাকার সঙ্গে কলের চাকা ঘুরলো। সেই হৃষিকেশকে আজকে যেন আর চিনতে পারা যায় না।

'কালীকম্বলীবাবার' বিরাট ইমারতের পূর্বপাশ দিয়ে অতি পরিচিত পথটি গেছে ঘাটের দিকে, এরই উপর একটি ছবির দোকানের পিছনে থাকতেন সেই আৎমানন্দ্, কে যেন তাঁকে এনে দিত 'সদাব্রত' থেকে খান চারেক রুটি আর একটু ডাল,— ওই খেয়ে তিনি রইলেন ছ'বছর। তাঁর দেশ ছিল মধ্যভারতে এবং দুখানা ছেঁড়া কম্বল ছিল ভরসা। সন্ধ্যার পরে একটি মোমবাতি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। সেই মোমবাতির আলোয় জ্বলজ্বলে দুটো চোখ নিয়ে আৎমানন্দ উঠে বসতেন। তখন রাত্রির নীলধারার ঝুমুর-ঝুমুর আওয়াজ আসতো



নীলকণ্ঠ পর্বতের পাদমূলে স্বর্গাশ্রম   নীচে নীলধারা



হৃষীকেশ   গঙ্গার পরপার



[illegible]

ঘরের পাথুরে দেওয়ালের ফাটলে-ফাটলে, আর ছবির দোকান থেকে লছমণের বুড়ি পিসি দোলাই গায়ে জড়িয়ে গুটি গুটি এগিয়ে আসতো গরম কল্‌কেটি হাতে নিয়ে,—আৎমানন্দ তখন আরম্ভ করতেন প্রাণায়াম আর যোগসাধনার কথা। একে একে আসতো দেহতত্ত্ব আর অধ্যাত্মবাদ,—বুড়ির চক্ষু বেয়ে জল নামতো, আমিও মুগ্ধমনে ব'সে থাকতুম। মোমবাতিটি নিভে যেতো অনেক রাত্রে। মাঝে মাঝে কোথাও বেজে উঠতো ঘণ্টা, কোথাও বা উদার গম্ভীর কণ্ঠে শোনা যেতো, বোম শংকর, জয় শম্ভো!

কিছুকাল পরে একবার গিয়ে শুনি, বুড়ি আর আৎমানন্দ্ দুজনেই মারা গেছে, এবং ছবির দোকান তুলে দিয়ে লছমণ গিয়ে কাজ নিয়েছে কোন্ ষ্টেশনে। ওখানে বসেছে এখন ছোট ছেলের খেল্‌নার দোকান।

ত্রিশ বছর আগে যখন একবার আসি হৃষিকেশে—বোধ হয় সেটি তৃতীয়বার—তখন 'কালীকম্বলীর' সদাব্রতে ঢুকতে গা ছমছম করতো। ঝুপসি ঘর নিঃসঙ্গ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা দালান, পুরনো পাঁচিল, কালো কালো দরজা জানলা,—এ বাড়ীর কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ, খোঁজ পাওয়া যেতো না। সেই কালের ওই এক অন্ধকার খুপ্‌রি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল এক অতি সুশ্রী ধনবান যুবক। আমারই সমবয়সী, কিছু বড় হ'তে পারে। নাম কিশোর জৈন, বাড়ী তা'র আওরঙ্গবাদে। অবাক ক'রে দিল সে আমাকে, যখন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো। নাবালক বয়সে বাড়ীর লোকের সঙ্গে আমি কবে গিয়েছিলুম একবার তারকনাথে, কিশোর জৈন নাকি সেই প্রায় বারো বছর আগে আমাকে দেখেছিল তারকনাথে,—সেখানে সে বাপের অসুখের জন্য ধর্ণা দিতে গিয়েছিল। আমার মনে নেই, কিন্তু কিশোর ভোলেনি। সে-যাত্রায় তিনদিন ধর্ণা দিয়ে 'ওষুধ' সে পেয়েছিল, সেই ওষুধের জন্যই নাকি তা'র বাবা বেঁচেছিল পরবর্তী পাঁচ বছর। কিশোর আমাকে কিছু ভাবতে দিল না, এখানে তা'র আসার উদ্দেশ্য কি জানতে দিল না, কেবল দিনআষ্টেক ধরে ঘূর্ণীবাত্যায় আমাকে টান মেরে উড়িয়ে নিয়ে ঘুরলো এ পাহাড়ে আর ও পাহাড়ে, ঘুরলো নীলধারার তীরে তীরে, সাধুদের আশ্রমের আনাচে কানাচে। নিয়ে গেল সেই কনখলের আশ্রমে আর গুরুকুলে: নিয়ে গেল দক্ষঘাটে, আর ওই তা'র দক্ষিণ দিকে 'সতীসমাধি-ক্ষেত্রে',—যেটির নাম 'সতীকুণ্ড', যেখানে অগণিত সতীমেয়ের অস্থি ও চিতা-ভস্মের উপরে স্মৃতিফলক বানানো। নিয়ে গেল তেলের আলো-জ্বালা হরিদ্বারের অন্ধকার পথে পথে। রাত্রিবাস করতে লাগলো যে কোনও ধর্মশালায়। পান আর জর্দা খাচ্ছে সে প্রচুর, পানের রস গড়াচ্ছে তা'র গরদের জামায়, ধুলোয় আর মালিন্যে ওই পরম সুন্দর রূপ জ্ব'লে পুড়ে যাচ্ছে। টাকা পয়সা খরচ করছে অজস্র, প্রয়োজনের বহু অতিরিক্ত। তা'র হাসিতে আর প্রাণের প্রাচুর্যে পথঘাট মুখরিত। আমি নাকি পৃথিবীতে তা'র একমাত্র বন্ধু। মোতি-বাজারের কোণে এক পানের দোকানে তার নাম হয়ে গেল, 'পানুয়া শেঠ।'

সত্যি বলতে কি, অত পান খাওয়া সে-বয়স অবধি আমি দেখিনি। তা'র হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলুম তিন সপ্তাহ পর। কিশোর তা'র উচ্ছৃংখলতার জন্য আমার মনে গভীর রেখা টেনেছিল।

পর-পর দু'বার আবার গেলুম হৃষিকেশে,—কিশোর জৈনকে পাওয়া গেল না। ওর মনের মধ্যে আত্মনাশের বীজ ছিল জানতুম। একথাও মনে হোতো, ওর একটা পরম মূল্যবান কথা আমার কাছে যেন চেপে রাখলো। আমার অনেকদিনের অনেক প্রশ্ন কিশোর এড়িয়ে গেছে। আমার ধারণা, ওর কোনও একটা পারিবারিক কলংক ছিল। কিন্তু শিক্ষিত যুবক ব'লেই সেটি আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

কিন্তু সেইটি শেষ নয়। ডায়েরীতে দেখছি, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে ওর সংগে শেষবার দেখা। ওই পথে 'সত্যনারায়ণের' মন্দিরে গাছপালার ছায়ায় ব'সে যে-ব্যক্তি ভাংগা গলায় ভজন গান করছিল, সহসা সবিস্ময়ে লক্ষ্য ক'রে দেখি, সে-ব্যক্তি কিশোর জৈনের প্রেতমূর্তি! বয়স ত্রিশ হ'তে তখনও অনেক বাকি, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ষাট হ'তে দেরি নেই। এক মুখ দাড়ি গোঁফ, ময়লা তামার পয়সার মতো গায়ের রং, শীর্ণকায় চেহারা, রাশিকৃত ময়লা চুল ঝুলে পড়েছে মাথার চারিদিক থেকে। সেই পদ্মপলাশ চক্ষু আজ দেখলে ভয় করে,—যেন গিলতে আসছে! যাত্রীদের কাছে বোধ হয় কিছু ভিক্ষার আশায় ছিল। আমার ধারণা, আমাকে সে লক্ষ্য করেনি। আমি আত্মগোপন ক'রে ছিলুম।

দু'চারজন ভিক্ষা অবশ্য দিল। কিন্তু যাত্রীদের মধ্যে একজন হঠাৎ ওর দিকে একটুখানি মনোনিবেশ ক'রে তাকাতেই ও যেন আগুন হয়ে উঠে দাঁড়ালো। হঠাৎ একটা বিশ্রী গালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু হট্টগোল বাধবার আগেই মন্দিরের চত্বর থেকে ছুটে এলো একজন সেবক। উভয়ের মাঝখানে প'ড়ে থামিয়ে দিয়ে সে কিশোরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে পথে বা'র ক'রে দিয়ে এলো। তারপর সেই ভদ্রলোকটিকে বললে, উনকো দেমাক ঠিক নহি হ্যায়, শেঠজি। বেহুঁস আদ্‌মি হুঁ।

পা দুখানা পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিশোর জৈন বার দুই ফিরে-ফিরে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো। তা'র সেই খুনে চেহারা লক্ষ্য ক'রে কেউ-কেউ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেবকটির কাছে খবর নিয়ে জানলুম, ও হোলো এক বোরেগী, এই অঞ্চলেই থাকে। তবে ওর মাথার কিছু দোষ আছে। লোকটা ক্ষয়রোগে ভুগছে, এবং রাস্তাঘাটে প'ড়ে থাকে।—এইটুকুর মধ্যেই কিশোর জৈনের সমস্ত জীবনের পরিচয় ধরা রয়েছে।

কিশোর জৈনের জন্য কাঁদবার কেউ থাকলে সেদিন আমিও কাঁদতুম বৈকি।

মীনবাহিনী গঙ্গার নীলধারা হিমালয়ের জটিল জটাবন্ধন খুলে ছুটে নেমে এসেছেন হৃষিকেশে,—প্রথম মর্ত্যলোকে নেমেছেন জাহ্নবী। যত গঙ্গা আছে উত্তরে,—সকলকে ধারণ করেছেন তিনি আপন নীলধারায়। যদি কেউ বলে এটি স্বর্গ আর মর্ত্যের সন্ধিস্থল,—বিশ্বাস ক'রে নেবো। এই নীলধারার ঘাটে ব'সে অনেকদিনের বেলা গিয়েছে কেটে,—অনেক সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে রাত্রে। এই হৃষিকেশের ঘাটে নেমে অবগাহন করেছে ভারতের সকল সম্প্রদায়,—মারাঠী, মাদ্রাজী, গুজরাটী, বিহারী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, উত্তরপ্রদেশী,—সবাই। কিন্তু স্থানীয় লোকরা বলে, হৃষিকেশের সর্বাপেক্ষা ভক্ত হোলো বাঙগালী। বাঙগালীর আশ্রম, বাঙগালীর প্রতিষ্ঠান, বাঙগালীর সেবা ও শিক্ষাদান,—এ অঞ্চলে সুবিদিত। হৃষিকেশ এবং লছমনঝুলা অঞ্চলে বাঙগালীর একাধিক ভূসম্পত্তি আজও রয়েছে, এবং লছমনঝুলার নিকটবর্তী সর্বাপেক্ষা মনোরম অঞ্চলে পাহাড়ের কিনারায় দুখানি বাঙগালীর বাড়ী আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের ঔষধ বিতরণের কেন্দ্রটির কথা কে না জানে! স্বর্গাশ্রমের পথে বহু বাঙগালী সাধু এবং শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মপরিচয় গোপন ক'রে অধ্যাত্ম তপস্যায় রত আছেন,—একথা কা'রো অবিদিত নেই। তাঁরা ভিন্ন ভাষা এবং অবাঙগালী পরিচ্ছদের অন্তরালে নির্জন পাহাড়ের আশে পাশে কুটীর বানিয়ে থেকে গেছেন অনেককাল। বছর পনেরো ষোল আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক প্রৌঢ়া বাঙগালী গৃহিণী এই অঞ্চলে খুঁজতে খুঁজতে এসে তাঁর গৃহত্যাগী স্বামীকে সাধুর বেশে সহসা এক কুটীরে নাকি দেখতে পান্। স্বামী তখন যোগসাধনায় নিমীলিতনেত্র ছিলেন। কিন্তু চোখ খুলে তিনি তাঁর গৃহিণীকে সহসা সামনে দেখেই আঁৎকে ওঠেন, এবং উঠে দাঁড়িয়ে ভগ্নকণ্ঠে চেঁচান, 'তুমি এখানেও ধাওয়া করেছ ?'—এই ব'লে তিনি পাগলের মতো একদিকে ছুটতে থাকেন। স্ত্রী এবং কর্তার শ্যালক অনেক ছুটোছুটি ক'রে বুঝি পুলিশের সাহায্যে তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু দুদিন পরে সেই ব্যক্তির মৃতদেহ গঙ্গার জলে খুঁজে পাওয়া যায়। দু'তিনখানা বড় বড় পাথরের খাঁজে লাসটি আট্‌কে ছিল।

'কালীকম্বলীর' নীচের তলাকার ওই পশ্চিমের এঁদো ঘরখানায় একদা এসে উঠেছিলেন কাশীর পাঁড়ে-হাউলীর পুষ্পদিদিরা। বিধবা পুষ্পদিদির সঙ্গে ছিল তাঁতীবৌ আর স্নেহলতা। স্নেহলতার চোখ ছিল কটা, পরণে থাকতো খদ্দরের থান, মানুষটা ছিল ক্ষণমজী এবং একগুঁয়ে। শাসন মানতো না স্নেহলতা, এবং সকলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ওই নীলধারার তুহিন ঠাণ্ডা জলে সাঁতার দেবার চেষ্টা পেতো। নিজের বয়স এবং বৈধব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল। কায়স্থের মেয়ে ছিল সে, সুতরাং পুষ্পদিদির শাশুড়ী

একদিন তা'কে ইঙ্গিতে মানা করেন, ব্রাহ্মণের রান্না জিনিষ ছুঁতে নেই! সেই অপমানে স্নেহলতা পাশের ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকে সারাদিন। সন্ধ্যার সময়ও দেখি, সে একা ঘরে প'ড়ে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। সান্ত্বনা দিতে গেলুম, সে ধমক দিয়ে উঠলো। কিন্তু এক সময় নিজেই সে উঠে বসলো। সারাদিন কেঁদে-কেঁদে মুখখানা ফুলেছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে, তীর্থে সে আসেনি, তীর্থের বয়স তা'র হয়নি—সে জানে। সে এসেছে তা'র স্বামীর সন্ধান পাবার জন্য!

চৌকাঠের বাইরে বারান্দায় তামাক সাজতে বসেছিলুম। ঠক্ ক'রে আগুনটা প'ড়ে গেল হাত থেকে। অবাক হয়ে স্নেহলতার দিকে তাকালুম। আগেই জানতুম কতকগুলো কথাবার্তা বলবার জন্য সে দিনতিনেক থেকে উসখুস করছিল। আজ অনেকটা যেন নিজ মনুষ্যত্বের উপর আঘাত খেয়ে বেদনাবোধটা তা'র ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। সহসা উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসে সে একপ্রকার চেঁচিয়ে উঠলো, এবং আমাকে নিকট-সম্ভাষণ ক'রে তিরস্কার করলো,—তুমি যদি বিশ্বাস না করো, আমার কিচ্ছু যায় আসে না। ফের বলছি আমিও বিশ্বাস করিনে! পৃথিবীসুদ্ধ লোক বললেও বিশ্বাস করব না।

ফরিদপুরের সেই মেয়ে তা'র কটা-কটা কান্নাভারাতুর চোখ তুলে সবাইকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে ফুঁপিয়ে আবার বলতে লাগলো, না, আমি বিশ্বাস করিনে—সে মরেছে! সে মরেনি, সে মরতে পারে না, তা'র মরবার কথা নয়। এই তা'র বুকের ছাতি, এই ডাকাবুকো চেহারা, রূপ যেন ঠিক্‌রে পড়ছে,—সে অমনি মরলেই হোলো? কখনই না, কিছুতেই না,—আমি তা'কে যেখানে পাই খুঁজে বা'র করবো! তা'রই জন্যে ঘুরছি আজ এক বছর। তা'র ওপর রাগ ক'রে বাপের বাড়ী গিছলুম, তারই শোধ সে নিচ্ছে। যাও, আমি কা'রো কথা শুনবো না!

স্নেহলতা হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। তা'কে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া, তা'কে খাবার জন্য অনুরোধ করা, তা'র এই যুক্তিহীন অর্থহীন ছুটোছুটি,—কোনও কথা নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া সম্পূর্ণ বৃথা। সেদিন তাঁতীবৌকে আড়ালে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ঠিক ব্যাপারটা কি বলুন ত?

তাঁতীবৌ হাসিমুখে বললে, মরবার সময় স্বামীকে দেখতে পায়নি, তাই সকলের ওপর আক্রোশ। একবার যখন রোখ্ চেপেছে, দিন দুই প'ড়ে-প'ড়ে কাঁদবে, মুখে অন্নজল দেবে না,—ভয়ানক রক্তের তেজ! আসলে মেয়েটা কিন্তু ভারি সরল!

সরল, না বোকা?

তাই হবে।—তাঁতীবৌ চ'লে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চামচিকারা ছুটোছুটি করছিল। তামাকের সজ্জা হাতে নিয়ে বাইরে চ'লে গেলুম।

এরই বছর তিনেক পরে অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে স্নেহলতাকে হঠাৎ

দেখেছিলুম কলকাতায় হাজার হাজার নরনারীর ভীড়ের মধ্যে। পরণে ময়লা খদ্দরের থান, ধুলোয় ভরা দুই পা, কালিবর্ণ গায়ের রং, খড়ের আটির মতো মাথার চুল, কোমরে একটি ছোট্ট পুঁটলী, শীর্ণকায় চেহারা,—স্নেহলতা একা যেন কোন্ দিকে চলেছে হনহনিয়ে। ভীড়ের মধ্যে সে হারিয়ে গেল।

ওর এই কাহিনীটি নিয়ে কবে কোথায় যেন একটি ছোট্ট লেখা লিখেছিলুম,—সেই লেখাটা আর খুঁজেও পাইনি।

এই 'কালীকম্বলীর' সদাব্রতের রান্নামহলটি দেখলে আজও অবাক হই। বিশাল এক চুল্লি, ভয়াবহ তা'র ডালের কড়াই আর বিস্তৃত তা'র আটা শানবার পাত্র, বিপুল পরিমাণ খাদ্যবিতরণের ব্যবস্থা। আয়োজনের ব্যাপারটা আগাগোড়া সমস্তই বৃহৎ। বৈরাগী, সন্ন্যাসী, সাধক,—এরা বিনামূল্যে খেতে পায়। কেউ ব'সে খায়, কেউ নিয়ে যায়, কেউ বা রসদ নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে প্রস্তুত ক'রে খায়। যতদূর যাও গাড়োয়ালে, কালীকম্বলীর 'সদাব্রত' যেখানে সেখানে। নেড়িকুকুরের দল ছোঁক ছোঁক ক'রে ভিতরে আসে, আসে বেপরোয়া পাহাড়ী বানরের পাল,—আসে পরিচয়হীন সর্বহারা অজানা দেশের দুর্বোধ্য ভাষাভাষী মানুষ,—অনেকেই এসে তাদের অস্থায়ী বাসা বাঁধে এই বিশালায়তন প্রাচীন ইমারতের গুহায়-গুহায়। কখনও কখনও ঘরে খুঁজে পাওয়া যায় একখানা ছেঁড়া কম্বল বা চাটাই, কোথাও একখানা গেরুয়া লেংটি কিংবা টিনের কৌটা, হয়ত কোনও নিরুদ্দেশ বৈরাগীর পরিত্যক্ত পুঁটলী, কোনও তীর্থযাত্রীর উনুনের পোড়া কাঠ কিংবা ভাঙা মাটির ঘট। এরই একটা ঘরে ম'রে পড়েছিল পণ্ডিত শীৎলাপ্রসাদ,—তা'র ছেঁড়া কম্বল, গামছা আর রবারের জুতোজোড়াটা নিয়ে গা ঢাকা দিল এক বৈরাগী। আবার এখানকারই ওই নোংরা চাতালে এক আমাশয়গ্রস্ত বৃদ্ধ বেণীনন্দনকে ফেলে পালিয়েছিল তা'র সহযাত্রীরা। ওরই পাশের ঘরখানায় এসে উঠেছিলেন কলকাতার এক 'রায়বাহাদুর' তাঁর জন পাঁচেক চাকরদাসী নিয়ে। সেদিন তাঁর প্রতাপে এই প্রাচীন ইমারত কেঁপে উঠেছিল। এসেছিল উদাসী আখড়ার সন্ত বামাদাস—একখানা ছবি টাঙিয়ে তা'র দিকে চেয়ে সে হাসতো আর কাঁদতো। আর এসেছিলেন নাগপুর থেকে আম্মল বাঈ—তাঁর সঙ্গে ছিলেন চারজন জামাই, নয়টি সাবালক পুত্রকন্যা, এবং গুণে দেখেছিলুম, চৌদ্দটি নাতিনাৎনী। তাঁদের দেখে স্থানীয় একটি লোক পথের ধারে তাড়াতাড়ি একটি পুরি আর তরকারির দোকান বানালো। ওরা সবাই দাঁদুড়ে খেয়েছে যত, তার চেয়ে বেশি বানর তাড়িয়েছে। তারপর সবাই যেদিন চ'লে গেল, দেখা গেল সমস্ত ঝুপসি ঘরখানার দেওয়ালগুলিতে কাঠকয়লার অসংখ্য আঁচড়ে ওদের বৃহৎ গোষ্ঠী ও বংশাবলীর নাম লেখা। অঙ্গারের সেই পাণ্ডুলিপি হয়ত আজও মোছেনি।

সন্ন্যাসীর কোনও জাত নেই,—ওরা সমস্ত মুছে দিয়ে হৃষিকেশে চ'লে এসেছে। ওরা আছে চারিদিকে ছড়িয়ে—পাহাড়ের পাশে, নদীর বাঁকে, পাহাড়-

তলীর গুহায়, মুনি-কি-রেতির তপোবনে, বাঁধা নিয়মের আশ্রমে, মন্দিরের চাতালে,—এবং লোকলোচন ও জনকোলাহলের বাইরে। মাঝে মাঝে কোনও পর্ব উপলক্ষ্যে ওদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। দশহরায়, অক্ষয়তৃতীয়ায়, মাঘী অমাবস্যায়, রামনবমীতে, জন্মাষ্টমীতে, শিবরাত্রিতে ইত্যাদি তিথিতে ওরা শতে শতে বেরিয়ে আসে। ওদের ওই গেরুয়ার বর্ণে আর চেহারায় সমগ্র হরিৎবর্ণ পাহাড়তলী আর নীলধারার নয়নবিমোহন সৌন্দর্য—সব মিলে দূরের থেকে মনে হয়, চার পাঁচ হাজার বছর আগের ইতিহাসে যেন পিছিয়ে গেছি,—যখন আর্যরা নেমে আসছে নদীপথের সূত্র ধ'রে ভারত সভ্যতার প্রথম উদ্বোধন করতে। সমগ্র পাহাড়ের ক্রোড়ভূমিগুলি, নদীতীর, মন্দির ও আশ্রমঅঙ্গন,—সব যেন রক্তবরণে ভ'রে ওঠে। তারপর আবার আসে কুম্ভমেলার সময়। তখন বিশাল ভারতের সকল অঞ্চল থেকে সহস্র সহস্র সাধু এসে পৌঁছয় এই 'গঙ্গাবতরণ' অঞ্চলে,—তখন হৃষিকেশ, কনখল আর হরিদ্বার সব একাকার। ওঁকারধ্বনি ওঠে তখন হাজার হাজার কণ্ঠে।

এই হৃষিকেশের প্রবেশপথে একদা এসে পৌঁছেছিলেন গান্ধীজীর অনুগতা শিষ্যা ইংরেজ নারী শ্রীমতী মীরাবেন। তিনি কর্মযোগিনী, তাই গুরুর নির্দেশ পালন করতে এসেছিলেন এতদূরে। তিনি এখানে একটি গোশালা গ'ড়ে তোলেন গঙ্গার একটি প্রান্তপ্রাঙ্গণে,—সেটি আজও এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। তিনি নাকি অপর একটি গোশালার উদ্বোধন করেছেন হিমালয়ের আর একটি গহন অঞ্চলে গিয়ে, শুনতে পাই। এটি তাঁর সাধনারই একটি অঙ্গ,—সমস্ত পরিচয় মুছে দিয়ে সর্বপ্রকার খ্যাতির বাইরে গিয়ে একটি কর্মজীবনের পরম সার্থকতার পথ বেছে নেওয়া,—বিদেশিনীর পক্ষে বিচিত্র বৈকি। তবু তিনি একা নন্,—ইংরেজ, জর্মান, ফরাসী, মার্কিন, ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়,—অনেক দেশ থেকে এসেছে জ্ঞানপিপাসু, সজ্জন, দার্শনিক, সাধু,—তা'রা ছড়িয়ে আছে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে, তাদের অনেকেই রয়ে গেছে হৃষিকেশের এখানে ওখানে। মোটর-বাসের ধূলো, পর্যটকের কৌতূহলী চক্ষু, বাস্তব জীবনের লাভ-ক্ষতি-টানাটানির কোলাহল,—এরা তাদের আশ্রম পর্যন্ত পৌঁছয় না। আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ অবধি বহু সাধুসন্ন্যাসীর কুটীরদ্বার রুদ্ধ থাকে। অনেকে স'রে যায় দূর পাহাড়ের দিকে,—কারণ এই সময়টায় থাকে বায়ুবিলাসী ও স্বাস্থ্যান্বেষীর জনতা,—তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নরনারী নোংরা কৌতূহল আর প্রমোদপ্রবৃত্তি নিয়ে ওদের আনাচে কানাচে ঘুরে ওদেরকে অস্থির ক'রে তোলে। তথাকথিত সভ্য আর শিক্ষিতকে দেখলে ওরা ত্রস্ত হয়। ওরা থাকে জীবনজোড়া জিজ্ঞাসা নিয়ে,—অস্তিত্বের তত্ত্বানুসন্ধানে ওদের দিন কাটে, ওদের প্রাণচৈতন্য আকাশের তারায় তারায় নিবিড় অস্থির পিপাসাবিন্দুর মতো নিত্য ঘুরে বেড়ায়,— তোমার-আমার ক্ষুদ্র কৌতূহল পিপীলিকার দংশনের মতো ওদের নিকট বিরক্তিকর।

নীলকণ্ঠ পর্বতের নীচে দুই বিশাল পাহাড়ের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে

দিগ্বিজয়িনী নীলবর্ণা গঙ্গা ছুটে এসেছেন মর্ত্যে তাঁর নাচের ঝঙ্কার
সেই ঝঙ্কার-ঝনকে হৃষিকেশ নিত্যকাল ধ'রে মুখরিত। হিমালয়ের
চক্রান্ত হার মেনেছে তাঁর কাছে। অতিকায় পাথরের অন্তরায়, উত্তুঙ্গ
বাধা,—এরা তাঁর দুরন্ত রণরঙ্গের কাছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, একে এ
ব্রহ্মলোক দেবলোক তপোলোক পেরিয়ে ছুটে এসেছেন মর্ত্যের মানব
দিকে। কিন্তু শূন্য হস্তে তিনি নেমে আসেননি। ওই অমৃতরসধার
এনেছেন ভারতের মহাজীবনের প্রাণ, এনেছেন বেদ-বেদান্ত-দর্শন-উ
এনেছেন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলমন্ত্র। হৃষিকেশ হোলো সেই প্রথম মত
যেখানে গঙ্গার ঝঙ্কারে শোনা যায় ভাগীরথীর প্রথম প্রতিজ্ঞার ভাষা
প্রাণের দ্বারা প্লাবিত করবেন আর্যসভ্যতাকে, কোটি কোটি নরনারীর
জীবনকে তিনি সঞ্জীবিত করবেন, তিনি আনবেন শুচিতা, স্বাস্থ্য, আয়ু
ও কল্যাণ। জাহ্নবীধারার দুই প্রান্তে জন্ম নিয়েছে নগরসভ্যতা,
ভাস্কর্য, বিবিধ শিল্পকলা, সাহিত্য ও মহাকাব্য। গঙ্গার মূলধারা
শাখানদী উপনদী প্রশাখানদীর কূলে-কূলে চিরকাল জন্ম নিয়েছে অ
সাধক, শিল্পী, মহাকবি, দার্শনিক ও তত্ত্ববিদ্। সেই গঙ্গার প্রথম অব
হোলো এই ব্রহ্মপুরা গাড়োয়ালের ভূস্বর্গপ্রান্ত হৃষিকেশে।

ওই হৃষিকেশের ঘাটে চন্দ্রপক্ষ কেটে গেছে কতবার। ওই নী
আকুলিবিকুলির মধ্যে বিগলিত চন্দ্র কেঁদে কেঁদে বয়ে গেছে ত্রিশ
পাথরের আসনে ব'সে দেহতত্ত্বের গান গেয়ে উঠে গেছে জীবনবৈরাগী, র
কোন্ অস্থির পাখী হিমালয়ের অনন্ত আনন্দ-মহিমার সংবাদ বিতরণ
আমার কানে কানে। বটের ঝুরির নীচে সন্ন্যাসী তা'র ধুনি জ্বালি
তন্দ্রজড়ানো কণ্ঠে 'শিবশম্ভোর' উদ্দেশে ডাক দিচ্ছে, দূর কোনও দেবাল
যাচ্ছে মৃদু উদাত্ত ঘণ্টারব। তখন ওই জ্যোৎস্নার নীচে প্রতি ছায়াচারী
হয়েছে দেবতার প্রতীক্, প্রতি সন্ন্যাসীকে মনে হয়েছে অজর অমর
বেদব্যাস, প্রতি পাথর হয়েছে শিবলিঙ্গ, প্রতিটি ধুনিকে মনে হয়েছে ত
হোমাগ্নি আভা।

স্বর্ণলঙ্কার রাজা রাবণ ছিলেন ত্রিভুবনবিজয়ী; তাঁকে সম্রাট বলতে ব
তিনি ছিলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, এবং আনুষ্ঠানিক। দশ দিকে তাঁর সজা
ছিল, তাই তিনি দশমুণ্ড। তিনি সাধক, পণ্ডিত, প্রেমিক ও বুদ্ধিমান
শক্তি ও সাধ্যে তিনি ছিলেন অজেয়, তাঁর বীর্যবত্তা কৈলাস পর্বতের প্রান্ত
শ্রীলঙ্কা অবধি স[illegible]দিত ছিল। ব্যক্তিত্বে, বিক্রমে, প্রবল প্রতিষ্ঠায়, অনন্য
রণকৌশলে তৎকালে তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন। আত্মশক্তি
তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। কিন্তু শক্তি তাঁর আসুরিক, দৈব নয়,—ও

ছিল বিতর্ক। তাঁর রাজনীতির মূল আদর্শটা দাঁড়িয়েছিল স্বৈরাচার হিংসার উপরে, সেটি উদারনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না। সম্ভবত আর্যজাতির সঙ্গে তাঁর বিরোধের মূল কারণ এইখানে। আর্যরা চেয়েছিল সর্বভারতীয় ঐক্য, তিনি চেয়েছিলেন অসুরশক্তির প্রভুত্ব। সুতরাং রাম-রাবণের যে সংগ্রাম সেটি নর এবং বানরের গদাযুদ্ধের কৌতুকের মধ্যে শেষ হয়নি, সেটি সকল দেশের চিরকালীন রাষ্ট্র ও সমাজের ন্যায়নীতি ও আদর্শের বিশাল পরীক্ষার ক্ষেত্র। ভারত সংস্কৃতির এই মূল ভাষ্যটি বিবর্তিত হয়ে এসেছে কল্পে ও কল্পান্তে। পুরাণে, ইতিহাসে, আধুনিকে এরই পুনরাবৃত্তি। প্রাক্‌বৈদিক যুগে সমুদ্রমন্থনে মহাদেবকে যে হলাহল পান করতে হয়েছিল, একালে এসে গান্ধীজীকেও প্রায় সেই প্রকার বিষ গলাধঃকরণ করতে দেখি। হিটলার এবং ষ্টালিনের মধ্যে রাজা রাবণের ছায়াও অনেকটা পড়েছিল বৈকি।

রক্ষকুলপতিকে সংহার ক'রে আর্যজাতির নেতা সদলবলে এসেছিলেন হৃষিকেশে। এই হৃষিকেশে পৌঁছে রাজা রামচন্দ্র শিবের তপস্যা করেছিলেন,— দেবাসুরের সংগ্রামকালে যিনি হলাহল পান ক'রে হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। সম্ভবত নীলকণ্ঠই রামচন্দ্রকে এই নির্দেশ দেন, ব্রাহ্মণকে তুমি হত্যা করেছ, সেজন্য তোমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। রামচন্দ্র হৃষিকেশ থেকে কিছুদূরে অগ্রসর হয়ে 'তপোলোকের' প্রান্তে গিয়ে দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হন এবং গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানকালে বোধকরি ব্রহ্মহত্যারও প্রায়শ্চিত্ত করেন। ব্রহ্মপুরার পথে এই হৃষিকেশ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় ভরতজীর মন্দির, লছমনঝুলার সাঁকোর পাশেই লক্ষ্মণের মন্দির, মুনি তথা 'মৌনি-কি-রেতির' তপোবনে শত্রুঘ্নজীর মন্দির, এবং দেবপ্রয়াগে রয়েছে রামচন্দ্রের মন্দির।

পরবর্তী যুগে মহর্ষি বেদব্যাস এসে হৃষিকেশে আসন নিয়েছিলেন। তিনি এখানে দুটি প্রধান কর্ম সম্পাদন করেন। প্রথমটি হোলো বেদবিভক্তি। বেদকে তিনি এখানে ব'সে চার ভাগে ভাগ করেন। তাঁর দ্বিতীয় কর্ম হোলো 'কেদারখণ্ড' রচনা। সম্ভবত কেদারখণ্ডের দ্বিতীয় নাম শিবপুরাণ। কিন্তু এই রচনায় শিবস্তোত্রই প্রধান নয়, এটি হোলো সমগ্র ব্রহ্মপুরা তথা গাড়োয়ালের একটি প্রামাণ্য এবং পরোক্ষ মানচিত্র। পৌরাণিক কালের কাহিনী এবং ভূগোলের এমন সার্থক পরিচয় বোধহয় অপর কোনও গ্রন্থে নেই। সেই কারণে মহাভারতের পাশে দাঁড়িয়েও এই 'কেদারখণ্ড' আপন স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য এতকাল ধ'রে বজায় রেখে এসেছে। জনৈক পণ্ডিত এই গ্রন্থখানির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এখানি গাড়োয়ালের সর্বশ্রেষ্ঠ 'গেজেটীয়র।' গাড়োয়ালের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন তীর্থপথ এবং দেবস্থান 'কেদারখণ্ডে' বিবৃত রয়েছে।

হৃষিকেশ ছাড়িয়ে উত্তর দিকে পা বাড়ালেই চন্দ্রভাগার ধারা। এই গিরি-নদীটির আর কোনও পৃথক নাম আছে কিনা আমি শুনিনি। বৎসরের

অধিকাংশকাল এই ধারাটি প্রায় শুষ্ক এবং পাথরের প্রচুর জটলায় আকীর্ণ থাকে, কিন্তু বর্ষায় এই নদীতে ঢল নামে। সম্প্রতি কয়েক বছর হোলো এর উপরে সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছে, এবং এখান দিয়ে মোটরবাস নরেন্দ্রনগর হয়ে দেবপ্রয়াগের দিকে যায়। এই মোটরপথে বিগত কয়েক বছরে কয়েকটি অপঘাতও হয়ে গেছে। যাই হোক, এই সাঁকো পেরিয়ে আন্দাজ মাইল দেড়েক পাহাড়ের ভিতরে এগিয়ে গেলে এক সময় ডান দিকে লছমণঝুলার পথ, এবং বাঁদিকে চ'লে যায় আরেকটি পথ কোটম্বারের দিকে। এই পথের বাঁ দিকে সম্প্রতি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ওঠার জন্য একটি সোপানশ্রেণী নির্মিত হয়েছে, এবং মন্দিরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালে গঙ্গার ওপারে স্বর্গাশ্রমের মন্দিরটিকে বড় সুন্দর মনে হয়। মানুষের মহৎ ভাবনাকে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরকাল ধ'রে কত সহায়তা ক'রে এসেছে, এই অঞ্চলটুকুতে আনাগোনা করলে তা'র প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। হৃষিকেশের প্রায় প্রত্যেকযাত্রী এই অঞ্চলে লছমণঝুলার সাঁকো পেরিয়ে ডানপথে সাধকদের আশ্রম দেখতে দেখতে স্বর্গাশ্রমের প্রশস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে নানা প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হন্, অতঃপর বিনামূল্যে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে আবার হৃষিকেশে ফেরেন। এই পরিক্রমাটি খুবই আনন্দদায়ক।

পথটি কেবল যে মনোরম তাই নয়। হৃষিকেশ থেকেই যেন আধুনিক ভারত সহসা রূপান্তরিত হয় প্রাচীন ভারতে। একটি অনাদিঅন্তহীন কালের হাওয়া লাগে গায়ে। নির্জন পাহাড়ের মধ্যে পাখীর ডাকে, উদাস হাওয়ায় এবং নদীর কলধ্বনিতে—এমন একটি মধুর অবসাদের ক্লান্ত সুর মনের মধ্যে কাঁদতে থাকে, যেটি অনির্বচনীয়। হিমালয়ের হাজার হাজার বর্গমাইলের মধ্যে এইপ্রকার পর্বত-রহস্যনির্গূত নদীপ্রাকৃতের শোভা আছে শত শত,—কিন্তু তা'রা এখানকার মতো এমন অধ্যাত্ম আনন্দের মহিমা ধারণ করে না। বহু পার্বত্যভূভাগ আছে যেগুলি পরম বিস্ময়ের ক্ষেত্র, যেখানকার অপার্থিব রূপ দেখলে রুদ্ধশ্বাস হতে হয়। এমন অগণ্য উপত্যকাপথ আছে,—যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে চক্ষু অপলক হয়, এবং পর্যটক হয় হতবাক,—কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। এটি যেন অধ্যাত্ম ভারতের প্রথম প্রবেশপথ। এখানে পদার্পণ করামাত্র অনুভব করা যায়, অতি পরিচিত বাস্তব জীবনের সর্বপ্রকার অভ্যস্ত সংস্কারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছি। এসে দাঁড়িয়েছি নরলোক এবং তপোলোকের সন্ধিস্থলে। যে কেউ একটিবারের জন্য এ অঞ্চলে এলেই হোলো,—সমস্ত বাকি জীবনের মধ্যে এর স্মৃতি ক্ষুধার মতো ঘুরে বেড়ায়। অনেককাল আগে এই অঞ্চলে এক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর নাম শিউদৎ ত্রিপাঠী। তিনি একসময় কিছুকালের জন্য লাহোরের কলেজে পড়াতেন। পণ্ডিত, সুরসিক, কিন্তু ভয়ানক নাস্তিক। কোনও বিষয়ে তর্ক করতেন না, কিন্তু দুচার কথায় তাঁর কঠোর নাস্তিকতা প্রকাশ পেতো। একদা স্বর্গাশ্রমের একটি গাছের ছায়ার নীচে ব'সে তিনি

, আমাদের মন হোলো আধুনিক। বিজ্ঞানের বাইরে কিছু ভাবিনে, ভাবতে জানিনে। এখানে এলে মনোবিকলন কেন ঘটে, এর স্পষ্ট কৈফিয়ৎ বিজ্ঞানে পাই, মনের যোগও তারই সঙ্গে। তবু এখানে এলে বস্তুতন্ত্র-অরুচিকর লাগে কেন—আমি বলতে পারবো না। বিজ্ঞানের বাইরে এসে য় মন যেন অহেতুক কান্না কাঁদতে চায়,—আশ্চর্য, এর কিন্তু কোনও ; নেই। সমস্ত পাবার পরেও মানুষের তৃপ্তি নেই, এখানে একথা বিশ্বাস জীবনের বাইরে কোনও পরমার্থ নেই, এখানে এসে সেটি ভাবতে ভয় নিয়ন্ত্রণ করছি, কিংবা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি, এ প্রশ্ন এখানে ওঠে। এতকাল বিশ্বাসটি পোষণ ক'রে এসেছি,—এখানে এলে সেই বিশ্বাসের ভিত

৩৬ খৃষ্টাব্দের কোন্ এক সময় পণ্ডিত শিউদৎ ত্রিপাঠী হৃষিকেশ অঞ্চলে মাশ্রম নির্মাণ ক'রে সেখান থেকে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করতে থাকেন। া তাঁকে পেয়ে বসে, এবং তিনি নাকি ওরই জন্য সর্বস্ব খোয়ান্। তাঁকে দিকে একটি মস্ত দল গ'ড়ে ওঠে। অতঃপর তিনি দলীয় লোককেই গালাগালি দিতে আরম্ভ করেন এবং সেই গালির চোটে কৌতুকজনক সৃষ্টি হয়। আমি গিয়ে তাঁকে পুনরায় আবিষ্কার করেছিলুম,—কিন্তু ভিন্ন ও সর্বহারা চেহারা দেখে তাঁকে চেনবার উপায় ছিল না। তিনিও চনতে পারেননি। এর পর হঠাৎ তিনি একদিন আশ্রম ছেড়ে কোথায় হয়ে গেলেন, আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। কেউ বলে এক ভৈরবী রি সঙ্গে।

র এই মাত্র কিছুকাল আগেকার ঘটনাটার কথা মনে পড়ছে। শশাঙ্ক লন। হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশের দিকে যাবার সময় শুনলুম, একটি মেয়ে একাকিনী রহস্যজনকভাবে লছমণঝুলার ওদিকে সম্প্রতি ঘুরে নিরুদ্দিষ্টভাবে। মেয়েটি বি-এ পাস করা, এবং চমৎকার ইংরেজিতে রেন। অতিশয় বুদ্ধিমতী, এবং মিষ্টভাষিণী। তিনি সন্ন্যাস নিতে বলা কঠিন, তবে মনে হয় নিজের জীবনে কোনও একটি বিষয়ে আঘাত পেয়ে দেশ ছেড়ে চ'লে এসেছেন। বয়স কম, বোধ করি। আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠলুম।

ঝুলার ওখানে এসে জানা গেল অনেকেই মেয়েটির সংবাদ রাখে এবং কটা চাপা আলোচনাও রয়েছে। সেই মহিলাকে আমরা আবিষ্কার মণঝুলার সাঁকো পেরিয়ে ডানহাতি বাঁকের মুখে একটি চালা ঘরে। বাজি' তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। একজন বাঙ্গালী শ্যামানন্দ,—পান নি প্রচুর; অন্যজন সিলেটী বোরেগী,—ব'সে ব'সে গঞ্জিকাসেবন মহিলা ঈষৎ গৌরবর্ণা ও স্বাস্থ্যবতী। বয়স পঁচিশের বেশী। পরণে একখানি শতছিন্ন ধুতি ও সেমিজ, মাথার চুল 'বব'-করার

মতো ছাঁটা,—চোখ দুটি শান্ত। আমাদের দেখে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। কোনও ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত নারী এমন ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদে বাইরে এসে দাঁড়ায়, এটি বিস্ময়কর। ফলে, মুখ তুলে কথা বলা কঠিন ছিল। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য এবং অবস্থিতির কারণ জানতে চাইলুম, তিনি সন্তোষজনক কারণ দিতে পারলেন না। বললেন, পথঘাট সবই খোলা, কোথাও যাবার বাধা নেই। প্রায় সপ্তাহ তিনেক এখানে আছি, এখান থেকে ফিরবো না!—তাঁর পরিচয় ইত্যাদি জানতে চাইলুম, কিন্তু তিনি একটি কথাও বলতে প্রস্তুত নন্। বাবাজি দুজন বললেন, মা আমাদের এখানে কোথাও একটি আশ্রম করতে চান্, আমরা সেখানে ওঁকে রেখে ওঁর চরণসেবা করবো। মা আমাদের জগদম্বা, জগদ্ধাত্রী জননী। আহা, মুখ তুলে চাও, মা। সাক্ষাৎ ভগবতীর আবির্ভাব!

একটু সংক্ষেপেই কাহিনীটুকু বলি। এখানে এভাবে তাঁর থাকাটা বিসদৃশ, এটি জানালুম। এবার তিনি বিশুদ্ধ এবং শ্রুতিমধুর ইংরেজি ভাষায় আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি আমাদের নিকট কোনও প্রকার সাহায্য নিতে চান্ না,—তথাপি আমরা কিছু টাকা ও বিশেষ ক'রে কাপড় চোপড় এনে দিতে চাইলুম। কোনও দান তিনি গ্রহণ করবেন না। তাঁর আত্মসম্মানবোধ এবং আত্মরক্ষার নৈতিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি আছে কিনা, অথবা এখানে অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য তাঁকে হীনতা স্বীকার করতে হচ্ছে কিনা—এ সকল প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, এবং অন্ন না জুটলে [illegible] বাস করবেন ও আশ্রয় না পেলে তিনি পথে প'ড়ে থাকবেন। বর্তমানে [illegible] ণজীর মন্দিরে পান্ডার বৃদ্ধা জননীর নিকট বাস করছেন। পরিচয়াদি [illegible] নি সম্পূর্ণ নারাজ, এবং নিজ নামটিও তিনি বলতে প্রস্তুত নন্। [illegible] ীবনযাপন করা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা অধিকতরো শ্রেয়,—আমার এই [illegible] নে তিনি এক সময় সহসা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন, এবং আমার [illegible] তিনি তাঁর সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতার কথা স্মরণ ক'রে আমাকে ডেকে [illegible] চালাটার উত্তর পাশে একটি পাথরের আসনে এসে বসলেন। অদূরে [illegible] রে শশাঙ্কবাবু অপেক্ষা ক'রে রইলেন।

[illegible] ধ্যাহ্নকাল। ঈষৎ কঠোর ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করা ভিন্ন গত্যন্তর [illegible] মহিলা অতি ভদ্র, কিন্তু কঠোরপ্রতিজ্ঞ। তিনি বিবাহিত, এবং [illegible] একটি কন্যার জননী। তাঁর এই অজ্ঞাতবাসের সংবাদ স্বামী অথবা [illegible] যদি কেউ পান্, তবে তাঁরা এই মুহূর্তে ছুটে আসবেন, একথা তিনি বললেন। তাঁর এই পলায়নের পিছনে কোনও প্রকার সামাজিক অথবা নৈতিক কারণ [illegible] ই—স্পষ্টই জানালেন। এক সময়ে তিনি বললেন, তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ করা আর কোনমতেই সম্ভবপর হচ্ছে না, কারণ ভিতরটা তাঁর প্রতি মুহূর্তেই প'চে যাচ্ছে,—'am constantly rotting within myself'. [illegible] পাচ্ছি আমাকে সেজন্য সবাই সরিয়ে দিতে চাইছে।—এই কথা

[illegible] আমার একটি হার [illegible]

[illegible] আমার ঠাকুর ছিল, [illegible] উপর থেকে [illegible] মধ্যে [illegible]

[illegible] একখানা পাথর কোলে [illegible] জানতে চাই [illegible]

[illegible] শেষে তাঁকে [illegible] আমার [illegible] উৎসাহে [illegible]

[illegible] ছিল, [illegible] তিনি [illegible]

[illegible] ও [illegible] যখন [illegible] চারটে [illegible]

[illegible]

[illegible] তাঁর [illegible] অবশ্য ভট্টাচার্য [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] আমি [illegible] অনুরাগ, উল্লাস [illegible] একদিকে [illegible] রয়েছে দুঃখ, দৌর্বল্য [illegible] এই দুই [illegible] নিয়েই [illegible] এসে [illegible] থেকে [illegible] নির্বাধ, তুষারমঙ্কার [illegible] পৃথিবীর [illegible] অন্নদের [illegible] এরা [illegible] অনেকের [illegible] পথে।

[illegible] বছরের অল্প-স্বল্প ডায়েরী এখানেই শেষ [illegible] কিন্তু [illegible] হয়নি [illegible] রয়ে গেল [illegible] পরিচয় প্রকাশ করা [illegible] পথ,—এদের [illegible] উপলব্ধি হয়ত [illegible] পেয়েছি [illegible] সেইটিই ছিল [illegible] আলিঙ্গনের [illegible] এই [illegible] তাকে ফেলে [illegible] বছর আগে।

[illegible] কেননা সেই [illegible] অবারিত থাক [illegible] আনন্দ, কারণ আমি [illegible] জোড়া [illegible] নিবিড় নৈরাশ্য [illegible] প্রবল ব্যাকুলতা,—এরা [illegible] নেই। কিন্তু আপন [illegible] কামনা করি। [illegible] যে-গতি সৃষ্টিলোকের, [illegible] অপমৃত্যু!

[illegible] নিরন্তর!

॥ সমাপ্ত ॥